সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩২।

সবুজ পত্র

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

——:০:——

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উদ্দেশ্যে সবুজ পত্র আবার বার কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, তাহলে সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারব না।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও এ প্রশ্ন ওঠে, এবং তার উত্তরে সেকালে বলি যে,—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ করবার জন্য, এত কাগজ থাক্‌তে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি, তাহলেও আমাদের নিরুত্তর থাক্‌তে হবে"।

কেন যে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সে বিষয়ে সেকালে অনেক কারণ দেখিয়েছিলুম, সে সব কথার পুনরুল্লেখ করা অসঙ্গত; কেননা রসিকতার পুনরাবৃত্তি করা চলেনা, বিশেষত সে রসিকতা যদি স্বকৃত হয়।

সবুজপত্রে পূর্ব্বে যে-সকল কথা বলা হয়েছে সে-সকল কথা আমি রসিকতা বলে মেনে নিচ্ছি এই জন্য যে, বহু গুরুগম্ভীর ক্রিটিকের মতে সে সব কথার ভিতর কোনরূপ গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য

ছিল না। আমাদের কাগজের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্ভবত মিথ্যা নয়। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছিলুম যে "দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়"। ও-জাতীয় প্রবীণচিত্ততা যে অতীতে সবুজ পত্রের অন্তরে ছিল না, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও থাক্‌বে না। সুতরাং শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদকে অভয় দিতে পারি যে, সবুজ পত্র কোনরূপ propagandaর মুখপত্র হবে না। আমাদের হাতে মর্ত্ত্যকে রাতারাতি স্বর্গ করে তোল্‌বার এমন কোনও কাটাছাঁটা programme নেই, যা আমরা বে-পরোয়া হয়ে প্রচার কর্‌তে পারি। আর যদি থাক্‌ত তাহলেও আমরা সে propaganda চালাতে তাদৃশ উৎসাহী হতুম না। মানুষকে কথার তাড়নায় অতিমানুষ বানাতে গিয়ে যে শুধু তাদের অমানুষ করে ফেলা হয়, এর প্রমাণ ইতিহাসে দেদার পাওয়া যায়। Propaganda যে advertisement-এরই একটা বিশেষ ধারা, এ জ্ঞান আমাদের আছে। সবুজ পত্র যে কতটা বিজ্ঞাপনগত প্রাণ, সে সত্য সাহিত্যসমাজে অবিদিত নয়।

মানুষের মতিগতি অনেক পরিমাণে বাহ্য ঘটনার অধীন। অবস্থার ফেরে সে মতি সে গতি মোড় ফেরে। লোকে যাকে "আমি" বলে, সে বস্তু কোনরূপ নির্ব্বিকার পদার্থ নয়। তার অবিচলিত স্থৈর্য্যের উপর নির্ভর করে কোনও কাজে হাত দেওয়া নিরাপদ নয়। বাঁধা প্রোগ্রাম মানুষে তৈরী করে পরের জন্য, নিজের জন্য নয়। তার কারণ প্রত্যেকে সহজেই অপরকে অনাত্ম পদার্থ বলে ধরে নেয়, এবং জড় পদার্থ হিসেবেই গড়তে ও চালাতে চায়। অধিকাংশ লোকও অবশ্য পরের দ্বারা এই ভাবেই চালিত হতে ভালবাসে। তাই তাদের

চালকেরও কখনো অভাব ঘটে না। ভাব্‌বার চিন্তবার বরাত পরের উপর দেওয়াটা অধিকাংশ লোকের পক্ষে বিশেষ আরামজনক। এ সব তর্কের কথা ছেড়ে দিয়েও নির্ভয়ে বলা যায় যে, যিনি একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে চান, তিনি এ কথা কখনই জোর করে বলতে পারেন না যে, তিনি এ বিষয়ে লিখবেন আর ও বিষয়ে লিখবেন না। একটা টাট্‌কা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা যখন সবুজ পত্র প্রথম প্রকাশ করি, তখন ও পত্র ভাষার তর্কে ভরে দেবার আমাদের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। কারণ সেকালে আমাদের ধারণা ছিল যে, ভাষা যে লিখতে পারে সে লেখে, আর যে পারেনা সে তা নিয়ে তর্ক করে। কিন্তু ফলে কি দাঁড়িয়েছে? বছরের পর বছর ধরে সবুজ পত্রকে ভাষা সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডায় অনবরত যোগ দিতে হয়েছে। এবার কিন্তু এ কথা ভরসা করে বলতে পারি যে, ও তর্ক সবুজ পত্রে আর স্থান পাবে না, কারণ সাধুভাষা-বনাম-চল্‌তি বাঙলার মামলায় সবুজ পত্রের জিত হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ একটি উচ্চ আদালতের রায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল পণ্ডিতপ্রবর শ্রী মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয় তাঁর সঙ্কলিত "সাহিত্য প্রবেশ" নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন যে,—

"লিখিত ও কথিত বাঙলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলি যেন দুই ভিন্ন যুগের বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ এই যে, লিখিত ভাষার ক্রিয়ার বিভক্তিগুলি এখন এত অপ্রচলিত হইয়াছে যে, সে ভাষায় কথা কহিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কোন জীবিত ভাষার এরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে না। সেইজন্য অনেক প্রতিভাশালী লেখক এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং

এই পথের প্রদর্শক। তাহার পর প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ভাষায় সাহিত্য মধ্যে চলিত ক্রিয়ার রূপ ব্যবহার করিয়া এক নূতন আদর্শের বাঙলা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় ভাষার মধ্যে আর একটি বৈষম্য আসিয়া পড়িয়াছে। প্রচলিত ক্রিয়াপদের সহিত সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করাতে তাঁহার রচনা কিরূপ বেখাপ বলিয়া মনে হয়। বিজলী প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকার ভাষায় এই বৈষম্য দূর হইয়াছে। এই ভাষার নমুনা স্বরূপ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা উদ্ধৃত করা গেল। হয়ত কালে এইরূপ ভাষাই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে।"

পণ্ডিত মশায় বীরবলী ভাষার যে বৈষম্য লক্ষ্য করেছেন, সে দোষকে পণ্ডিতী ভাষায় গুরু-চণ্ডালী দোষ বলা হয়। এ দোষ যে পাণ্ডিত্যের কাছে কত দূর অসহ্য, তা উক্ত দোষের নামকরণেই বোঝা যায়। তদ্ভব ক্রিয়াপদের সঙ্গে তৎসম বিশেষ্য বিশেষণ যোগ করলে রচনা যে কতদূর বিষম ও বিকট হয়, তার একটি জবর উদাহরণ দিচ্ছি।

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কন হানে, অধীর রুধির বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥"

গুরু-চণ্ডালী দোষের এর চাইতে বিষম উদাহরণ আমার আর জানা নেই। এই কটি শ্রুতিকটু ছত্র যে কোনও শব্দালঙ্কারসিদ্ধ পণ্ডিত মশায়ের কলম থেকে ভুলেও বেরত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে দোষ থেকে স্বয়ং ভারতচন্দ্রের রচনা মুক্ত নয়, সে দোষ থেকে আমাদের লেখা যে মুক্ত হবে, এ দুরাশা আমরা কখনো

মনে পোষণ করিনি। এখন শুনছি যে, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকার ভাষা, উক্ত সমাসের সন্ধি বিচ্ছেদ করে, সমতা প্রাপ্ত হয়েছে—অর্থাৎ গুরু-চণ্ডালীর গুরুত্ব পরিহার করে তার অবশিষ্ট গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এ মত সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলতে পারিনে। যদি হয়, তাহলে এ কথা শুনে আর কেউ না হোক্, বীরবল মহা আনন্দিত হবেন। কারণ বিজলী প্রভৃতি পত্রিকার ভিতর বীরবলেরও হাত যথেষ্ট দেখা দিয়েছে।

সে যাই হোক্, অধ্যাপক মহাশয়ের শেষ বাক্যের নীচে আমিও নিঃসঙ্কোচে সই করতে পারি, শুধু তার একটি পদ বাদ দিয়ে। মুরলী বাবু বলেছেন যে,—

"হয়ত কালে এইরূপ ভাষাই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে"। হয়ত কেন?—নিশ্চয়ই স্থান পাবে। স্কুলবুক নামক উচ্চ সাহিত্যে যখন সে ভাষা স্থান পেয়েছে, তখন বাজে সাহিত্যে যে পাবে, এ ত ধরা কথা। এই কারণেই ভরসা করে বলতে পারি যে, ভাষার তর্ক সবুজ পত্রকে আর করতে হবে না। কেননা আমাদের ভাষা সাহিত্যে প্রমোশন পেয়েছে।

আমাদের লেখায় যে শুধু তৎসম শব্দ আছে তাই নয়, খুব সম্ভবত তৎসম মনোভাবও আছে। শুধু সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ নয়, সংস্কৃত মনোভাবের সঙ্গেও যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরা আমাদের লেখা একটু মন দিয়ে পড়লেই দেখতে পাবেন যে, তার ভিতর পূর্ব্বোক্তজাতীয় মনোভাবও এখানে ওখানে ঠেলে বেরিয়েছে। তদ্ভব ও দেশী মনোভাবের সঙ্গে তৎসম মনোভাবের সমাবেশ যাঁদের কাছে বেখাপ্পা লাগে, তাঁদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি যে,

এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের ধাতুসাম্য আমরা হাজার চেষ্টাতেও করতে কৃতকার্য্য হব না। বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসন্তান মাত্রেই তাদের দেহের কাঠামের ন্যায় মনের কাঠামও উত্তরাধিকারী স্বত্বে লাভ করেছে। যে মন নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি, তার উপর অতীতের হাতের অনেক লেখা অমর হয়ে রয়েছে, যা আমাদের মনের শ্লেটের নতুন লেখার সবর্ণ নয়। সময়ে সময়ে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, এই সব নতুন লেখার চাইতে সেই পুরোনো লেখার অক্ষরগুলি মনের ভিতর বেশী জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। নব শিক্ষার ঘস্‌ড়ানিতে সে লেখা আমরা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারিনে। আজকালকার অনেক নতুন ভাব যে আমরা গ্রাহ্য ও আত্মসাৎ করতে পারিনে, তার মূলে রয়েছে ঐ প্রাচীন লেখার বাধা। আর সত্য কথা বলতে হলে, প্রাচীন কথা মাত্রই অগ্রাহ্য আর নবীন কথাই গ্রাহ্য, এ মত, যা নবীন তাই অগ্রাহ্য আর যা প্রাচীন তাই গ্রাহ্য, এ মতের মতই সমান বাজে ও সমান মিছে। এ সব কথা পরিষ্কার করে বলে রাখছি এই জন্যে যে, সবুজ পত্রের কপালে ভবিষ্যতে যদি এই অপবাদ জোটে যে, সে পত্র re-actionary, সে অপবাদের ভয়ে আমরা ত্রস্ত হব না। কারণ নূতন ও পুরাতনের মধ্যে কোনও পূর্ণ ছেদ আমরা দেখতে পাই নে। অতীত যেমন অনেকাংশে বর্ত্তমান হয়ে উঠেছে, বর্ত্তমানও তেমনি অনেকাংশে চোখের সুমুখে অতীত হয়ে যাচ্ছে। যে সকল মতামত সেকেলে, তার বেশীর ভাগ অবশ্য নৈসর্গিক নিয়মে বুড়ো হয়ে মারা যায়। অপরপক্ষে একেলে মতামতের মধ্যে infant mortality কিছু কম নয়। এমন কি একালে যে সব মতামত, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই, যুদ্ধং

দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে ও বেজায় হাত পা ছোঁড়ে—তারাও দেখতে পাই অচিরে রণলীলা সম্বরণ করে।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরুরা একটা মহাসত্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন পুরোনো মনোভাবকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে renovate করা—অর্থাৎ তাকে নব কলেবর দান করা। আজকের দিনে দেশের যত ভাবুক লোক, জ্ঞাতসারে হোক্, অজ্ঞাতসারে হোক্ - সেই কাজই করছেন। অর্থাৎ যে সকল তৎসম-ভাবের অন্তরে প্রাণ আছে, দেশের মন থেকে সে সব ঝরে যায় নি; শুধু রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের নব শিক্ষাদীক্ষা যে সকল নতুন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেই সকল ভাবের সঙ্গে মিলে মিশে আমাদের পুরোনো মনোভাব সব নব রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ আমাদের মনের বাক্সে এমন পৃথক পৃথক খোপ নেই, যার ভিতর দেশী বিদেশী ভাব সব পরস্পর নিঃসম্পর্কিত ও অস্পৃশ্য ভাবে বাস করতে পারে। মানুষের মন হিন্দু সমাজের ছাঁচে গড়া নয়। ফলে, নূতন পুরাতন, দেশী বিলেতি, সবরকম ভাবেরই আমাদের মনের ভিতর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়—সুতরাং তাদের ভিতর দ্বন্দ্ব ও মিলন দুই ঘটে। যেখানে দ্বন্দ্ব বেশি, সেখানেই আমাদের দুর্ব্বলতা; আর যেখানে মিলন বেশি, সেখানেই আমাদের শক্তি। সুতরাং সবুজপত্রে যদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় মনোভাবের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন মনোভাবের entente-এর পরিচয় কেউ পান, তাহলে আমরা তার জন্য লজ্জিত হব না।

বিলেতি সাহিত্যের প্রভাব যে আমাদের মনের উপর যথেষ্ট আছে, সে কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, কারণ আমাদের লেখার

ভিতরই সকলে সে সত্যের পরিচয় পাবেন। এ সত্য গোপন করবার কোনও প্রয়োজনও নেই, যেহেতু আহেল-বিলাতি মনোভাবকে সংস্কৃতের বেনামিতে চালাবার প্রবৃত্তি আমাদের ধাতে নেই। মনোজগতের অসংখ্য জর্ম্মাণ মাল যে আমাদের ভাবের হাটে মুনিঋষিদের নামে চালানো হচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, তার কারণ আর্য্যাবর্ত্ত ও বর্ত্তমান জর্ম্মানী যে এক দেশ নয়, এ ধারণা অনেকের নেই; যেহেতু জিওগ্রাফির চর্চ্চা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হয় না। ইউরোপে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন আমার জনৈক বন্ধু আমাকে বলেন যে, poison-gas তৈরী করবার প্রকরণ পদ্ধতি সব "ধনুর্ব্বেদে" আছে। ও শাস্ত্রের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত নেই, সুতরাং তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না, তাই উত্তরে বললুম I hope not। বর্ত্তমান ইউরোপে অনেকরকম মানসিক poison-gasও তৈরী হচ্ছে, আশা করি বেদ উপনিষদে সে সবের গন্ধমাত্রও নেই; কেননা এ সব gas জড় মস্তিষ্ক হতে প্রসূত, বড় মন থেকে নয়। অনেক ক্ষেত্রে তৎসম মনোভাব এই সব বিষাক্ত বাষ্পের আক্রমণ থেকে আমাদের মনকে বাঁচাবার সনাতন রক্ষা-কবচ। সম্প্রতি সবুজপত্রের পরম হিতৈষী ধীমান শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "সবুজ পত্র" যেন mass-mind-এর উপাসক না হয়ে ওঠে। নিজ মনকে হট্টমনে লীন করে দেবার নামই যে মুক্তি, এ অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রচারক আমরা যে হয়ে উঠব, এ ভয় পাবার তাঁর কোন সঙ্গত কারণ নেই। যে কথা জাহাজ চড়ে আসে, তারই অন্তরে যে এক জাহাজ অর্থ আছে, এ বিশ্বাস আমাদের পূর্ব্বেও ছিল না, আশা করি পরেও জন্মাবে না। এ আশার

কারণ এই যে, দু-একটি তৎসম বাক্য এ ক্ষেত্রে আমাদের মনের রক্ষা-কবচ হয়ে রয়েছে। মহাভারতে আছে যে,—

পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা।
তুষ্যন্তি চ পৃথক সর্ব্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া॥
কারণান্তর যোগেন যোগে যেষাং সমা মতিঃ।
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃত॥
তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যোন্যোন্যং বিপদ্যতে॥

অন্বার্থ:—

পুরুষে পুরুষে যে পৃথক পৃথক শোভনা বুদ্ধি আছে, সকলেই সেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। কারণান্তর সমুদয় দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি সমতা ধারণ করে এবং যাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট হয় এবং পরস্পরকে বহুমান করে, সেই সেই মনুষ্যের তৎ তৎকালের সেই সেই বুদ্ধি কাল সহকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া তাহাদের বিপন্ন করে।

পূর্ব্বোক্ত কথা-কটির বক্তা হচ্ছেন—অশ্বত্থমা। অশ্বত্থমা মহাভারতে দুরাচার বলে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মহাভারতের কোন মহাপুরুষই অশ্বত্থমার চরিত্রমনের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তেজস্বিতার কথা বলতে ভোলেন নি। অপর যে ক্ষেত্রে উক্ত মতের সার্থকতা থাক্‌ আর না থাক্‌, সাহিত্যক্ষেত্রে ওর সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। যিনি নিজের বুদ্ধিকে শোভনা না মনে করেন, যিনি নিজের প্রজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন, যিনি মতামতের জন্য নিত্য পরমুখাপেক্ষী, যিনি হয় গুরু-গঞ্জনা নয় লোক-লাঞ্ছনার ভয়ে অতি কাতর,—তাঁর আসন সাহিত্যে নয়, তাঁর সিংহাসন সংবাদপত্রে।

সবুজ পত্র যখন সাহিত্যের অথবা সাহিত্যিকের পত্র, তখন তা হট্ট-বুদ্ধির শরণাপন্ন হবে না, আর যদি হয়, তখনই ধরে নিতে হবে যে, তা মাসিক হলেও দৈনিকে পরিণত হয়েছে। ভাল কথা, সাহিত্য জিনিষটে কি? এই পৃথিবীতে গত তিন হাজার বৎসর ধরে নানা দেশে নানা লোক এ প্রশ্নের নানা উত্তর দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন উত্তরই অদ্যাবধি চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়নি। আমরা বলি সাহিত্য হচ্ছে সেই জিনিষ, যার কোনও utility নেই। যিনি ঐ utility শব্দের বিলেতি অর্থ জানেন, তিনিই আমাদের definition-এর মর্ম্ম বুঝবেন। আমার শেষ কথা এই যে, সবুজ পত্র কারও উনুনে হাঁড়ি চড়াবার সাহায্য করবে না, বড় জোর উনুন ধরাবার কাজে লাগতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চরকা।

চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করিনি অপবাদ দিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালীতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার পরে সম্পূর্ণ নির্ম্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এ'তে আমার ব্যথা দূর হ'ল, তাছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধ্‌বে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বন্য দ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুল্‌লে নারায়ণের দরবারে হিসাব নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সীর মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু

কোনো একটার পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত, তখন সে জন্যে কারো কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সী ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকৃত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সীই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে?—এদিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, "ওরে পালোয়ান, কূল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা,—কোনোটা উত্তরে কোনটা দক্ষিণে।"

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষ ফললুব্ধ শাসনকর্ত্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক-কলের মজুর, এক উর্দ্দিপরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায়নি, সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চল্‌ছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তাহলে সেই "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর" দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জান্‌ব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ

বলবান্। এই মরণের ধর্ম্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের পরেই এক একটি বিশেষ কাজের বরাৎ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরীর বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম্ম। এইরকমে পিঁপ্ড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্ত্তা, যে সৃষ্টি করে, এ'তে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরী করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্মজন্মান্তরের পুনরাবর্ত্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাব্‌ছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্ম্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান্ শুধু এইটুকু নয়, এম্‌নি করে যারা কল ব'নে গেল তারা বীর্য্য হারালো, কোন আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধ'রে চতুর তাদের ঠকাচ্চে, গুরু তাদের ভোলাচ্চে, প্রবল তাদের কানমলা দিচ্চে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্ম্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে' আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্য্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবন্মৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা

মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন, এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাৎ। মানুষের খোলের মধ্যে ঘুর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন বলে' অত্যন্ত ছট্‌ফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল ক'রে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা ক'রে তবে কর্ত্তারা একদলের কাছে কেবলি আদায় করছেন তাঁদের কাপড়, আরেক দলের কাছে কেবলি ঘানির তেল, এক দল কেবলি জোগাচ্চে তাঁদের ফরমাসের হাঁড়ি, আর এক দল বানাচ্চে লাঙলের ফাল। তারপরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড় কাজে তাদের মন পেতে, তারা বলে বসে, "মন ? সেটা আবার কোন্ আপদ ? হুকুম করো না কেন ? মন্ত্র আওড়াও।"

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরী করতে গেলে, সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁট্‌তে হয়। তেমনি ক'রে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্ম্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এদিকে ওদিকে তার গোটাকতক ডাল-পালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম ক'রে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মত মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তাহলে কেউ যেন উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এই জন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্চে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্য্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায়নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্দ্ধা বলে মনে করবেন,

বিশেষ রাগ করবেন, কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে-মাছটা ফস্‌কে যায়, তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত, কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ ক'রে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবী বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেননি যে, আগে বাহ্যিক তারপরে আন্তরিক, আগে অন্নবস্ত্র তারপরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড় দাবী ক'রে তাকে বড় সম্মান দিয়েছিলেন, আর সেই বড় সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হ'য়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ, অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি—তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশজুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে, তাহলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয়

পান না। মানুষ পাথরের মতো জড় পদার্থ হ'লে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্ত্তি বদল করা যেত,—কিন্তু মানুষের মূর্ত্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই—হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল পাঠানের ধাক্কা যেই লাগ্‌ল, হিন্দু-রাজত্বের ছোটো ছোটো আল্‌গা পাট্‌কেলের কাঁচা ইমারৎ চারদিক থেকে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায়নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ, তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটী ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্ব্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারিনি তার কারণ এ নয় যে আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই,—কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন মোগল পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও ত ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম, তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মত জল ধরে রাখা যায়। এদিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনা পাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি, এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সব চেয়ে বড় দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য

মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তাহলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলা দেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে—কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই, তাহলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্ত্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরাণীর কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরাণীগিরির দেশে সকলেই জানে। সঙ্কীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মত অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জন্যেই, যে সব কাজ মুখ্যতঃ কোনো একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন, কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশী চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরী করে, তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—অর্থাৎ না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে, তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধান-

তর অর্দ্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড় সভ্যতাই, হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরীর আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চ্চার সামনে যদি কোনো বড় নৈতিক সাধনা থাকে, সে হচ্চে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্চে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।

একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে-বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে,—তাই মানুষ

মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ অন্তরের প্রাণ উভয়কেই রক্ষা কর্‌তে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্ম্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুল্‌তেই হবে, নইলে সমাজ চল্‌বে না। এই সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায় স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভার-লাঘবতার মত ঐশ্বর্য্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্ব্বে প্রথম বুঝতে পারলে, যেদিন প্রথম চাকা ঘুর্‌ল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগ্‌ল, ধন তখন থেকে চক্রবর্ত্তী হয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম, তেমনি আরেকটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে, অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এই জন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকিনি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ, তাহলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাবো না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্চে এ কথা যদি ভুলি, তাহলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে, তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায়, সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে। তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোন কাজ করো না, এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো, এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়? স্বরাজ সাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দ্দিষ্ট, আর তার চারদিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্চে না? বস্তুত সে কি এতই মস্ত? ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে,—চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে? একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু তাও কি সম্ভব হয়েছে? পূজাবিধিই কি এক হল, না দেবতাই হল একটি? দেবতাকে আর দেবার্চ্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসচে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজ-তীর্থের সাধন-মন্দিরে একমাত্র চরকা দেবীর কাছেই সকলের

অর্ঘ্য এসে মিলবে? মানবধর্ম্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী ব'লে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে, এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হ'ল। সে বার বার মনে মনে সকল রকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবী মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্যায় দাবী। স্বরাজ সাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড় যখন ডাক দেন তখন বড় দাবী করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেন না, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চম্‌কে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ ব'লেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজোর পরে আমাদের ভরসা বেশী। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবী থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি, তাহলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্ত্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার

এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম ক'রে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি, আর মনে মনে বল্‌ছি স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চল্‌ছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন ক'রে বল্‌তে হচ্চে যে, স্বরাজের ভিৎ বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড় হ'তে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাক্‌বে।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিল্‌বে এমন চর্চ্চা এখানে কোনো দিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে, সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এই জন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড় মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোট বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মত এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়, যদি প্রমাণ করতে পারি এখানেও প্রতিযোগিতাই মানব-শক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য,—তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার ক'রে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রাম-সমাজে এই

ক্ষেত্রে মেলবার চর্চ্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদিবা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের বিষয়-বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়-বুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি। এ পর্য্যন্ত এমনিই চলচে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্ত ভাবে স্বকীয় স্বার্থ সাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত, সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলি ভারি হয়ে উঠ্‌চে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে, এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট ক'রে বুঝবে যে, সর্ব্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্ম্মনীতিকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চ্চা, এগুলোকে কেবল পরামার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় ব'লে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়ত রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু মানুষ যখন মানুষ, তখন তার

জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই ত চাই। কয়েক বছর পূর্ব্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানব সভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য—মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো একটা বাহ্য কর্ম্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়-তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়, এই জন্য বহু কর্ম্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজী ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকা সাধনার পক্ষে এ সে রকম পথ নয়। বুঝেছিলুম এই পথ দিয়ে কোনো একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্ম্মবীর A. E. রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়

জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড় সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি, এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বই কি। কোনো বড় সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিষের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বল্‌চেন, অনেকে বিশ্বাসও করচেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেচেন, এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চল্‌চেও না, রাগারাগি চল্‌চে। যাঁরা তর্কে নামেন, তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তাহলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিষটা জটিল মিশ্র জিনিষ। আর এ জিনিষটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্ব্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে

এক করে ধ'রে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না? দেশশুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে, তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারী থুৎকার-প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেল্‌বেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা প্রবর্ত্তনে প্রথম লেগেছিলেন, তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম সুরু হয়েছে, National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে, তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে-দেশের যে-কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তিনি

একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন ক'রে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তেত্রিশকোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ ক'রে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে, তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল ক'রে দেখে, তারা জানেনা যে অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বল্‌লেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্য দূর বা স্বরাজ লাভ বল্‌লে যতখানি বোঝায়, তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ্য ততদূর পর্য্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কি? চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে, তখন চাষীর, এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্ব্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাওনা কেন। মনে আছে এই জাতীয় আর একটা কথা পূর্ব্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি, তাহলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরো অনেক জিনিষ আছে, যাকে

আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন না; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্য দোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ লাভের যে একটা বিশেষ উদ্যোগ চল্‌চে, দেশশুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্ব্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারো তো মনেও হয় না। তার কি কোন কারণ নেই? এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্ম্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার ক'রে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্ম্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্ম্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিস্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্ম্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, এ সব কথাই সত্য ব'লে মানলেও তবু বল্‌তেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেই জন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুল্‌তে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এই জন্যেই জলের শুচিতা রক্ষার ধর্ম্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্ম্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্ম্মের সঙ্গে আচার ধর্ম্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম

দুর্গতি যে কত ঘট্‌চে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্ব্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের বেশে গদাহাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করচে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্ব্বলতার আর একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর একদিন আর কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়ত স্বারাজ্য সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয়, সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণা-সভায় ঢুক্‌তে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশী দিন চলে, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেনপাত উপলক্ষ্যে মানুষের রক্তপাত করতে থাক্‌বে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে, এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তাহলে সেদিন ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা ফাটাফাটি হয়েছে, এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচার পরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি, সেই অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুল্‌চে।

কেউ কেউ বলবেন তুমি যে সমবায়-জীবিকার কথা বল্‌চ, সকলে মিলে চরকা কাটাই ত তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দু-সমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্ব-মূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। ওটা একটা কর্ম্ম, ওটা একটা

সত্য নয়। এই জন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকচে, পুকুরের জল তখন মলিন হচ্চে, ঘরের কানাচের কাছে গর্ত্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহতপ্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করচে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই—এই সাবধানতার মূলে প্যাষ্ট্যর-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্ম্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মত প্রকাণ্ড; সেই জন্যেই এই কর্ম্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচ্‌চে, মানুষ বাঁচ্‌চে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বশুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে-অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেচে, তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্য্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড় ক'রে দেখ্‌লে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কি হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জ্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক্, বলশালী করুক্, তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সঙ্কল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক্—এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন

রায়ের মত অত বড় মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বল্‌তে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি,—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্ম্ম-বিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে, যাকে আমার স্বধর্ম্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারচে না। সে জন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে? ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি বিচারে চরকার যতটুকু মর্য্যাদা, তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা ক'রে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্ব্বেও বারবার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য্য রক্ষা করেছেন, আজও করবেন; আচার্য্য রায় মশায়ও অনাদর-নিরপেক্ষ মত-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতা সভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না ক'রে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর যাঁরা আমার দেশের লোক, যাদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন, কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদিবা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি, কালও তেমনি হয়ত এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব, যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অন্ধকার

——:০:——

অন্ধকার—ওগো অন্ধকার !
অসীমের রাজপাটে একেশ্বরী অয়ি বন্ধ-দ্বার,
নিবিড় নিকষ তব ঘনকৃষ্ণ চিকুরের তলে
নিখিল পাগল-করা কালো চোখে যে মাণিক জ্বলে,
নিশীথ বিরলে ;
কোনো দিন কারো কাছে মিলিল না সন্ধান তাহার
ব্যর্থ বসুধার,
অয়ি অন্ধকার !

বিদেশিকা হে অন্তঃপুরিকা,
চিরদিন উপেক্ষিছ আলোকের অন্ধ অহমিকা ;
দর্শন হয়েছে অন্ধ, বিজ্ঞানের হ'ল জ্ঞান হারা,
ধ্যানের স্তিমিত নেত্রে অঝোরে ঝরিল বারিধারা
খুঁজিয়া কিনারা ;
ভাষার আভাষ পাতে আঁকিবারে তব রূপচ্ছবি
চাহে মুগ্ধ কবি !

বিশ্বজয়ি অয়ি একেশ্বরি,
তোমার তিমির-দুর্গে জাগে ভয় সতর্ক প্রহরী ;

দ্বারে দ্বারে অজানার আতঙ্কেতে ত্রস্ত যাত্রী সব,
পথে পথে অচেনার আশঙ্কার আর্ত্ত কলরব
ভীষণ ভৈরব;
কুহুনিশীথিনী তার কাকপক্ষ অন্ধ পাখা দিয়া
রাখে আগলিয়া!

হে অজানা ওগো অন্ধকার,
যা-কিছু জানি বা চিনি, তারো মর্ম্মে তব অধিকার!
খনিগর্ভে গিরিগর্ত্তে বনমধ্যে সমুদ্রের জলে
তোমার বিজয়-চিহ্ন প্রতি ছত্রে আঁকা ধরাতলে
সর্ব্ব জলস্থলে;
সীমা নাই শেষ নাই বাধা নাই—বসুন্ধরা কাঁপে
তোমার প্রতাপে।

হে অচেনা, হে চির অজানা!
মানবের মনোমাঝে কে খুঁজিবে তোমার ঠিকানা?
কোথা ফুটে প্রেমপুষ্প কোন্ সে নিভৃত অন্তরালে,
কোথা ছুটে গন্ধ তার কোন্ রস-রহস্য-পাতালে,
কোন্ সন্ধ্যাকালে;
চিত্তকুহরের ফাঁকে পাকে পাকে কত হিংসাবিষ
ফুঁসে অহর্নিশ!

তমোময় তোমার আলয়ে
সূর্য্য চন্দ্র কোনোদিন দৃষ্টি তার হানেনাক ভয়ে;

প্রগল্‌ভের অন্তরালে রচিয়াছ তব রাজধানী,
ত্রিলোক যোগায় নিত্য নিদ্রারূপে পরাভব মানি'
রাজকর খানি;
মরণ-তোরণ-দ্বারে ডাক যারে, সেই শুধু যায়
তব পদচ্ছায়!

রঙ্গময়ি হে অবগুণ্ঠিতা!
তুমি কিন্তু ত্রিভুবনে হের নিত্য চির অকুণ্ঠিতা;
বন্ধ বাতায়নপথে অপরূপ কালো ভুরু হানি'
বাসনার হাত হ'তে খসাও উদ্ধত অসিখানি,
ওগো মহারাণি;
লালসার বক্রদৃষ্টি নিবে তব সংক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসে
মৌন অট্টহাসে!

হে নিঃসঙ্গ, তবু ভাবি মনে—
তোমারও ঈপ্সিত বুঝি আছে কেহ সুদূর ভুবনে!
বিরহ বেদনা যার ধূমাঙ্কিত বাসনার ধূপে
ছাপিয়া হৃদয় তব চিররাত্রি জ্বলে কালোরূপে
তমিস্রার স্তূপে;
একবেণীধরা তুমি জাগ নিত্য নিশীথ শয়নে
বিনিদ্র নয়নে!

হে ব্যথিতা, হে অপরিচিতা,
তব রূক্ষ কটাক্ষেতে নিবে' যায় দিবসের চিতা;

সখী রাত্রি একা যাত্রী তোমার গহন কুঞ্জবনে,
অপরাজিতায় ঘেরা; কোকিলের মৌন আলাপনে
জাগে তব সনে;
তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বভয়হারা
যোগে আত্মহারা!

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দেহ দেবি, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্ব্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিল মা আর,
মাঝে দুদিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি' পরপার,
হে চির আঁধার;
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে!

ওগো মাতা, ওগো অন্ধকার!
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে,
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে।
অতুল সে কালো রূপে, ছায়া ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারম্বার,
অয়ি অন্ধকার!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সবুজের হিন্দুয়ানী।

সম্পাদক মহাশয় শুনেছেন অনেকের আশঙ্কা, নবপর্য্যায়ের 'সবুজ পত্র' নাকি হবে জীর্ণ হিন্দুয়ানীর আতপত্র। কথা কি করে রট্‌লো বলা যায় না, তবে এ কথা বলা যায় যে, ভয় একেবারে অমূলক নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বয়স হয়ে আস্‌ছে; আর প্রথম বয়সের ইংরাজী-পড়া তার্কিক যে শেষ বয়সের শাস্ত্রভক্ত গোঁড়াহিন্দু,—এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই যাদের ভাবনা হয়েছে পুনরুদ্গত 'সবুজ পত্র' আধুনিকতার প্রখর রশ্মি থেকে প্রাচীন হিন্দুত্বকে ঢেকে রাখ্‌বে, তাদের ভয়কে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ তিনি কেবল ইংরাজীনবীশ নন, ইউরোপের আরও দু একটা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যনবীশ; যার ফলে ইংরেজী মদের নেশা কোনও দিনই তাঁকে বেসামাল কর্‌তে পারে নি। আর হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চাও তিনি শেষ বয়সে 'বঙ্গবাসীর' অনুবাদ মারফত আরম্ভ করেন নি, তরুণ বয়স থেকেই শাস্ত্রকারদের নিজ হাতের তৈরী খাঁটি জিনিষে নিজেকে অভ্যস্ত করে এসেছেন। এখন আর ওর প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়্‌বার তাঁর কোনও সম্ভাবনা নেই।

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রের

উপর চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি যে, গোঁড়া গদ্গদ ভক্তি নয়, তার যথার্থ কারণ এ দুয়ের উপর তাঁর অসীম প্রীতি, কেননা ওখানে তাঁর নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও চৌধুরী মহাশয়ের শরীরে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রক্তের ধারা কতটা অক্ষুণ্ণ আছে, এ নিয়ে হয়ত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্ক তুল্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও মনোভাব যে, প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি ও মনোভাবের অক্ষুণ্ণ ধারা, এতে আর তর্ক চলে না। শাস্ত্রকার মনু কি ভাষ্যকার মেধাতিথি, এঁদের সঙ্গে আজ মুখোমুখী সাক্ষাৎ হলে তাঁরা অবশ্য চৌধুরী মহাশয়কে নিজেদের বংশধর বলে চিনতে পারতেন না ; বরং পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলনে প্রত্যন্তবাসী কশ্চিৎ ম্লেচ্ছ বলেই মনে করতেন। কিন্তু দু'চার কথার আদানপ্রদানে টপ্‌হ্যাট ও ফ্রক্ কোটের নীচে যে মগজ ও মন রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়কে এই বলে আশীর্ব্বাদ করতেন :—

"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদাং শতম্।"

'হে পুত্র! আমাদের আত্মাই তোমাতে জন্ম পরিগ্রহ করেছে। তুমি শতবৎসর পরমায়ু নিয়ে অযজ্ঞিয় ম্লেচ্ছপ্রায় বঙ্গদেশে ইস্পাতের লেখনীমুখে আর্য্যমনোভাব প্রচার ও তার গুণ কীর্ত্তন কর।'

এই আর্য্যমনোভাব বস্তুটি কি, একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। কারণ প্রমথবাবু যদি 'সবুজপত্রে' হিন্দুয়ানী প্রচার করেন, তবে এই মনোভাবেরই প্রচার করবেন।

যে প্রাচীন আর্য্যেরা হিন্দুসভ্যতা গড়েছে, তাদের সকলের মনোভাব কিছু একরকম ছিল না। হিন্দুসভ্যতার জটিল বৈচিত্র্য

দেখ্‌লেই তা বোঝা যায়। যারা উপনিষদ রচেছে ও যারা ভক্তিশাস্ত্র লিখেছে; পুরুষার্থ সাধন ব'লে যারা যাগ যজ্ঞ-বিধির সূক্ষ্ম বিচার ও বিচারপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছে; ও যারা চতুরার্য্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ করেছে; যারা শ্রুতিকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের পরম প্রমাণ বলেছে, ও যারা বলেছে বেদ লোকযাত্রা-বিদ্‌দের লোক-নিন্দা থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র (১); ন্যায়-দর্শন যাদের তত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি করেছে, ও যারা অখণ্ড অদ্বয় বাদে না পৌঁছে থামতে পারে নি—তারা সবাই ছিল আর্য্য, এবং হিন্দুসভ্যতা গড়ার কাজে সবারই হাত আছে। এক দল অনুশাসন দিয়েছে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ ও প্রজোৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে তবে বানপ্রস্থী হয়ে মোক্ষ চিন্তা করবে, নইলে অধোগতি হবে; অন্য দল উপদেশ করেছে যেদিন মনে বৈরাগ্য জাগবে সেইদিনই প্রব্রজ্যা নেবে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির উপায় রাজাকে শেখাবার জন্য এক দল 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছে; অপর দল 'ধর্ম্মশাস্ত্র' লিখে সে পথ দিয়ে হাঁটতে রাজাকে মানা করেছে। কেউ বলেছে পুত্রের জন্মমাত্র সে পৈতৃক ধনে পিতার মতই স্বত্ব লাভ করে, কেউ বিধান দিয়েছে পিতা যতদিন বেঁচে আছে পুত্রের ততদিন কোনও স্বত্ব নেই। যে লৌকিক প্রবচন বলে এমন মুনি নেই যাঁর ভিন্ন মত নেই, তার লক্ষ্য হিন্দু সভ্যতাস্রষ্টাদের এই মতবিরোধের বৈচিত্র্য।

---

(১) "বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, সংবরণ মাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।"

(কৌটিল্য ১২)

এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই, বিশেষত্বও কিছু নেই। যে-কোনও বড় সভ্যতার মধ্যেই এই বিরোধ ও ভেদ দেখতে পাওয়া যাবে। সভ্যতা হ'ল মনের স্বচ্ছন্দ লীলার সৃষ্টি। বহু মনের লীলাভঙ্গী বিচিত্র না হয়ে যদি সৈন্যের কুচের মত একেবারে একতন্ত্র হ'ত, তবে সেইটেই হ'ত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও যখন জাতি-বিশেষের নামে কোনও সভ্যতার নামকরণ করি, যেমন হিন্দুসভ্যতা কি গ্রীকসভ্যতা,—তখন যে কেবল এই খবর জানাতে চাই যে, কতকগুলি বস্তুজগতের ও মনোরাজ্যের সৃষ্টি বংশপরম্পরাক্রমে মোটামুটি এক জাতির লোকের কাজ, তা নয়। প্রকাশ্য বা নিগূঢ় ভাবে এ ইঙ্গিত প্রায় সকল সময়ে থাকে যে, ঐ সব বিচিত্র, বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন আছে, যে ঐক্য কেবল জন্মস্থান-সমতার ঐক্য নয়, কিন্তু ভাবগত ও রুচিগত ঐক্য। খুব সম্ভব এ ঐক্যের মূল ঐ জন্মগত ঐক্য। কারণ ঐ সৃষ্টিগুলির যারা কর্ত্তা, তাদের শিরার রক্ত ও মাথার মগজের এক মূল জীব থেকে উৎপত্তি, এবং তাদের প্রাকৃতিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিকও অনেক অংশে এক। অতি বড় প্রতিভাশালী স্রষ্টাও এর প্রভাব এড়াতে পারে না, ও এড়াতে চায় না। ফলে তাদের সৃষ্ট সভ্যতা তার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নানা পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও ভিতরের কাঠামো খানি প্রায় বাহাল রাখে। ঘরের চাল বদ্‌লে যায়, দরজা জানালার পরিবর্ত্তন হয়, পুরানো বেড়া তুলে ফেলে নতুন বেড়া বসান হয়, কিন্তু মাঝের 'ফ্রেম্'টি বজায় থাকে। আর্য্যমনোভাব হিন্দু-সভ্যতার এই "ষ্টীলফ্রেম"।

বলা বাহুল্য এ 'ষ্টীলফ্রেমের' শলাকা চোখে দেখা যায় না।

চুম্বকের 'লাইন্‌স্ অব্ ফোর্সেস্' শক্তিসঞ্চার পথের মত সেগুলি অদৃশ্য। তাদের উপাদান কোনও বস্তুসমষ্টি নয়, এমন কি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানও নয়। চিন্তা বা মননের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গী, ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশেষমুখী প্রবণতা দিয়ে এ 'ফ্রেম' তৈরী। সুতরাং আর্য্যমনোভাব জিনিষটিকে রূপরেখায় চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রত্যক্ষ পরিচয় হলে এ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট ছবি মনে এঁকে যায়, ভাষায় তার মূর্ত্তি গড়া সুদক্ষ শিল্পীর কাজ। সে অনধিকার চেষ্টায় উদ্বাহু না হয়ে শাদা কথায় তার দু' একটা লক্ষণের কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র করবো।

ইংরেজীতে যাকে 'সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্' বলে, আমরা তার বাঙ্গলা নাম দিয়েছি ভাবালুতা। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ চল্লিশ বছর ছিল এই ভাবালুতার পুরো জোয়ারের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর যে ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন পুষ্ট হচ্ছিল, সে কাব্য ও সাহিত্য 'সেণ্টি-মেণ্টালিজ্‌ম্' এর রসে ভরা; সুতরাং তার প্রেরণায় বাঙ্গালী যে সাহিত্য সৃষ্টি করছিল, তা ভাবালুতায় ভরপুর। এবং প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মাত্র যে অংশের তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর প্রভাব ছিল, সেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যও এই ভাবালুতার অনুকূল। এই মানসিক আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের যে লক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চোখ ও মন সব চেয়ে সহজে ও সবলে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে 'সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্' বা ভাবালুতার অভাব; এবং কেবল অভাব নয়, বিরোধী ভাবের আধিপত্য। কারণ

প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবে এমন একটা ঋজু কাঠিন্য ছিল, যা কি শরীর কি মনের সমস্তরকম নুইয়ে পড়া ও লতিয়ে চলার বিরুদ্ধ। কালিদাস আর্য্যরাজার মৃগয়াকর্ষিত শরীরের যে ছবি এঁকেছেন, সেটা প্রাচীন আর্য্যমনেরও ছবি।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।"

"মেদহীন কৃশতা ঋজু দীর্ঘতায় কৃশ বলে' লক্ষ্য হয় না। পর্ব্বত-চারী গজের মত দেহ যেন কেবল প্রাণের উপাদানেই গড়া।" অথচ এই মেদশূন্য কৃশতা কল্পনা-অকুশল মনের বস্তুতান্ত্রিক রিক্ততা নয়। হিন্দুর বিরাট পুরাণ ও কথাসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গাথার বিপুলতা ভারতীয় আর্য্যমনের অফুরন্ত কল্পনালীলার পরিচয় দিচ্ছে। এ কাঠিন্যও শুষ্কপেশী কঙ্কালসার কাঠিন্য নয়। ভাবের দীনতা, রসবোধ ও রসসৃষ্টির অক্ষমতা, জাতির মনকে বিধিনিষেধ-সর্ব্বস্ব যে শুষ্ক কঠিনতা দেয়, সে কাঠিন্য হিন্দুর কখনও ছিল না। বেদসূক্তের উষার বন্দনা থেকে ভর্ত্তৃহরির শতকত্রয় পর্য্যন্ত ভাব ও রসের সহস্র ধারা তাকে পাকে পাকে ঘিরেছে, তার ভোগকে শোভন ও জীবনযাত্রাকে মণ্ডনের জন্য চৌষট্টি কলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্ত ভাব ও কল্পনা, রস ও কলাশিল্পের মধ্যে একটা সরল, কঠিন মেরুদণ্ড সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যমনে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা যাকে বলি "ভাবে গলে' যাওয়া", তার মাধুর্য্য সে মনের রসনা আস্বাদ করে নি। ভগবান বুদ্ধ লোকের জন্মজরামরণের দুঃখে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু চোখের জল ছাড়েন নি।

পণ্ডিত লোকে এমনও বলেছে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি মূলে ছিল যাযাবর লুঠতরাজের দল—'প্রিডেটারি নোমাড্‌স্‌'। অন্য ধ্রুবশীল সভ্যজাতির ঘাড়ে চেপে তাদের পরিশ্রমের অন্ন খেতে খেতে তাদেরি সংস্পর্শে তারা ক্রমে সভ্য হয়েছে। এই ধার-করা সভ্যতার বীজ উর্ব্বরা জমীতে খুবই ফলেছে বটে, কিন্তু তার শিকড় আদিম যাযাবরত্বের প্রস্তরকঠিন অন্তর ভেঙ্গে মাটি কর্‌তে পারে নি, ফুলপাতায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। এ মতের ঐতিহাসিক মূল যতটা থাক না থাক, এটি স্পষ্টই প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা পৌরাণিক অর্থাৎ 'ইভলিউ-শনারি' ব্যাখ্যা। একটি ছোট উদাহরণ দিই। নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন হিন্দুর প্রিয়বস্তু ছিল। হিন্দু আলঙ্কারিকেরা কাব্যের মধ্যে নাটককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের শিল্পকলার সংখ্যাও গণনায় চৌষট্টি পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র একযোগে বিধান দিয়েছে—কারুকর্ম্ম ও কুশীলবের কর্ম্ম শূদ্রের কাজ, আর্য্যের নয়। (১)

উদাহরণে পুঁথি বেড়ে যায়। কিন্তু আর্য্যমনের এই কাঠিন্য যে কত কঠোর, তা তাঁরা নিজেদের জীবনের অপরাহ্ণকালের জন্য যে দুটি আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কথা একটু কল্পনা কর্‌লেই উপলব্ধি হয়।

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥" (মনুঃ ৬।২)

"গৃহস্থ যখন দেখ্‌বে গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে আস্‌ছে, চুলে পাক ধরেছে, ও পুত্রের পুত্র জন্মেছে", অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অপটু শরীরে

(১) "শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম্ম চ।" (কৌটিল্য ১।৩)

গৃহের ছোটখাটো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র পৌত্রের সেবা ও শ্রদ্ধা সব চেয়ে কাম্য হয়ে এসেছে, তখন ঘর ছেড়ে বনে প্রস্থান করবে।” হ'তে পারে সে বন খুব বন্য ছিল না। কিন্তু পুরাতন প্রিয় গৃহ ও সমাজের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্বন্ধচ্ছেদের নির্ম্মমতাতেই তা ভীষণ।

“ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ ॥” (মনুঃ ৬।১৬)

‘ভূমিকর্ষণে যা জন্মেছে, পড়ে পেলেও তা আহার করবে না। আর্ত্ত হলেও গ্রামজাত ফলমূল গ্রহণ করবে না।’ এই বনবাসে উগ্র তপস্যায় নিজের দেহ শোষণ করাই ছিল বিধি।

“তপশ্চরং শ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।” (মনুঃ ৬।২৪)

কিন্তু মৃত্যুকে অভিনন্দন ক'রে এ জীবনেরও সংক্ষেপ কামনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

“নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥” (মনুঃ ৬।৪৫)

“মরণকেও কামনা করবে না, জীবনকেও কামনা করবে না। ভৃত্য যেমন ভৃতিপরিশোধের অপেক্ষা করে, তেমনি কালের অপেক্ষা করবে।”

বানপ্রস্থের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কতটা অনুরাগ আছে জানিনে, কিন্তু মনের যে বীর্য্য নিজের বার্দ্ধক্যদশার জন্য এই বানপ্রস্থের বিধান করেছিল, সেই বীর্য্য তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন আর্য্যমনের এই বীর্য্য ফিরিয়ে আনতে চান। এবং বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

যদি re-actionary হয়, তবে চৌধুরী মহাশয়কেও re-actionary বল্‌তে হবে।

হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্য কালবশে কমে আস্‌ছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে কমার বেগ ক্রমে দ্রুত হয়ে এখন প্রায় লোপের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের একটা কোমলতা, গুটি কয়েক রসে আবিষ্টতা ও ভাবে বিহ্বলতা, তার খালি জায়গা অনেকটা জুড়ে বসেছে। হিন্দুর সচল মন নিশ্চেস্ট থাকে নি। এই নূতন মনোভাবের উপযোগী ধর্ম্মসাধনা, কাব্য ও দর্শন গড়ে উঠেছে। বাঙ্গলা দেশে এর সাধক শ্রীচৈতন্য, কবি চণ্ডীদাস; দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী। প্রমথ বাবু যদি 'সবুজপত্রে' প্রাচীন হিন্দুয়ানী প্রচার কর্‌তে চান, তবে এই নবীন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে তাঁকে লড়্‌তে হবে। কারণ 'পুরুষ ব্যাঘ্র বনাম মানুষ মেষ'-এর মামলায় তিনি যে বেদখল বাদীর পক্ষে সরাসরি একতর্ফা ডিক্রী পাবেন, এমন মনে হয় না। প্রথম ত তামাদি দোষ কাটাতে বেগ পেতে হবে। তারপর সভ্যতার ইতিহাসে বাঘের চেয়ে মেষ হয়ত সভ্যতর জীব। এবং 'দাসমনোভাবের' চেয়ে যে, 'প্রভুমনোভাব' শ্রেষ্ঠ, তাও বিচার সাপেক্ষ। যাহোক, এ তর্ক যদি প্রমথ বাবু সত্য সত্যই তুল্‌তে পারেন, তবে বাঙ্গলা সাহিত্যে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের একটা নতুন সংস্করণ অভিনয় হবে। কারণ অসম্ভব নয় যে, বাঙ্গলার তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুর কতকটা কাঠিন্য ও বীর্য্য বিকট ছদ্মবেশে লুকান আছে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমথ বাবুর একমাত্র প্রতিমল্ল হবে না। বাঙ্গালীর ইংরাজী-শিক্ষিত মন আজকার দিনে অনেক রকম 'সমন্বয়'

সাধন করেছে। বৈষ্ণব আচার্য্যেরা যে রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সে রস ইক্ষুরস। সাংসারিক ভোগসুখ, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সমস্ত পিষে ফেলে তবে সে রস নিঙ্‌ড়ে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির বিধানে আজ আমরা ঠিক সেখানে বসে নেই। আমাদের ইংরেজী শিক্ষায় 'এক্‌লেক্‌টিক্' মন ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের সঙ্গেও রসতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। আফিস, আদালত, সেয়ার মার্কেট, খবরের কাগজ, এ সব বাহাল রেখেই আমরা ও-রস ভোগ কর্‌ছি। অর্থাৎ ও-রস এখন আর ইক্ষুদণ্ডে বদ্ধ নেই, পেটেণ্ট করে' বোতলে পোরা হয়েছে। দিনের কাজের শেষে, কি ছুটির দিনে, খুব সুখে ও সহজে ওকে ঢেলে সম্ভোগ করা চলে। প্রাচীন হিন্দুর পক্ষ নিলে এ 'সমন্বয়ের' সঙ্গে প্রমথ বাবুকে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বর্ণসঙ্করের বিরুদ্ধ হলেও আধুনিক বিজ্ঞান নাকি তার সপক্ষ। সুতরাং এ যুদ্ধ জেতাও সহজ হবে না। মোট কথা প্রাচীন হিন্দুয়ানীর যুদ্ধ লড়্‌তে হলে, প্রাচীন হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্যের প্রয়োজন হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মনে ও গুণ আছে বলেই জানি। সুতরাং তিনি এতে সাহসী হলেও হতে পারেন।

আমার কথা ফুরোয় নি, কিন্তু 'সবুজ পত্রের' পাতা ফুরিয়েছে। পাঠকদের যদি ধৈর্য্য থাকে, আর্য্যমনোভাবের আর দু'-একটা দিক বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

চিত্তরঞ্জন।

——ঃ০ঃ——

চিত্তরঞ্জন দাসের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই আমাকে তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামত নানা ইংরাজী ও বাঙলা কাগজে অল্পবিস্তর প্রকাশ করতে হয়েছে। এখন সেই সব লেখা পড়ে দেখছি যে, আত্মশক্তিতে তাঁর বিষয় যে দু-কথা বলি, সেই কথাই আমার মনের খাঁটি কথা। আর আমার বিশ্বাস সে দু-কথা সত্য কথা এবং চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে সার কথা। এই বিশ্বাসের বলেই আমি সবুজ পত্রে সে দু-কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"আত্মশক্তি সম্পাদকের অনুরোধ,—দেশবন্ধুর বিষয়ে আমাকে দু'কথা বলতে হবে।

সে অনুরোধ শিরোধার্য্য করে আমি তাঁর বিষয়ে শুধু দু কথাই বলব।

উপনিষদের ঋষিরা বলে গেছেন "অল্পে সুখ নেই"। আমরা বেশির ভাগ লোক কিন্তু অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকি।

অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জনের কখনই অল্পে মনস্তুষ্টি হত না। অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন উপনিষদকারদের সহজ শিষ্য। কি-ধন, কি-মান, কি-পদ, কি-সম্পদ, কি-ক্ষমতা, কি-প্রভুত্ব, কি-ভোগ, কি-ত্যাগ, কোন বিষয়ে তিনি

স্বল্পের সাধনা কখনই করেন নি,—নিজের জন্যও নয়, দেশের জন্যও নয়।

মহাভারতের একটি শ্লোকে বলে :—

স্থপূরা-বৈ কুনদিকা স্থপুরো মুষিকাঞ্জলিঃ।
স্থসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি॥

অর্থাৎ কাপুরুষেরাই স্বল্পে সন্তুষ্ট হয়, যেমন অল্পজলে কুনদী পূর্ণ হয়—অল্পেতেই মুষিকাঞ্জলি ভরে ওঠে।

এ সব শাস্ত্রীয় নিন্দাবাদ সত্ত্বেও আমরা অধিকাংশ লোক যে মুষিকাঞ্জলিতেই সন্তুষ্ট থাকি তার কারণ, আমরা আমাদের অঞ্জলীর মাপ জানি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের শক্তিরও সীমা জানি। সাধারণ লোকের অন্তরে আর যে শক্তিই থাক্, আত্মশক্তি নেই। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে যে শক্তির পরিচয় পেয়ে বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ হয়েছে, সেই অনন্যসাধারণ শক্তির নাম আত্মশক্তি। আত্মশক্তি জিনিষটে কি?—বুদ্ধিবলও নয়, হৃদয়বলও নয়, মনোবলও নয়, এমন কি এ তিনের সন্নিপাতজ শক্তিও নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদয়বল বুদ্ধিবলকে খর্ব্ব করে,—বুদ্ধিবল ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে। মানুষের আত্মশক্তি হচ্ছে সেই জাতীয় শক্তি, যার দেখা পেলে আমরা চিনতে পারি, যদিচ মুখে তার পরিচয় দিতে পারিনে। দেশের লোক একমনে চিত্তরঞ্জনকে যে অসাধারণ লোক বলে মেনে নিয়েছেন, তার কারণ দেশের লোক অন্তরের অন্তরে অনুভব করছেন যে তাঁর সকল কাজ সকল কথার মূলে ছিল আত্মশক্তি। অর্থাৎ সেই শক্তি, যা দেশকাল অবস্থার দ্বারা সৃষ্টও নয়, সম্পূর্ণ নিয়মিতও নয়, কিন্তু

সকল প্রকার বাহ্য কারণের অতিরিক্ত। পুরাকালে সংস্কৃত ভাষায় এ শক্তির নাম ছিল ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানতেন যে এ হচ্ছে একপ্রকার লোকোত্তর শক্তি।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বের ১৩৩শ অধ্যায় হতে উদ্ধৃত। এ হচ্ছে সৌবীররাজ মহিষী বিদুলার কথা। উক্ত অধ্যায়ে বিদুলার আরও অনেক কথা আছে, যা চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে। যশস্বিনী ও দীর্ঘদর্শিনী বিদুলা বলেছেন যে,—

যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতম।
রাশিবর্দ্ধণ মাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান॥

অর্থাৎ,

লোকে যার মহদদ্ভুত চরিত্রের জল্পনা না করে, সে ব্যক্তি স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, তার অস্তিত্ব সুধু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য।—চিত্তরঞ্জন যে এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না, তার প্রমাণ দেশসুদ্ধ লোক আজ তাঁর মহদদ্ভুত চরিত্রের বিষয় জল্পনা করছে। বিদুলা আরও বলেন যে—

"মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয় ন তু ধূমায়িতং চিরম"

অধিকাংশ লোকের মন যেখানে ধোঁয়ায়, চিত্তরঞ্জনের মন সেখানে জ্বলে উঠ্‌ত। এই কারণেই তিনি দেশে বিদেশে লোকচক্ষু আকর্ষণ করেছেন। সুধু তাই নয়, লোকসমাজ যে সমস্বরে চিত্তরঞ্জনের গুণগান করছে, তার কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, তাঁর প্রকৃতির লোক এ যুগে একান্ত দুর্ল্লভ। বিদুলার আর একটি কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি বলছেন যে—

শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রীয়া বা বিক্রমেন বা।
জনান্ যোঽভিভবত্যন্যান্ কর্ম্মনা হি স বৈ পুমান্॥

অর্থাৎ,

"যে মানব বিদ্যা, তপস্যা, ধনসম্পত্তি, অথবা বিক্রমের দ্বারা সকলকে অতিক্রম করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।"

দেশের লোক চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে এই অসামান্য পৌরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেই এত চমৎকৃত হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে, বেশির ভাগ মানব শুধু রাশিবর্দ্ধক মাত্র।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অতীত।

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না নিঃশেষ অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;—
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি,
কোন্ সুদূরের বাণী
তার মাঝে গুপ্ত থাকে, কি বলে সে কে বুঝিতে পারে।
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
জড়ায় অশ্রুর বাষ্পজাল;
অতীতের সূর্য্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে'
মৃত্যুর ঐশ্বর্য্য দেয় ঢেলে',
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল,
নাম ভুলে যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হ'তে বহে আনে ;
যেন কি অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে
মিলনের রাতে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

প্রভাতী।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয় কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু।
বলে, "এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধু সঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এসো এ বক্ষমাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে॥

দেখ চেয়ে কোন্ উতলা পবন বেগে
সুরের আঘাত লেগে'
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কি যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হের কি আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি'।

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী,
অরুণ পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি ॥

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাওনি সে সংবাদ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা
দিকে দিকে আজি পাওনি কি সে বারতা?
শোনোনি কি গাহে পাখী,
হে কালো কাজল আঁখি?
শিশির শিহরা পল্লব ঝলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল,
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একদা।

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি,
সেখানে মিলেছিনু সময়-হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজি একা ভেসে
কোথা যে কতদূর দেশে,—
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে;
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি',
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি॥

সেখানে বসেছিনু আপনা-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে,
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া ওঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুসি ওঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
তারায় হল তারাময়,

প্রাণের নিঃশ্বাস কি মহাবেগে
ছুটিছে দশদিকগামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি ॥

বিজনে বসেছিনু আকাশে চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখি পাতে।
সে দিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি ॥

বুঝিনু কি আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে,
কেন যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে।

অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে;
রজনী কি খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী
বুঝিনু, যবে দোঁহে পরাণপণে
খেলিনু তুমি আর আমি ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র।

সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনি সবুজ পত্র আবার প্রকাশ করছেন শুনে সুখী হলুম। সবুজ পত্রের কাছে যুবক সম্প্রদায় সকলেই ঋণী, বিশেষ করে এই আমাদের ত্রিশ বছরের দল। যখন প্রথম সবুজ পত্র বের হল, তখন আমরা কলেজে প্রবেশ করেছি, জ্ঞানের ভিখারী, বইয়ের পর বই পড়ি। কিন্তু সে সব বই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও এক নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত। কোন-কিছুর তোয়াক্কা না রাখাই সে সব বইয়ের ভঙ্গী। আবার বয়সের ধর্ম্মে আমাদের ভাবনাগুলিও তখন পাহাড়ের ঝরনার মতন প্রচলিত সংস্কারগুলিকে ডিঙ্গিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের ভাবধারার আদিতে যে শক্তিই থাক না কেন, তার শিরে ছিল ঘন কুয়াসা। সে কুয়াসা ভেদ করার শক্তি আমাদের ছিল না বলেই আমরা প্রত্যেকেই সেই ভাবধারার পাদদেশে এক কুসুমকানন রচনা করেছিলাম। আপনার দলের লেখা সে কুয়াসা নষ্ট করে দেয়, তাই সবুজ পত্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কুয়াসা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি যে, কুসুমকাননও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে এ অপচয়ে আমরা দুঃখিত হলুম। তারপর যখন বুঝলুম যে, ঝরনা নদীতে আশ্রয় নিয়েছে, আর সে নদী দেশের মাটীকে উর্ব্বর করেছে, তখন এই বুঝে আর আনন্দের সীমা রইল না যে, স্বাধীনতার বেগ নিষ্কাম এবং উদ্দেশ্যবিহীন হলেও পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ। রবি বাবু আমাদের সমাজকে অচলায়তন বলেছেন—সেটি বোধহয়

অন্যের গড়া, তাই কি তাকে অসংস্কৃত মনের বেষ্টনও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধিরও একটা আবেষ্টন আছে—তার বাঁধন আরো শক্ত, আরো অজানিতভাবে নিবিড়। আপনি এবং আপনার দল কোন উপদেশ না দিয়ে আমাদের ঐ কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন বলে আমরা আজ খানিকটা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছি। বর্ত্তমানে দেখছি যুবকদের মনে সমাজ-বন্ধন, ও ইংরেজী বুলির দাসত্ববন্ধন ছাড়া রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতার এক নতুন বন্ধন এসে পড়েছে। সমাজ-বন্ধন জীবন যাত্রার পক্ষে দরকারী, মনের কাছে নয়; ইংরেজী বুলির দাস হলে হয়ত নেতা হওয়া যায়, কিন্তু মন স্বাধীন হয় না। ভাবপ্রবণতার সাহায্যে দেশকে নাড়া দেওয়া যায় শুনেছি। নাড়া দেওয়া এবং নড়ে যাওয়া, এ দুটি মানুষের পক্ষে চরম কথা নয়। গন্ধমাদনের জীবজন্তুরা হনুমানের কাঁধে নাড়া খেয়ে জেগে উঠে যে মানুষ হয়ে উঠেছিল, এ কথা রামায়ণে প্রকাশ নেই। স্বরাজ, ত্যাগ-ধর্ম্ম, অহিংসা, অসহযোগ, দাস-মনোভাব, প্রভৃতি ধরতাই বুলির সাহায্যে মন কখনও মুক্ত হবে না। অতএব প্রায় ১৫ বছর আগে যে সমস্যা আমাদের ছিল, তা এখনও রয়েছে, বরং তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে। সবুজ পত্র তখন সে সমস্যা-সমাধানে তৎপর হয়েছিল, এবং অন্ততঃ জনকয়েকের পক্ষে সমাধান করেও ছিল—স্বাধীনতার অমৃত বণ্টন করে। আমরা আশা করছি সবুজ পত্র এখনও যুবকবৃন্দের মন থেকে কথার নেশা আবার ঘুচিয়ে দেবে।

আশাও করছি, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে যদি সবুজ পত্র "ভুর্জ্জ" পত্রে পরিণত হয়ে থাকে। সেই জন্য আমরা প্রথম সংখ্যা পড়বার

জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছি। আপনাকে গোড়ায় বলে রাখা ভাল যে, নিম্নোক্ত লক্ষণ দুটি সবুজ পত্রে প্রকাশ পেলে, আমরা আপনাদের পত্রখানিকে অন্যান্য বাজে পত্রিকার সঙ্গে ওজন দরে বাজারে ছেড়ে দেব।

(১) কি কাজ করতে হবে, তার প্রোগ্রাম তৈরীকরণ।

(২) সমাজ-মন, জাতীয় মন, দলের মন বোলে একটি নতুন পদার্থে বিশ্বাস করা এবং তাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

কাজ আমরা না করে থাকতেই পারি না, কিন্তু কাজের চেয়ে কি মনোভাবে কাজ করি, সেইটেই আসল কথা—এই অভিজ্ঞতা আমরা অর্জ্জন করেছি। অর্থাৎ মন তৈরী আগে দরকার। মন তৈরী হওয়ার মানে মনের ধর্ম্ম বোঝা। সে ধর্ম্ম হচ্ছে স্বাধীনতা। মনের ধর্ম্ম বোঝার অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার গোড়ার কথা এবং উপায় হচ্ছে আলোচনা, বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্য। প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধিছাড়া নয়, যখনই জোর কোরে বুদ্ধিকে প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করি, তখনই আলোচনা abstraction-এ পরিণত হয়। বুদ্ধির সাথে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ মানলেই আলোচনা কার্য্যকরী হয়। তথাকথিত শব্দ-বুদ্ধির সাহায্যে জোর প্রোগ্রাম তৈরী হয়, কাজ হয় না। মন শুধু তা'তে স্বপন্থা হারায়, কথার কুয়াসার ভিতর। কথা এবং কার্য্যের অসহযোগ হয় তখনই, যখন পণ্ডিতী বুদ্ধির সাহায্যে কথা কর্ম্মচ্যুত এবং কার্য্য বুদ্ধিচ্যুত হয়ে পড়ে। সেই জন্য সম্পাদক মহাশয়, আপনি দয়া কোরে পণ্ডিতী তর্কের প্রশ্রয় দেবেন না, এবং প্রোগ্রামসমূহকে দূরে পরিহার করবেন—এই আমাদের অনুরোধ। বছর চারেক মাষ্টারী করে দেখেছি যে, পণ্ডিতমূর্খই ভারতের সব চেয়ে অপকারী জীব,

এবং প্রোগ্রাম তৈরী করাই সব চেয়ে বৃথা কাজ। কারণ সেটা কাজও নয়, কথাও নয়। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, এই মাষ্টারদের এবং সমাজ-সংস্কারকদের ধারণা এই যে, দেশোন্নতি করা একটি ইমারৎ গড়ারই মতন কাজ, অর্থাৎ ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়ে যাওয়া, mechanics-এর নিয়ম অনুসারে। নিউটন সাহেব অনেক খাঁটি কথা বোলে গিয়েছেন, সত্য। সভ্যতা যদি মনোরাজ্যের বস্তু হয়, তাহলে অবশ্য নিউটনের নিয়মগুলিকে খাটাবার চেষ্টা বৃথা। আমরা একটি মনের ওপর আর একটি মনের প্রভাব কি তা জানি নে, উন্নতি এবং অবনতি কি পদার্থ তা জানি নে, তবে তাদের লক্ষণগুলিকে চিন্‌তে শিখেছি। যদিও আজকালকার মনোস্তত্ত্ববিদেরা সে লক্ষণ গুলিকে অঙ্কের নিয়মে ফেলতে তৎপর হয়েছেন, তথাপি Behaviourism সম্বন্ধে যে কেউ পড়েছেন, তিনিই জানেন সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়েছে। অঙ্কের হাত থেকে সমাজতত্ত্ব উদ্ধার করা একটি মহৎ কাজ, এই আমার বিশ্বাস,—কেননা সব সময়ে হিসেব করা দরকারী কাজ হলেও, সেটি বেণে বুদ্ধির পরিচায়ক। সম্পাদক মশাই, শুনেছি আপনি বেণে বুদ্ধির বিরোধী, তাই আপনাকে প্রোগ্রাম না বাঁধতে অনুরোধ করছি।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, নতুন সবুজ পত্রের কোন ছত্রে যেন সমাজ-মন, জাতীয়-মন ইত্যাদি কথা না থাকে, এবং একমাত্র ব্যক্তিগত মন ছাড়া আর কোন মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রকাশ না পায়। যখনই দেখেছি কি শুনেছি State কিম্বা নেতারা লোকদিগকে উৎসাহিত করেছেন অতিমানুষিক মনের দোহাই দিয়ে, তখনই তার ফলে সাধারণ লোকেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, হয় অন্য লোকের সঙ্গে,

নয় নিজেদের দেশের ভিন্ন মতাবলম্বীর সঙ্গে। কোন সমষ্টির মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া আরো অন্য কারণ আছে। ও পদার্থ হয় যোগ নয় বিয়োগে তৈরী। মনের যোগবিয়োগ হয় না, জড় পদার্থেরই হয়। কেউ কেউ বলেন, একত্র থাকার ফলে একটি মন ও আর একটি মনের সংমিশ্রণে নতুন একটি মনের সৃষ্টি হয়। নতুন মনটিকে কিন্তু শাসকের দল ছাড়া আর কেউ চিন্তে পারে না। পরের কাছে আত্মসমর্পণ করা মনের ধর্ম্ম নয়, তবে জোর করে আত্মসমর্পণ করান শাসক-ধর্ম্ম বটে। একত্র বাসে মন যে এক হয়ে যায় না, এ প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিই জানেন। হয় না, তার নাম একটি tradition। সেটি বাইরের জিনিষ, তার ক্ষমতা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মতনই কার্য্যকরী। এবং তার ফল নির্ভর করে তার নিজের শক্তির উপর নয়, ব্যক্তির তা ব্যবহার করবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার উপর। সমাজ-মন বোলে কোন পদার্থ নেই, যা আছে সেটি ব্যক্তির মনের মধ্যে একটি বিশ্বাসমাত্র। সে বিশ্বাস mechanical নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট একটি analogy মাত্র। Analogy-কে সত্যের রূপ দিলে সত্যের অপমান করা হয়। সত্য হচ্ছে ব্যক্তি। আমি ইংরেজী ব্যক্তি-তন্ত্রতার কথা বলছি না। সামাজিক মনের উপকারীতা মূর্খ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কেবল মূর্খরাই সমাজ-মনের অস্তিত্ব মানে। সমাজকে কেটে বেরতে হবে ব্যক্তির, এই হচ্ছে আদৎ কথা।

সম্পাদক মশাই, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আপনারই পুরাতন সবুজ পত্রের কথা। আপনাকে আপনার কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে সাধারণে হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে,

পুরাতন, সবুজ পত্রের সঙ্গে নতুন সবুজ পত্রের কোন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নেই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মন্ত্র আপনাকে অসহযোগ আন্দোলনের বাইরে দাঁড় করিয়েছিল, সে মূলমন্ত্র আশা করি আজও সবুজ পত্রের শক্তি সঞ্চার করবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য :—

শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদের চিঠি পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফেসারি করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য প্রফেসারের অসংখ্য বই পড়তে বাধ্য হয়েছেন, ফলে তাঁর অন্তরাত্মা পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। শ্রীমান সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় Personality নামক যে নাতিহ্রস্ব কেতাব লিখেছেন, তার সুধু পাতা উল্টে গেলেই দেখা যায় যে, তাঁকে ইতিমধ্যেই এক লাইব্রেরী প্রফেসারী পাণ্ডিত্য গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। এর ফলে তাঁর যে পাণ্ডিত্যে অরুচি হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সবুজ পত্র পণ্ডিতী কাগজ হবে না, তার কারণ আমরা পণ্ডিত নই, এবং আমাদের শরীরে তাদৃশ পাণ্ডিত্যভক্তিও নেই। যেটুকু ছিল, ইউরোপের গতযুদ্ধে সেটুকু নষ্ট করেছে। উক্ত যুদ্ধ হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সকল কথাই সমান মিছে। আর ইউরোপের যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে, তার মূলে ছিল পাণ্ডিত্যের প্ররোচনা ও উত্তেজনা।

সম্পাদক।

গত হিন্দুসভা।

—–ঃ০ঃ—–

পৃথিবীতে প্রতি যুগে প্রতি জাত একটা-না-একটা মহা আবিষ্কার করে বসে। তাই নৈসর্গিক নিয়মে আমাদের জাতও এ যুগে একটা মস্ত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, হিন্দু মুসলমান এই দুই জাত মিলে মিশে এক না হলে আমরা একজাত, ভাষান্তরে nation হব না। এ আবিষ্কারকে মহা আবিষ্কার বলছি এই কারণে যে, এটি হচ্ছে সেই জাতীয় আবিষ্কার যা বালক ও বৃদ্ধ উভয়েই প্রত্যক্ষ করতে পারে। সকালে ঘুম ভাঙবার পর চোখ মেলা মাত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আবিষ্কার করে যে, আকাশে সূর্য্য উঠেছে। আমাদের এই নব আবিষ্কার পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারের অনুরূপ। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের জাতির পলিটিকাল ঘুম ভেঙেছে, অথবা ভাঙছে।

আবিষ্কার অবশ্য প্রথমে করেছেন পলিটিসিয়ানরা, তবে যেহেতু ভারতবর্ষে পলিটিসিয়ান ছাড়া আর মানুষ নেই,—বাদবাকী সকলে "মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি"—সে কারণ এই পলিটিসিয়ানদের আবিষ্কারকেই আমি জাতীয় আবিষ্কার বলছি।

এই মহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পলিটিসিয়ানদের মাথায় এক মহা সমস্যা উপস্থিত হল। যা না হলে হবে না, তা কি করে করা যাবে? শেষটা অনেক মাথা ঘামিয়ে পলিটিসিয়ানরা স্থির করলেন

যে, এ হচ্ছে ছেরেফ্ সংখ্যার কথা। সরকার এ দেশে যদি আদম শুমারী না করতেন ত, এ সমস্যা উঠ্‌তই না। অমনি সংখ্যা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করবার জন্য কংগ্রেস আঁক কষতে বসে গেল। কিন্তু হাজার কষাকষি করেও পলিটিসিয়ানরা এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করতে পারলেন না। কারণ কংগ্রেস দেখতে পেলে যে, পাটি-গণিতের হিসেবে, এক থেকে এক বিয়োগ করলে হয় শূন্য, আর একে একে যোগ দিলে হয় দুই। সুতরাং এ দুয়ের যোগ বিয়োগের ফলে এক কিছুতেই হয় না। তার পর কংগ্রেস গেল জ্যামিতির কাছে। ও শাস্ত্র দেখিয়ে দিলে যে, এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের parallel lines-য়ে চলা। কিন্তু এ মীমাংসা কংগ্রেস গ্রাহ্য করতে পারলে না, কেননা ও দুই সমান্তরাল সরল রেখার মিলন হয় অসীমের দেশে, ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে they meet in the infinite। কিন্তু কংগ্রেস চেয়েছিল ছ-মাসে স্বরাজ।

একমাত্র যে শাস্ত্র ওর মীমাংসা করে দিতে পারত, কংগ্রেস সে শাস্ত্রের অর্থাৎ algebra-র কাছ দিয়েও ঘেঁষ্‌লে না। পূর্ব্বোক্ত দুইকে এক করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, $a+b=c$ করা, কিন্তু তাতে কেউ রাজী হয় না; aও b-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে c হতে চায় না, bও a-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে c হতে চায় না। এ দেশের ইংরাজীপড়া মহা পেট্রিয়টদের মাথায় এ সোজা কথাটা কিছুতেই ঢুক্‌ল না যে, nation শব্দের মানে হচ্ছে সেই c জাত, যার ভিতর a ও b মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

অগত্যা কংগ্রেসওয়ালা পলিটিসিয়ানরা Science ছেড়ে Art-এর শরণাপন্ন হলেন, অর্থাৎ তাঁরা বসে গেলেন হাতেকলমে এ মিলনের

ধ্যানমূর্ত্তি গড়্‌তে। শেষটা তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাঁরা শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়েছেন।

ফলে হিন্দুরা এখন A হতে চাচ্ছে। এই বাসনা থেকেই জন্মলাভ করেছে হিন্দু মহাসভা। এই হিন্দুসভার আমি বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ হিন্দু জাতের প্রতি আমার প্রাণের টান আছে, আর হিন্দুসভ্যতার প্রতি আমার মনের টান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দু-সভার সংগঠন দেখে আমি যেমন উৎফুল্ল হই, আবার তার চালচলন দেখে তেমনি বেকুব বনে যাই। আমি ও সভার সভ্যদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝতে পারিনে যে, সে সব কথা হিন্দু সভ্যতার কথা, কি হিন্দু অসভ্যতার কথা। এ কথা শুনে চম্‌কে উঠবেন না। সকল সভ্যতারই গোড়ায় অনেকটা অসভ্যতা থাকে। হিন্দিতে একটা প্রবচন আছে—চিরাগ্‌কো নীচে আঁধেরা। এই উপরের আলোর নামই সভ্যতা, আর তার নিম্নস্থ অন্ধকারের নাম অসভ্যতা। অবশ্য সমাজমাত্রেই আলোছায়া দিয়ে গড়া, কিন্তু মন জিনিষটে ওর ছায়া বাদ দিয়ে আলোটাই আত্মসাৎ করতে ভালবাসে; হাঁস যেমন নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করে। আর মন যে হাঁস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—কারণ যার চরম মন, তাকে আমরা পরমহংস বলি।

হিন্দুসভা যে কলকাতায় কেন এল, তার একটু কারণ আছে। এই হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা ভারতব্যাপী হলেও, সর্ব্বত্র এর প্রকোপ সমান ভীষণ নয়। এ বৎসর মা শীতলার অনুগ্রহ সমগ্র কলকাতা সহরটার উপর হলেও, সে অনুগ্রহ মারাত্মকরকম হয়েছে এক নম্বর ও চার নম্বর ডিষ্ট্রিক্টে, অর্থাৎ এ সহরের উত্তর ও দক্ষিণ মুড়োয়। তেমনি হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা বিশেষ করে ঘনিয়ে উঠেছে, শুধু

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে,—পাঞ্জাবে ও বাঙলায়। তাই হিন্দু উত্তরপশ্চিম হিন্দু দক্ষিণপূর্ব্বের কোলে এসে পড়েছিল। আসল এ সমস্যাটা হচ্ছে চিরকেলে উত্তরাপথেরই সমস্যা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তরাপথে এ সমস্যাটা হচ্ছে মামুলি, আর তা চণ্ডিদাসের পীরিতি বেয়াধির মত থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠে, জ্বালার নাহিক ওর। দক্ষিণাপথের সমস্যা স্বতন্ত্র, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণশূদ্রের মধ্যে, বর বড় কি কণে বড়, এরই মামলা।

হিন্দুসভা কিন্তু বাঙলায় এসে দেখলেন যে, এ দেশে তার এক পরিপন্থী সভা রয়েছে, যার নাম ব্রাহ্মণ-সভা। সে সভা হিন্দুসভাকে অস্পৃশ্য বলেছে। ফলে বাঙালীরা নাকি হিন্দুসভাকে বয়কট করেছে। এ কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছি, কেননা বাঙালী যে ব্রাহ্মণ-সভার হুকুমের দাস, এ জ্ঞান আমার ছিল না। এ দেশে যে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব নেই, তার কারণ বাঙলায় ব্রাহ্মণসভা থাক্‌তে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নেই। বাঙলাদেশে অবশ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত নামক এক দল মহাব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু তারা আছে শুধু বিদায় নেবার জন্য। বাঙালীরা যে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেনি, তার কারণ বাঙলায় হিন্দু নেই। যে কটি ছিল তারা সব একদম Indian হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, দেখা যাক্ হিন্দু-সভা কলকাতায় কি করে গেলেন। সে সভা করেছে কতকগুলি সংকল্প। সে সংকল্পগুলির চেহারা প্রথমে দেখে মনে একটু খট্‌কা লাগে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, সভা যা করেছে তা করা ছাড়া তার উপায়ান্তর ছিল না। হিন্দুর হিঁদুয়ানি বজায় রেখেই ত সভা তার সভ্যতার পরিচয় দেবে।

অস্পৃশ্য জাতদের যে উন্নতি করতে হবে, এ বিষয়ে সকলেই এক

মত, অপরপক্ষে অস্পৃশ্যদের যে অস্পৃশ্য রাখতে হবে, এ হচ্ছে *হিন্দু মত। অস্পৃশ্যতা দূর করলে হিন্দু সমাজ ত আর হিন্দু সমাজ থাকে না; অস্পৃশ্যতাই যে হিন্দু সমাজের প্রাণ, তা একটু ভেবে* দেখলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমাদের সমাজে হরেকরকমের অস্পৃশ্যতা আছে, যথা—আমরা কোনও কোনও জাতের দেহ স্পর্শ করিনে; আবার যে জাতের দেহ স্পর্শ করি তার জল স্পর্শ করিনে; আবার যাদের দেহ ও জল দুই স্পর্শ করি, তাদের অন্নস্পর্শ করিনে; আবার যাদের অন্ন স্পর্শ করি তাদেরও হাতে রুটি খাই, ভাত খাইনে। মহাত্মা গান্ধী যে অস্পৃশ্য বলতে ইতর জাত বোঝেন, এটি তাঁর মহা ভুল। আমরা অপরকে ছুঁলে আমাদের জাত যায়, আর অপরে আমাদের ছুঁলেও আমাদের জাত যায়। সুতরাং আমরা জাতে যে যত বড়, সে তত অস্পৃশ্য। আমাদের ভিতর যার জাত যত ঠুন্‌কো—তার জাত তত টঙ্ক।

অস্পৃশ্যতা দূর করলে হিন্দুর জাত মারা যায়, আর সমাজের পতিত উদ্ধার না করলে হিন্দুজাতি মারা যায়। এই উভয় সঙ্কটের ভিতর থেকে বেরবার হিন্দুসভা একটি অপূর্ব্ব উপায় বার করেছেন। তাই প্রথম সংকল্প হয়েছে এই যে, অস্পৃশ্যদের অস্পৃশ্য রেখে, পতিত উত্থিত করতে হবে। পতিতদের পিপাসা দূর করতে হবে, তাই তাদের জন্য অস্পৃশ্য কূয়ো খুঁড়তে হবে। জল-পিপাসার মত তাদের জ্ঞান-পিপাসাও মেটাতে হবে, অর্থাৎ তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তাই তাদের জন্য সব অস্পৃশ্য স্কুল বানাতে হবে। আর সে সব স্কুলে অস্পৃশ্য রাখতে হবে, একমাত্র বেদ। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন শুধু পদম্‌রাজ জৈন। তিনি বলেন যে, এক কলের জল

যখন আমরা সবাই খাই, তখন সকলে এক কূয়োর জল কেন খাব না? তারপর বেদ যখন খৃষ্টানে পড়ছে—তখন অধিকাংশ হিন্দু তা কেন পড়তে পারবে না?—এ দুই অহিন্দু প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়।

কলের জল আর কূয়োর জল এক নয়। কূয়োর জল আতপ আর কলের জল সিদ্ধ, অতএব তা শুদ্ধ, অতএব তা সকলেই খেতে পারে। তারপর এই সিদ্ধ জল কল খুলে নিতে হয়—আর আতপ জল কূয়ো থেকে তুলে নিতে হয়। কলের জল উপর থেকে পড়ে, অতএব তা মন্দাকিনীর জল, কূয়োর জল নীচে থেকে আসে, অতএব তা ভোগবতীর জল। এ দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। স্বর্গে জাতিভেদ নেই, কিন্তু রসাতলে আছে। সুতরাং কলের জল সর্ব্ব লোকপানীয়, কিন্তু কূয়োর জল স্বধর্ম্ম অনুসারে পেয়।

তারপর যে সব খৃষ্টানেরা বেদ জানে, তারা বেদ মানে না; আর যে সব হিন্দুরা বেদ জানে না, তারাই তা মানে। দেশশুদ্ধ লোককে যদি বেদ মানাতে চাও, তাহলে দেশশুদ্ধ লোককে বেদ জানতে দিয়ো না। এ সব যুক্তির কোনও খণ্ডন নেই—কাজেই শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈনের আপত্তি হিন্দু-সভায় সর্ব্ব হিন্দুর সম্মতিক্রমে সকরতালি অগ্রাহ্য হয়েছে।

হিন্দু নামক ছোট হাতের aকে বড় হাতের Aতে পরিণত করতে হলে, হিন্দু সমাজের শুধু বাহ্যিক উন্নতি করা যথেষ্ট নয়, হিন্দু মাত্রের মনেরও উন্নতি করতে হবে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, অপরাপর সমাজের মত হিন্দু-সমাজের ভিতর আলোও আছে, অন্ধকারও আছে। আমাদের মনের অন্ধকার দূর করবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—

হিন্দুমনের আলো আমাদের সকলের মনের উপর ফেলা। তাই হিন্দু সভা প্রস্তাব করেছেন যে, আমাদের প্রত্যেককেই প্রতি একাদশীতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করতে হবে। এ প্রস্তাব অতি সুবিবেচিত; স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করেই এ প্রস্তাব করা হয়েছে। গীতা আমাদের একাদশীর দিনই পড়তে হবে, কারণ খালি পেটেই মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতা ভালরকম জেগে ওঠে। তারপর আপামর চণ্ডাল সকলকেই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়তে হবে। কেননা, তা পড়লে সে সব অনধিকারীদের বেদ পড়বার লোভ আর থাকবে না। কারণ তাঁরা দেখতে পাবেন যে,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

এতেও যদি তাঁদের বেদ পড়বার লোভ মূলে হাবাৎ না হয়ে যায়, তাহলে সেই বেদলোভিরা একটু পরেই দেখতে পাবেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন

নির্গুণ হওয়াই যে হিন্দুর আদর্শ, তা কে না জানে; সুতরাং ভগবানের এ আদেশ আমাদের সকলেরই শিরোধার্য্য।

তবে উক্ত প্রস্তাব শুনে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, হিন্দু-সভার কর্ত্তৃপক্ষেরা হয়ত গীতাকে Bible বলে ভুল করেছেন। ইংরাজী সভ্যতার নকল সকল ক্ষেত্রে চলে না। Bible সকলেই পড়তে পারে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাই বিলেতে Bible সকলকে পড়ান হয়। কিন্তু গীতাকে লোক-মনের "মহাপ্রসাদ" করা চলে না;

বিশেষতঃ তার দ্বিতীয় অধ্যায়কে ত নয়ই। ও বস্তু হচ্ছে ভয়ঙ্কর কড়াভোগ।

ও অধ্যায়ের প্রথম অংশ আদ্যোপান্ত Metaphysics, এবং বেজায় মাথা-বকানো Metaphysics। আমরা জাতকে জাত ঘোর আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু এতদূর দার্শনিক নই যে, ও দর্শন গলাধঃকরণ করবামাত্র সকলেই তা জীর্ণ করে ফেলতে পারব। গীতা গিলে বহু লোক যে তা জীর্ণ করতে পারে না, তার প্রমাণ তারা চব্বিশ ঘণ্টা তা উদ্গীরণ করে। এ দর্শনের বড় জোর একটি উপমা আমরা আয়ত্ব করতে পারব ঃ—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

শুনছি গীতা যে-সে বাজারে নয়, বড় বাজারে চালানো হবে। তা যদি হয়, তাহলে বড় বাজার খুব সম্ভবত ও শ্লোকের অর্থ বুঝবে এই যে, মানুষের ইহলোক পরলোকের ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে প্রকৃতির piece-goods-এর কারবার। সে যাই হোক্, ও শ্লোক যে যত মুখে আওড়াক, কেউ তা মেনে নেবে না। কারণ নিত্য দেখা যায় যে, মানুষে দেহরূপ বাসকে কিছুতেই ত্যাগ করতে চায় না, আর ও বাস জীর্ণ হলেও যতদিন পারে ততদিন সেটিকে তালি মেরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তা যদি না করত, তাহলে ডাক্তারি বলে মনুষ্যসমাজে একটা বিদ্যে ও ব্যবসা বেরত না। ও কাপড়ের উপর মানুষের নৈসর্গিক মমতা ছাড়া, ও কাপড় ছেড়ে ফেলার আর এক অন্তরায় আছে। নতুন কাপড় যে পাব, সে কাপড় কিরকম হবে তা কারও জানা নেই। হিন্দুশাস্ত্রে ভয় দেখায় যে, সে কাপড়

পশুচর্ম্মও হতে পারে, সাপের খোলসও হতে পারে। সেই ভয়েই ত হিন্দুরা জন্মান্তর চায় না, চায় মোক্ষ, ভাষান্তরে নির্ব্বাণ,—অর্থাৎ ও বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাকেও একদম পুড়িয়ে নিবিয়ে দিতে চায়।

তারপর ও অধ্যায়ের প্রথম অংশের Metaphysics-এর পিঠ পিঠ আসে দ্বিতীয় অংশের Ethics। সম্ভবত হিন্দুসভা সকলকে এই Ethics-ই এস্তমাল করতে বলেছেন। কিন্তু ও Ethics-এর প্রতি একটু মনোযোগ করলেই দেখা যায় যে, ও ব্রাহ্মণের জন্য নয়, বৈশ্যের জন্যও নয়, শূদ্রের জন্য ত নয়ই :—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ কথা যে আমাদের সম্বোধন করে বলেন নি, তার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কেউই "পরন্তপ" নই; আমরা সকলেই "পরন্তাপিত"।

ও ধর্ম্ম হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের একচেটে ধর্ম্ম, শুধু তাই নয়, যে-সে ক্ষত্রিয়কে ভগবান ও উপদেশ দেননি, দিয়েছেন একমাত্র তৃতীয় পাণ্ডবকে। সে-উপদেশ অর্জ্জুনের মনের খোরাক, আমাদের পক্ষে তা strong meat—সংস্কৃতে যাকে বলে মহামাংস। ও আধ্যাত্মিক আহার আমাদের পক্ষে অতিশয় গুরুপাক। ও বস্তু পেটে যাবামাত্র আমাদের মাথায় চড়ে যাবে, আর অমনি হবে heart-failure। তারপর তৃতীয়াংশে পাই আদর্শ মানবের definition। এ অংশটি অবশ্য পাঠ্য, আমাদের leader-দের পক্ষে। তাঁদের যদি "প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" হয়, তাহলে আমরা জাতকে জাত মনুষ্যত্বের আরেক ধাপ্ উঁচুতে উঠে যাব। নেতাদের অব্যবস্থিতচিত্ততাই আমাদের জাতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তাঁদের হুকুমে দুদিন আগে আমরা যাদের

সঙ্গে গলাগলি করতে প্রস্তুত হয়ে ছিলুম, তাঁরাই আবার আজ তাঁদের সঙ্গে দলাদলি করতে হুকুম দিচ্ছেন।

গীতার প্রদীপ থেকে আমাদের মনের সল্‌তে ধরিয়ে নেবার প্রস্তাবটা খুবই ভাল। কিন্তু আমরা তা করতে পারব, যদি আমাদের মানসিক বর্ত্তিকায় স্নেহ থাকে। অপরপক্ষে সে সল্‌তেয় যদি তেল না থাকে, আর থাকে শুধু তুলো, তাহলে গীতার প্রদীপের সংস্পর্শে ত মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব, ভাষান্তরে নির্ব্বাণ লাভ করব।

তাই আমি বলি, দেশশুদ্ধ লোককে গীতাপাঠ না করিয়ে চণ্ডীপাঠ করানো হোক। "ধনং দেহী মানং দেহী দ্বিষং জহি"—এ সব কথা সকলে বুঝতেও পারবে, ও মনের সঙ্গে সমস্বরে বলতেও পারবে। আর লালাজীরও এই হচ্ছে আসল প্রার্থনা,—অবশ্য নিজের জন্য নয়, সমগ্র জাতের জন্য। লালাজী আমাদের যুবকদের মনে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে আনন্দ আনতে চেয়েছেন। চণ্ডীপাঠ করলে সে আনন্দও যুবকরা লাভ করবে। কেননা, পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রের শেষে আছে, "মনোরমাং ভার্য্যাং দেহী"। আর আচামার সাধারণের এ শাস্ত্রে যে অধিকার আছে তার প্রমাণ, কথায় বলে "চণ্ডীপাঠ ও জুতো সেলাই" এক সঙ্গেই করা যায়।

হিন্দু-সভার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, ɑকে A করবার একটা অব্যর্থ উপায় আছে। সে উপায় হচ্ছে স্বরকে একটু পরিবর্ত্তন করা। Uকে I করতে পারলেই ɑ, A হয়ে যাবে—আর আমরা যদি তা না করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে 0 হব—গণিতের ভাষায় যাকে বলে শূন্য।

বীরবল।

কণা-বচন।

(১)

আজকাল শিক্ষিত সমাজ মাথা ঘামাচ্ছে, স্বরাজ নিয়ে নয়,—স্বরাজের মানে নিয়ে।

(২)

স্বরাজ যে কি তা কেউ জানে না, কিন্তু স্বরাজ যে কি নয়, তা সবাই জানে। স্বরাজের সংজ্ঞা "নেতি" "নেতি"।

(৩)

মহাত্মা গান্ধী হাত বাড়িয়েছিলেন স্বরাজ ধরতে, হাতে পেয়েছেন, স্বরাজপার্টি।

(৪)

স্বরাজ ও স্বরাজপার্টি এক জিনিষ নয়। স্বরাজপার্টি হচ্ছে স্বরাজ বানাবার কল।

(৫)

অতীতে এ কল মানুষে বানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ কলে মানুষ বানাবে।

(৬)

কংগ্রেসের এতদিনে নাড়ীকাটা হল। চরকার সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে।

(৭)

এ সূতা ছিঁড়ে দিয়েছে এক ফুৎকারে। লর্ড বারকেনহেডের বক্তৃতার পর কংগ্রেস আর Spinning association থাকতে পারে না।

(৮)

আমাদের হাজার কথার চাইতে, ইংরাজের এক কথার মন্ত্রশক্তি বেশি। এর কারণ আমাদের কাজের কথাও পদ্য, ওদের ভাবের কথাও গদ্য।

(৯)

লর্ড বারকেনহেডের বক্তৃতায় কি আছে?—তার ভিতর আছে গর্জ্জন, নেই বর্ষণ।

(১০)

আমরা ওদের কাছে অবশ্য কিছু পাবার আশা করিনে, কিন্তু না পেলে নিরাশ হই।

(১১)

অপরের কাছে নিরাশ হলে, নিজের উপর ভরসা বাড়ে।

(১২)

ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালেই আমরা সোঽহং হয়ে উঠি।

(১৩)

কবি আবিষ্কার করলেন "ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়"।

(১৪)

অমনি অকবিরা আবিষ্কার করলে,—

না জাগিলে সব ভারত ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥

(১৫)

পরে দেখা গেল, এ দেশে পুরুষের ঘুম স্ত্রীলোকের চাইতে কিছু কম নয়। বরং আমাদের নাসিকাগর্জ্জন বেশি।

(১৬)

তাই এ যুগে "ললনার" জায়গায় জন-সাধারণ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(১৭)

আমরা এখন জন-সাধারণকে জাগাবার ভার অসাধারণ-জনের হাতে দিয়েছি।

(১৮)

জন-সাধারণের সঙ্গে অসাধারণ-জনের স্পষ্ট প্রভেদ এই যে, জন-সাধারণ ঘুমোয় কিন্তু স্বপ্ন দেখে না, অপরপক্ষে অসাধারণ-জন ঘুমোয় না, সুধু স্বপ্ন দেখে।

(১৯)

নিদ্রা ও স্বপ্ন, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টা বেশি ভাল বলা কঠিন।

(২০)

ঘুম হচ্ছে খাঁটি মাল, আর স্বপ্ন হচ্ছে মেকি জাগরণ।

(২১)

নিজে জাগা ও পরকে জাগানো এক ক্রিয়া নয়। জাগ্‌বার ও জাগাবার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

(২২)

পরকে এক দিকে জাগাতে হলে, অন্য দিকে ঘুম পাড়াতে হয়।

(২৩)

হৃদয়কে জাগাতে হলে যে মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়াতে হয়,— এ ত পুরোনো কথা।

(২৪)

নতুন কথা এই যে, পলিটিকাল বুদ্ধিকে জাগাতে হলে ন্যায়বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াতে হয়।

(২৫)

বাঙালীর যে পলিটিকাল বুদ্ধি নেই, তার কারণ বাঙালীর Conscience আছে; আর মারহাট্টাদের যে পলিটিকাল বুদ্ধি আছে, তার কারণ তাদের Conscience নেই।

(২৬)

যার Conscience আছে, তার Discipline নেই। সে বাগ মানে না।

(২৭)

Discipline মানে হচ্ছে উপরওয়ালার হুকুম নির্বিচারে মানা।

(২৮)

ন্যায়বুদ্ধিও বিচারবুদ্ধি, বুদ্ধিও বিচারবুদ্ধি।

(২৯)

ও দুই বুদ্ধিকে দু' হাতে চেপে দিতে পারলেই, মানুষ পূরো Disciplined হবে, অর্থাৎ ভেড়া বনে' যাবে।

(৩০)

ভেড়াকে যত সহজে চরানো যায়, অন্য কোনও জানোয়ারকে তত সহজে নয়। গরুও মাঝে মাঝে শিং বাঁকায়।

(৩১)

দ্বিজু রায় বলেছেন, "মানুস আমরা নহিত মেষ"।

(৩২)

কবিতেই বাঙালীর মাথা খেয়েছে।

(৩৩)

আমরা যদি পলিটিকালি বড় হতে চাই, তাহলে আমাদের কায়-মনোবাক্যে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা মানুষ নই, মনুষ্যরূপী মেষ।

(৩৪)

আমাদের বোঝা চাই যে, আমরা জাতকে জাত ভেড়া না বনে' গেলে আমাদের মধ্যে মেড়া জন্মাবে না।

(৩৫)

আর তা না জন্মালে আমাদের হয়ে লড়বে কে? আমাদের leader হবে কে?

(৩৬)

এ পরিণতি লাভ করবার জন্য অসাধ্য সাধন করতে হবে না। কে না জানে যে বাঙালী কামরূপ গেলেই ভেড়া বনে।

(৩৭)

কামরূপ কোথায়?—বাঙলার বাইরে।

(৩৮)

কামরূপ যাবার সোজা পথ কি? উড়ো পথ, ভাবের শূন্যমার্গ।

বীরবল।

নবম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

——:০:——

—মা, ও-বাড়ীর মালীর সঙ্গে দু'জন মা'জী এসেছেন।

—আচ্ছা, বস্‌তে বল, আমি যাচ্ছি।

হাতের কাজ সেরে যখন সিঁড়ির ঘরে গেলুম, তখন দেখলুম আমাদের ব্যামিশ্র গৃহসজ্জাকে লজ্জা দিয়ে দু'টি ভৈরবী একটা কৌচে বসে' আছেন। অবশ্য ভৈরবী ঠিক কা'কে বলে আমি জানিনে, তবে একপ্রকার সাধারণ ধারণা আছে যে, তাঁদের পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুর, গলায় মালা এবং হাতে ত্রিশূল থাকে। উক্ত বর্ণনার সঙ্গে এঁদের আর সব বেশভূষার মিল ছিল, কেবল ত্রিশূলের বদলে হাতে ছিল চাঁদার খাতা। শুনলুম বারাণসী ধামে তাঁরা অসহায় অসুস্থ হিন্দু-বৃদ্ধাদের জীবিত-সেবা ও মৃত-সৎকারের উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন, এবং খাতা খুলে দেখলুম অনেকে তাঁদের সৎকার্য্য ও সততা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং আশ্বস্ত মনে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে ভদ্রতার খাতিরে দু'চার কথা কইতে বসলুম। বল্লুম—সেকালে বৌদ্ধদের মধ্যে শুনেছি এরকম সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মেয়েরা কাজ করত, অন্য দেশে আজও করে; কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর সে-ভাবে কাজ হয় না, অথচ তার একটা ব্যবস্থা থাকা খুব দরকার। অবশ্য অনেক বিধবা আত্মীয়-পরিবারে জীবন উৎসর্গ করেন, কিম্বা অনেক স্ত্রীলোক সেবিকারও কাজ করেন; কিন্তু সে

কাজ পুরুষের মত নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য; তোমরা যেরকম দল বেঁধে পরোপকার ব্রত নিয়েছ, সে ভাবের কাজ ত নয়। আর সকলে যদি সংসার ত্যাগ করে ত সংসারই বা চলে কি করে?—আমার কোন কথা তাঁদের মনঃপূত হলে, সন্ন্যাসিনীদ্বয় চাওয়াচাওয়ি করে' সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন; পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের নিজের কথা বল্‌তে লাগলেন।

ক্রমে তাঁদের কথায় এত তন্ময় হয়ে পড়লুম যে, ভদ্রতা আগ্রহে এবং দু'চার কথা দীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথনে পরিণত হল। বই আমরা পড়ি কিসের জন্য?—না নতুন ভাব, নতুন জ্ঞান, নতুন ঘটনা ও নতুন মনের সংস্পর্শ পাবার জন্য, এবং নিজের মনের প্রতিধ্বনি শোনবার জন্য,—এই ত? এই সব উপাদানই প্রচুর পরিমাণে এই নবীন সন্ন্যাসিনীর সরল বাক্যালাপের মধ্যে পেয়েছিলুম। যদিও এস্থলেও উক্ত ফর্দ্দের শেষ দফাটি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকতে পারে। তবে পরের কাছে নিজের প্রতিধ্বনি সচরাচর পাওয়া না গেলেও, পরের মনের প্রতিধ্বনি সহজেই দেওয়া যায়, যদি নিজের মনের সুর বাঁধা থাকে এবং ঠিক পর্দ্দায় আঘাত পড়ে।

দু'টি আগন্তুকই প্রায় সমবয়সী, এবং আমাদের দেশে যাকে আধাবয়সী বলে' থাকে, তাই;—যদিও কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে ঠিক বয়স বলা শক্ত। দু'জনেরই সুচেহারা, তবে একটি যেন অপেক্ষাকৃত চুপচাপ, আর একটি প্রগল্‌ভা ও প্রধানা বলে' বোধ হল। মনে করা যাক্ প্রথমার নাম আনন্দময়ী, এবং দ্বিতীয়ার শান্তি মা। সন্ন্যাসিনীর আবার নাম কি? অন্যের সঙ্গে পৃথক করবার সুবিধার্থে তাঁদের ভেক-নাম একটা মার্কা মাত্র, কয়েদীর নম্বরের মত। যদিও সে নাম

যোগানন্দের আভাসে সরস, তবু যে নামে আত্মীয়ের "ঘা দিয়ে হৃদয় মাঝে মঙ্গল আরতি বাজে", বা যে নাম কোন জীবনের নিভৃত জপ-মন্ত্র,—অর্থাৎ নাম বলতে আমরা যা বুঝি, সে পর্য্যায়ের নাম ত তাঁদের নয়। বড় জোর নিজগুণে কেউ সে নাম বিশ্ববরেণ্য করে তোলেন, যেমন বিবেকানন্দ।

শান্তি-মা'র সঙ্গেই আমার বেশির ভাগ গল্প হল। কথায় কথায় জানলুম তাঁর বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী দুইই কাশীতে। জিজ্ঞাসা করলুম—ছেলেপিলে হয় নি ?

—হাঁ মা, তা' কি আর হয়নি ? যা' থাকতে হয়, সবই ছিল। প্রথম ছেলেটিকে কোলেও করতুম, সবই করতুম, কিন্তু কেমন যেন আপনার মনে হত না। সেটি দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। তারপরে একটি মেয়ে হল, সেও মারা গেল। কিন্তু আমার কিছুতে সংসারে মন বস্‌ত না।

—তোমার স্বামী কিছু বল্‌তেন না ?

—বল্‌তেন বই কি। আমি যখন বলতুম সবই ত করছি, তিনি বল্‌তেন করলে কি হবে, তোমার অন্তরটা কোথায় বল দেখি ?

—তুমি কি আগে বিশেষ কোন মন্ত্র নিয়েছিলে, বা বিশেষ কোন ইষ্টদেবতাকে মানতে কেউ শিখিয়েছিল ?

—না মা, ছোটবেলা থেকেই আমার মনে কেমন একটা বৈরাগ্য হত, মনে হত এই ত শরীর, এর কিছুই থাকবে না, এই ত মানুষের পরিণাম, এ সব নিয়ে কি হবে।

—বোধহয় তোমাদের বংশে এইরকম দিকে কারো কারো ঝোঁক ছিল ?

—হাঁ মা, আমাদের বংশ সাধকের বংশ। আমার বাবা আমাকে কাছে করে' বসিয়ে পড়াতেন, বল্‌তেন মেয়েদের হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিটা এস তোমাকে শিখিয়ে দিই।

—সংস্কৃত শেখান নি?

—না, তার আর সময় হল কই? দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাই যেটুকু হয়।

—তোমার মা কিছু বলতেন না?

—মা রাগ করতেন। ঘর সংসারের কাজ ত কিছু শিখতুম না।

সঙ্গিনী।—ঘরকন্নার কিছুই জানতেন না। আত্মীয় স্বজনে বল্‌ত— মেয়েটা দেখছি কুলে কালী দেবে। তারপরে অবশ্য সব শিখেছিলেন।

—তারপরে বিয়ে হল ত? বিয়ে ত দিতেই হবে।

—হাঁ মা, ১১ বছর বয়সে বিয়ে হল। বাপের বাড়ী যেমন সাদা-সিধে ভাবে থাকতুম, একখানি বিলিতী কাপড় পর্য্যন্ত কখনো পরি নি, এঁদের তেমনি বৃহৎ সংসার, সাহেবী চালচলন। বাড়ীতে খানসামা, কুড়িজন দাসদাসী। এত বড় সংসারের জলখাবারের ভার আমার উপর পড়ল, বুঝতেই পারেন কত ময়দা মেখে কত লুচি ভাজতে হত। কিন্তু মন আমার যে-কে-সেই। কতবার তুলসীতলায় হাত যোড় করে' ঠাকুর দেবতাকে ডেকেছি যে—হে ঠাকুর, আমার মন ভাল করে' দাও, ও সব বাজে কথা যেন মনে না আসে। ভাল কথাকে বাজে কথা বলতুম! লোকে মনে বৈরাগ্য আনবার চেষ্টা করে, আমি বৈরাগ্য তাড়াবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। বেশ মনে আছে, দোলের দিন আমার ননদ জা'রা মিলে কত আমোদ

করেছে, আমিও চুলে পাতা লতা কেটে সেখানে গেছি, মিশেছি, ষ্টেজ পর্য্যন্ত হয়েছে; কিন্তু ঘরে ফিরে এসে মনে মনে বলেছি,—দু'দিনের এই সব মায়ায় কেন ভুলে রয়েছ, এই সব হাসিখেলার পিছনে সংসারের যে আসল রূপ রয়েছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ না? মনে হত চিরকালই কি এরা আমাকে এই বন্ধনে বেঁধে রাখবে? প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ত।

—তারপর কি হল?

—তারপর কোলে যে সেজ ছেলে হ'ল, তার উপর সত্যিকার মায়া পড়্‌ল। সে আবার অতিরিক্ত ভালবাসা—একেবারে বিশ্ব-বিনিময়। সে ছেলেটিও তেমনি ছিল। তিন বছর বয়স হয়েছিল, তার মধ্যে নিজেও মাছ খেত না, আমাদেরও খেতে বারণ করত। ঠাকুর দেখলেই প্রণাম করত। নাম ছিল শচীশ। তার শেষ অসুখের সময় আমি প্রাণপণ সেবা করেছিলুম, কিন্তু রাখতে পারলুম না। সে সময় আমার চোখের সামনে থেকে কি-একটা পরদা সরে' গেল, জগৎকে অন্যরকম দেখলুম, যেন এ জগৎ নয়, আর এক জগৎ। তখন পেটে আর এক ছেলে ছিল, কিন্তু সে যে কবে হল, কি হল, কে দেখ্‌লে, সে সব আমি কিছুই জানিনে।

—তখন কি করতে?

—কি আর করব, পড়ে' থাকতুম, শুধু সাধু সন্ন্যাসী কেউ এলে উঠে বসতুম। আর একলা হলেই বিবেকের দংশন সইতুম। যেন ভিতরে ভিতরে বল্‌ছে—তুমি এই মনে করে' এই করেছিলে, এই আশা করেছিলে, কেমন, এখন কি হল, কি পেলে? মা, শোক সহ্য হয়, কিন্তু এই বিবেকের দংশন সওয়া যায় না। লোকে এরই যন্ত্রণায়

সংসার ত্যাগ করে। মনে হত যেন শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাব। আর শরীরও এমন হয়ে গিয়েছিল যে, ধরে ধরে চল্‌তে হত। আমার জন্যে এক দাসী রেখে দিয়েছিলেন। এমন দিন গেছে, যখন তার কাঁধে মাথা রেখেছি, তবে সে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, এই অবস্থা। আর সকলকে ডেকে ডেকে বলতুম—হ্যাঁগো, আমি ত ছেলেমানুষ ছিলুম, কিন্তু তোমরা ত সংসারের সবই জানতে, তোমরা কেন এই অগ্নিকুণ্ডে আমায় জেনে শুনে ফেলে দিলে?

—তাঁরা কি বল্‌তেন?

সঙ্গিনী। মা খুড়ি যে আস্‌ত, তাঁদেরই অমনি করে' জিজ্ঞেস করত। এতখানি চুল ছিল, আর রং আপনার ঐ সাড়ির পাড়ের মত লাল হয়ে গিয়েছিল। চোখ বের করে' যখন ঐ সব কথা বল্‌ত, তখন সকলে চুপ করে' এ ওর দিকে চাইতেন, বোধহয় মনে করতেন শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে।

—তোমার সঙ্গে কি এঁর অনেক দিনের আলাপ?

—হাঁ, সেই সময় থেকেই উনি যাওয়া আসা করছেন।

—তারপর?

—এমনি ভাবে দিন যায়। কাউকে কিছু বলতুম না, চুপ করে'ই থাকতুম। একটু সুস্থ হলে একদিন ননদের বাড়ী গেলুম। সেখানে বাইরে ছেলেরা গোল করছে শুনে আমিও বেরিয়ে এলুম। দেখি জামগাছে একজন সন্ন্যাসিনী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চারদিকে সকলে হাসি আহ্লাদ করছে। মা, আমি ছেলেবেলা থেকে ভিতরে ভিতরে একটা কেমন আভাস পেতুম, যেন সংসারে আমার অত্যন্ত আপনার কেউ একজন আছেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু বুঝতে

পারতুম না। এঁকে দেখে মনে হল, এঁকেই ত আমি ভিতরে ভিতরে চেয়েছি, এই সেই! অমনি ছুটে গিয়ে তাঁকে বল্লুম—ওগো, তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চল, আমি এখানে থাক্‌ব না!

—এই সব শুনলে পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস হয়। তা তিনি কি বল্লেন?

—তিনি আর কি বলবেন, হাসতে লাগলেন। সে যে কি রূপ, সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির কথা আপনাকে কি বলব। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কেন? এই আপনি যদি হঠাৎ আমাকে বলেন, তোমার সঙ্গে যাব,—সেইরকম আর কি। তাও কি হয়?

—তা' ত সত্যি, গৃহস্থের বউ। তবে কি করলে, কবে গেলে?

—সেদিন ত বাড়ী ফিরে গেলুম। পরদিন সকালে আমার স্বামীকে বল্লুম—আমার দীক্ষাগুরুর ওখানে যাব।

—তিনি তোমাকে যেতে দিলেন?

—হাঁ মা, তা' দিতেন। কোন জায়গায় কীর্ত্তন কি কিছু হলে তিনি নিজেই লোকজন দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। আর এই ছ'মাস পরে আমি মুখ ফুটে একটা ইচ্ছে প্রকাশ করলুম, তা'তে তিনি বরং খুসিই হয়ে আমাকে কাপড়, জামা, চাদর গায়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথমে গুরুর বাড়ী গেলুম। যে মানুষ বল্‌তে গেলে এতদিন উঠে বস্‌তে পারি নি, সেই মানুষ বেশ উঠে হেঁটে অতটা পথ গেলুম। তারপর সোজা সেই সৌদামিনী-মা'র বাড়ী গিয়ে উপস্থিত! তিনি ত আমাকে দেখে অবাক্—অ্যাঁঃ, এই কাল দেখা হ'ল, আর তুমি আজই এসেছ?

—তিনি কি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন? তোমরা কি ভৈরবী?

—না মা, আমাদের বৈদান্তিক মত, নিরামিষ আহার। তিনি আগে কারো শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্তু তারপরে নিজের মতেই নিজে চলতেন। তাঁর যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি উদার মন ছিল। কি যে মানুষ ছিলেন, সে বল্‌তে পারিনে। এই আশ্রমের কাজ তখন সবে তিনি আরম্ভ করেছেন। তাঁরই সঙ্কল্পিত কাজ আমরা হাতে করে' করছি।

—তাহলে তাঁর সঙ্গ বেশিদিন পাওনি?

—সাড়ে তিন বৎসর তাঁর কাছে ছিলুম। তারই মধ্যে তিনি আমাকে অনেক কাজ শিখিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম সহজ কাজ দিতেন, তাই নিয়ে বাড়ী চলে' যেতুম। বাসাবাড়ী যেখানে ছিল সেখানে বড় গোলমাল, তাই সোজা শ্বশুরবাড়ীতে ফাঁকায় চলে' গিয়ে ছাতের উপর পড়াশুনা করতুম।

—তাঁরা কি বল্‌তেন?

—বল্‌তেন ঐ দেখ ছোট বউমার আবার এক পাগলামী,—চিলে কোঠায় বসে' বসে' কি সব পড়ে! এই আধ্যাত্মিক গীতা, যা'তে সব ব্যাখ্যা আছে, আর যোগবাশিষ্ঠ, এমনি সব বই পড়তুম। সে আবার কিরকম পড়া, খাবার জন্যে ডাকতে এলে এইরকম করে' (সঙ্গিনীকে ঠেলা দিয়ে) ঠেল্লে তবে হুঁস্ হত। কিন্তু তখন নিজের পথ নিজে খুঁজে পেয়েছিলুম কিনা, তখন আবার অন্যদিকে মনও দিতে পারতুম। আমি খুব ধীর উদার ভাবে থাকতুম, পাছে কেউ বলে জ্যাঠামী করছে। কিন্তু মা, সংসারের লোক উদার ভাব ভালবাসে না।

—তা সত্যি, ছেলেমানুষ বেশি বৈরাগ্যের কথা বল্লে লোকে

জ্যাঠামোই' ত বলে' থাকে। তারপর তোমার কোলের ছেলের কি হল?

—সেটা মেয়ে হয়েছিল মা, সেটাও বছরখানেক পরে মারা গেল। আমার শোকটোক কিছু হয়নি, আপনাকে সত্যি বল্‌ছি। মনে হত ঘরে ঘরে যত প্রসূতী প্রসব করছে, সকলের মধ্যেই আমি মা হয়ে রয়েছি। ছেলে মেয়ের ভাবনা কিসের?— বাগানে কত খেলা করতে আসত। আমার বরং মনে হল আমি ছুটি পেলুম। তখন স্বামীকে আবার বিয়ে করবার জন্যে ধরে' বসলুম। প্রথমে কিছুতেই রাজি হন না। ১৬ বৎসরের অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়?—আমি অনেক করে' বোঝাতুম, বল্‌তুম দেখ, আমি মরে গেলে ত বিয়ে করতেই, তার চেয়ে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে করনা, তাহলে আমি ছাড়া পাই, তোমাকেও সংসারে বসিয়ে দিয়ে যাই—আমি ত না থাকারই মধ্যে। এইরকম করে' বল্‌তে বল্‌তে শেষে একদিন যেই বিয়েতে মত দিলেন, অমনি আমি একটি ১৭ বছরের মেয়ের সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে' ফেল্লুম।

—তাঁরা সতীনে দিতে রাজী হলেন?

—হাঁ, তাঁরা সমস্তই জানতেন কিনা। অনেক দিন থেকে দেখে শুনে তবে দিলেন।

—আর তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক?

—তাঁরাও আপত্তি তুলেছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ী তখন ছিলেন না, কিন্তু আমার এই শরীরের ভাসুরপো, অমুক (পশ্চিমের একটা সহরের নাম করে') জায়গার বড় সাহেব, তিনি খবর শুনে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন যেন এ বিয়ে বন্ধ করা হয়।

সঙ্গিনী।—তিনি অবশ্য ভাল মনে করে'ই বলেছিলেন যে, ছোট খুড়িমা শোকে পাগল, এ সময় তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে বউ ঘরে আনা উচিত নয়।

—তা' আমি সেই লোককে বেশ করে' জল খাইয়ে বল্লুম দাঁড়াও, এখন এ নিয়ে গোল কর' না। বলে' তাড়াতাড়ি গায়ে-হলুদ পাঠিয়ে দিলুম।

—তারপর কি করলে? সে বউ তোমাকে ভালবাস্‌ত?

—তারপর যেতুম আসতুম। সে ভালবাসবে না কেন? আমি তাদের সংসার পাতিয়ে, ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে তবে ত এলুম। মা, লোকে রাতারাতি সংসার ছেড়ে পালায় কেন বুঝিনে। একি চুরি করছি যে লুকিয়ে পালাব? আমি ১৬ বৎসর ঘর করেছি, তারপরে নতুন বউটির যখন ছেলে হ'ল তার প্রসবের সময় থেকেছি, তারপর ছেলেটি দু' মাসের হ'তে সেই যে চলে' এসেছি,—আর যাইনি।

—এ তুমি একটা নতুন জিনিষ দেখালে বটে! বিয়ে করা দূরে থাক্, স্বামী যদি অন্য মেয়ের দিকে চায়, তাহলেই কত স্ত্রী কেঁদে কেটে অনর্থ করে,—আর সেই স্বামীকে কি না তুমি নিজের হাতে করে' বিয়ে দিলে?

— হাঁ মা, আমার এই শরীরের ভগ্নীপতিও সে সময়ে বলেছিলেন যে তুমি একটা নতুন কাণ্ড করলে।

* * * * *

কেমন সহজে এঁরা "এই শরীরের" বিশেষণটি ব্যবহার করেন, আর কি সুন্দরভাবে এতে প্রয়োজন সাধিত হয়। শুধু "এই

শরীরের” এই সব সম্বন্ধ? তাই ত! অন্য শরীরে অন্য ঘরে জন্মালে সম্বন্ধ ত সবই অন্যরকম হত! কিম্বা তা ঠিক নয়—যেখানেই জন্মাই, যতবারই জন্মাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীরঘটিত, আত্মা নিঃসম্পর্ক ও নির্লিপ্ত,—এই ভাবে হয়ত ঐ কথা বলেন।

কিন্তু এঁদের বৈরাগ্য শুষ্ক স্বার্থপর বৈরাগ্য নয়, কেবলমাত্র নিজের মুক্তিলোভী নয়, সে ত এঁদের কার্য্যেই প্রকাশ। আমার বলে' বিশেষ জন-কতকের উপর সাধারণ গৃহীর যে বিশেষ মমতা, কবির ভাষায় এঁদের বলা যেতে পারে—“করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বমাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!” মানুষ বলে' মানুষের উপর ওঁদের যথেষ্ট দরদ আছে, তা শান্তি-মা স্বীকার করলেন। অথচ মানুষের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করেন না, কি জানি কেন। বল্লেন—

—আমি দুর্ব্যবহার পাব বলে'ই মনে করি। এই আপনার কাছে আসছিলুম, মনে হচ্ছিল আপনি হয়ত বিরক্ত হবেন। আবার ভাবলুম, বিরক্ত হলেই বা কি করব।

—হাঁ, তোমরা ত নিজের জন্যে কিছু চাচ্ছ না যে চাইতে লজ্জা হবে। পরের সেবা আর ঘরের সেবার মধ্যে তফাৎ এই যে, আপনার লোকের দাবীদাওয়া এত বেশি, তাদের জন্যে যতই করনা কেন, সব যেন ফুটো পাত্রে জলের মত ঢাল্‌তে ঢাল্‌তেই বেরিয়ে যায়, কিছুতেই আশা পূর্ণ করা যায় না। আর পর তোমার কাছে কিছু আশা করে না বলে' যতটুকু পায় সেইটেই আশাতীত মনে করে—তাই দিয়েও তৃপ্তি হয়। আমারই কোন আত্মীয়াকে বল্‌তে শুনেছি যে, “যত পার ভাই দিয়ে যাও, জীবনে কারো কাছে কিছু চেয়ো না।” কিন্তু তাঁরা অত বয়সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তুমি জীবনের আরম্ভ

থেকেই সে জ্ঞান পেলে কি করে', সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়।

—মা, আমি কষ্ট অনেক পেয়েছি, এতরকম দুঃখ আমার উপর দিয়ে গেছে যে শরীরে সইলেও মনে সহ্য করা যায় না। কিন্তু একদিন একটা বাড়ি তৈরি করা দেখলুম। মিস্ত্রীরা দেখি এত বড় একটা লোহার girder ছাতে তুল্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখলুম যে, যে দেয়ালের উপর সেটা বসবে, সেগুলি এতখানি করে চওড়া। ঐ অত মজবুৎ গাঁথ্নী বলে'ই না অত ভারি লোহার চাপ সইতে পারবে? তখন মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান যখন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন, তখন অবশ্য সহ্য করবার শক্তিও তিনি দেবেন।

—এখন তোমার শরীর ভাল হয়েছে ত?

—হাঁ মা, ছোটখাটো অসুখবিসুখ যেগুলি ছিল, সেগুলি সেরে গিয়েছে। আর এখন আমার বিষয়বুদ্ধিও ঠিক হয়েছে। ঐ যে ওখানে আপনার টেবিলটা রয়েছে, কিম্বা এই সাজাবার জিনিষগুলি রয়েছে, তা' বলে' দিতে পারব যে কোথায় কোন্টা রাখলে কাজ হবে, কোথায় কি মানাবে।

—তোমার জীবনের এই সব কথা লেখনা কেন?—শুনলে লোকের ভাল লাগবে।

সঙ্গিনী।—বাড়ীতে কত লেখা এমনি গাদা-করা পড়ে রয়েছে। আচ্ছা মা, এখন তবে আসি, আপনারও নাইতে খেতে অনেক বেলা হল। আবার যেদিন এদিকে আস্ব, আপনার সঙ্গে দেখা করে' যাব।—

. সন্ন্যাসিনীদ্বয় বিদায় হলেন, আমিও বাস্তব সংসারে ফিরে এলুম। কোন্‌টা সত্যি বাস্তব?—

যদি তাঁদের কথাবার্ত্তার আংশিক আভাস পাঠকদের দিতে গিয়ে তাঁদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকি ত আশা করি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। আর সন্ন্যাসিনীর তা'তে কি আসে যায়? তাঁদের জীবনও যেমন গৃহশূন্য, মনও ত তেমনি অনাগারিক।

* * * *

হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চূরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥

জনৈক গৃহিণী।

৺রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার।

—:o:—

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার যে এতদিন বেঁচে ছিলেন, এ কথাটা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম, কারণ গত বারো বৎসরের মধ্যে তাঁর মুখের কোনও কথা আমরা শুনতে পাইনি। তাই কাল খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ে' তাঁর জীবনের কথা মনে পড়ে' গেল।

ভারতবর্ষের এ যুগ হচ্ছে আসলে renaissance-এর যুগ। এ যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা এই যে, ভারতবর্ষ মনে পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের এই নব জীবনের চাঞ্চল্য দেখে অনেকে এর কারণ অনুসন্ধান করছেন।

এই অনুসন্ধানের ফলে একদল আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের এই চাঞ্চল্যের মূলে আছে ইউরোপ থেকে আমদানী-করা আমাদের নব-শিক্ষা। আমাদের সকল ছট্‌ফটানি হচ্ছে pouring new wine into old bottles-এর ফল।

আর একদল আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের নব জীবন তার রসরক্ত নীরবে সংগ্রহ করছে প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও সাহিত্য থেকে। বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর Lord Ronaldshay বলেন যে, এ দেশের বর্ত্তমান পলিটিকাল অশান্তির মূলে আছে বেদান্ত। আর বেদ অনাদি হলেও, বেদান্ত হচ্ছে অনন্ত।

এ উভয় মতই এক হিসেবে সত্য, এবং এ উভয় মতই একদেশ-দর্শিতার ফল।

আমাদের নতুন মন গড়ে উঠছে যুগপৎ নবীন ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতবর্ষের মনের স্পর্শে। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের এই দুই মনের সন্ধিতেই আমাদের মন যে তার নবরূপ লাভ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ মন জিনিষটে আসলে দেশ কালের বহির্ভূত। যে স্থূলদর্শী ওর সুধু পার্থক্য দেখতে পায়, সে মন জিনিষটিকে দেখতে পায় না। আমাদের মনের এই renaissance-এর অগ্রদূত হয়েছে প্রধানত ভারতবর্ষের দুটি জাতি—বাঙালী ও মারাঠী।

ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা মুখ্যত অনুপ্রাণিত হয়েছে Bengalee Babu; আর সংস্কৃত শাস্ত্রের এ যুগে বিশেষ চর্চ্চা করেছে Poona Brahmin.

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের দল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও প্রচার করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার হচ্ছেন অগ্রগণ্য। সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের তিনি যে পারদর্শী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র অভিধান ও ব্যাকরণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চা করেছেন, ইংরাজরা যাকে বলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি অনুসারে। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃত অক্ষরের মধ্য হতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারকল্পে জীবন যাপন করেছেন। ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনের কাছে অতীতকে বর্ত্তমান করে তোলা, আর যে অংশে ও যে পরিমাণে মানুষের জীবন

তার মনের অধীন, সেই পরিমাণে ইতিহাস আমাদের নব জীবনের স্রষ্টা। ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা এক জীবনের কাজ নয়, এক ব্যক্তিরও কাজ নয়। গুরুশিষ্যপরম্পরায় ইতিহাস গড়ে ওঠে। ভাণ্ডারকর সুধু নিজের কীর্ত্তি রেখে যান নি, তিনি মহারাষ্ট্র দেশে বহু শিষ্য রেখে গেছেন, এবং এই শিষ্যমণ্ডলী তাদের গুরুর প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রতিদিন অগ্রসর করে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উভয়মুখী renaissance-এর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ছিলেন একজন আদিগুরু। সুতরাং এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের চরণে স্মৃতির ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা আমাদের বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ তিনিও ছিলেন এ যুগের একজন nation-builder।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শুভ-দৃষ্টি।

বাড়ীভরা লোকজন; ঘরে ঘরে গল্প আর হাসি—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভকর্ম্ম কণ্ঠে কণ্ঠে উঠিছে উদ্ভাসি;
চারিদিকে ডাক হাঁক, একটু নিরালা কোথা নাই;—
আজি বুঝি বৌ-ভাত! সাহানায় বাজিছে সানাই,
কলকোলাহলপূর্ণ বিচিত্র ধ্বনির বক্ষ চিরে,
বাড়ীতে না পেয়ে শ্রোতা সুর ভেসে বাহিরায় ধীরে!
চলেছে মেয়ের দল, ঝম্ ঝম্ ঝুম্ ঝুম্ ধ্বনি,
সেই সে সকাল থেকে কেবলি বাজিছে আগমনী!
—বেতর স্বরের মেলা—পান দেনা, ওরে জল আন—
উচ্ছ্বসিত শিশুকণ্ঠে আনন্দের উন্মত্ত তুফান!

আরে আরে বর কই? বন্ধুরা শুধায় পরস্পরে;
বরের নাহিক দেখা, নাই সে নীচের কোনো ঘরে!
ততক্ষণ কোন্ ফাঁকে খুঁজে খুঁজে তেতলার কোণে
দেখে বর, নববধূ একা বসে' কাঁদিছে গোপনে!
ঘোমটার অন্তরালে অশ্রুবিন্দু ঝরি' ঝরি' পড়ে
স্বর্ণ আভরণে ভরা অঙ্কশায়ী দুটি হস্তপরে।
এদিক ওদিক চাহি' ধীরে বর শুধাইলা তারে—
কি হয়েছে, কাঁদ কেন? একবার বল' না আমারে!
বলিবেনা, বলিবেনা?—তত জোরে ঝরে আঁখিজল,
আনন্দ-প্রতিমা চক্ষে ভাষাহীন বেদনা তরল!
কি হয়েছে বল' না গো—বল' বল' লক্ষ্মীটি আমার!

এবারে কহিলা বধূ, অতি কষ্টে রুধি' অশ্রুধার,—
অস্পষ্ট মুদিত কণ্ঠে বাহিরিল ধ্বনি অতি ক্ষীণ—
ছোট ভাইটির মোর জ্বর দেখে' এসেছি সেদিন;
আমারি সে অনুগত—কাঁদে শুধু দিদি দিদি বলি',
মার কোলে ফেলে' তারে লুকায়ে যে এসেছিনু চলি',
ওগো, দুটি পায়ে পড়ি—
—চুপ চুপ, কেঁদোনাক আর,
এখনি খবর আমি এনে দিব ভায়ের তোমার।
সমবেদনায় পূর্ণ শুনি' সেই আশ্বাসের স্বর,
বধূর ব্যথিত বক্ষে বহে নব শান্তির নির্ঝর!

ঘোমটার আবরণ চকিতে উঠিয়া গেল ধীরে,
ডাগর নয়ন দুটি জলে-ভরা অমনি সে ফিরে'
মুহূর্ত্তে উঠিল ফুটি' স্বামীর সতৃষ্ণ নেত্রপানে,
সত্যকার শুভদৃষ্টি নিমেষে মিলায়ে সেইখানে!
উৎসবের বক্ষোবাসী আনন্দের চক্ষু দুটি ভরি'
অপরূপ হাসিকান্না একসঙ্গে পড়ে যেন ঝরি'!

আজি এই শুভদিনে কাঁদিতেছ তুমি নব বধূ?—
কবি কহে অশ্রু নহে—অপূর্ব্ব ও অন্তরের মধু
প্রথম স্ফূরিল আজি ভোগবতী অমৃতের মত,
সমবেদনার বাণে সর্ব্ববাধা করিয়া প্রহত!
আরক্তিম শুক্তি মাঝে ওই অশ্রু মুকুতা তরল—
ওরি মূল্যে মহনীয় গৃহস্থের রিক্ত গৃহস্থল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মাধুরী।

—মরতে এতদিন ভয় পাই নি। এখন চোখ বুজ্‌লেই শিউরে উঠি!

—ছিঃ—সে কি কথা! তুমি সেরে উঠ্‌বে।

—না গো! আর আমায় মিথ্যে প্রবোধ দিয়ো না। ছেলেমানুষটি তো আর নই! বিশটি বছর বয়স হয়েছে। মরবার আগেকার সব লক্ষণগুলিই আমি চিনি। তোমার অসুখের সময় ডাক্তার বহুবারই তোমাকে জবাব দিয়ে গিয়েছিল। তবু আশা ছাড়ি নি, কায়মনোবাক্যে যমের সঙ্গে যুঝেছিলাম—জিতেওছি। আমার মাথার সিঁদুরের টিপটি দেখ দেখি—খুব লাল—না?

—হাঁ।

—কিন্তু শুধু 'লাল' বল্‌লেই তো বলা হ'ল না! ও তো শুধু লাল নয়—আগুনের মত লাল টক্‌টকে। টিপ যখন পরি—মনে হয় আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বল্‌ছি!

—তুমি আরো সুন্দর হয়েছ দেখতে!

—হবই তো! আগুন যে দেখতে খুব সুন্দর!—কিন্তু সে যে নিজে কতখানি জ্বলে' জ্বলে' অমন রাঙা রূপ পায়, তার খোঁজ কয়জনে রাখে?

—রাখি, আমি রাখি। মরে' তো গিয়েইছিলুম—বাঁচিয়েছ তুমি। এই বিদেশে যেদিন পঙ্গু হয়ে পড়লুম, চাক্‌রিটি গেল; কয়েক মাসের চিকিৎসা আর পথ্যে শেষকালে তোমার গয়না ক'খানিও গেল—সে

পর্য্যন্ত দেখেছিলুম, হাঁ, সে পর্য্যন্তও দৃষ্টিশক্তিটুকু ছিল—তারপর আর জ্ঞান ছিল না। মনে পড়ে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতুম—যেন তুমি 'সাবিত্রী'।

—সে তুমি শতবার বলেছ—আমি শতবার শুনেছি,—কিন্তু শুনে কখনো লজ্জায় জিভ্ কাটি নি, বা মাথায় হাত তুলে সেই দেবীর উদ্দেশে নমস্কার করি নি। কেন করব? তাঁর চাইতে তো আমি কিছু কম করি নি! বরং এখন এই মরতে বসে ভাবছি—তিনিই বড়—না আমিই বড়! শুনলে লোকে হাসবে,—হাসবে কি ধিক্কারই দেবে—দিক্।

—তুমি ঘুমোও। বেশী কথা কইতে ডাক্তার বারণ করে গেছে।

—ডাক্তার এসেছিল?

—এসেছিল।

—ভিজিট?

—তা' সে কিছুতেই নেবে না। আর আমিই বা দেব কোথা থেকে? তাঁর দয়ার অন্ত নেই, মাধুরী!

—নেই-ই বটে!—কিন্তু তবু তো তোমার জন্য কোন ভরসা পাচ্ছিনে আমি। এখনো ভালো করে তোমার শরীর সারে নি—দুটি দিন একরকম উপোস করেই রয়েছ।—ডাক্তার আবার কখন্ আসবে?

—সকালবেলা। কিন্তু দেখ, এখন একটু ঘুমোলে কি ভালো হ'ত না?

—এখন রাত কত?

—রাত ভোর হয়ে এসেছে।

—অন্ধকার শেষ হয়ে এসেছে, না? উষার আলো বহুদিন দেখি নি। জানালা দুটো খুলে দিয়ে ঘরের দীপটি নিবিয়ে দাও না?

—আচ্ছা, দিচ্ছি। এইবার ঘুমোও।

—আঃ কি সুন্দর! এই উষায় জন্ম আর মৃত্যু কি মিশে গেল? অন্ধকার মরে যাচ্ছে—আলো ফুটে উঠছে। অন্ধকারের ভয়ের পাশে এই ফুটন্ত আলোর আশা আমার বড়ই ভালো লাগছে! যন্ত্রণা আমার অনেক কমে গেছে। সত্যি, আমার এখন কেমন ঘুম পাচ্ছে। একটা গল্প বলনা শুনি?

—সে কি গো!

—হাঁ, ঘুমিয়ে পড়লে তো চল্‌বে না। ডাক্তারের সঙ্গে যে শেষ দেখা হয় নি! আর যদি না জাগি?

—ডাক্তার তোমাকে বিশেষ করে ঘুমোতে বলেছে।

—আমাকে বিশেষ করে'ই জেগে থাক্‌তে হবে। তুমি বেহুলার গল্পটি বল—বেহুলার কথাই আজ বড় বেশী মনে পড়ছে!

—বেহুলার গল্প তো আমি ভালো করে জানি নে। আর একটা কিছু বলি?

—না, তা হবে না। তবে আমি যতটুকু জানি, তুমি সেইটুকুই না হয় শোন।

—কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছ না কি?—দেখ, আমিও তো সারা রাত ঘুমই নি—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—বেশ তো! আমার 'শাস্তর' শুনতে শুনতেই না হয় ঘুমিয়ে পড়। মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ো কিন্তু—

—হুঁ।

—বাসর-রাতে সর্পাঘাতে লখিন্দরের প্রাণ গেল। বেহুলা বিয়ের রাত্রেই বিধবা হ'ল।

—হুঁ।

—বেহুলা বল্‌ল সে হবে না, আমি স্বামীকে মরতে দেব না, যেমন ক'রেই হোক্ বাঁচিয়ে একে তুলবো-ই।

—হুঁ।

—বেহুলা মৃত স্বামীকে ভেলায় তুলে নিয়ে নদীর স্রোতে ভেসে চল্‌ল।

—চল্‌ল।

—মৃতদেহ পচে গেল, খসে' গেল। কিন্তু বেহুলা তবু আশা ছাড়্‌ল না। দেশের পর দেশ পার হয়ে গেল—কত আপদ, কত বিপদ, কিছুতেই সে দম্‌ল না। পথে কত লোকে কত প্রলোভনই না তাকে দেখাল। কত জনে বল্‌ল "ও মড়া আগ্‌লে আর কতদিন রইবে? তোমার অমন রূপ, অমন যৌবন!

—হুঁ।

—বেহুলা সে কথায় ফিরেও চাইল না—চল্‌ল, চল্‌ল,—এই যে, ঘুমিয়ে পড়েছ, না?

—হাঁ।

—বাঃ, শোন—

—বল—

—তারা সব বেহুলার রূপযৌবন চেয়েছিল, কিন্তু কেউ ই লখিন্দরের প্রাণ দান করতে চায় নি।

—না।

– চেয়েছিল ?

—না।

—এ কথা তো কেউ বলে নি—'তোমার রূপযৌবন দাও, লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুল্‌ছি।' কেউ বলেছিল ?—বল!

—হুঁ।

—কি! বলেছিল ? বলেছিল ?—বল!

— না।

—যদিই বা কেউ তা বল্‌ত—তবে ? নাঃ, তুমি ঘুমিয়েই পড়েছ। আঃ, কি শীর্ণ হয়ে পড়েছ তুমি! আবার যদি তোমার সেবা করতে পারতুম! যাক্‌—ওকি! ও কার পায়ের শব্দ! ডাক্তার এসেছ ? আমি যে তোমারি প্রতীক্ষায় এখনো চোখ বুজি নি!

– কেমন আছ ?

—ও-পারের আলো তো আমার চোখে এসে পড়েছে। কেন, তুমি কি তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না ডাক্তার ? পূব আকাশে তাকিয়ে দেখ না, কেমন লালে লাল হয়ে গেছে!

— কেমন আছ মাধুরী ?

—আমার সিঁথির সিন্দুর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, না ?

—হাঁ। কিন্তু, আর ভুল ব'কো না। যা' জিজ্ঞেস করি, উত্তর দাও। যন্ত্রণা বড় বেড়েছে, না ?

—যন্ত্রণা নয়, জয়ের উল্লাস! সাবিত্রীই বল, আর বেহুলাই বল—

তাঁদের সকলের গৌরবকে ম্লান করে' আমি চল্‌লুম। চল্‌লুম কিনা, তুমিই বল—

—সাধুচরণ দেখ্‌ছি ঘুমিয়ে পড়েছে—ওকে যে এখনি দরকার হবে।

—না, ওকে আর ডেকো না—সারাটি রাত আমার পাশে জেগে বসেছিল। অসুখের পর শরীর এখনো সারে নি—অথচ ওর অযত্ন অনিয়মের অন্ত নেই। হাতে একটি পয়সা নেই—কেমন করে' যে ওর চল্‌বে ভেবে পাইনে। আজ মরবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার শেষ মিনতিটি নিবেদন করতে চাই—

—তুমি বেঁচে উঠ্‌লে ওর জন্য ভাবনা নেই—কিন্তু, তোমাকে যে এখন operation-এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

—না ডাক্তার, আর operation নয়, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও,—operation করলেও আমি বাঁচ্‌ব না।

—তোমার কোন ভয় নেই। সাধুচরণের অসুখের সময় দেখেছি অসাধারণ তোমার সাহস, অসাধারণ তোমার ধৈর্য্য। তোমাকে chloroform করতে হবে। ঐ পর্দ্দার আড়ালে আমাদের ডাক্তার সাহেব বসে' আছেন। তিনিই operation করবেন।

—কিন্তু এ বৃথা চেষ্টা। আমার হয়ে এসেছে। ডাক্তার! আমার শেষ অনুরোধটি তোমাকে রাখতেই হবে। রাখবে না কি?

—সে হবে এখন।—প্রস্তুত?

—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার কথাটি রাখ—

—বল্‌লুম তো সে হবে এখন। তুমি প্রস্তুত হও—হাঁ, ঠিক্ হয়েছে—হাঁ ঠিক্ হচ্ছে—that's right—

—উঃ—মাগো! ডাক্তার!—আমার কথা রাখ—

—আচ্ছা, বল—

—আমি জানি, আমার স্বামীর উপর তোমার এতটুকু প্রীতি নেই, দরদ নেই, মমতা নেই।

—সে কথার তো এখন কোন প্রয়োজন নেই, মাধুরী!

—আছে। ও বেচারী নিঃস্ব, তার উপর পঙ্গু—ওর ভার যে তুমি নেবে, সে ভরসা আমি মোটেই করি নে।

—সে দেখা যাবে এখন—

—না, দেখা যাবে নয়, এখনি সেটা দেখ্‌তে হবে।

—বেশ! কি করতে হবে শুনি?

—একদিন জোর করেই তুমি আমাকে তোমার একটা হীরের আংটি দিয়েছিলে। তখন ও নিয়ে আর গোল করতে ভরসা পাই নি। ভেবেছিলাম পরে কোন উপায়ে সেটা তোমাকে ফেরৎ দেব। আজ সেটা তোমাকে ফেরৎ দিচ্ছি, কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা নিবেদনও আছে। এই নাও—

—সে নেব এখন। কিন্তু আর দেরী নয়। ডাক্তার সাহেবের সময় নষ্ট হচ্ছে—

—নাও এটা—

—দাও—

—দাঁড়াও—আর একটু বাকী,—উঃ—সরাও—মাগো—গেলুম—ডাক্তার! ডাক্তার!—ওকে ডেকে তোল—ডেকে তুলে তুমি নিজের হাতে আমার ঐ বেচারী স্বামীকে—ঐ আংটিটি দান কর—নাহয়

ভিক্ষাই দাও—আমি দিলে সে সন্দেহ করবে—দাও—দাও—ও—কে ডা—কো—

—মাধুরী তুমি—সে নয়। এ সব কথা আর নয়। ডাক্তার সাহেবের যথেস্ট সময় নস্ট করেছি—একটু সহ্য কর।

—হাঁ মাধুরী আমি, সে নয়···কিন্তু সে যে মাধুরীর সব। উঃ! যা—ই—গে—লু—ম ডাক্তার—সাহেব—ডা—ক্তা—র সা—হে—ব, মা—গো—

—এ কি! এ কি! এ যে ডাক্তার! এ কি হচ্ছে ডাক্তার?

—ঘুমোও, ঘুমোও—আমি ওকে chloroform করছি। এ সময় বিরক্ত ক'র না—

—না—না—তু—মি শো—ন। বাইরে ডাক্তার সাহেব ব—সে আ—ছে—ন—তাঁ—কে ডা—কো—

—মাধুরী, লক্ষীটি চুপ কর—এখনি ওঁরা তোমাকে আরাম করে দেবেন—

—স—য়—তা—ন···ও—রা স—ব স—য়—তা—ন···উঃ! সরাও, দ—ম আ—ট্—কে আ—স্—ছে···নিঃ—শ্বা—স ব—ন্ধ হ—য়ে গে—ল···ডা—ক্তা—র সা—হে—ব শো—ন···উঃ—গে—লু—ম···এই ডাক্তার বাবু—আ—মা—র স্বা—মী—কে বাঁ—চা—বা—র স—র্ত্তে—ওঃ! মা—গো—

[বাইরের ডাক্তার]—Well doctor, are you ready? It is getting late.

[ঘরের ডাক্তার, কপালের ঘাম মুছিয়া] Yes sir, it is too late!

মন্মথ রায়।

রবি-শস্য।

তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখি কাল সন্ধ্যাকালে কুয়াসার যে ঘনায়মান ঘোমটা সমস্ত প্রান্তরকে নাই করিয়া দিয়াছিল—আজ তাহা কোথায়! প্রান্তরলক্ষ্মীর দিক্‌বলয়-বেণীর একটি কেশও যে বিস্রস্ত হয় নাই। এই শিশিরচিক্কণ পৌষ উষাটি দেখিয়া কবি উর্ব্বশীর কল্পনা করিয়াছিলেন নিশ্চয়।

নিকটের নদীতীরে একখানি ক্ষেত। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম। কাছেই একটা লোক কাজে ব্যস্ত, সে আমাকে দেখিয়াও দেখিল না। সদ্যজাত এই শিশু-ফসলের ক্ষেতে আমার দ্বারা কোনো ক্ষতি হইবে, এমন আশঙ্কা তাহার নাই।

চারিদিকে এই কচি-কোমল ক্ষেতটি সবুজ রঙের একটি কোলাহলের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা এখনো প্রকৃতির খেলাঘরে স্নিগ্ধ বাতাসে চলি-চলি পা-পা করিয়া দুলিতেছে; ইহাদের কাছে কোন্ প্রবীণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে! এখনো ইহাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া বিজ্ঞ কৃষক হালের বলদ এবং গৃহিণীর অলঙ্কার কিনিতে ভরসা করে না! এখনো ইহাদের অবস্থাটা হওয়া-না-হওয়ার নাগরদোলায় দোল খাইবার মধ্যে।

আমার পাশের এই আখের ক্ষেতটি বড় তরুণ—ইহার রঙটি শরৎ কালের বৃষ্টি-বিগত স্বচ্ছ আকাশের মত। আর এই সরিষা ক্ষেতের সবুজ রঙটি শিশির পড়িয়া শাদা হইয়া উঠিয়াছে। মাকড়সার জালে

শিশির লাগিয়া ইহার পাতায় পাতায় মুক্তার মালা গাঁথা; এখনি সূর্য্য উঠিবে, দেখিতে দেখিতে মৌন রজনীর এই অশ্রু-সাধনাগুলি স্বর্ণ কান্তিতে সার্থক হইয়া উঠিবে। অদূরে ওই আলুর ক্ষেতটি বর্ষার প্রথম মেঘের মত গম্ভীর, ঘুমের মত চোখ-ডোবানো গাঢ় সবুজ তাহার বর্ণ। তাহার তৃষিত শিকড়ের চাপে মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া মানচিত্রের নদীর মত সব রেখা পড়িয়াছে। কাছেই মুশুরীর ক্ষেতটি বড় প্রতিবেশি-পরায়ণ—ছোট ছোট ঝাড় বাঁধিয়া উঠিতেছে; কিন্তু রঙটা কেমন যেন ম্লান, অনেক দিন যে বাড়ীতে চূণকাম করা হয় নাই, খানিকটা সেইরকম; ইহার মধ্যেই দুই একটা নীল ফুল ফোটো-ফোটো—তাহারা হঠাৎ আগে আসিয়া পড়িয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ওখানে ওই সরিষা ফুলের গন্ধটি এখনো মৌমাছি ডাকিবার মত তীব্র এবং নির্ভরশীল হয় নাই—এখনো যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজেরই সন্দেহ; ঠিক নূতন কবির প্রথম কবিতার খাতাটির মত। ক্ষেতের আলের চারিপাশে কুসুম ফুলের চারা-পাতাগুলির দুই পাশে কাঁটা—যেন অনাগত রঙের আনন্দে ইতিমধ্যেই তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

পাশে ওই নদী। নদী হইতে ক্ষেতে জল সেচন করিবার চরখিটি অপ্রয়োজনের অবসরে মাছের খোঁজে উৎসুক বকটির মত এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীটা ক্রমাগত আঁকিয়া বাঁকিয়া পাক খাইয়া ছুটোছুটি করিয়া দুই তীরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে; তাহারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নদী বেচারীর জলের সঞ্চয় বেশি নাই, বারে বারেই তাহার রিক্ততা ধরা পড়ে। ছোট ছোট স্রোতগুলি বালুর মধ্যে বিভক্ত হইয়া মৃত পুত্রের শ্মশান-শয্যায়

জননীর বিস্রস্ত বেণীর ইঙ্গিত করে। দুই পারের দৃশ্য কেমন অনুর্ব্বর—মোটেই অতিথি-বৎসল নয়। সেখানে কতকগুলি শালিক উড়িয়া পড়িল, তাহাদের পাখার রঙ তাম্রধূসর, কিন্তু তলাটা শাদা—বাহিরে গম্ভীর অথচ ভিতরে রসিক লোকদের মত।

শিশিরসিক্ত মাটির ও ফসল-ক্ষেতের নানা গন্ধ মিলিয়া সৌগন্ধের একটি যে একতান উঠিতেছে, তাহা আমি কল্পনায় বার বার পাইতেছি। সে গন্ধ এত সূক্ষ্ম যে, হঠাৎ তাহা পাওয়া যায় না; দিনের আলোয় ক্ষীণ চাঁদ যেমন দেখা যায়, আবার যায়না,—তেমনি।

তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু এই ক্ষেতটির কথা ভুলিতে পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল এই শিশু ক্ষেতটিকে ইহার মালিক "হ্যাম্‌লিনের" বাঁশীওয়ালার মত কোন্ যাদুমন্ত্রবলে বর্ণ বৈচিত্র্যহীন মরাইমুখী অন্ধকার এক পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—যদিও আজ সে ধরিয়া আছে বিরহীর ব্যথিত চিত্তের সম্মুখে অযাচিত সান্ত্বনার শ্যামায়মান সুধার পাত্রটি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

অপলাপ।

আমি তব নাম লয়ে করেছিনু খেলা,
ভেবেছিনু মরণের অভিনয় করা
পরম গৌরব বুঝি। বলেছিনু জরা—
কামহীন, শক্তিহীন, স্তিমিত, একেলা,
চাহিনা। স'বনা আর জীবনের হেলা,
প্রণয় বাসনাতিক্ত, দিন গ্লানিভরা,
যৌবনের ব্যর্থ চেষ্টা। তার চেয়ে ত্বরা
আসুক অননুভূতি, মৃত্যু এই বেলা।

হে করুণ, সত্য ভেবে মোর সে মিনতি,
যেমনি আসিলে মোরে তুলে নিতে কোলে,
অমনি কাতরে বলি, ভাসি' অশ্রুজলে—
ধরা অভুঞ্জিতা প্রিয়া, সর্ব্ববিত্তবতী,
জীবন যৌবন কাম্য, প্রেম সুমধুর,
মরণ অজ্ঞাত, অন্ধ, অসুন্দর, ক্রূর!

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ দত্ত।

খেয়াল-খাতায়।

——:০:——

জীবন-খাতার শেষ দিকেতে এমনি ক'রে কবে
শেষ কথাটি লিখে দিয়ে বিদায় নিতে হবে!
যাত্রা যেদিন হবে সুরু—দুরু দুরু হিয়া—
মিলন লাগি' কার্ তরে সে কোন্ জনমের প্রিয়া?

কোন্ জনমের বধূ সে মোর—যুগযুগান্ত পরে
বাসর-রাতে দীপটি আবার জ্বালবে আমার তরে!
পথ-চাওয়া তার ক্লান্ত আঁখির মৌন আলাপনে
হারিয়ে-যাওয়া কথা যত আস্‌বে ফিরে মনে?

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি-খসা আধেক আঁচলখানি
পাত্‌বে সে কি আমার তরে, বক্ষ হ'তে টানি?
গন্ধজলের ঝারির পাশে চন্দ্র-উজল থালা,
তারি পরে রইবে কি তার যত্নে-গাঁথা মালা?

নূতন জীবন পাব কি সেই নূতন পরিচয়ে?
মিলন বাঁধা রইবে চির মাল্য-বিনিময়ে?
মুখটী রেখে ঘুমভাঙ্গা মোর ব্যাকুল হিয়ার পরে,
অমরী সে—অমর মোরে করবে চিরতরে!

শ্রীকান্তি চন্দ্র ঘোষ।

বীরবলের পত্র।

(১)

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার দার্শনিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করেছেন যে, সবুজ পত্রের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড পাকা টিকি আছে, সে টিকি ছিল পুরাকালে শাস্ত্রকারদের মাথায়, আর কালক্রমে তা আপনার মাথায় এসে বর্ত্তেছে। এ টিকির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে আর্য্যটিকি। আপনি যখন উক্ত আবিষ্কারটি আপনার কাগজের মারফৎ প্রচার করেছেন, তখন ধরে নিচ্ছি যে, আপনি অতুল বাবুর কথাকে ব্যজনিন্দা মনে করেন। মানুষের আত্ম-প্রতারণার সীমা নেই, বিশেষত সে মানুষ যদি সাহিত্যিক হয়। অতুল বাবু যা বলেছেন তা ব্যজস্তুতিও হতে পারে।

আপনার বিষয় আমার ধারণা এই যে, আপনি হচ্ছেন যুথভ্রষ্ট অতএব যুগভ্রষ্ট সাহিত্যিক। বর্ত্তমানের প্রতি বিরাগই আপনার স্বধর্ম্ম, তাই আপনি বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে কখনো অতীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, কখনো ভবিষ্যতকে,—অর্থাৎ যা নেই তাই দিয়ে যা আছে তাকে আক্রমণ করেন। বর্ত্তমান যে আপনার মনঃপূত নয় তার কারণ, আমাদের বর্ত্তমান হচ্ছে কতকটা পড়ে-পাওয়া অতীত আর কতকটা উড়িয়ে-নেওয়া ভবিষ্যৎ। আমরা তাই একসঙ্গে তলারও কুড়তে উপরেরও পাড়্তে চাই, ফলে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হই। এই হচ্ছে আমাদের যুগধর্ম্ম।

আপনি যে কোনমতেই হিন্দু-পদবাচ্য নন্, সে কথা অতুল বাবু আপনাকে সুহৃৎ-সস্মিত বাণীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ দেশ মুসলমান বিজয়ের পরে হয়েছে "হিন্দুস্থান," পূর্ব্বে ছিল আর্য্যাবর্ত্ত। সুতরাং যার মন হিন্দুস্থানের বাইরে হিঁদুয়ানীর সন্ধান পায়, সে বিশেষ্য বাদ দিয়ে বিশেষণের ভক্ত হয়। যেমন যার nation নেই সেই nationalism-এর ভক্ত হয়। ও-জাতীয় মনোভাব আমাদের সকলেরই আছে, সুতরাং এতে আপনার কিছু বিশেষত্ব নেই। আমাদের সকলের মাথাতেই হ্যাটও আছে, টিকিও আছে; আর আমরা পালায় পালায় ও-দুইই সমান আস্ফালন করি,—কখনো হ্যাট মনে করে' টিকিকে, কখনো টিকি মনে করে' হ্যাটকে। আপনি হয়ত হ্যাটকে হ্যাট, আর টিকিকে টিকি বলেই মানেন; নাহয় ত আপনার মতে টুপি আর টিকি ও-দুই একই জিনিষ।

(২)

সে যাই হোক্, এখন দেখা যাক্ এই আর্য্য টিকির স্বরূপটি কি, তা সে টিকি আপনার মাথাতেই থাক্ আর মনু-মেধাতিথির মাথাতেই থাক্। সে টিকির ভদ্র নাম হচ্ছে আর্য্য মনোভাব। আর্য্য বলে' কোনও জাতি ছিল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Max Muller এ জাতকে আবিষ্কার করেন ভারতবর্ষে ও পারস্যদেশে। তারপর পণ্ডিতের দলে প্রশ্ন উঠল—এই আর্য্যরা ভারতবর্ষে এল কোত্থেকে? মানুষ এল কোত্থেকে, এই হচ্ছে দর্শনের ও বিজ্ঞানের আদি প্রশ্ন। জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা পরে অনেক হাড়ভাঙা গবেষণার ফলে আবিষ্কার করলেন যে, সাদা মানুষের জন্মস্থান হচ্ছে কালো বন (Black

Forest)—নামান্তরে জর্ম্মানী। যতদিন এ আবিষ্কার হয় নি, ততদিন জর্ম্মান পেট্রিয়টিক পাণ্ডিত্যের ঘুম হয় নি। অন্যান্য ইউরোপীয়রা এ আবিষ্কারে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয় নি। ফরাসীরা বল্‌লে যে, ভারতবর্ষে যারা গিয়েছে তারা কখনই ফ্রান্সে জন্মায় নি, কারণ ফরাসীদেশে যারা জন্মায় তারা La belle France ছেড়ে স্বর্গেও যেতে রাজি নয়, ভারতবর্ষ ত অগ্নিকুণ্ড। আর ইংরাজরা লোকের জন্মভূমি নিয়ে মাথা বকায় না। পরের দেশকে আপন করাই হচ্ছে তাদের ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, যেমন আপন দেশকে পরের করাই হচ্ছে ভারতবাসীর ঐতিহাসিক ধর্ম্ম। তারপর সম্প্রতি ইউরোপের মাটি গভীরভাবে খুঁড়ে দেখা গেছে যে, তার ভিতর পোঁতা আছে শুধু কাফ্রির করোটি ও কঙ্কাল। অর্থাৎ কৃষ্ণবনের আদ-বাসিন্দারা ছিল সব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং এখন হাতে-কোদালে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আর্য্য বলে কোনো জাত যখন ইউরোপে জন্মায় নি, তখন তারা পৃথিবীতে ছিল না। ও জীব আছে সুধু সাহিত্যে, এবং স্বনামে আছে সুধু সংস্কৃত সাহিত্যে; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেও আর্য্য পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আর্য্যপুত্র। আর সেকেলে আর্য্যপুত্রদের নিয়ে টানাটানি করত পণ্ডিতরা নয়—মেয়েরা।

আর্য্য ছিল না, কিন্তু আর্য্য মনোভাব আছে। ও একরকম অশরীরী আত্মা। আর ও আত্মা মাঝে মাঝে এর ওর দেহে ভর করে। আর তখন সে হয়ে ওঠে একজন ধনুর্দ্ধর সাহিত্যিক।

(৩)

আর্য্য মনোভাবের লক্ষণ কি? কিসে ও বস্তুকে চেনা যায়? আর্য্যমনোভাব নাকি কখনো পুরুষের দাসমনোভাবকে আপনার

করেনি, কিন্তু আর্য্যরা স্ত্রীজাতির দাসীমনোভাবকে যে খুব আপনার করেছিলেন, তার দেদার দলিল সংস্কৃতে আছে, গদ্যে ও পদ্যে। কারও না কারও উপর প্রভুত্ব না করতে পারলে প্রভুমনোভাব বজায় রাখা যায় না। তাই প্রভুমনোভাবের চর্চ্চা করতে হয় নিত্যনিয়মিত। ইংরাজরা বলে Charity begins at home;—কথাটি ঠিক, কেননা প্রভুমনোভাবের চর্চ্চা ঘরে যত আরামে করা যায়, তার শতাংশের একাংশও বাইরে করা যায় না। বাইরে প্রথমত সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়ত পরের উপর প্রভুত্ব খাটানোও নিরাপদ নয়। বিয়ে করলেই আমরা দেবতা হই—সুধু স্ত্রীর কাছে; তা'তে তেত্রিশ কোটীর সংখ্যা একাধিক হয় না। আর কার্য্যগতিকে ব্যাপারটা যদি তার উল্টো হয়—অর্থাৎ স্ত্রী যদি নিজগুণে দেবতা হয়ে ওঠেন, আর স্বামী হন তাঁর উপাসক—তাহলে সে সত্য আমরা পরদাচাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি, সমাজকে এই আশ্বাস দেবার জন্য যে, আমাদের সনাতন স্বত্ব স্বামীত্ব সবই বজায় আছে—অন্তঃপুরে। অতুল বাবু বলেছেন যে, প্রভু-মনোভাব ও দাস-মনোভাব, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উঁচুদরের তা বলা যায় না। আমি বলি এ সমস্যা উঠতেই পারে না, কারণ এর একটি মনোভাব অপরটির অপেক্ষা রাখে। ও দুইই তাই হয় সমান শ্রেষ্ঠ, নয় সমান নিকৃষ্ট। দাস মনোভাব দূর করতে পারলে প্রভুমনোভাব থাক্‌বে না, আর প্রভু-মনোভাব দূর করলে দাসমনোভাব থাক্‌বে না। আসলে ও দুইই একই মনে ঘর করে। আমরা প্রত্যেকেই কারও কাছে দাস, কারও কাছে প্রভু। যদি এই যমজকে বধ করা বর্ত্তমানে মানবের পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়, তাহলেও ঐ দুটিকেই একসঙ্গে শুকিয়ে মারতে হবে। ওর একটিকে হৃষ্ট

করলে অপরটিও পুষ্ট হতে বাধ্য। আমরা যদি ঘরে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রভু-মনোভাবকে দমন করতে পারি, তাহলে খুব সম্ভবত বাইরে পুরুষের প্রতি দাস-মনোভাব থেকে মুক্তিলাভ করব। স্মরণ করিয়ে দিই যে, Charity begins at home। দাস-মনোভাব থেকে নিস্কৃতি পাবার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রথমে প্রভু-মনোভাব থেকে মুক্ত হওয়া। কথাটা শুনতে বিপরীত শোনায়, তার কারণ সত্য কথা চিরকালই অভ্যস্ত মিথ্যার উল্টো কথা। সুতরাং অতুল বাবুর আবিষ্কৃত আর্য্য মনোভাবকে সকলের পক্ষে একালে তামাদি গণ্য করাই শ্রেয়। যে প্রভুত্ব মানুষের মত মানুষের পক্ষে কাম্য, সে হচ্ছে নিজের উপর প্রভুত্ব। কিন্তু এ মনোভাব ডিমক্রাসির কাছে অগ্রাহ্য—কেননা এ হচ্ছে সাধনার ধন।

(৪)

তারপর অতুলবাবু বলেছেন যে, ইভলিউসনের হিসেবে মেষ শার্দ্দুলের চাইতে সভ্য জীব কি না, তাও বিচারাধীন। ইভলিউ-সনের পাকা হিসেব আমার নিকট অবিদিত। বিজ্ঞানের হিসেবে যা হয় হোক, কিন্তু মানুষের হিসেবে মেষ শার্দ্দুলের চাইতে নিশ্চয়ই ঢের বেশি সভ্য, অর্থাৎ মানুষের ঢের বেশি পছন্দসই জীব। মেষের সঙ্গে আমরা ঘর করতে পারি, শার্দ্দুলের সঙ্গে পারি নে। তারপর ভেড়ার লোমে আমরা পোষাক বানাই, আর সেই পোষাক পরে আমরা সভ্য হই। অপরপক্ষে মহাদেব ছিলেন একমাত্র কৃত্তিবাস দেবতা, আর মহাদেব যত বড়ই দেব হোন, কেউ তাঁকে কস্মিনকালে সভ্য বলেও নি, বল্‌বেও না। কিন্তু মেষের সভ্যতার সব চাইতে বড় দলিল হচ্ছে এই যে, ভেড়াকে আমরা খাই, আর বাঘ আমাদের খায়।

যে জীব মানুষকে যুগপৎ অন্নবস্ত্র দুইই জোগায়, সে যে অতি শ্রেষ্ঠ জীব, প্রকৃতি কোটী কোটী বৎসর ধরে সেই জীব যে মানুষের জন্য ধীরে সুস্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী করেছে, এ কথা মানুষ হয়ে কে অস্বীকার করবে? অন্নবস্ত্র বাদ দিলে সভ্যতার আর বাকী থাকে কি? মেষ যে সুধু সভ্য তাই নয়, সে মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে সভ্য করেছে, এবং তার সভ্যতা অদ্যাবধি বাঁচিয়ে রেখেছে। মটন না খেলে Darwin যে ইভলিউসান আবিষ্কার করতে পারতেন না, তা বলাই বাহুল্য।

অপর পক্ষে বাঘ মানুষের কোন কাজে লাগে না, এক কাব্যের উপমা ছাড়া। আর সে উপমার জন্য যে আমাদের বাঘের কাছেই যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বাঘের বদলে সিংহ আমরা যেখানে সেখানে বসিয়ে দিতে পারি। ভারতচন্দ্র বলেছেন "কড়িতে বাঘের দুধ মেলে"। মিলতে পারে, কিন্তু সে দুধ খায় কে? সুতরাং এ কথা জোর করে বলা যায় যে, ব্যাঘ্র জাতির কোনরূপ economic value নেই। আর্য্যদের যে খুব ব্যাঘ্রপ্রীতি ছিল, এ ধারণা অতুল বাবুর হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের উপমা পড়ে'। আর এ কথা যদি সত্য হয় যে আর্য্যদের খাদ্যখাদকের ভেদজ্ঞান ছিল না, তাহলে সে অভেদজ্ঞানের প্রশ্রয় আশা করি আপনি দেবেন না।

(৫)

নর-শার্দ্দুল আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শ পুরুষ হতে পারে, কিন্তু মানুষকে বাঘ বানাবার বিদ্যা জানা ছিল হিন্দুস্থানের লোকের, কোম্পানির আমলে।

দেবেই না, কোনও বাঙালীও দেবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং গুরুচরণ বাবুর মত ইংরাজী কথক, লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সাক্ষ্য অমান্য করা চলে না। অতএব প্রমাণ হয়ে গেল যে, কোম্পানীর আমলে এ দেশে স্ত্রীলোক সাপ হত আর পুরুষ বাঘ হত। সুতরাং মানুষকে নর-শার্দ্দুল বানাবার জন্য আমাদের বৈদিক যুগে ফেরবার প্রয়োজন নেই। বছর পঞ্চাশ ষাট পিছু হট্‌লেই আমরা একটা হিন্দুস্থানী লুপ্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারব।

(৬)

সম্পাদক মহাশয়, আপনি হয়ত এ সব কথা শুনে একটু বিরক্তির স্বরে উত্তরে বলবেন যে, রঘুর উদাহরণ দেওয়ায় আর্য্যত্বের অপমান করা হয়, কারণ রঘু ছিল প্রথমত অস্পৃশ্য, দ্বিতীয়ত মাতাল। রঘুর শরীরে এ দুই দোষ যে ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে রঘু আপনাকে শার্দ্দুলে রূপান্তরিত করে, সে হচ্ছে ষোল-আনা আর্য্য-মনোভাব। রঘুর ভিতরকার প্রেরণা ছিল psychological,—physiological নয়। স্ববংশ নির্ব্বংশ করবার অভিপ্রায়ে রঘু বাঘ হতে চায় নি। শার্দ্দুলের মনোভাব আয়ত্ত করবার লোভেই সে নর-শার্দ্দুল হয়েছিল। এ লোভ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উচ্চ আশা।

অবশ্য ব্যাঘ্রত্ব লাভের জন্য ধোবা বেচারা অনার্য্য উপায় অবলম্বন করেছিল। সে শিকড় খেয়েছিল, অর্থাৎ সে সাহায্য নিয়েছিল দ্রব্যগুণের, বিদ্যার নয়; matter-এর, spirit-এর নয়। কিন্তু এক-

মাত্র বিদ্যার সাহায্যেও নর যে শার্দ্দুল হতে পারে, তার প্রমাণ ঐ Sleeman সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তেই আছে।

Sleeman সাহেব তাঁর বন্ধু মৈহারের রাজার সঙ্গে জব্বলপুর থেকে মির্জ্জাপুর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি রাজা বাহাদুরকে ও প্রদেশে বাঘের উপদ্রবের কথা বলেন। উত্তরে রাজা সাহেব বলেন যে, আসল বাঘের দৌরাত্ম্য দূর করা অতি সোজা, কিন্তু বিদ্যাবলে মানুষ যখন বাঘ হয়, তখন তাকে সামলানো অসম্ভব। এ কথা শুনে কর্ণেল সাহেব রাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"মানুষ কি করে বাঘ হয়?" রাজা সাহেব উত্তরে বলেন যে,—"যারা বিদ্যা অর্জ্জন করেছে, তাদের পক্ষে বাঘ হওয়া অতি সোজা। তবে ও বিদ্যে যে তারা কি করে' শেখে, তা আমাদের মত নিরক্ষর লোকেরা জানে না।" তারপর রাজা সাহেব এই গল্পটি তাঁকে শোনান।

এই মৈহারে একটি খুব বড় মন্দিরে একটি খুব বড় পুরোহিত ছিল, সে বিদ্যাবলে মাঝে মাঝে বাঘ হত। তার একটি সোনার কণ্ঠী ছিল, সে বাঘ হবামাত্র তার চেলারা তার গলায় সেটি পরিয়ে দিত। শেষটা বৃদ্ধ বয়সে সে বাঘ হবার অভ্যাস ছেড়ে দিলে। এক সময় যখন তার পুরোণো চেলারা সব তীর্থভ্রমণে গিয়েছিল, তখন হঠাৎ একদিন তার মনে বাঘ হবার দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ল। আর সে একটি নতুন চেলার হাতে সোনার কণ্ঠীটি দিয়ে তাকে আদেশ করলে যে, আমি যেই বাঘ হব, অমনি আমার গলায় এটি পরিয়ে দিয়ো। কিন্তু গুরুকে বাঘ হতে দেখে, চেলা বেচারা ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল। আর যে মুহূর্ত্তে তিনি বিকট গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন, তখন চেলার হাত থেকে কণ্ঠীটী মাটিতে পড়ে গেল। পুরোহিতপ্রবর

যখন দেখলেন যে ফিরেফিরতি মানুষ হবার উপায় নষ্ট হল, তখন তিনি মহা গর্জ্জন করতে করতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। তারপর গুরুজী বছরের পর বছর ধরে' অসংখ্য লোকের ঘাড় মটকে তাদের রক্তমাংস আহার করতে লাগলেন।

এ গল্প শুনে Sleeman সাহেব প্রশ্ন করলেন ঃ—

"Do you think, Raja Sahib, that the old highpriest is one of the tigers at the Katras pass?"

কর্ণেল সাহেব পাছে উক্ত ব্রাহ্মণের উপর গুলি চালান, এই ভয়ে রাজা সাহেব সসম্ভ্রমে উত্তর করলেন—"No, I do not"। তার পরে রাজা সাহেব যে ক'টি কথা বলেন, সে কটি সোনার অক্ষরে লিখে সব আর্য্য-পণ্ডিতদের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা উচিত। মৈহার রাজের কথা ক'টি এই ঃ—"When men once acquire this science, they cannot help exercising it, though it be to their own ruin, and that of others"। যে মনোভাবকে অতুল বাবু আর্য্য মনোভাব বলেন, সে হচ্ছে আসলে জর্ম্মান-আর্য্য-মনোভাব, এবং সেই মনোভাবের kultur করার ফল হয়েছে their own ruin, and that of others। আপনি আশা করি বাঙালীর মনে এমন কোনও ভাব আনতে চান না, যার ফলে তারা স্বজাতির ঘাড় ভেঙ্গে খাবে, আর তাদের স্ত্রীরা সব হুড়কো হবে। আর যে ক'জন হবে না, তারা গুরুচরণ বাবুর পিতামহীর মত সাপ হবে, এবং শেষকাণ্ডে স্বামী শার্দ্দুলের সঙ্গে সহমরণে যাবে। বাঘ হবার মহা বিপদ এই যে, একবার বাঘ হলে আর মানুষ হওয়া যায় না। বেচারা রঘু ও বেচারা highpriest এ মহাসত্য সশরীরে আবিষ্কার করেছিল। একজন

মল' গুলি খেয়ে, আর বশিষ্ঠবংশাবতংসের কাজ হল শুধু অরণ্যে গর্জ্জন করা। দ্বিজু রায় আমাদের বলেছেন—"আবার তোরা মানুষ হ"—এই উপদেশই শিরোধার্য্য। মানুষ-জন্তুটি কি বলা কঠিন, কিন্তু এ জানোয়ার যে ভেড়াও নয় বাঘও নয়, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই; আর ও-দুয়ের মাঝামাঝি কোনও জীব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মানুষকে হয় মেষ নয় শার্দ্দুল করা হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের আদর্শ, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নয়। আর সেকেলে আর্য্যদের কাছে অর্থের চাইতে যে ধর্ম্ম বড় ছিল, এ কথাটা বিনা বিচারে মেনে নেওয়া ভাল, কারণ আমরা নিজেদের তাঁদের বংশধর বলে' মনে করি।

(৭)

এখন সবুজের হিঁদুয়ানীতে ফিরে আসা যাক্। অতুল বাবুর একটি কথা নির্ভুল। তিনি বলেন যে, আর্য্য মনের প্রধান গুণ হচ্ছে ঋজু কাঠিন্য। যার চোখ আছে, আর্য্যমনের এ গুণ যে তার চোখে পড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ গুণ হচ্ছে æsthetical, কারণ ঋজুতা হচ্ছে form-এর একটা বিশেষ ধর্ম্ম। আর যার অন্তরে কিঞ্চিৎ কাঠিন্য নেই, অর্থাৎ যা অন্তঃসারশূন্য, তা কখনই ঋজু হতে পারে না,—মনোজগতেও নয় বস্তুজগতেও নয়, উদ্ভিদজগতেও নয় জন্তুজগতেও নয়। প্রাচীন সভ্যতা মাত্রেরই এই নয়ন-মনোমুগ্ধকর form অর্থাৎ আকার আছে, তা সে সভ্যতা গ্রীসেরই হোক্ আর ভারতেরই হোক। অপরপক্ষে বর্ত্তমান সভ্যতা মাত্রেই যে কদাকার, বর্ত্তমান সভ্যতার উমেদার ও মোসাহেবরা এ সত্য ভুলে গেছে। কিন্তু ঘটনা যে সত্য, তা একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখা যায়।

বর্ত্তমান সভ্যতার বীজমন্ত্র হচ্ছে দুটি কথা—liberty এবং progress, মুক্তি ও গতি। মুক্তি কাম্য গতিলাভের জন্য, আর গতি কাম্য মুক্তিলাভের জন্য। বাঢ়ং। মুক্তি জিনিষটে কি? আকারের বন্ধন থেকে মুক্তি। আর গতির লক্ষ্য কোন্ দিকে? বিকারের দিকে। চোখের মাথা খেয়ে দার্শনিক না হতে পারলে এই কিম্ভূতকিমাকার সভ্যতাকে আইডিয়াল বলে' চেনাও যায় না, মানাও যায় না। নবযুগ-ধর্ম্মী দার্শনিকরা মানুষকে লোভ দেখান যে, বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে ভেসে চল্‌লে মানুষ চট্‌পট্ ভবিষ্যৎ সভ্যতায় গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে মানুষমাত্রেই দেহে বাঘের মত খেতে পারবে ও মনে সাপের মত এগতে পারবে। সংক্ষেপে মানুষ যেখানে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পরমার্থ লাভ করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থা রেখে সেই বীরপুরুষই বর্ত্তমান সভ্যতাকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বুকে ধরতে পারেন, যিনি অর্থের লোভে কুরূপাকে বিয়ে করতে পারেন; ওরকম ইকনমিক বুকের পাটা সকলের নেই, সম্ভবত আপনারও নেই। তরলতার চাইতে সরলতাকে বেশি পছন্দ করার নাম যদি হয় হিঁদুয়ানি, তাহলে সে হিঁদুয়ানি অবশ্য সবুজ পত্রেরও ধর্ম্ম।

বীরবল।

পাঠকের কথা।

ভিতরে সত্যকারের প্রেরণা না থাকিলে কাহারও গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা উচিত নহে, এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা অনায়াসে চলিতে পারে, যেহেতু সাহিত্যসৃষ্টির অপ্রেরণাই এ প্রবন্ধের প্রেরণা হইবে ;—যেমন জাতীয় জীবনে আর আমাদের বক্তৃতার তিলমাত্র অবসর নাই, এই বিষয়ে তালপরিমাণ বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা রসনাস্রাবী হয়। বক্তব্যটা নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হইল না। কিন্তু তাহাই যদি উদ্দেশ্য থাকিবে, তবে উপমা দিলাম কেন? আমার সেটুকু ভাষাজ্ঞান আছে, যাহাতে আমি অনর্গল বলিয়া যাইব অথচ আপনারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। অগভীর জল স্বচ্ছ হইলেই বিপদ, তাহার তল দেখা যায়। এলোমেলো ঘাঁটাইয়া তাহাকে নিয়ত ঘোলা না রাখিলে তাহা গভীর প্রতিপন্ন হয় না। যাহারা সাঁতার জানে না তাহারা ত ব্যাপার দেখিয়া তটস্থ হইয়াই থাকিবে ; আর যে কয়জন সাঁতার জানেন, তাঁহারাই কাদার ভয় বেশী রাখেন। এতএব কোনদিক হইতে আশঙ্কার আর কারণ থাকে না।

আমি ভাবিয়া পাইনা এত লোক এত বাজে কথা কেন লেখে ও প্রকাশ করে। কণ্ডূগ্রস্তের নিজের দিক হইতে কণ্ডূয়ণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে স্বীকার করিলেও তাহা লোকসমাজে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার কথা অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক লেখকদের সম্বন্ধে খাটে না; কারণ অপ্রকাশিতকে প্রকাশিত করাই, অন্ধকার হইতে আলোকে আনাই তাঁহাদের ব্রত। তাঁহাদের রচনার গভীরতায় নামিতে নামিতে সকল আলো অন্ধকার হইয়া যখন কিছুই আর বুঝা যায় না, তখনই বেশ বুঝা যায় যে, তাহা প্রকৃত গবেষণামূলক ও অন্তঃপ্রেরণা সঞ্জাত। কেবল তাঁহাদের নিকট আমার সানুরোধ প্রস্তাব এই যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সংক্ষেপে পর পর ফিরিস্তি করিয়া একসঙ্গে বলিয়া দেন, তাহা হইলেই আমরা বিশ্বাস করিয়া লইব। চরক ঋষি যে চরকার আবিষ্কারক এবং বাদরায়ণ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রথম বাঁদর আনয়ন করেন, এসব আমরা তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিলেই মানিয়া লইব; তাঁহারা যেন আর যুক্তিপ্রমাণের অছিলায় সমগ্র শিলালিপি নিরীহ পাঠকদের স্কন্ধে না চাপান। তবে তাঁহাদের স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রবোধার্থ 'হিমালয়' বা 'কিউনলুন্' নামে পৃথক 'মাসিক শিলালিপিকা' বাহির করিতে পারেন।

অধিকাংশ গল্পলেখক গল্প লিখিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা না করিয়া বাড়ীর ছেলে মেয়ে অথবা মেয়েছেলের নিকট নিজের বাহাদুরীর গল্প করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি বুঝিতে পারি না প্রতিমাসে এত ভাল ভাল লোক এত বস্তা বস্তা মিথ্যা কথা লেখেন কেন? 'সদা সত্য কথা কহিবে' বলিয়াই, প্রায় একই নিশ্বাসে যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ "গোপাল নামে এক বালক ছিল" এই ঘোরতর মিথ্যার অবতারণা করিলেন,—(কারণ বিদ্যাসাগরের গোপাল কখনও কোথাও ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপের অপেক্ষাও

সে মিথ্যা,)—সেই দিনই বোধহয় বাঙ্গালী সত্যের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। তারপর হইতে চিরন্তন সত্য ফুটাইবার ছলে অজস্র মিথ্যাভাষণের আর অন্ত রহিল না। বিষ্ণুশর্ম্মা "কথাচ্ছলেন বালানাং" যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কি পাপে বালানাং পিতারা সেই ফল ভোগ করিতেছে, তাহা পরমপিতাই জানেন।

কবিতার উপর বাণক্ষেপ করা একটু কঠিন মনে করি; কারণ কবির দল এখনও 'ভীষ্মাভিরক্ষিত';—স্বয়ং বিশ্বকবি তাহাদের চালনা করিতেছেন। তথাপি বলিতে হয় যে, যদিও তিনি এই বয়সেও মাঝে মাঝে অল্পবয়সী কবিতা লিখিয়া আমাদের ভক্তহৃদয়কে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ আমাদের নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নিজের মনের বয়স নাই, একথা তিনি ত বলিয়াছেন, আমরাও পুনঃপুনঃ তাহার পরিচয় পাইতেছি, আর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। কিন্তু বাকী সকলের পক্ষে ত সে কথা খাটে না। তাঁহাদের মন বৃদ্ধ হইয়া তরুণী কবিতার ফরমাসে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ভিতরে যে স্থবির হইল, বাহিরটা তাহার স্থাবর হইলেই সামঞ্জস্য থাকে, শোভন হয়। ভাবের দিক হইতে তাঁহাদের কবিতা যতদূর জরাগ্রস্ত হইবার তাহা হইয়াছে, অথচ তার ছন্দ, অলঙ্কার একেবারে নবীনার মত। রং পাউডার মাখিয়া এক একটী বৃদ্ধা ইংরাজ মহিলা 'ডিঙি' মারিয়া নৃত্যচ্ছন্দে চলিবার চেষ্টা করেন; ইঁহাদের কবিতা পড়িয়া আমার সেই হাস্যজনক দৃশ্য মনে পড়ে। অন্যপক্ষে তরুণ কবিদের বলিতে পারি যে, বিবাহ হইয়াছে বা হয় নাই বলিয়াই কবিতা লিখিয়া প্রকাশিত করিবার অধিকার তাঁহাদের জন্মায় নাই। একদিন বৎসরের প্রারম্ভে উপরের

ছবিখানি দেখিয়া ভুলবশতঃ ভি, পি, গ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি সারাবৎসর ধরিয়া পাঠকদের এসব 'মনসার কাঁদুনি' সহ্য করিতে হয়, তবে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইতেছে বলিতে হইবে। একে নানা কষ্টের মধ্য দিয়া পাঠকদের জীবন যাত্রা। দিনে মনিবের তাড়া, রাত্রিতে ছেলের কান্না, প্রভাতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই অপ্রত্যাশিত পাওনাদারের তাগাদা, সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার পরেই 'অম্বলের ব্যথা'। ইহার মধ্যেও বেচারী নিতান্ত পয়সা দিয়াছে বলিয়াই রস সাহিত্য চর্চ্চার যেটুকু অবসর করিয়া লয়, সেটুকু তিক্ত করিয়া তুলিবার অধিকার নবীন কবিদের কে দিয়াছে? ঝঙ্কার আমরা গৃহেই যথেষ্ট শুনি। তথাপি নিতান্ত নিরর্থক কথায় পূর্ণ, ছত্রের পর ছত্র সমতালে কেবলমাত্র ধ্বনি শুনিবার লোভ যদি কোন পাঠকের থাকে তবে তিনি ধুনারি ডাকাইয়া লইবেন। কর্ণের পরিতৃপ্তিও হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লেপতোষক তৈয়ারের ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। লোকে সেতারীর কাছে যায়,—সঙ্গীত শুনিবার অভিলাষে; 'ডারে ডা' বা টুং টাং এর কসরতের খাতিরে নয়।

এতদিন মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ভেদে কবিতা দুই রকম দেখিতাম। অমিত্রাক্ষরে প্রকাশ্যমিল নাই; কিন্তু তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোপন মিল ও ছন্দের লীলা যে অব্যাহত বহিয়া যায়, আমার ন্যায় অনধিকারীর কানেও তা ধরা পড়ে। কিন্তু নিতান্ত সম্প্রতি এক 'বিচিত্রাক্ষর' কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মিলের ত চেষ্টা বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত নাই, ছন্দেরও কোন বালাই নাই। অথবা যে ছন্দে জনযানপূর্ণ লালবাজার রোডের উপর দিয়া 'মোটর ব্যস্' ছুটে;—হঠাৎ গতিবৃদ্ধি করিয়া, হঠাৎ ব্রেক কসিয়া, হঠাৎ বামে যাইবার ভঙ্গী

দেখাইয়াই ঝাঁকি দিয়া পূরাদমে দক্ষিণ ভেদ করিয়া, কেবলমাত্র মোড়ের মাথায় (বা পৃষ্ঠার শেষে) পুলিশের তর্জ্জনীসঙ্কেতে বোকার মত একবার থামিয়া;—এ কবিতাও ঠিক সেই ছন্দের অনুসরণ করে। পাঠকেরা জানিত গদ্যের সহিত পদ্যের একটা আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, যেমন নরের সহিত নারীর। সকল নারী নারীত্বের পূর্ণ গৌরবের অধিকারিণী হইতে পারেন না, কিন্তু তবুও যে তাঁহারা নারী তাহা বুঝিতে নিতান্ত আনাড়ীরও কোন দিন কষ্ট হয় না,—সকলেরই কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত কোমল, সকলেই কিছু না কিছু অলঙ্কার বন্দন-প্রিয়, সকলেরই গমন অন্ততঃ শারীর বিদ্যার নিয়মেও, অল্পবিস্তর ছন্দোবদ্ধ। সেইরূপ কবিতা ভাল বা মন্দ হউক তাহাকে কবিতা বলিয়া চিনিতে এতদিন কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু এই বিচিত্রাক্ষর কবিতায় মাসিক বা সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় দুই পাশে অনেকটা স্থান বাদ দিয়া ছাপান হইয়াছে ছাড়া, কবিতার আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান দেখি না। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' ইহা ভাল হউক মন্দ হউক, চিরদিন আমরা পদ্য বলিয়াই বুঝিয়া আসিতেছি। যেহেতু 'পাখীসব' তবুত 'করে রব'! এবং 'কাননে কুসুম কলি' একটিমাত্র অতিরিক্ত মিলের লোভে সত্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কবির ফরমাসে একেবারে 'সকলি ফুটিল'। উচ্চাঙ্গের না হইলেও এই সকলেই ইহার পদ্য প্রকৃতি ধরা পড়ে। কিন্তু বিচিত্রাক্ষর একটি কবিতাকে আমার এক বন্ধু cross word puzzle ঠিক করিয়া বাম হইতে দক্ষিণে পড়িয়া, পুনরায় উপর হইতে নীচে পড়িয়াছিলেন, তথাপি অর্থবোধের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই 'বিচিত্রাক্ষর' মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বকবি একটু তাড়া

দিলে এখনও কাঁদিয়া উঠিতে পারে;—তাহা হইলেই পাঠকেরা সহ্য করিতে পারিবে, কারণ ছেলেকান্নার মধ্যেও তবু একটা ছন্দ আছে, এবং পাঠকদের সেটা সহ্য করা অভ্যাস আছে।

প্রবন্ধের সহিত নিবন্ধের কি পার্থক্য, তাহা পাঠকেরা ঠিক অবগত নহেন। তবে শুম্ভ ও নিশুম্ভের মধ্যে ঠিক প্রভেদ না জানিলেও দেবী-মাহাত্ম্য বুঝিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। প্রবন্ধের আমরা শেষের দিক প্রথমে পাঠ করি, অর্থাৎ লেখকের নাম দেখিয়া পছন্দ হইলে তবে পাঠ করি। সেইজন্য প্রায়ই আমাদের পাঠের কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আর সময়ের ও ধৈর্য্যের অভাবে সব সময় পছন্দসই প্রবন্ধও শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া উঠিতে পারি না; তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে 'আধকপালে' ধরিয়া কষ্টও পাই। তবে পলিটিক্সের গন্ধ থাকিলেই পলাণ্ডুযুক্ত ব্যঞ্জনের ন্যায় প্রবন্ধমাত্রেই অপেক্ষাকৃত স্বাদু হয়। সেই জন্যই ভাদ্রের সবুজ পত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে; কারণ, চরকাই বলুন আর হিন্দু-সভাই বলুন, এখন এ সবই পলিটিক্স। তথাপি স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ যে তুচ্ছ চরকা লইয়া ২১ পৃষ্ঠা ধরিয়া উল্টা দিকে ঘুরাইবেন, তাহা আমরা কখনই প্রত্যাশা করি নাই। তিনি কি সত্যই আশঙ্কা করিয়াছেন যে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি বর্ণ ধর্ম্ম রুচি নির্ব্বিশেষে হয়ত একদিন চরকা কাটিতে বসিয়া যাইবে? আশঙ্কা বলিতেছি এইজন্য যে, বিপ্লবপন্থীর নিকট হইতে আশঙ্কার কারণ না হইলে, যেমন অর্ডিন্যান্স্ বাহির হইতে পারে না, তেমনি চরকা চলনের কিছু ভয় না থাকিলে চরকা দমনের প্রবন্ধও বাহির হইতে পারিত না। রবীন্দ্র নাথ চিরদিনই বলিয়া আসিতেছেন, এবং আমরাও আমাদের মত করিয়া বরাবর বুঝিয়া আসিতেছি যে, কোন একটী নিয়ম, তা যত

ভালই হউক, সকলের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না; তাহা প্রকৃতির অভীষ্টও নহে। বৈচিত্র্যই জীবন। সকলকে একই নিয়মে বাঁধিতে গেলে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যর্থ করিয়া দেয়। এরূপ চেষ্টা বিফল হওয়াই বরং শুভ, সফল হওয়া মৃত্যুরই নামান্তর। জগত যে বৈচিত্র্য ছাড়িয়া কিছুতেই এক নিয়মের বাঁধনে ধরা দিতে চাহে না, তাহার প্রমাণ চিরদিনই পাওয়া যাইতেছে এবং বাঙ্গালীও তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। বৈচিত্র্য রক্ষার খাতিরেই আমরা সকলে সত্যকথা কহি না, দুই ভাই এক অন্ন গ্রহণ করি না। একই স্ত্রীতে চিরদিন অনুরক্ত থাকিবার পক্ষেও এই বৈচিত্র্য জ্ঞানই বোধ হয় বাধা প্রদান করে। রসনা-বৈচিত্র্য জন্য সকলে অহিংস হইয়া উঠিতে পারিল না; রুচি-বৈচিত্র্য হেতু একই দেশে প্রস্তুত একই রকম মোটা কাপড় পরিতে পারিল না। তরুণ বিদ্যার্থীরা একবার হুড়মুড় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়াই পরক্ষণে তেমনি সশব্দে পুনঃ প্রবেশ করিল। এ সমস্তই বৈচিত্র্যের লীলা বলিয়াই আমরা বুঝি। ভাবের ক্ষেত্রে সকলে অহিংস হইয়া নির্ভয়ে সত্যকথা কহিতে থাকিবে। আর কর্ম্মের ক্ষেত্রে নিজের নিজের চরকা লইয়া তাহাতে তেল দিবে; সঙ্গে সঙ্গে চাষা ও বিদ্বানের মধ্যে ঐক্যসূত্র কাটিয়া উঠিবে, এরূপ বৈচিত্র্যহীন জীবন প্রকৃতই কখনও আসিতে পারে, এ আশঙ্কা বাঙ্গালী কোনদিন করে নাই। তাহার উপর সত্য কথন বা হিংসা বর্জ্জনের ন্যায় চরকা-কাটন কখনই একটী চিরন্তন সত্য নহে;—যেহেতু কোনও কারণে বস্ত্রের আমদানি বন্ধ হইলেও আমাদের যে চিরকাল বস্ত্র ব্যবহার করিতেই হইবে, তাহা কে বলিল? সুতরাং যদিবা কখনও সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে সকলে একমতও হয়, চরকা

সম্বন্ধে যে আমরা কখনও ঐক্য লাভ করিব, এ ভয় মোটেই ছিল না। স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রবীন্দ্র নাথের নিকট ঠিক কি আশা করিয়াছিলেন ও তাহাতে নিরাশ হইয়া ঠিক কি বাক্যে রবীন্দ্রনাথকে এই প্রবন্ধের প্রেরণা প্রেরণ করিলেন, তাহা আমরা সম্যক অবগত ছিলাম না। স্যর প্রফুল্ল কি মনে করিতেছিলেন যে, বিশ্বকবির উচিত ছিল, বিশ্ব-সাহিত্যের উপযোগী করিয়া মাঝে মাঝে 'চরকার গান' লেখা? পাঠকদের কেহ কোনদিন তাহা আশা করেন নাই। এই বয়সে ও এই শরীরে তাঁহার মত লোক যে সভা করিয়া চরকার উপকারীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবেন, ইহাও কেহ মনে করিতে পারে না। গল্প বা উপন্যাসের উপাদান হইতে, 'চরকার' আরও কিছু দেরী লাগিবে, ইহাও সকলেই বুঝিতেছে। বাকী থাকে প্রবন্ধ লেখা। ২১ দিন উপবাসে থাকিয়াও যিনি নিয়মিত চরকা কাটা হইতে বিরত হন নাই, তাঁহার লিখিত পঠিত ও কথিত অসংখ্য প্রবন্ধেও যদি চরকা চলনের কোন সহায়তা না হইয়া থাকে, তবে বিশ্ব কবির সুচতুর উপমাবহুল যুক্তিতে ও অসাধারণ রচনা নৈপুণ্যে প্রতারিত হইয়া যে সমস্ত লোক চরকা লইয়া বসিয়া যাইত, এই একান্ত দুরাশা স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র করিয়া-ছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু পাঠকদের মধ্যে কেহ কোনদিন তাহা পোষণ করেন নাই। কারণ বাঙ্গালী পাঠক বেশ জানে, ছাপার অক্ষরে পড়িতে যাহা যত ভাল লাগে, কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাহাই তত অনুপযোগী। সবুজ পত্রের প্রথম সংখ্যায় পাঠকেরা রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ পড়িবার আশায় কিছুদিন হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া-ছিল। সামান্য কারণে স্যর প্রফুল্লর নিকট কৈফিয়ৎ দিবার হিসাবে লিখিত এই দীর্ঘ অথচ অপ্রয়োজনীয় প্রবন্ধের দ্বারা আমরা নিজেদের

বঞ্চিত মনে করিতেছি। বিশেষতঃ রবীন্দ্র গান্ধীর মত বিভেদের মূলে রামমোহন রায় ও চরকা যে সমান স্থান অধিকার করিতেছে, এ কথার প্রাসঙ্গিকতাও আমাদের নিকট একান্ত অস্পষ্ট রহিয়া গেল। তবে মহাত্মার খাতিরে একবার চরকা কিনিয়া সুতা কাটিবার ভার সযত্ন পালিত মাকড়সার হাতে দিয়া আমরা যে একটু বৈচিত্র্য দেখাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কি যেন একটা লজ্জা ছিল। অথচ এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ নির্লজ্জ হইবার যে সব সুসঙ্গত কারণ ও অকাট্য যুক্তি সমস্ত জাতির পেটে গজ্‌গজ্‌ করিতেছিল কিন্তু প্রকাশ-কৌশল আয়ত্ত্ব না থাকায় মুখে ফুটিতেছিল না স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ মুখপাত্র হইয়া আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিলেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

সামান্য মক্ষিকা হইয়া ষট্‌পদোপদবী পাইবার দুরাশা আমার না থাকায়, যে সমস্ত লেখা পাঠকদের প্রকৃত আনন্দ দান করে, তাহার উল্লেখ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। সুতরাং এই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ যদি এইখানেই শেষ করি, তবে কি তাহাকে কেহ কবন্ধ বলিবেন? আমি তাহাতেই খুসি হইব, কারণ কবন্ধের সুবিধা অনেক;—চক্ষুলজ্জার দায় থাকে না, গালে চুণ কালী পড়িবার উপায় থাকে না, কপালে মার থাকে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সম্পাদকের কথা।

——ঃ০ঃ——

ভাদ্র মাসের সবুজ পত্র পড়ে "মরীচিকা"র কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রস-পিপাসা যে পরিতৃপ্ত হয় নি, তার কারণ, তিনি ও-পত্রের প্রবন্ধনিবন্ধের ভিতর পলিটিক্‌সের গন্ধ পেয়েছেন। এর জন্য তাঁর দুঃখিত হওয়া উচিত নয়, কেননা তিনি ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই চরকা ও হিন্দুসভা গলাধঃ করেছেন। ও দুটি যে "পাখী সব করে রব"-এর মত নিছক রস-সাহিত্য নয়, তা' তাঁর মত রসজ্ঞ মাত্রেই জানেন। কিন্তু যতীন বাবু একটু ধীরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে, যে গন্ধে তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পরে বিকৃষ্ট হয়েছেন, সে গন্ধ এ যুগে সাহিত্যে অপরিহার্য্য। পলিটিক্সের কাছে সাহিত্য অস্পৃশ্য হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের কাছে পলিটিক্‌স্ অস্পৃশ্য নয়। সাহিত্য মনের জিনিষ, পলিটিক্‌স্ জীবনের। জীবন ও মন, এ দুই অবশ্য এক জিনিষ নয়। প্রমাণ, মানুষে চিরকাল বিশ্বাস করে' এসেছে যে, জীবন গেলেও মন থাক্‌বে। আর এ বিশ্বাসের গোড়া এত শক্ত যে, দর্শন বিজ্ঞানের উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড ধাক্কায় সে বিশ্বাসকে একেবারে উন্মূলিত করতে পারে নি। অপরপক্ষে এই দুটী বিভিন্ন পদার্থ ইহলোকে যে বিচ্ছিন্ন নয়, এ সত্যও প্রত্যক্ষ।

মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হ'লে জীবন ফূর্ত্তি করে লম্ফ প্রদান করতে পারে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হলে মন অনেকটা পঙ্গু হয়ে

পড়ে, যদি তার কুম্ভকবিদ্যা আয়ত্ত না থাকে। ফলে পলিটিক্স্ সাহিত্য হতে যত সহজে মুক্ত হতে পারে, সাহিত্য পলিটিক্স্ থেকে তত সহজে পারে না। যতীন বাবুকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই দুটো মুখ আছে। তার একটা মুখ কর্ম্মের দিকে, আর একটা মর্ম্মের দিকে। যতীন বাবুর উপমার সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব। কেউ যদি বলে যে ঐ ঘোলা জল গভীর নয়, তাহলে তার সঙ্গত উত্তর এ নয় যে, "কে ঐ জলে ডুবে মরতে যাচ্ছিল" ?

যতীন বাবু বলেছেন যে, "চরকার" উপর প্রবন্ধ লেখবার রবীন্দ্র নাথের কোন প্রয়োজন ছিল না। কোন্ বিষয়ে লেখবার প্রয়োজন আছে, আর কোন বিষয়ে প্রয়োজন নেই, তা স্থির করবে কে? লেখক না পাঠক? পাঠক যে নয়, সে বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। কারণ পাঠকের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার আছে, তাঁর কাছে যা অপ্রয়োজনীয় তা' না পড়বার; লেখককে ফরমায়েস দেবার অধিকার পাঠকের এ যুগে নেই। সম্ভবত যতীন বাবু, যে লেখা তাঁর মনোমত নয় তাকেই অপ্রয়োজনীয় বলেন। রবীন্দ্র নাথ যে চরকাকে একুশ পাতা ধরে উল্টো পাকে ঘুরিয়েছেন, এ ত যতীন বাবুরই কথা। এতে একদলের পলিটিসিয়ান-দের মাথা ঘুরে যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকদের কেন যে "আধকপালে ধরবে", সেকথা বুঝতে পারছিনে। যতীন বাবু বলেছেন যে, "চরকা" অতি তুচ্ছ পদার্থ। চরকা যদি অত তুচ্ছ পদার্থ হত, তাহলে পলিটিসিয়ানরা অনেকে চরকাসূত্র ছিঁড়ে পালিয়ে স্বরাট হতেন না, আর যতীন বাবুও তার উত্তর মীমাংসা করতে ব্রতী হতেন না। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিদ্রূপ করে' বলেছেন যে, তাঁরা আবিষ্কার

করেছেন যে, চরকার উদ্ভাবন করেছেন চরক ঋষি। প্রত্নতত্ত্ব আমার খুব প্রিয় জিনিষ নয়, এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভয়ে অনেক সময় আমার কলম সরে না। হারাপ্পা ও মহেঞ্জ দারো আমার মনের সব সাজানো তাস ভেস্তে দিয়েছে। কিন্তু চরক্ ঋষি যে চরকার স্রষ্টা, প্রত্নতাত্ত্বিকদের এ আবিষ্কার খুব সম্ভবত সত্য। কারণ চরকা হচ্ছে আমাদের সর্ব্বরোগের মহৌষধ।

চরকা যদি একটা যন্ত্রমাত্র থাক্‌ত, যা' পৃথিবীতে আবহমান ছিল আর আজও আছে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু চরকা যে এখন কর্ম্ম-জগত থেকে ধর্ম্ম-জগতে প্রমোশান পেয়েছে। এখন ত চরকা আর কর্ম্মের কল নয়, ধর্ম্মের কল হয়ে উঠেছে, তাই তা' নড়ছে এখন আমাদের মুখ মারুতে। যখনই কোনও বস্তু matter-এর অধিকার থেকে বেরিয়ে spirit-এর রাজ্যে ঢোকে, তখনই তা' সাহিত্যের আমলে আসে। সুতরাং সবুজ পত্র চরকার বিচারে স্বাধিকারপ্রমত্ততার পরিচয় দেয় নি।

যতীন বাবুর উপমাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক্। চরকা নামক আধ্যাত্মিক মতটা যে এলোমেলো ঘাঁটিয়ে অতিশয় ঘোলা করা হয়েছে, সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং এই ঘোলা জলের গভীরতা কত, তা জানবার কৌতূহল কিছু অস্বাভাবিক নয়,—বিশেষতঃ সাহিত্যিকদের পক্ষে, কেননা তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা ঘোলা জলে মেটে না। বাঙালী বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিচারে সব চরকা কাটতে বসে যাবে, এ আশঙ্কা যে রবীন্দ্রনাথের মনে উদয় হয়েছিল, তার প্রমাণ তাঁর একবিংশতি পত্রব্যাপী প্রবন্ধের এক ছত্রেও নেই। চরকার সূতো কাটায় তিনি কাউকে রত কি বিরত করতে চান নি—এই উপলক্ষ্যে

মনোজগতে যে সূতো কাটা হয়েছে, সে সূতো যে মানসিক লূতাতন্তু, এই হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। অন্ততঃ আমি ত তাই বুঝেছি।

যতীন বাবু তাঁর ঘরের চরকা মাকড়সার হাতে সঁপে দিয়ে সলজ্জ ভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, কিন্তু মনের চরকাকে সকলে সমান খোস-মেজাজে মনোজগতের উর্ণনাভদের হস্তে ন্যস্ত করতে পারে না, নাভীপদ্ম থেকে অন্তঃপ্রেরণার বলে শারীরিক সূত্র বার করবার জন্য। রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে এ প্রবন্ধ লেখা যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ হওয়া।

এই সূত্রে যতীন্ বাবু একটা মহা দার্শনিক সমস্যা তুলেছেন। তাঁর মতে মানুষের পক্ষে নিয়মের অধীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ; অবশ্য সে নিয়ম যদি ভাল হয়। নিয়মটা ভাল কি মন্দ সেটা কিন্তু বিচার সাপেক্ষ। অতএব দাঁড়াল এই যে, নির্ব্বিচারে কোনও নিয়ম মানাই মানুষের পক্ষে ভাল নয়, এবং অনেকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু নিয়মওয়ালারা যা' একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না, সে হচ্ছে বিচারবুদ্ধি। তাঁরা মুখে যাকে নিয়ম বলেন, তার আসল নাম হচ্ছে আদেশ। আমরা যদি সবাই একের হুকুমের দাস হই, তাহলে সামাজিক জীবন যে নিখির্খিচে চলে যাবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? এ স্থলে একটা সেকেলে কথার উল্লেখ করি। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মত law and order-এর পক্ষপাতী লোক পৃথিবীতে বোধহয় আর কোথাও ছিল না, কারণ তাঁরা ধর্ম্ম অর্থে বুঝতেন শুধু বিধি ও নিষেধ। কিন্তু ধর্ম্মকে তাঁরা অপৌরুষেয় বলেই জানতেন। অপৌরুষেয়ের মানে হচ্ছে যা' কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নয় এমন কি মহাপুরুষ কর্ত্তৃকও নয়।

কেননা তাদের মতে একের ভ্রান্তিতে জগৎ ভ্রান্ত হতে পারে না। মানবসমাজের law এবং order-কে তাঁরা বিশ্বের law এবং order-এর আনুষঙ্গিক মনে করতেন। প্রকৃতির law এবং order আমরা সবাই মানি, কেননা পেয়াদায় মানায়। আমরা সশরীরে উড়তে গেলে আমরা সশরীরে ধরাশায়ী হব, যেমন মাদক দ্রব্যের উত্তেজনায় মানুষ কখনো কখনো হয়ে থাকে। এই সৌর জগৎটা নিয়মে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর যতীন বাবুর কবিতার ভাষায় "মাখন-মাখানো" পথে বেমালুম ঘুরছে। এর একমাত্র কারণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ কারও দেহে মন নামক বালাই নেই। মানুষের পক্ষে হয়ত ঐরূপ মাখন-মাখানো পথে জীবনে বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাওয়াটা আইডিয়াল। দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষের অন্তরে মন নামক একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আছে, যা' তাকে জড়ের আইডিয়ালকে জীবনে পরিণত করতে দেয় না। মানুষকে যে জড়পদার্থ করে' গড়া হয়নি, তার জন্য দোষী তার সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং বাঙালীজীবনের ছন্দ যদি সত্যই বিচিত্রাক্ষর হয় (যা বস্তুগত্যা মোটেই নয়), তাহলে তার স্বচ্ছন্দতা প্রমাণ করে যে তার মন আছে। এ প্রমাণ পেয়ে সাহিত্যিকরা আনন্দ লাভ করে, পলিটিসিয়ানরা তাতে যতই নিরানন্দ হউন। যার ভিতর মন নেই, তা' মিত্রাক্ষরই হোক্ আর বিচিত্রাক্ষরই হোক্, সমান নিরক্ষর। জীবনেরও একটা মানে আছে, তা শুধু ছন্দোবদ্ধ ডারে ডা টুং টাং নয়।

যতীন বাবু "সবুজ পত্রের" চরকাবহির্ভূত অন্য কোনও লেখা স্পর্শ করেন নি। তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের বাঙলা করে' তার সবিনীত কারণ বলে' দিয়েছেন। তিনি বলেন তিনি মক্ষিকা, ষট্‌পদ হবার

দুরাশা তাঁর নেই, কেননা মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদা। কিন্তু এর আসল কারণ, অপর সব লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, কেননা তাদের ভিতর পলিটিক্সের পিঁয়াজের গন্ধ ছিল না। সবুজ পত্র নিরামিষ, সুতরাং পিঁয়াজ রশুনের "সাহিত্য" তাতে বেশি পাবার আশা করলে অহিংস রাজসিক রসনা তার অভ্যস্ত ও স্পৃহনীয় রসে বঞ্চিত হবে। যতীন বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, পলিটিক্সেও মরীচিকা আছে, আর তা'ও সাহিত্যের বিষয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্বরাজ সাধন

——ঃ০ঃ——

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুসি কথায় বল, লেখায় লিখোনা। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি; সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করিনে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয়, তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে, সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে—কেবল উত্তর বায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে একটা জিনিষ আমাদের পেয়ে বসে, সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে' বিশ্বাস করি—সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলে'ই যুক্তি জুটিয়ে আনি—সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে' তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না,

কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেচে। গণ মনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ প্রতিবাদ উত্তর প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগবিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে, সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে' দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই বলে'ই যে মাতে তা' নয়, লোভে পড়ে' বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলে'ই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হ'ল স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে' দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠ্‌ল সর্ত্ত পালন করা হয়নি বলে'ই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখ্‌লেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে সর্ত্ত প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার সর্ত্ত আমরা পালন করিনে বলে'ই স্বরাজ পাইনে, এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে, তাহলে স্বরাজ পাবার একটা বড় ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেক্‌চে এইখানেই যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন হল না; যদি মিলৃত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে

যে ৩৬৫টা দিন আছে, সব ক'টা দিনই হ'ত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির ক'রে দিলে নেশা লাগে, তাই ব'লে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

পাঁজির নির্দ্দিষ্ট দিন অনেক কাল হ'ল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সঙ্কীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েচে চরকা।

তাহলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়—স্বরাজ জিনিষটা কি? আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটিনে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখ্‌তে পারে না। হয় ত পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসর-কাল সুতো কাটায় নিযুক্ত ক'রে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যাঁরা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্চেন, তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্চেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্চে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে ত। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কি? দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জ্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে, তাহলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে' নেওয়া যাক্‌ এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত

সহজ, তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধান ভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে' দিলেই হ'ল না—ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষকরা-কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েচে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে' কাজ করে না, এ অপবাদ তা'কে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তাহলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তা'তে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আরেকটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরীর কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা' চলে ট্রামগাড়ির মত। হাজার প্রয়োজন হ'লেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে-কাজ করতে বলা যায়, তা'তে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলে ঠুলে তাকে হয়ত নাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তা'তে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন, তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। তারপরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে

পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আরেক জেলায় চাষী ধান পাট আখ্ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ সব শস্য সহজে হয় না, সে জমি তাদের বৃথা পড়ে' থাকে, তার খাজনা বহন করে' চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে' নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষী পাটের ফলন করে, তা'কে স্বভাবত অলস বলে' বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে-যে পাট একচেটে, তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেচি এই চাষীই তার বালু জমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয়, তখন মানুষের মনকে কি করে' এক পথ থেকে আর এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে,—মানুষের

মনের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করাই হ'ল গোড়ার কাজ। "হিন্দু মুসলমানের মিলন হোক্", বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই—তবু "এহ বাহ্য।" কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেচে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয়পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবীশের কথা জান্‌তেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচিপূর্ব্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট্ ঈষ্টারণের ভাতটা বাদ দিতেন—বলতেন মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠ্‌তে চায় না। যে-সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে, সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিল্‌তে তাঁর বাধবে। ধর্ম্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলে'ই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বল্‌লে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা

অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুন্‌লেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ উপার্জ্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে, সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়মানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌তেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ সাধনার প্রধান অঙ্গ, এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে, তবে মান্‌তেই হয় সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এই জন্যই, দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে, সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধ'রেই নেওয়া যাক যে, চাষীরা তাদের অবসর-কাল যদি লাভবান কাজে লাগায়, তাহলে আমাদের স্বরাজ লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধ'রেই নেওয়া যাক্ এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তাহলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে চাষীদের অবকাশকালকে সম্যকরূপে কি উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসঙ্কট ঘটে, তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে' সাহিত্য রচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়ত হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি, তাহলে

শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড় করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি-যে নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চা-ওয়ালার মত আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চা-ওয়ালার মত আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখ্‌তে বা স্কুল-কলেজপাঠ্য বিষয়ের নোট্‌ লিখ্‌তে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেক্‌লে হয় ত সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তা'তে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদিবা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ্‌ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে' চাষীর দেহমনের যে-শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে, তার থেকে তা'কে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তা'কে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি, মনের চর্চ্চা যাদের কম, গোঁড়ামি তাদের বেশি—সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ বশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে, তা'তে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোন কোন কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেচে। সে সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেচে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি

থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করচে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো আনা খাটাবার চেষ্টা না করে' তা'কে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। 'আমরা চাষীকে অলস বলে' দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তা'কে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই, তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল, এটা এই মনে করে'ই করেচি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হ'লে, তা'তে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করে'ও থাকেন। আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে' কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত ক'রে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্চে।

দেশের কল্যাণ বল্‌তে যে কতখানি বোঝায়, তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোট করে' দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবী কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে' তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে' রাখলে দেশের [illegible] শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয়

ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোট করি, আমাদের সাধনাকেও ছোট করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে, তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদরের ছবি দেশের কল্যাণের বড় ছবি নয়। এ হ'ল হিসাবী লোকের ছবি, এ'তে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না, যা' বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্ব্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখ্‌তে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তেও পারে না, তখনো এইটেই তা'কে কেবলি আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে' যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্ব্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চারদিকে কেবলি ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র, তাহলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হ'ত, এবং তাও শিখতে লাগ্‌ত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজ সাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই, তাহলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর করে' তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্ত্তির

য়তন যে খুব বড় হবে, এ কথা বলিনে; কিন্তু তা' সম্পূর্ণ হবে, সত্য ব, এ দাবী করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিষের পরিণতি প্রথম কেই সমগ্রতার পথ ধরে' চলে। তা' যদি না হ'ত, তাহলে শিশু মে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত—তারপরে সেটা ধীরে র হ'ত হাঁটু পর্য্যন্ত পা; তারপরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা খা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে—ই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে নুষ করে' তোলবার কঠিন দুঃখও মা বাপ স্বীকার করতে পারে। লে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার পাঁচ বছর টাতে হ'ত, তাহলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য য় উঠ্‌ত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই খতে থাকি, তাহলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ ধনায় মহাত্মার মত লোক হয়ত কিছুদিনের মত আমাদের দেশের কদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত হাত্ম্যের পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন রাকেই অনেকে ফললাভ বলে' গণ্য করে। আমি মনে করি, রকম মতি স্বরাজ লাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে, কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্ ভাবে গ্রহণ রবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিষটা অনেক-গুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। াদের একটাকে পৃথক করে' নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের

সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তা'তে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক'রে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কা'কে বলে, সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর পরে', কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিষটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই, ভারতবর্ষের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশে তা'কে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাহলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তাহলে আত্মপ্রভাবের যে কি মূল্য তা' বুঝতে পারব ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্ম-শক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে, তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশ রূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাস্‌তে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্চে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে' তুল্‌চে না, এই জন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ্য নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের

অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্ম্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্যোগকে আমরা আয়তনে ছোট বলে' অবজ্ঞা করি, তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি,—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চ্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরব-বোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'লে, তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব, আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জন-সঙ্ঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে,—তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে' আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে, সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ—অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্চে সেই ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি ক'রে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষ সাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আমার

প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়ত বল্‌তেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত, সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিষটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে-মানুষ সুতো কাটচে সেও একলা, তার চরকার সূত্র অন্য কারো সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্ত ভাবে নিজের চারদিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন, তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন—চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্যোগ করচে, তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারি কাজে স্বরাজ সাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয়, তাহলেই বুঝব গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্চে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজ লাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও, সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশো'র হারে লাভ না হলেও হয়ত শতকরা একের হারে লাভ;—

এই লাভই শতকরা একশো'র সগোত্র, এমন কি, সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন উপার্জ্জনে, আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জেলেছে। তারপরে একটা দীপের থেকে আরেকটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবেনা, স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শেষ বর্ষণ।

রাজা। পারিষদবর্গ।

নটরাজ। নাট্যাচার্য্য ও গায়ক-গায়িকা।

গান আরম্ভ।

রাজা।

ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালা গানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ।

(পুঁথি দিয়া) এই নিন্ মহারাজ।

রাজা।

তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কি লিখ্ছে? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

আচ্ছা বেশ ভাল। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ।

কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তারপরে জগতে তার মত অদরকারী আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা।

পরিহাস ব'লে ঠেক্‌চে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালালো কেন?

নটরাজ।

পাছে মহারাজ ব'লে বসেন, ভাব, অর্থ, সুর, তান, লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা সেই ভয়ে। লোকটা বড় ভীতু।

রাজ-কবি।

এ তো বড় কৌতুক! পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপ্‌সা।

রাজা।

তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ।

ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য্য নিজে লুকিয়েচেন কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজ-কবি।

তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড় সাদা।

নটরাজ।

ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুল্‌তে থাকবে।

রাজা।

কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ।

সে ভার আমার উপর। ইসারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা।

আমার কাছে ইসারা চলবেনা। বিদ্যুতের ইসারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কি দিয়ে?

নটরাজ।

বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা।

বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজ-কবি।

ঋতু-উৎসবের শব সাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন! অদ্ভুত রসের কীর্ত্তন।

নটরাজ।

কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।

রাজা (পারিষদের প্রতি)

মানে কি হে?

পারিষদ।

মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজ-কবি।

যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টান্‌লে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ।

বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা।

রোসো রোসো। বর্ষাকে ডাকা কি রকম? বর্ষা ত নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ।

সেত আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা।

গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরি বাঁধা?

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

এই আর এক বিপদ।

রাজ-কবি।

নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্ত্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্ব্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক্ তাহলে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ।

রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে তবে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা।

ওহে নটরাজ, রস জিনিষটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিষটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা নাই পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তাহলে তো আমার মতো লোকের মুস্কিল।

নটরাজ।

মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ।

অলমতি বিস্তরেণ। তোমাদের ধর্ম্ম যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মত সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়ক গায়িকাদের প্রতি)

ঘন মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এস কর স্নান নবধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

নটরাজ।

মহারাজ এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা।

ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম।

নটরাজ।

গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করচেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠ্‌ল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

নটরাজ।

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ঐ শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হ'ল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে ॥

রাজা।

পূব দিকটা আলো হয়ে উঠ্‌ল যে, কে আসে?

নটরাজ।

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজ-কবি।

শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইসারায়।

রাজা।

নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও ত বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ।

মহারাজ, বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ! তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিৎ, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা বদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আন্‌লে?

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল ॥

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে,
আসা যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

রাজা।

বেশ, বেশ এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা।

ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ।

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্ব্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥

তোমার মন্ত্র বলে
পাষাণ গলে ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মর মর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে ?
সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা ।

রাজা ।

সব রকমের ক্ষ্যাপামিই ত হল । হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী ?

নটরাজ ।

বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখ্‌লে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আন্‌মনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য্য, ধর হে,—

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি ।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী ॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী ॥

ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী ॥

নটরাজ।

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেলো কিন্তু ওর বাণীটি আছে, তোমার কণ্ঠে মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা ॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

রাজা।

আর নয় নটরাজ বিরহের পালাটাই বড় বেশী হয়ে উঠ্‌লো, ওজন ঠিক থাক্‌চে না।

নটরাজ।

মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারদিকে ছল ছল করচে, মিলন পদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজ-কবি।

তাই না হয় হোলো। কিন্তু অশ্রু বাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেল্‌লে ত চল্‌বেনা।

নটরাজ।

মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য্য একবার শুনিয়ে দাও ত।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে ॥

রাজা।

আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগলো। থাম্‌লে চল্‌বে না। দেখ না, তোমাদের মাদলওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়েচে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ।

বলি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটলো, ওরা যে ক্ষ্যাপার মত চলেচে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক্ না সুরে, কথায়, মেঘে, বিদ্যুতে, ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে,
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে কর্‌বি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস্ আপ্‌নারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে॥

রাজ-কবি।

ঐরে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরী নেই, আবার কান্না নামলো বলে।

নটরাজ।

ঠিক ঠাউরেচ। বোধ হচ্চে চোখের জলেরই জিৎ। বর্ষার রাতে সাথী-হারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে॥

বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে॥

রাজা।

কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই ত খণ্ড খণ্ড করে হোলো এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য্য, তবে ঐটে সুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় কর নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ কর সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে।
তালে তালে ছুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেকযুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

রাজা।

বাঃ বেশ জমেচে। আমি বলি আজকের মত বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ দেখ্‌চেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভ'রে উঠ্‌লো। ঐ যে, "এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তা'রে
ডেকে গেল আকাশ পারে,
তাইতো সে যে উদাস হ'ল
নইলে যেত কি॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠ্‌ত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়।

শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি ॥

রাজা।

নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ।

তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করচে।

রাজা।

তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মানো রাজার কথা মানো না? আমি যদি বলি যেতে দেব না।

নটরাজ।

তাহলে আমিও তাই বল্‌ব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য্য।

নটরাজ, ও বলচে ওর সময় গেলো।

নটরাজ।

গেলোই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনি ত সুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেল্‌তে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥

পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেলো চ'লে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেলো ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে ॥"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন ?
ও যে হ'ল সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "মিল্‌বে যুগল কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে ॥"

নটরাজ।

শরতের প্রথম প্রত্যুষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিলো অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা।

নটরাজ, তুমিও ত কথা কইতে কসুর করো না।

নটরাজ।

আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা।

আর আমার হোলো তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হোলো নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরণা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে-বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ।

এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাঁধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইলো না। গীতাচার্য্য গান ধরো।

দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়॥
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশায় আকাশ উঠিলো পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়॥

নটরাজ।

ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌচেছে। আকাশে আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিলো ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্ত্যে, তার ব্যথা ক'জন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি ॥
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিলো এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি ॥
বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইলো পাতা সে
কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি ॥

রাজা।

নটরাজ, অমন করে শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে ?

নটরাজ।

আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে-মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়া-রূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজলো, কঙ্কণ চমক দিলো কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন ॥
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন ॥

অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত' গোপন আসা-যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ ॥

নটরাজ।

শুভ্র শান্তির মূর্ত্তি ধ'রে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক্‌—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে ॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে ॥

(বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

রাজা।

ও কী হল নটরাজ, সেই বাদল লক্ষ্মীই ত ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন! রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ।

চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোর রাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখীর কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছো মিলায়ে পবনে পবনে ?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছো লুকায়ে আপন মায়াতে ?
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না ॥
আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লব-বীজনে,
নামো জলে ছায়া-ছবি সৃজনে,
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না ॥
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা !
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা ॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা, শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিলো কে ?
আহা বরিলো তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা ॥

নটরাজ।

প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে. এইবার বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ প্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো ॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো ॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতানতলে বাজুক বঁধূর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব
প্রণয়-দোলায় দোলো ॥

(অবগুণ্ঠন মোচন)

নটরাজ।

অবগুণ্ঠন ত খুললো। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরি মধ্যে, না আমার চোখেরই সাম্‌নে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হোলো বলা,
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

রাজা।

শরৎশ্রী কা'কে ইসারা করে ডাকচে? বলো তো এবার কে আস্‌বে?

নটরাজ।

উনি ডাক্‌চেন সুন্দরকে। যা ছিলো ছায়ার কুঁড়ি তা ফুট্‌লো আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

(সুন্দরের প্রবেশ)

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিলো মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা॥

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা ॥

রাজা।

নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরি মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ?

নটরাজ।

শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া আসায় স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

নটরাজ।

এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজ্‌লো ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হোলো গত
নিশিশেষের তারার মত
তারে শেষ করে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে॥

রাজা।

ওকি! একেবারেই শেষ হয়ে গেলো নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হোলো, গান সারা হোলো! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা,—তারপরে।

নটরাজ।

"তারপরে" প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তারপরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়।
চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেলো চলে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

রাজা।

উত্তম হয়েছে।

রাজ-কবি।

আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন হিন্দুর বুদ্ধিটা ছিল ঘোলাটে। যে-সব জিনিষ পরস্পর থেকে অতি স্পষ্ট তফাৎ, এরা তাদেরও ঘুলিয়ে এক করে' ফেলেছে। যেমন ধর্ম্ম আর আইন। এর একের সঙ্গে অন্যের কিছু সম্পর্ক নেই। এর একটি হ'ল ইহলোকের, অন্যটি পরকালের। একটির স্থান ধর্ম্মমন্দির, অন্যটির আদালত। একটির কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিত, ধর্ম্ম-যাজক; অন্যটির জজ কৌঁসিলি। অথচ প্রাচীন হিন্দু বলে, তার আইন তার ধর্ম্মেরই অঙ্গ। তার আদালত হচ্ছে ধর্ম্মাধিকরণ, তার জজ-জুরী হ'ল ধর্ম্মপ্রবক্তা। উত্তরে আমরা নব্যহিন্দুরা বলি—ঐ ত ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিশেষত্ব। ঐ-খানেই হিন্দুর হিন্দুয়ানী। অন্য সব জাতির স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে ভেদ আছে—কিন্তু হিন্দুর নেই। হিন্দুর যা 'অমূত্র' তাই 'ইহ'। তার সংসারযাত্রার প্রতি খুঁটিনাটি ধর্ম্মশাসিত। দাঁতমাজা থেকে ব্রহ্মধ্যান, সবই তার ধর্ম্মাচরণ। হিন্দু ধর্ম্মৈকপ্রাণ, ধর্ম্মসর্ব্বস্ব।

গল্প আছে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ নবপ্রতিষ্ঠিত 'রয়াল সোসায়টির' মুরব্বি হয়ে তার সভ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন—বাঁচা মাছের চেয়ে মরা মাছ ওজনে ভারী কেন? সমিতির পণ্ডিতেরা ভেবে চিন্তে নানা জনে নানা কারণ দর্শালেন, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই সকলের তেমন মনঃপূত হ'ল না। শেষে একজন পণ্ডিত একটা বাঁচা মাছ এনে ওজন করে', মেরে তাকে আবার ওজন করলেন; ওজন বেশী দেখা গেল

না। প্রাচীন হিন্দুকে নিয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতের সঙ্গে নব্যহিন্দুর যে বিচার বিতর্ক, সেও এই ধরণের। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে-সব তথ্য প্রচার করেন, সেগুলি সত্য কি মিথ্যা, তা পরখ্ করে' দেখা আমরা দরকার মনে করি নে। মনে মনে বিশ্বাস আছে, এ সম্বন্ধে তাঁদের বাক্য আপ্তবাক্য। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে সেই সব তথ্য থেকেই নানা তত্ত্ব বের করি, এবং তার বলে প্রমাণ করি, যে-সব কারণে তাঁরা হিন্দুসভ্যতাকে বলেন খাটো, ঠিক সেই কারণেই হিন্দু সভ্যতা সব চেয়ে উঁচু। তাঁরা বলেন প্রাচীন হিন্দু-যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ কর্‌তে পারে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাদের সভ্যতা আদিম অবস্থা ছাড়িয়ে বড় বেশীদূর এগোতে পারে নি; কারণ সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ও দুই জিনিষ একসঙ্গেই মিশে থাকে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমে তাদের পৃথক করে' নেয়। আমরা বলি প্রাচীন হিন্দুরা-যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ করে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁরা সভ্যতার একেবারে শেষ সীমায় পোঁছেছিলেন; কারণ সভ্যতার চরম অবস্থায় মানুষ আইনের ধারা মান্‌বে ধর্ম্মবুদ্ধিতে, 'ল' যাবে 'মরালিটিতে' মিশে। এখন যদি প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরা ধর্ম্ম ও আইন মোটেই মিশিয়ে ফেলে নি, ও দু-জিনিষকে খুবই তফাৎ করে' দেখেছে, এমন কি এত তফাৎ করে' যে বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের আইনেও ধর্ম্ম ও আইনের তফাৎ তত বেশী নয়,* তবে মুস্কিল হয় এই যে, তা'তে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আঘাত পায় না, নব্যহিন্দুর হিন্দুয়ানীতেও ঘা লাগে।

* জুলাই মাসের The Visva Bharati Quarterly পত্রিকায় The Spirit of Hindu Law প্রবন্ধে এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।

হিন্দুর আইন-যে হিন্দুর ধর্ম্ম থেকে পৃথক ছিল না, আর দন্তধাবন ও সত্যভাষণ দুইই যে তার ধর্ম্ম—পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও নব্যহিন্দুর এই বিশ্বাসের মূল একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সে প্রমাণ হচ্ছে, প্রাচীন হিন্দু একই শাস্ত্রে আইন, দন্তধাবন ও সত্যভাষণের ব্যবস্থা দিয়েছে; এবং সে শাস্ত্রের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যা আছে তাই যে হিন্দুর ধর্ম্ম, এতে আর কথা চলে না। এবং গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের এমন কোনও অবস্থা নেই, যার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে নেই। সুতরাং হিন্দুর জীবনের প্রতি কাজ যে ধর্ম্ম এতে আর সন্দেহ কি। তাই বঙ্কিম বাবু অনেক আগেই বলেছেন হিন্দুর 'ধর্ম্ম' খৃষ্টানের 'রিলিজান' নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম বড় ব্যাপক জিনিষ। এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম্ম' মানে 'কাল্‌চার'। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম মানে 'হিন্দু কাল্‌চার'। কিন্তু 'ধর্ম্ম' কথাটা 'রিলিজান'-এর প্রতিশব্দ নয়, 'কাল্‌চারের' প্রতিশব্দ, এই আভিধানিক তথ্য নিয়ে ত হিন্দুসভ্যতার ভালমন্দ বিচারের কোনও তর্ক ওঠে না। তর্ক যে উঠেছে তার কারণ, এ কথার মধ্যে একটু ইঙ্গিত আছে; এর অভিধা ছাড়িয়ে একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। হিন্দুর 'ধর্ম্ম' 'রিলিজান' নয়, 'কাল্‌চার'; কিন্তু তার সমস্ত 'কালচার'-টাই তার 'রিলিজান'। অর্থাৎ খৃষ্টানের গির্জায় গিয়ে হাঁটুগাড়ার সঙ্গে যে মনোভাব রয়েছে, হিন্দুর শৌচাচারের সঙ্গে সেই মনোভাবেরই যোগ রয়েছে। হিন্দুর 'রিলিজাস্' ও 'সেকুলার'-এর মধ্যে ভেদ নেই, কারণ সমস্ত সাংসারিক কাজও তাকে কর্‌তে হবে 'রিলিজাস্' মনোভাব নিয়ে। হিন্দু সভ্যতার যদি এই আদর্শ হয়, তবে সেটা ভাল কি মন্দ তা নিশ্চয়ই তর্কের বিষয়।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। প্রাচীন হিন্দু 'সেকুলার' ও

'রিলিজাস্', ঐহিক ও পারত্রিক—এর মধ্যে প্রভেদ করে নি, এ তথ্য সম্পূর্ণ অমূল, টীকাকারদের ভাষায় 'শশবিষাণের মত অলীক'। ও দুয়ের মধ্যে যে ভেদের গণ্ডী তাঁরা টেনেছেন তা গভীর, যে প্রাচীর তুলেছেন তা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের নব্য-হিন্দুদের যদি তা চোখে না পড়ে, সে আমরা চোখ বুজে আছি বলে'। এবং চোখ চেয়ে দেখ্‌লে হয়তো বা মনঃক্ষুণ্ণ হব।

ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ কি, এ আমাদের মাথা ঘামিয়ে বের করতে হবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা তা খোলা-খুলিই বলে' গেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনঃ" (১), যা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম শব্দ তারি বাচক। "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধি প্রতিষেধয়োঃ······দৃষ্টপ্রয়োগঃ" (২), যা কর্ত্তব্য এবং যা অকর্ত্তব্য তার বিধি ও তার নিষেধ অর্থেই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মানে কর্ত্তব্য। মানুষের যত কিছু কর্ত্তব্য—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিগত ও 'রিলিজাস্'—এ সকলের সাধারণ নাম 'ধর্ম্ম'। এ সব বিভিন্ন কর্ত্তব্যের যে এক নাম, এবং এক শাস্ত্রে যে তাদের ব্যবস্থা, তার কারণ ভিন্ন হলেও একই মানুষের ব্যক্তিত্বের অদ্বয় যোগ-সূত্রে তারা একসঙ্গে বাঁধা আছে। এ সব কর্ত্তব্যই একই মানুষের নানা সম্বন্ধ ও নানা সম্পর্কের কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন তাদের ঐক্য আছে, তেমনি ভেদও আছে। সব কর্ত্তব্যের মূল এক নয়, প্রমাণ এক নয়। সব কর্ত্তব্যই 'রিলিজাস্' নয়, কারণ 'রিলিজাস্' কর্ত্তব্য নানারকম কর্ত্তব্যের মধ্যে একরকমের কর্ত্তব্য মাত্র।

(১) মেধাতিথি; ৭।১
(২) মেধাতিথি; ১।২

এই ভেদ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' সংক্ষেপে এই ঃ— মানুষের যা সব কর্ত্তব্য, তার দুটো ভাগ। একভাগ বেদমূল, অন্যভাগ ন্যায়মূল। যে কর্ত্তব্যের মূল বেদ, তা' অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না। বেদের বাক্যই তা' জানার একমাত্র উপায়। স্মৃতি বা সদাচার থেকে যে এরকম কর্ত্তব্য জানা যায়, তারও মূল বেদ; কারণ স্মৃতির বচন থেকে বা সাধুদের আচার দেখে সেইরূপ বেদবাক্যের বা বিধির অনুমান করা যায়। কিন্তু মানুষের যে-সব কর্ত্তব্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণে জানা যায়, সে-সব কর্ত্তব্য বেদমূল নয়, ন্যায়-মূল। সেখানে বেদের প্রসার নেই, কারণ তারা বেদের বিষয় নয়। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বল্‌ছেন;—"ধর্ম্ম নামে মানুষের যে পুরুষার্থ অন্য কোনও প্রমাণ থেকে জানা যায় না, তাদের জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ। এই ধর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধন করে বলেই মানুষের কর্ত্তব্য, কিন্তু কেমন করে' যে সে শ্রেয়ঃ সাধন করে, তা প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। আরও সব কাজ আছে যা শ্রেয়ঃ সাধন করে বলে' মানুষের কর্ত্তব্য, যেমন কৃষি। কৃষি যে কেমন করে' মানুষের শ্রেয়ঃ সাধন করে, তা সাধারণ অন্বয়ব্যতিরেক প্রমাণেই (induction by agreement and difference) জানা যায়। এবং কেমন করে' কৃষি সাধন করলে যে ফসল পাওয়া যাবে, তাও প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই জানা যায়। কিন্তু যাগযজ্ঞ কেমন করে' সাধন করতে হবে, এবং তার সাধনফলে পরকালে কি করে' যজমানের সুখ কি স্বর্গলাভ হবে, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক জ্ঞানের প্রণালী দিয়েই পাওয়া যায় না। এ ধর্ম্ম কেবল জানা যায়

বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিধিবাক্য থেকে, এবং ক্বচিৎ মন্ত্র অংশ থেকে (৩)।

এই 'থিওরি' অনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজধর্ম্ম বা 'পলিটিক্স্' বেদমূল নয়, ন্যায়মূল (৪)। আইন বা ব্যবহারস্মৃতি, তাও বেদমূল নয়—ন্যায়মূল (৫)। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যদি অন্য কথা বলেন, এবং আমরা যদি সেই কথাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বলে' চালাই, তার দায়ী প্রাচীন হিন্দু নয়।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের এই 'থিওরিতে' অনেক নবীন হিন্দু খুব সম্ভব বেজার হবেন। কারণ এ 'থিওরিতে' হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এবং বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, এ দুয়েরই পথ বন্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যা অলৌকিক তা লৌকিক যুক্তি ও বিচার দিয়ে

---

(৩) বিদ্যস্তনন্ত প্রমাণবেত্তং ধর্ম্মলক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ।......যৎ পুরুষস্য কর্ত্তব্যং প্রত্যক্ষাদ্যবগম্য বিলক্ষণ স্বভাবেন। শ্রেয়সাধনং কৃষিসেবাদি ভবতি পুরুষস্য কর্ত্তব্যত্বস্য চ তৎসাধন স্বভাবোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেণ কৃষ্যাদের্ব্রীহ্যাদিসিদ্ধিঃ যাপি প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যৈব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেণা পূর্ব্বোৎপত্তি ব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যম্।............... অয়ং ধর্ম্মো ব্রাহ্মণবাক্যেভ্যোঽবগম্যতে লিঙাদিযুক্তেভ্যঃ, ক্বচিচ্চ মন্ত্রেভ্যোঽপি। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য ২।৬)

(৪) প্রমাণান্তরমূলা হ্যত্র ধর্ম্মা উচ্যন্তে। ন সর্ব্বে বেদমূলাঃ। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য, ৭।১)

(৫) অন্যত্রাপি ব্যবহারস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা তত্র যথাবসরং দর্শয়িষ্যামঃ। (মেধাতিথি, ২।৬)

বুঝ্‌বার চেষ্টা পণ্ডশ্রম; আর যা লৌকিক, তা লৌকিক যুক্তি বিচারেই বুঝ্‌তে হবে, তার মধ্যে অলৌকিককে টেনে আনা মূর্খতা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হ'ল অলৌকিককে লৌকিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা; আর বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হ'ল লৌকিকের মধ্যে অলৌকিককে এনে ফেলা। হিন্দুধর্ম্মের কোনও অংশের যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' মতে সে অংশটা বেদমূল ধর্ম্ম অর্থাৎ 'রিলিজান' নয়, ন্যায়মূল লৌকিক কর্ত্তব্য মাত্র। তার ভালমন্দ যুক্তি দিয়ে বিচার কর্‌তে হবে, কারণ শাস্ত্র-বাক্যের সেখানে প্রসার নেই। অর্থাৎ প্রত্যূষে ফুলতোলা ও একাদশীতে উপবাস যদি স্বাস্থ্যের জন্য হয়, তবে তার ব্যবস্থা নিতে হবে ভট্‌চাযের কাছে নয়, কবিরাজের কাছে। এবং এতে যার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তার পক্ষে এ সব কর্ত্তব্য নয়; এ নিয়ে শাস্ত্রের বচন তুলে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া বৃথা। আর যাগযজ্ঞে মানুষের মঙ্গল হয়, শাস্ত্রের বচনে যদি এতে বিশ্বাস জন্মে—ভাল কথা। যদি না হয় ত ফুরিয়ে গেল। যুক্তি তর্ক দিয়ে তা আর প্রমাণ করা যাবে না।

আমার এক শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু তুলসীদাসী রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে' বাল্মীকির উপর অশেষ ভক্তিমান ছিলেন। এবং রামায়ণের সব মহৎ চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে' নব্য বাঙ্গালীর প্রায়ই কঠোর সমালোচনা করতেন। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ষা সমাগমে রামের যে বিরহ বর্ণনা আছে, একদিন তার পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর জন্য ওরকম বিলাপ একালের কলেজের ছেলেদের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মনে যে আদর্শ ছিল, বাল্মীকির রামায়ণ তা'তে একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। আমার

আশঙ্কা হয়, প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'লে, নবীন হিন্দুর মনে এমনি অনেক আঘাত লাগ্‌বে।

যে মনোভাবের বশে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অলৌকিককে লৌকিক থেকে একেবারে পৃথক করে' দেখেছিলেন, সে 'র‍্যাশানালিজ্‌ম্‌' বা যুক্তিতন্ত্রতা প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ। যা চোখ মেল্‌লে স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ অর্দ্ধেক বুজে তা'কে ঝাপ্‌সা করে' দেখা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যেটা যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র, তাকে আধ্যাত্মিকতার মোহ, কি হৃদয়াবেগের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে রাজি ছিলেন না; বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্য্যালোক সেখানে ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও তার টীকাকারদের লেখার প্রতি পাতায় এই 'র‍্যাশানালিজমের' পরিচয় রয়েছে। যা বিচার ও যুক্তির ব্যাপার, সেখানে যুক্তি ও বিচার যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে পৌঁছতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভয় কি দ্বিধা ছিল না। বিচার বিতর্ক আমরাও কিছু কম করিনে। কিন্তু তর্কে হেরে কে কবে নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে প্রতিবাদীর ধর্ম্ম নিয়েছি, নিজের মতকে প্রকাশ্যে মিথ্যা স্বীকার করে' প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য হয়েছি। বরং এ কাজ যে করে, তাকে বলি কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর পণ্ডিতসমাজে এ ঘটনা যে নিত্য ঘট্‌ত, জনশ্রুতি তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যেরা যুক্তিকে কেবল মুখে নয়, জীবনে স্বীকার কর্‌তেন।

কিন্তু যুক্তিতন্ত্রতা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। আর্য্য মন যুক্তি-তন্ত্রী বলে' ধর্ম্মশাস্ত্রেও তার ছাপ লেগেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে গঠন ও শাসনের শাস্ত্র। এখানে যে মনোভাবের মুখ্য পরিচয়, সে হচ্ছে শিল্পী ও শাসকের, organiser ও administrator-এর মনোভাব।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের চোখের সামনে ব্যক্তি ও সমাজের একটি স্পষ্ট ও পূর্ণ আদর্শমূর্ত্তি ছিল। তাদের বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে ঠিক সেই আদর্শের মত মূর্ত্তি দিয়ে গ'ড়ে তোলা। এবং এ কাজে তাদের সাহসের অন্ত ছিল না। মানুষের জীবনকে তারা মনে কর্‌ত শিল্পীর মুর্ত্তিগড়ার উপাদান। সহস্র বিধিনিষেধের অস্ত্রে কেটে যে একে মনের আদর্শ-মূর্ত্তির সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা'তে তাদের সন্দেহ ছিল না। এবং ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের কোনও অংশ অনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ অগঠিত থাক্‌বে, তাদের মন ছিল এ মনোভাবের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য মন ছিল যাকে এখন আমরা বলি 'বুরক্রেটিক' মন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদের চেষ্টার ফলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার হিত হয়েছে বেশী, না অহিত হয়েছে বেশী, এ অবশ্য তর্কের কথা। মানুষের জীবনকে কতটা হাতে গড়ে' তোলা যায়, আর প্রাণবন্ত বলে' কতটা ছাড়া রাখ্‌লে তবে সে নিজে গড়ে' ওঠে—এ বিচারের হয়ত কোনও চরম মীমাংসা নেই। বাঁধনের বাধায় ক্লিষ্ট হয়ে একবার সে চাবে মুক্তি, আবার ছন্দহীন মুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে খুঁজ্‌বে নূতন বন্ধন। সে যাহোক্, জীবনের প্রাণপন্থা ও শিল্প-পন্থার বিচারে প্রাচীন আর্য্যেরা ছিলেন শিল্প-পন্থী। যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ, তারা যে বিধিনিষেধের এত শাসন মান্‌বে না, ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের তা অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন আচার্য্য গৌতম বলেছেন, "দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্", যারা মহৎ তাঁদের সাহস আছে, তাঁরা ধর্ম্মবিধিকে অতিক্রম করে' থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি ও মনে যারা মধ্যবিৎ, বিধিনিষেধ অতিক্রম করে' চলার অধিকার তাদের দিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের সাহস ছিল না। প্রাচীন হিন্দুরা

ব্যাকরণের জটিল বন্ধনে ভাষাকে বেঁধেছিলেন। ঋষিদের বাক্য এ জটিলতাকে মান্‌বে না, মহাকবিরা যে এ বন্ধন ছাড়িয়ে যাবে, তা তাঁরা জান্‌তেন। কিন্তু যারা ঋষিও নয়, কবিও নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারকে তাঁরা অত্যাচার বলে'ই মনে কর্‌তেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

প্রাইজ।

——ঃঃ০ঃঃ——

আপিসের ফেরতা কাপড় ছাড়চি, গৃহিণী এসে বল্‌লেন—ওকি আবার কাপড় ছাড়চ যে? যাবে না নাকি?

—কোথায়?

—আজ অমলদের প্রাইজ, সে কথা ভুলে গিয়েচ?

—ওঃ তাইত! আজ বিস্যুদ্‌বারই ত বটে। কিন্তু—

—আর কিন্তু করো না, যাও একবার বেড়িয়ে এস। আহা, তোমায় দেখলে বাছার আমার কত আহ্লাদ হবে!

—বড্ড দেরী হয়ে গিয়েচে যে এদিকে—

—কিচ্ছু দেরী হয়নি। এই নাও, টিকিট রেখে গিয়েচে তোমার জন্য।

বলে' তিনি একখানা শিরোনামা-লেখা খাম আমার হাতে দিলেন।

—টিকিটের জন্য ত ভাবচিনে—

—তা ভাব্‌বে কেন—কিসে না যেতে হয় সেই ছুতো খুঁজ্‌চ যে—

—ছুতো নয়, সত্যি দেরী হয়েচে। এই দেখ টিকিটে লেখা রয়েচে সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হবে, আর ঘড়ির দিকে চেয়ে বোঝ ক'টা বেজেচে।

—নাহয় আধ ঘণ্টা দেরীই হবে। এ ত আর লাট সাহেবের দরবার নয়, যে ঢুকতে দেবে না।

—এ ত্যারো বাড়া।

—অর্থাৎ তুমি যাবে না! কেমন, এই ত? আচ্ছা, আমার ঘাট হয়েচে তোমায় যেতে বলেচি। কি করব, আমাদের যাবার জো নেই, নইলে—বল্‌তে বল্‌তে গৃহিণী চলে' গেলেন।

আমাকেও তাই সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে হল। স্কুলের সামনে গিয়ে বুঝলাম রীতিমত ব্যাপার একটা কিছু হচ্চে বটে—রাস্তার দু'ধারে মোটর দাঁড়িয়ে গিয়েচে এবং লোকও জমেচে বিস্তর। যাহোক্ টিকিটের জোরে এবং কতকটা গায়ের জোরেও বটে কোনরকমে ভিতরে ঢোকা গেল, কিন্তু বসবার জায়গা একেবারে নেই।

বেশ জমকালো-গোচের একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে স্কুলের উঠানেই সভার জায়গা করা হয়েচে। গাছপালা ফুলমালা দিয়ে জায়গাটী মনোরম করে' সাজানো। মাঝখানে সভাপতির জন্য বেদী। তারই একপাশে বেশ একটু তের্‌চা ভাবে বানানো একটী ছোট ষ্টেজ, আর অন্যপাশে এই ষ্টেজেরই কায়দায় মেয়েদের বসবার জায়গা।

সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম সম্পাদক মশায় তাঁর সুদীর্ঘ বিবরণ প্রায় শেষ করে এনেচেন। শুনলাম মাঙ্গলিক বেদগানটী আগেই হয়ে গিয়েচে।

সম্পাদক বসলে নানা বেশে নানা বয়সের ছেলেরা নানা ভাষায় নানা কবিতা ও নাট্য আবৃত্তি ও অভিনয় করে' গেল। দেখতে শুনতে তাদের কোনটীই মন্দ হয়নি— তবে গেরুয়া পরিধান ও উত্তরীয় নিয়ে জটাভার মাথায় ঋষি-বালকরূপে সুঠাম সুন্দর যে ছেলে ক'টী সংস্কৃত

বন্দনা গান করেছিল, তারাই বোধহয় সব চেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছিল। আমাদের পিছন থেকে কে একজন 'এন্‌কোর' বলে' চেঁচিয়ে পর্য্যন্ত উঠেছিল।

তারপর প্রাইজ দেওয়ার পালা। বই খাতা থেকে আরম্ভ করে' ঘড়ি, ফুট্‌বল এমন কি হারমোনিয়াম পর্য্যন্ত ছেলেরা সব হাসতে হাসতে নিয়ে গেল দেখলাম; আর শুনলাম যারা এ সব কিছু পেল না, তাদের জন্যও রীতিমত ব্যবস্থা আছে। উপস্থিত মান্য-ব্যক্তিদের মধ্যে দু' তিনজন অতঃপর দু'কথা না বলে' ছাড়লেন না—একজন ত রীতিমত গুরুগিরি আরম্ভ করে' দিলেন এবং ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে' ছেলের বাপদের পর্য্যন্ত নীতি-কথামালা শুনিয়ে দিলেন। শেষে যখন বক্তৃতা থাম্‌ল, তখন গুমোটে, গরমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অবসাদে ও ততোধিক বিরক্তিতে মন আমাদের একেবারে খিঁজে গিয়েচে। ভাবগতিক বুঝেই বোধহয় সভাপতি মশায় সামান্য দু'কথায় তাঁর কাজ সেরে নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার কথাটা উঠতে না উঠতে সকলে হুটোপুটি করে' উঠে পড়ল।

বাইরের খোলা জায়গায় বেরোবার জন্য তারপর কি ঠেলাঠেলি, কি গুঁতোগুঁতি! দেখে আমি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালাম।

যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁরা রীতিমত বক্তৃতা করতে করতেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা যা' বল্‌ছিলেন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ একটার সঙ্গে আর দশটা কথা আসছিল বলে' কানে বাজ্‌ছিল শুধু একটা কোলাহল।

ক্রমে ভিড় পাতলা হ'য়ে গেল দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে এসে প্রাণটা যেন জুড়ল। হাওয়াটা এমন মিঠে লাগ্‌ল যে, গোলদিঘির মধ্যে দু'চক্র না দিয়ে যেতে পারলাম না।

বাড়ী ফিরতে তাই বেশ একটু রাত হয়ে গেল।

সদর দরজা ভেজানো ছিল—ঠেল্‌তেই দেখি অমলকে ঘিরে তার চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েচে পাড়ার ছেলে ও বাড়ীর সকলে। অমল কি বল্‌ছিল, আমায় দেখে হঠাৎ থম্‌কে গেল।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—যাওনি তুমি!

—বাঃ! এই ত সেখান থেকেই আসচি বরাবর।—ইচ্ছা না করলেও শেষের এই মিথ্যা বিশেষণটি বেমালুম বেরিয়ে এল বুঝে আমি চুপ করে' গেলাম। কিন্তু গৃহিণী ধরে' ফেল্‌লেন—মিথ্যা কথা! তুমি যাওনি ওখানে—এই ত অমল বল্‌চে—

এত বড় প্রমাণের উপরে কোন কথা বলতে স্বভাবতই আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, এমন সময়ে অমল তার বরফ-খেয়ে-ভাঙা গলায় জেরা আরম্ভ করে' দিল—

—আচ্ছা বাবা, গিয়েছিলে ত বল দেখি আমি কি সেজেছিলাম?

অমলের মুখের দিকে চেয়ে আমি উত্তর করলাম—সাজবি আবার কি, তুই কি থিয়েটার করতে গিয়েছিলি?

—যাওনি ত কি করে' বুঝবে কি করতে গিয়েছিল ও—বলে' ফোড়ন দিয়ে গৃহিণী তাঁর সাধা সুরে আরম্ভ করলেন—আমার মন-বোঝানো বেরতে হয়, তাই একবার ইত্যাদি।

তার মায়ের কথার মধ্যেই অমল আবার বলে' উঠ্‌ল—না বাবা, তুমি নিশ্চয় যাওনি—আচ্ছা দেখাও ত দেখি সোনার জলে ছাপানো আমাদের প্রোগ্রাম?

আর কে কি বুঝ্‌ল জানিনে, কিন্তু আমি বুঝ্‌লাম এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর চলবে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেঁট করে' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।

নব কমলাকান্ত।

—ঃ০ঃ—

—প্রিয়ে, শোন শোন।

প্রস্থানোদ্যত প্রিয়া ফিরে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন—কি?

আমি সুর করে' ধরলেম—"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"—

প্রিয়া চাবির গোছায় মৃদু ঝঙ্কার তুলে বল্‌লেন—তোমার গান শোনবার এখন আমার সময় নেই।

আমি গাইলেম—"সেহ পিরীতি অনুরূপ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।"

আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে প্রিয়া তাঁর আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটা কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ফেলে দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই মেঝেতে বসে' পড়লেন। এমন গানের এমন শ্রোতা পেয়ে আমার উৎসাহের ধারা নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতো সহস্রমুখী হয়ে ঝর্‌তে লাগ্‌ল। আমি গানটী আদ্যোপান্ত গাইলেম—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরূপ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

আমার গানের সুরের শেষ ঝঙ্কার না মিলাতে মিলাতে প্রিয়া উঠে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন—"জান ঘরে চাল বাড়ন্ত, কোথাও থেকে চার্‌টি চাল জোগাড় ক'রে আনতে না পার্‌লে আজ আর রান্না চড়্‌বে না,—তোমার আফিসে যেতে হবে না খেয়ে।" তারপর প্রিয়া তাঁর ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় দেহলতাকে কঠিন করে' তাঁর চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের স্থিরযৌবনের আভা গুটিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর গৃহাভিমুখে চলে' গেলেন। হায় প্রিয়া!

আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা দুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে অশ্রুভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদু গন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—"এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে;" যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ্ হ'য়ে উঠেছে; বুঝি কত কত গিরিগুহায় যক্ষ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে; কত বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে;—তখন তোমার ঐ ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায়

দেহলতার মধ্যে যে একটি মন আছে, ওই স্থিরযৌবনশ্রীর অন্তরে যে একটি প্রাণ আছে, সেই মন সেই প্রাণের কাছে কি না "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই কথাটাই সবার চাইতে প্রধান হ'য়ে রইল! এর চাইতে নৃশংসতা আর কি আছে? আজ দু' দণ্ড কি প্রতিদিনকার হিসেব-গুলো, আফিসের খাতাপত্রগুলো বিস্মৃতির কালো পর্দ্দা ঢাকা দিয়ে, চিত্ততলে এই কথাটাকে প্রধান করে' তোলা যায় না—

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়—

আজ এই আসন্ন বর্ষার মেঘমেদুর অম্বরতলে যখন চারিদিকে ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে, চিত্ততলে কোন্ প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, মানস-লোকের রঙীণ স্বপ্নের জালের সূক্ষ্ম তন্তুরাজি কোন্ দূরদূরান্তরে বিছিয়ে গেছে;—তখন মর্ম্মতলে এই অনুভবটাই যে সবার আগে সবার চাইতে আনন্দ ও ব্যথা নিয়ে জেগে উঠেচে,—সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। এই অনুভবের মধ্যে চাওয়াপাওয়ার কোন দাবী নেই, লাভ লোকসানের কোন হিসেব নেই, অতীত ভবিষ্যতের কোন অনুসন্ধান নেই। এ অনুভব স্বরাট অহৈতুকী—এর সুখ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গুরু গুরু ডাকের তালে তালেই, এর বেদনা কদম কেয়ার বিচ্ছুরিত গন্ধের সাথে সাথেই; মানুষের সকল সুখদুঃখের অনুভবের সার্থকতা সেই অনুভবের মধ্যেই—তার বাইরে নয়। মানুষের জীবন থেকে যদি অনুভবগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে তার জীবনের আর কি থাকে?

এই অনুভব!—মানবমানবীর অনুভবসামর্থ্যের মধ্যেই যে তাদের জীবনের সকল রহস্যের বাসস্থান। পশু মানুষ, কবি অকবি, কর্ম্মী জ্ঞানী, দেবতা দানব, প্রণয়বান প্রেমহীন, বীর কাপুরুষ, এদের

মধ্যে প্রভেদ ত কেবল ঐ অনুভবসামর্থ্যের। কাব্যে নানা সুর, দর্শনে নানা মত, জীবনে নানা ভঙ্গিমা; এর পিছনে আছে কেবল অনুভব বৈষম্য। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিরাট অনুভব-সমষ্টি—আর কিছু নয়।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই অনুভবসমষ্টির ইতিহাস। গ্রীস্, রোম, বাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন, এদের সভ্যতার নিরিখ আমরা সেইখানে সেইখানে খুঁজি, যেখানে যেখানে পাই এদের অনুভবের চিহ্ন অঙ্কিত। এদের কাব্য, এদের সাহিত্য, এদের ভাস্কর্য্য চিত্রকলা, এদের দর্শন, পুরাণ, যার যার পিছনে এদের অনুভূতির মহিমা চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে; যে যে বস্তুকে আশ্রয় ক'রে' এদের অন্তরলোকের সাধনা আনন্দলোকের স্পর্শলাভ ঘোষণা করেছে; সেইখান দিয়ে ব'য়ে এসেছে এদের ইতিহাসের ধারা। জার্ম্মান জাতির ইতিহাসে তার বিশ্ব-বিজয় আকাঙ্ক্ষা একটা ঘটনামাত্র, কিন্তু তার গ্যেটে হাইনে, তার নিট্‌শে সোপেনহার, তার বিটোভেন ওয়াগ্‌নার তার লাভের ঘরে আসল অঙ্কপাত। এইখানেই বিশ্ব জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এইখানেই বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারায় জার্ম্মানী আপনার সব দান অর্পণ করেছে। জার্ম্মানীর বিশ্ব-বিজয়-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ নাস্তিমূলক। কিন্তু তার অন্তরানুভূতির সাধনা যেখানে, সেখানে সারা বিশ্ব সাগ্রহে এসে মিলেছে—বলেছে জার্ম্মানী বিশ্বশৃঙ্খলার একটী নিয়ম, তার অনুভবের ধারা বিশ্ব-মানবের অনুভূতির একটী তরঙ্গ; তার কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান আমাদের আনন্দ দিয়েছে, মৃত্যু দেয় নি। এইখানেই বিশ্বের শুভেচ্ছা জার্ম্মানী লাভ করেছে, আর জার্ম্মানীর আত্মার আনন্দ-স্পর্শ বিশ্ব অনুভব

করেছে। সত্য ও মঙ্গল এইখানে আপনার আসন পেয়েছে। ক্রুপের কারখানার হাতুড়ির ঠক্ ঠক্, পট্‌স্‌ডামের যুদ্ধদামামা আটিলার রণ-হুঙ্কারের চাইতে কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নয়। কিন্তু বিটো-ভেনের সঙ্গীতরাগ সভ্য জগতকে যে বন্ধনে জার্ম্মানীর সঙ্গে বেঁধেছে, তা' ছিন্ন করবার ক্ষমতা সভ্য মানুষের হাতে নেই। প্রবুদ্ধ জার্ম্মানী আমাদের আত্মীয়, প্রযুদ্ধ জার্ম্মানী নয়।

মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, আধ্যাত্মিক সাধনা সমস্ত তার এই অনুভব সামর্থ্যের উৎকর্ষতার আয়োজন। এই অনুভবসামর্থ্যের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্জ্জিত আনন্দের রূপ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে। সাধারণ মানুষের থেকে কবির একটা বিশেষ অনুভব সামর্থ্য আছে। এই বিশেষ অনুভবসামর্থ্যই তার চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টির সৃষ্টি করেছে। তাই বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে, শিশুর হাসি থেকে, কিশোরীর যৌবনশ্রী থেকে যে আনন্দ আহরণ করে' সে নেয়, তার নিশানা সাধারণ মানুষ কোথায়ও খুঁজে পায় না। শরৎ ঊষার আকাশে কি আছে,—যা' সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না? বর্ষার মেঘের গুরু গুরু ডাকে কি আছে, যা সাধারণ মানুষের কানে লাগে না? বসন্তের স্পর্শে, আম্রমুকুলের সৌরভে, সামান্য অলিকুলের পক্ষতাড়নে কি আছে, যার সিরিখ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় না? কিশোরীর গ্রীবাভঙ্গীতে এমন কি আছে যা' কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষার মত্ত আবিলতাকে সহজে ছাপিয়ে ওঠে? কিন্তু প্রাকৃত মানুষ তার সন্ধান পায় না। তাই প্রাকৃত মানুষ বলে—কবি, তুমি যা' দেখ্‌ছ তার প্রকৃত অস্তিত্ব কোথাও নেই, এক তোমার উর্ব্বর কল্পনায় ছাড়া। কবি হেসে উত্তর দেয়—আমি যা' দেখছি সেইটেই বিশেষ করে' বাস্তব।

এ বাস্তবতাকে তোমার দেখবার দৃষ্টি নেই, কারণ তোমার অন্তর-লোক এই বিশেষ অনুভবের স্তরে পৌঁছোয় নি। তাই বিশ্ব প্রকৃতি তোমার কাছে মূক, বিশ্ব-মানব প্রাকৃত জীবনের সহজ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিমাত্র, বিশ্বসংসার একটা সনাতন চক্রের আবর্ত্তন। তাই তোমার জীবনের পাত কেবল জমাখরচের ছোট বড় নানা অঙ্কে ভরে' উঠ্‌ল; কিন্তু সেখানে সেই রাগিণীর সুর একটিও নেমে এল না, যা' জীবনকে জীবনাতিরিক্ত করে' তোলে, দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষার শাসন নত করে' দেয়, মানুষ যেখানে পুলকবিহ্বল হ'য়ে বলে—"কি পুছসি অনুভব মোয়।" সাধারণ মানুষ অবিশ্বাসের সুরে বলে—ছোঃ, বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্ন, গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ! অনুভবসামর্থ্যের অভাবে বৃহত্তর আনন্দের অবদান এখানে মিথ্যা হ'য়ে আছে।

কিন্তু তবুও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অনুভবের এই প্রভাবকে আমরা এড়িয়ে চল্‌তে পারি নে। তাই শিল্পের এবং শিল্পীর, কাব্যের এবং কবির, চিত্রের এবং চিত্রকরের আসন আমরা উঁচুতে স্থাপন করেছি। এরা যে আমাদের মুক্তি দেয় আমাদের প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন থেকে, আমাদের মনের নানা তর্কবিতর্ক থেকে, আমাদের বুদ্ধির নানা প্রশ্ন নানা সন্দেহ থেকে। শিল্পী কবি আমাদের চোখের সামনে মনের সামনে যা ধরে, সে যে একটা অনুভবের সুষমাগঠিত সাকার মূর্ত্তি। তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে যে আপন মহিমাতেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসেবের খাতার অঙ্কগুলোকে ছাপিয়ে ওঠে, বলে—দেখ আমি কোন্ দিব্যলোক থেকে নেমে এসেছি সহজ সুষমায়, স্বতঃউচ্ছ্বসিত

সঙ্গীতে, লীলায়িত রেখায় ছন্দে বর্ণে গন্ধে; এই সহজসুন্দরকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কি দিয়ে?—তোমার ঐ জীবন-যাত্রার কোলাহল দিয়ে? তোমার ঐ দৈনন্দিন কাড়াকাড়ির সংগ্রাম দিয়ে? তোমার ঐ বিশ্বগ্রাসী জড় বস্তুর ক্ষুধা দিয়ে?—সুন্দরকে তোমার বুদ্ধি মন প্রাণ অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তোমার অন্তরাত্মা যে জানাবেই আমি নেমে এসেছি জীবনের বৃহত্তর আনন্দের অবদান সঙ্গে নিয়ে। আমার পিছনে আছে সেই বস্তু যা অনির্ব্বচনীয়, যা প্রশ্নের অতীত, সুতরাং তা'তে সন্দেহের অবসরই নেই; যা ব্যাখ্যার বাইরে, সুতরাং তা'তে প্রমাণ অপ্রমাণের স্থানই নেই; যা একমাত্র অনুভবগম্য। ভগবদ্-ভক্তিই হোক্, ব্রহ্মানন্দই হোক্, সব এই অনুভবেরই এক এক প্রকারভেদ।

এই অনুভব সাধনা মানবজাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' আমাদের জীবনে তথ্যের চাইতে তত্ত্ব. ব্যাকরণের চাইতে কাব্য, ইতিহাসের চাইতে রূপকথা, রয়টারের তারের খবরের চাইতে উপন্যাস বড়। কারণ তথ্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, তারের খবর কতকগুলো ঘটনাসমষ্টি মাত্র, যে ঘটনাগুলো ঘটে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সে হচ্ছে কানের ও মনের। এর মধ্যে সেই রস নেই, যে রস আমাদের অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত করে, বৃহৎ করে, আমাদের অনুভবের রাজ্যে বুদ্ধির টানা কঠিন সীমা-রেখাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের গভীরতম আমিকে মুক্তি দেয়। কিন্তু কাব্যে ও উপন্যাসে, তত্ত্বে ও রূপকথায় আছে একটা অন্তরাত্মার সেই অনুভব, যার সীমারেখা আমাদের মনের মন্দিরে এসেই ঠেকে থাকে না, যার সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার কোন

ব্যবধানই নেই। তাই এর স্পর্শে আমরা বলি—পেয়েছি সেই বস্তু, যা' আমার জীবনে বিশেষ করে' প্রয়োজন; যে বস্তু ইতিহাসের আলোচনায়, ব্যাকরণ-সূত্রের গবেষণায়, রাশি রাশি তথ্যের বোঝার মাঝে খুঁজে পাই নি। আজ একটী অন্তরের অনুভূত আনন্দ আমার অন্তরকেও আনন্দাপ্লুত করল; একটী অন্তরাত্মার উচ্ছ্বসিত রস-ধারা আমার অন্তরাত্মাকে রসে অবগাহিত করল। তখন আর আমরা তর্ক করি নে, ব্যাখ্যা করতে বসি নে, প্রমাণ চাই নে। তখন পুলকবিহ্বল হয়ে শুধু বলি—কি পুছসি অনুভব মোয়।

এই অনুভব-সাধনা মানব-জাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' শাস্ত্র-বাক্যের চাইতে মানুষের জীবন-কাব্য বড় হয়ে রইল। মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি পাদক্ষেপটী কি করে ফেল্‌বে, শাস্ত্র-বাক্য তারই বিধি কঠিন করে' বসে' আছে। কিন্তু জীবন-কাব্য হঠাৎ একদিন নবীন ঊষায় পুলক-কম্পিত কণ্ঠে বলে' ওঠে—আমি নতুন পথের অনুভব পেয়েছি—নতুন পথের নবীন রাগিণী আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মা স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শ আমাকে সঞ্জীবিত কর্‌ছে, আনন্দাপ্লুত করছে। ওই পথেই আমাকে চল্‌তে হবে, কারণ ওইখানেই আমার জীবনের অনুভব সত্য হ'য়ে উঠেছে, ওইখানেই আমি সত্য হ'য়ে উঠ্‌ছি। ও পথে কি আছে জানি নে। হয়ত সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে, আঘাত আছে, আশীর্ব্বাদ আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে—ওখানে নির্ব্বিঘ্নতা নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, প্রতিদিনের পরিচিত সহজ গতিভঙ্গী নেই; কিন্তু ওই সুখদুঃখে, হাসিঅশ্রুতে, আঘাত আশীর্ব্বাদে আছে জীবনের উচ্ছ্বসিত রস-ধারা, যা আমার সঞ্জীবনী সুধা। ওর ছন্দ ও সুর, বর্ণ ও গন্ধ আমার

কাঠিন্য দূর করে' আমাকে লীলায়িত করবে, অভ্যাস-চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুল্‌বে, আমার সামর্থ্যকে সাকার করে' তুল্‌বে; তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমার মান্‌বার উপায় নেই। শাস্ত্র-বাক্য যেখানে সমাপ্তি টেনে শেষ হয়ে থাকে, মানুষের অনুভব সেখানে আবার নবীন আরম্ভের সুর তুলে নব যাত্রার আয়োজনে জীবনের অন্তরবাহির গতিশীলতার লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ করে' তোলে, বৃহৎ করে' তোলে, স্বরাট করে' তোলে, যুগে যুগে লোকে লোকে।

তাই এই অনুভব-রাজ্যের স্বর্ণ-দুয়ার যাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়ে গেছে, জীবনে বেদনা ও আনন্দের স্পর্শকেও তারা হারিয়েছে। অভ্যাসের চক্রে তারা যত ঘুরতে থাকে, অমৃতত্বের কাছ থেকে তারা তত দূরে সরে যায়। এই অভ্যাসের চক্র তাদের কেবলই খর্ব্ব করতে থাকে। তাদের আত্মাকে খর্ব্ব করে', তাদের মনকে প্রাণকে বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে। তাদের সমাজকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে, কর্ম্মানুষ্ঠানকে, তাদের আত্মশক্তিকে খর্ব্ব করে। মৃত্যুকে তারা আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না।

কিন্তু বল্‌ছিলেম আমার প্রিয়ার কথা। "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" —বৈষ্ণব সাহিত্যের এই অতুলনীয় গানটীর উত্তরে প্রিয়ার "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই বাক্যের বিসদৃশতার কথা। হায় প্রিয়া!

তবে এ কথা মানি যে, মানব-জাতির আহার করবার একটা বিধি আছে। অন্ন যে ব্রহ্ম—এটা সেকালের কথা হলেও, একালেও এ সত্য কিছুমাত্র মলিনতাপ্রাপ্ত হয়নি। বরং এই কলিকালে এ সত্য অতিরিক্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। এবং ঐটেই আপত্তি। ওই অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা।

অন্ন ব্রহ্ম—মানুষের জীবনে এ সত্যের বিধি-নির্দ্দিষ্ট একটা স্থান আছেই। কিন্তু এ সত্য যদি সেই স্থানকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মানুষের জীবন-কাব্যের সকল পৃষ্ঠাগুলিকেই অধিকার করে' বসে, যদি পুরু-ভুজের মতো ভুজ মেলে দিয়ে মানুষের মন প্রাণ বুদ্ধি আত্মাকে জড়িয়ে আপনার বেষ্টনীর মধ্যে কেবলই পিষ্ট করতে থাকে, তবে কোথায় থাকবে মানুষের জীবনে বৃহত্তর আনন্দের আয়োজন? কোথায় থাক্‌বে তার কণ্ঠে সেই রাগিণী, যা' তারার সুরে সুর মেলায়, মেঘের ডাকে ডাকে রূপ পায়? এই রাগিণীই না সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করেছে? এই রাগিণীই না প্রতি মুহূর্ত্তের সমাপ্তির ভিতরে প্রতি মুহূর্ত্তের আরম্ভের জন্ম দিয়েছে? এই রাগিণীই না মানুষকে প্রতি নিমেষে বল্‌ছে—মানুষ, তোমার শেষ তোমাতে নয়—তোমাকে অতিক্রম করে'? এই রাগিণীতেই না মানুষ প্রতি নিমেষে আপনাকে অতিক্রম করে' করে' চলেছে? অন্নের অত্যাচারের নীচে যদি এই রাগিণী চাপা পড়ে' যায়, তবে বিশ্ব-মানব কেবলমাত্র বৈশ্যমনের আধার হয়ে উঠ্‌বে। তখন আর বর্ষার জল-ধারা, বসন্তের নবকিশলয়, জ্যোৎস্নার সঙ্গীত, সন্ধ্যার রাগিণী মানুষকে সেই বস্তু দিতে পার্‌বে না, যে বস্তু তার অন্তরকে সুন্দর করে, আনন্দাপ্লুত করে' তাকে অতিরিক্ত করে। তখন আর মানুষ দেবতার সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে না, তখন সে আপনার মাঝেই আপনি নিঃশেষ হয়ে থাক্‌বে।

প্রতি মানুষের মধ্যেই একটা কবি আছে। অন্নের অত্যাচার যদি এই কবিকে নত করে, তবে আর কোন নব-যৌবনা প্রেয়সীর রূপরাশিই আঁধার ঘরে আলো জ্বালবে না; তার আঁখির আলো আনন্দ-তরঙ্গ

ভুল্‌বে না; তার ঠোঁটের হাসি, গ্রীবার ভঙ্গী, তার দেহের রেখা, ছন্দ, সুর কোন স্বপ্ন-লোকেরই সৃষ্টি কর্‌বে না। তখন পুরুষ নারী দুইই জীবনের সেই এক পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে—যার পাওনা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিসেবের খাতা খুঁজে কোথায়ও মিল্‌বে না।

অতএব অয়ি প্রিয়ে! অয়ি দীর্ঘ-কুঞ্চিত-কুন্তলে! অয়ি দুগ্ধ-চম্পাক-বর্ণ-সন্নিভে! অয়ি চাবিগুচ্ছবদ্ধ-অঞ্চলে! এসো—আজ আর কিছু নয়। এসো—আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা দুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে অশ্রু-ভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদুগন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—“এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে”;—যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ হ'য়ে উঠেছে; বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে; তখন এসো—আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে ওই গীত গাই—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নর্ম্মাল।

——:০:——

সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি শুনতে পাচ্ছি যে, গত মাসের সবুজ পত্রে প্রকাশিত আমার পত্রখানিতে পণ্ডিতি বুদ্ধির সমালোচনা এবং হটুমনের উপর আক্রমণ একটু পণ্ডিতিধরণের হয়েছে। মাষ্টারি করতে গেলে পড়তে হয় বটে, কিন্তু আপনার কৃপায় আমি পণ্ডিত হওয়া থেকে খুব সাম্‌লে গিয়েছি। আগে সাহেব-লোক যা' ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন তাই প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পড়তুম এবং তাই বিশ্বাস করতুম। তাই পূর্ব্বে হটুমনের উপর আস্থা ছিল, এখন আর নেই।

আমার বর্ত্তমান রুচিবিকারের একটি ইতিহাস আছে। যখন সেকেণ্ড ক্লাসে হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে উঠি। রসজ্ঞানের বিকাশ হ'ল কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে কম নম্বরে। অমনি আমরা জনকয়েক রসিক মিলে এমন কয়জন মহাজনের তালিকা প্রস্তুত করলুম, যাঁদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হয়েও জগতের মহৎ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। অঙ্কের মাষ্টারমহাশয়কে ঐ তালিকাটি দেখাবার পরের দিনই তিনি আর একটি তালিকা প্রস্তুত করে' এনে দেখালেন, যার মধ্যে শতকরা একশ' জন মহারথীই অঙ্কের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে যে, আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ তালিকাটি দেখে নীরব

হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি ঐ দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত মহারথীদের জীবন-রচয়িতার সাক্ষ্য সন্দেহ করবার সাহস পর্য্যন্ত কারো হয় নি। কিন্তু তখন থেকে মনে এই একটা খট্‌কা র'য়ে গেল যে, একটি তালিকার সিদ্ধান্ত অন্য তালিকার সিদ্ধান্ত হতে পৃথক কেন, এবং আমার ইচ্ছার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বাধ্যবাধকতা কোথায়?

যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন ভেবেছিলাম যে, বড় বড় পণ্ডিতের কাছে আমাদের ছেলেমানুষী সন্দেহের নিরাকরণ হবে। অঙ্কে কাঁচা হয়েও বিজ্ঞান পড়তে উদ্যত হই, যেমন সকলে করে। প্রথম দিনই বিজ্ঞানের অধ্যাপক বল্লেন, "বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব স্থষ্টি করা। বাঙ্গালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকই সাহিত্য, দর্শনের দোহাই দিয়ে মিথ্যা কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে। তাদের মুখে তত্ত্বকথাই শোনা যায়। সেই জন্য এই জাতীয় দুর্ব্বলতার উচ্ছেদকল্পে বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা এই যে, সাহিত্যে দর্শনে একটি এমন বৈজ্ঞানিক মান নেই, যার দণ্ডে ভালমন্দের ওজন হতে পারে। রবি বাবু ভাল কিম্বা মন্দ কবিতা লেখেন, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কোথায়? আর সেইটি না থাকার দরুণই তর্কের মেরুদণ্ড থাকে না। ফলে জাতিও দুর্ব্বল এবং কল্পনাশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞান কিন্তু এলোমেলো তর্কের প্রশ্রয় দেয় না।" তারপর শিক্ষক মহাশয় বল্লেন, "এই দণ্ডকেই আমরা নর্ম্মাল বলি। রসায়ন শাস্ত্রে যেমন এতখানি আয়তনের বস্তুতে জল মিশিয়ে হাজার C. C. আয়তনে পরিণত করলে সেই জলীয় পদার্থকে নর্ম্মাল সলিউসন বলা যায়। যখন তোমরা হাতে কাজ করতে আরম্ভ করবে, তখন

সব দ্রব পদার্থকেই তার নর্ম্মালের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।” এখনও বুঝতে পারিনি কোন্ খেয়ালে বৈজ্ঞানিক নর্ম্মালের সৃজন হ’ল।

তারপর কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়ে বি, এ, ক্লাসে অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিলাম। অর্থশাস্ত্রের প্রথম কথাই আবার সেই নর্ম্মাল মূল্য। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম যে, নর্ম্মাল মূল্যের অস্তিত্ব শুধু Marshall সাহেবের মাথায়, নচেৎ দর কষাকষিতেই দাম ধার্য্য হয়, এবং সেই কার্য্যে অনেকখানি মনের ক্রিয়া আছে। রসায়ন শাস্ত্রে যখন প্রত্যেক বস্তুর নিজের নর্ম্মাল আছে, তখন বাজারে কেন প্রত্যেক মানুষের নিজের নর্ম্মাল থাকবে না? মার্শাল সাহেব উত্তর দিলেন যে, “সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই অভাব আছে, সে অভাব পূর্ণ করবার চেষ্টায় সে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অভাবগুলিকে এবং অভাবপূরণের পন্থাগুলিকে থরে থরে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে সাজালে একটি ল, সা, গু, পাওয়া যাবে, সেটি একটি স্বার্থপর জীব এবং তার নাম স্বার্থাভিসন্ধি। এই জীবটির সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, তিনি সর্ব্বদা নর্ম্মাল মূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনছেন এবং বেচ্ছেন।” অর্থাৎ নর্ম্মাল মূল্য নর্ম্মাল জীবেরই মূল্যনির্দ্ধারণ, রক্তমাংসের জীবের নয়।

নর্ম্মাল কথাটির মানে কি?—এর খানিকটা গড়পড়তা, খানিকটা স্বাভাবিক এবং খানিকটা আদর্শ। প্রথমেই প্রত্যেকের বিশিষ্ট অ-স্বাভাবিকত্বটুকু বর্জ্জন করতে হবে। তারপর প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে একত্র সাজাতে হবে। তখন অবস্থাভেদে ব্যবহার

ভিন্ন হবে বটে, কিন্তু সে বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যেও একটি কার্য্যগত সামঞ্জস্য টের পাওয়া যাবে। অতএব এর ভিতর ধর্ম্ম নেই, নীতি নেই; আছে শুধু ক্ষেত্রকর্ম্মানুসারে বিধান এবং নিয়ম। এই হ'ল বৈজ্ঞানিকের প্রথম নির্ব্বাচনের ফল। এখন অনেকগুলি নর্ম্মাল আছে। পরে বহু নর্ম্মালের সামান্যীকরণে 'একটি' বৃহৎ নর্ম্মালের সৃজন হবে, যার পরে আর কোন কথা নেই। কিন্তু যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে, তখন সেই অবস্থার নর্ম্মালই সেই অবস্থার ব্রহ্ম।

যথা, Anatomy-তে রোগা মোটা হাড়ের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু 'হাড়ের'; অর্থশাস্ত্রে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন বন্ধুর স্থান নেই; ডাক্তারীতে যেমন কেবল রোগী আছেন, সুস্থসবল কেউ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র হাড়, কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং কেবলমাত্র অসুস্থ ব্যক্তি চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে সেটি হয় রোগা নয় মোটা হাড়, এবং একই ব্যক্তি কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনও সহায়, কখনও রুগ্ন, কখনও সবল। বাস্তব জগতে নর্ম্মালের অস্তিত্ব নেই। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা' বলে আমরা নর্ম্মালকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছি শুনে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?' অবশ্য নর্ম্মালের আবশ্যক আছে, যদিও সেটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন। এ না হ'লে জ্ঞানের দানা বাঁধে না। প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই শেষ কথা নয়, পরোক্ষ উদ্দেশ্যকেও মানতে হবে।

জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে চিরজীবি হয়ে থাকা। জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তাহলেই জ্ঞান সার্থক হল। মাঝিমাল্লারা জোয়ার ভাঁটা, মেঘ ঝড় রোজ লক্ষ্য করে'

বলতে পারে কখন্ জোয়ার ভাঁটা আসবে এবং কখন্ নৌকা ছাড়লে ঝড়ের আগেই নদীর ওপারে পৌঁছতে পারা যাবে।

দৈবজ্ঞ রাজার হাত গণনা করে বলে' দিলেন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত। জয়লাভ যদি হ'ল, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী; হার যদি হ'ল, ব্রাহ্মণ টুলো পণ্ডিতই রয়ে গেলেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক সেই পুরাতন দৈবজ্ঞেরই বংশধর, তাই কত বৎসর পরে কোন্ মুহূর্ত্তে ধূমকেতু আসবে, এখন থেকেই অঙ্ক কষে বলে' দিতে পারেন। সোনারূপার দাম বাড়বে কি পড়বে, অর্থশাস্ত্রীর দল এক বছর আগেই তা' কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন। আবার জনকয়েক সমাজতত্ত্ব-বিশারদ কোন বিশেষ সমাজের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং হ্রাসের হার দেখে সেই সমাজের পতন, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত বাৎলে দিতে পারেন। তবে এঁদের কথাগুলি ঠিক ফল্‌ছে না, তাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক এখনও সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌কে বিজ্ঞানের আসরে রূপার আসনেই বসিয়ে রেখেছেন, সোনার সিংহাসন দেন নি।

প্রকৃতিকে বশ করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সেই বশীকরণের মন্ত্র হ'ল নর্ম্মাল। জোয়ারভাঁটার গতি যে মোটে একশ' বার লক্ষ্য করেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা, যে হাজার বার লক্ষ্য করেছে তার বাণীই সফল হবার সম্ভাবনা বেশী। যে আবার আরো বেশী বার লক্ষ্য করেছে, সে-ই জোয়ারভাঁটার স্বাভাবিক, সাধারণ গতি বলে' দিতে পারে, কেননা সে-ই জোয়ারভাঁটার অসাধারণ, অস্বাভাবিক আচরণগুলি সচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে। তারপর যে নিয়মটি নির্ণীত হ'ল, সেইটি নর্ম্মাল গতি। অতএব নর্ম্মাল সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি মাদ্রাজী হিসাবনবীশকে ডাকতে হবে সট্‌কে পড়বার

জন্য, যোগবিয়োগ করবার জন্য। নর্ম্মাল সৃষ্টির পরও তাঁর কাজ আছে। তাঁকে গুণতে হবে কয়টি বস্তু কিম্বা কার্য্য নর্ম্মালের সঙ্গে মিলছে। অবশ্য কতখানি মিল গরমিল হ'ল ওজন করা কিম্বা গরমিলকে খাতির করা তাঁর কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক তাঁকে অতখানি বিশ্বাস করেন না, যদিও তাঁর কাজ বিজ্ঞানগঠনের পূর্ব্বে এবং পরেও ছিল এবং আছে। যে বিজ্ঞান যত উৎকৃষ্ট, সেটি তত সংখ্যামূলক।

কিন্তু নর্ম্মাল সৃজনে এবং সংখ্যা গণনে কতখানি যে বাদ পড়ে' গেল, তা' বৈজ্ঞানিক না বুঝলেও প্রত্যেক মানুষেই বোঝে। এক ছাঁচে গল্‌তে গিয়ে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য হারালো, প্রত্যেক খামখেয়ালী, অবিবাহিত যুবকেরই মতন। খেয়ালও গেল। অথচ বৈচিত্র্য এবং খেয়াল, সৃষ্টির এক একটি প্রধান উপকরণ। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে হয়ত সনাতনকে পাওয়া যায় কখন কখন। কিন্তু সনাতনের সন্ধানে সত্যের আভাস হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়েছে। সনাতনের খাতিরে সত্যের অঙ্গহানি করবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। তারপর এই সত্যরূপী সাধারণ সনাতনকে আদর্শ মানতে গিয়ে, প্রত্যেকের কর্ম্মের ভিতর, জীবনের পরতে পরতে যে আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, তা'কে কি অবমাননা করা হ'ল না? বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য হয়ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত আদর্শের পরিপন্থী না'ও হতে পারে। তখন সেই নর্ম্মাল পদার্থটি কেবল বৈজ্ঞানিকেরই দেবতা হবার উপযুক্ত, কিন্তু সত্য উপলব্ধির পক্ষে অপদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যার আধিক্য দেবত্বের দিকে নর্ম্মালকে সাধারণকে এগিয়ে দেয়, এবং ব্যক্তিগত মোটা মোটা পার্থক্যকে মিহিন্ করে দেয়।

যে সব বিজ্ঞান কেবলমাত্র সংখ্যামূলক এবং নিরালম্ব, সংখ্যাই তাদের নর্ম্মাল, বিশেষ করে' একক এবং শূন্য। কিন্তু বস্তুবাচক বিজ্ঞানে, যেমন, পদার্থবিদ্যা কিম্বা রসায়নশাস্ত্রে, একটি নর্ম্মাল বস্তুর প্রয়োজন হয়, যদিও সেটির সৃজন এবং উদ্দেশ্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে—সংখ্যাই তার শৃঙ্খল। এই দুই প্রকার বিজ্ঞানেই নর্ম্মাল কেবলমাত্র ক্রিয়াসাধক যন্ত্র মাত্র। এ ইন্দ্রিয়রহিত inorganic জগতের কথা। কিন্তু ইন্দ্রিয়রাজ্যে ওঠবার মুখেই যে সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়, যেমন প্রাণিতত্ত্ব,—তখনই গোলমাল বাধে। এখানে অন্ততঃ দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির নর্ম্মাল চাই। কেননা জীববিদ্যা রসায়ন শাস্ত্র এবং দেহতত্ত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিপদ আরো ঘনিয়ে ওঠে সেই সব বিদ্যায়, যেখানে ব্যক্তি নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কারবার। ব্যক্তির ক্রিয়াপদ্ধতি প্রথমে তার মনের এবং দেহের উপর, দ্বিতীয়তঃ তার দেশ এবং দেশস্থ জীবজন্তু, মাটি, আবহাওয়ার উপর, এবং তৃতীয়তঃ তার কালের এবং ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ কালের প্রাণ নেই, সেই জন্য সমাজতত্ত্ববিদ্, অর্থশাস্ত্রী ও রাজনৈতিক এই জড়ের নর্ম্মাল তৈরী করতে তত গোলে পড়েন না, যত গোলে পড়েন একটি নর্ম্মাল মানুষ গড়তে। আমরা অর্থনৈতিক জীবটির সহিত পরিচিত হয়েছি। রাজনৈতিক জীবটিও ঠিক একই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে এ জীবটি পৃথক, কেননা অন্যান্য ব্যক্তি ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ করে; কিন্তু রাজকীয় ব্যক্তির একমাত্র ক্রিয়া ভোট দেওয়া এবং নেওয়া। রাজকীয় জীবটি তাহলে রাজকীয় কার্য্যের পক্ষে নিগুর্ণ, অন্ততঃ বৈশিষ্ট্য, উন্নতিশীলতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের ধার এ জীবটি ধারে না। এর বুদ্ধি বিবে-

চনার লক্ষণ শুধু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে,তবে অনেক বুদ্ধিমানের দেশেও এ কাজটি টিকিট দিয়েই হয়। এই নির্গুণ জীবটির সঙ্গে যাচিয়ে নিতে হবে রক্তমাংসের জীবকে। এই সাংঘাতিক পরীক্ষায় যত সংখ্যক ব্যক্তি পাস হলেন, তাদের একটি দল হ'ল; সঙ্গে সঙ্গে ফেল করার দলও আর একটি হ'ল। যদি পূর্ব্বোক্ত দলের সংখ্যা পরোক্ত দলের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে কেবলমাত্র সেই নর্ম্মাল নির্ব্বাচিত সংখ্যার আধিক্যই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি কার্য্যের উপযুক্ত হলেন। এখন নর্ম্মাল কি করে' দল বাঁধতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নর্ম্মাল ত নির্গুণ এবং অবাস্তব। কিন্তু দল একটি খাঁটি বাস্তব জিনিষ, এবং দলের গুণের বালাই নিয়ে আমরা সকলেই মরে' আছি। নর্ম্মালের প্রাণ চাই। এখন ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, বৈজ্ঞানিক নিরহঙ্কার, তাঁর অহঙ্কার সংখ্যার খুরে পেতে দিয়েছেন। তাই তিনি বল্লেন—এই যে নর্ম্মালে আবদ্ধ দলটি, এটি আমার রচনা নয়, এর নিজের প্রাণ মন সব কিছুই আছে। সবই সংঘমনের সৃষ্টি, তবে সাধারণ মানুষ নিজের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে সংখ্যাকে তাচ্ছিল্য করে, এবং সংঘমনকে বুঝতে না পেরে নিজের মনকেই প্রধান করে' দেখে। কিন্তু বস্তুতঃ সংঘমন টালার চৌবাচ্ছার মতন, ব্যক্তি এক একটি কলতলার নল বইত নয়। অবশ্য এ সব সমাজতত্ত্ববিদের কথা, বাস্তব জগতে তিনি হয়ত অতখানি বিনয়ী নাও হতে পারেন। মন প্রাণ যখন পাওয়া গেল, তখন সেই নর্ম্মাল হট্টমনের নর্ম্মাল পদ্ধতি পাওয়া শক্ত কথা নয়। সমস্ত বিজ্ঞানের নর্ম্মাল বস্তু এবং নর্ম্মাল কার্য্যগত সম্বন্ধগুলিকে একত্র করে' তার ল, সা, গু, করে' নিলেই সংঘমনের কার্য্যপদ্ধতি টের পাওয়া যাবে।

সেই পদ্ধতিই হবে আদর্শ, এবং তার থেকে বিচ্যুত হবে শুধু পাষণ্ডের দল।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের সমাজে আমরা এতদিন নর্ম্মাল মন্ত্রটি জপ করে এসেছি। আমাদের ঋষিরা ছিলেন একাধারে পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তাঁদের রচিত সমাজ 'জার্ম্মান-পসন্দ্'। সে বন্দোবস্ত একটি নর্ম্মালের উপরই স্থাপিত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর থেকে আমরা—অর্থাৎ B. Sc. M. Sc.-র দল এবং সেই পুরাতন আর্য্য বৈজ্ঞানিকদের বংশধর,—সকলে অতি গম্ভীরভাবে রাজনীতির ছাত্র হয়ে উঠেছি। এতদিন পরে আমরা একটি রাজকীয় নর্ম্মাল আবিষ্কার করেছি। এর পূর্ব্বে আমরা শুধু মানুষের মাথাই গুণে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আজ দল পাকা হ'ল, কেননা সেই দলের একটি মনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই দলের একটি নেতা বলছেন এই সংঘমনের কাছে আত্মসমর্পণ কর—দু'দিন পরে অবশ্য বলবেন যে, সংঘমনই একমাত্র মন। কিন্তু সে সাহস এখনও হয় নি। এখন তিনি উপায়মাত্র বলে' দিচ্ছেন যে কি করে' আত্মবলি দিতে হবে। তার নাম discipline, অর্থাৎ জার্ম্মান-ড্রিল্।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, আমার মনে হয় যে, হট্টমন-রূপ নতুন একটি মন্ত্র জপ করার ফল অন্যান্য নামজপের মতনই সুখের হবে—অর্থাৎ সেই নাম জপ্‌তে জপ্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

—:০:—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাণীতে যে প্রেরণা এবং জীবনসাধনায় যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরকাল ভারতের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে মানবজাতি ও মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিবে। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তিনিও আধুনিক ভারতের অন্যতম সৃষ্টিকর্ত্তা। এই অমরত্রয়ীর প্রত্যেকেই বর্ত্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠভাগ হইতে অনেক আলোক অনেক শিক্ষা এবং অনেক প্রাণশক্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের স্বকীয় সভ্যতার সারাংশের সহিত সে সব মিশাইয়া লইয়াছিলেন এবং এককালে তাঁহাদের জন্মভূমি যে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাকে পুনরায় সেই উচ্চপদে উন্নীত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবন এমন বিচিত্র ঘটনাপরিপূর্ণ যে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার যে জীবনস্মৃতি প্রকাশকেরা "একটি জাতির অভিব্যক্তি কাহিনী" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার নিজের কথা অতি অল্পই আছে। যে অদ্ভুতকর্ম্মা রাষ্ট্রশিল্পী স্বজাতির পুনরুদ্ধারকে জীবনের

---

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "কলিকাতা উইক্‌লি নোট্‌সে" প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুসরণে ও তাঁহার সহকারিতায় লিখিত।

ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিতে হইলে গ্রন্থের পর গ্রন্থেও কুলাইবে না। ভারতে আর কেহই স্বীয় আদর্শকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসে এত দীর্ঘকাল এমন নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুশয্যার একপার্শ্বে জীবনের চিরসঙ্গী অতি সাধারণ রূপার ঘড়িটি পড়িয়া ছিল, উহার সাহায্যে তিনি তাঁহার দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের প্রতি কাজ, এমন কি আহার বিশ্রাম এবং বিশ্রম্ভালাপ, নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার কাহিনী সুপরিচিত, তাহার পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। ম্যাট্‌সিনির মত প্রথম বয়সেই স্বজাতিকে জাতীয়তার অক্ষয়সূত্রে সংবদ্ধ দেখিবেন, এই স্বপ্ন তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ নিপুণভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, সুতরাং বিপ্লবের পথ পরিহার করিয়া সংস্কারের পথই বরণ করিলেন। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে, ভারত যদি একমত হইয়া উপনিবেশসমূহের আদর্শানুযায়ী স্বরাজপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড কখনই সেই সঙ্কল্প প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। তাই তিনি একতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এক ভারতব্যাপী আন্দোলনের সূচনা করিয়া নিজের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জাতীয় মহাসভায় এমন একটি স্থান পাইয়াছিলেন যেখান হইতে তিনি অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে আপনার ধ্যানধারণা আদর্শের কথা সাধারণ্যেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগের সময় তাঁহার এই একতান্দোলন অতি কঠিন পরীক্ষায় পড়ে, কিন্তু সেই আন্দোলন যখন সুদীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী

বিবিধ বিপত্তির মধ্য দিয়া অবশেষে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাঁহার নেতৃত্বকুশলতাই জয়যুক্ত হইল। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯:২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বাংলায় এমন দৃঢ়সংবদ্ধ অপূর্ব্ব একপ্রাণতা বজায় রাখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড এবং এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ যে বঙ্গবিভাগকে অপরিবর্ত্তনীয় বিধান বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই অপরিবর্ত্তনীয় বিধিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

বঙ্গবিভাগ রহিত হইবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সকল সুখ দুঃখের এবং সকল কাজ কর্ম্মের চিরসঙ্গিনী চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। তিনি আদর্শ হিন্দুপত্নী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে, সেই কঠোরতম পরীক্ষার সময়—ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতসচিব তাঁহার উপর যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে; বিলাতের ইন্স্ অব কোর্টের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আইনব্যবসায়ে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করায় তিনি নিঃস্ব হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন; অপরের চক্ষে যখন ভবিষ্যৎ শূন্যময় এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও দেশের গণ্যমান্য সকলে যখন তাঁহাকে চিরজীবনের মত অকৃতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সেই নিদারুণ দুর্দ্দিনে, জীবনের সন্ধিক্ষণে, এই পরমসাহসিকা নারী অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করতঃ, এবং তদপেক্ষাও যাহা মূল্যবান অকুণ্ঠ প্রেম, অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অশেষ সহানুভূতি দান করতঃ, নিগৃহীত স্বজাতির উদ্ধার কল্পে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্পে তাঁহাকে অকাতরে সাহস ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু সেই প্রথম জীবনের সঙ্কটকালে নয়, সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত রাজনৈতিক জীবন ব্যাপিয়া এই পরমধর্ম্মপ্রাণা

রমণী তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও অনুরূপ চরিত্রবল লইয়া সচিব, সখী এবং গৃহিণীরূপে স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই স্ত্রীশক্তির বলে, সুরেন্দ্রনাথের দুর্গম দেশসেবার পথে, দারুণ দুর্য্যোগ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কোনদিন তাঁহার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে নাই, এবং দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বিপত্তি প্রতিকূলতা এমন ভাবে অতিক্রম করিতেন যে, দেশবিদেশে তিনি "সারেণ্ডার নট্" অর্থাৎ "নাছোড়-বান্দা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে সুরেন্দ্র-নাথ জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, এবং এই দুর্ঘটনায় যেন তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনধারায় একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

সংস্কার-বিধান তাঁহারই আজীবন পরিশ্রমের ফল। ইহাকে তিনি মধ্যপথে একটা সাময়িক আশ্রয়মাত্র মনে করিতেন, এবং এই বিশ্বাস তাঁহার ধ্রুব ছিল যে, যেদিন আমরা আত্ম-কলহ ভুলিয়া এক হইতে পারিব, স্বগৃহে স্বাধিকার আমাদের সেইদিনই লাভ হইবে। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক কটূক্তি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ বিচারবিতর্কের পর যে সংস্কার বিধান তিনি অল্পদিনের অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিলেন, তাহার প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিতে তিনি যে ন্যায়তঃ বাধ্য ছিলেন। মন্ত্রী হইয়া তিনি বাংলার জেলাবোর্ড ও মিউনিসি-প্যালিটীসমূহ স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন; কলিকাতা কর্পোরেশনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রবল সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিনায়কপদে প্রথম একজন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়া আত্মমত রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং অনুরূপ

বিরুদ্ধতার মধ্যে চিকিৎসাবিভাগে ১৬ জন সুযোগ্য ভারতীয় চিকিৎসককে এমন কয়েকটি পদ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাতে এতকাল ইংলণ্ডেনিযুক্ত আই, এম, এস্. কর্ম্মচারীদের অনন্যাধিকার ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার নব বিধানে সম্পূর্ণ সুফল ফলে। চাঁদপুরে কুলীবিভ্রাটের সময় তিনি উপযাচী হইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নানারূপে সহায়তা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সাহায্যের ব্যবস্থা করা তাঁহার অধীনস্থ কোন বিভাগের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। উত্তর বঙ্গে বন্যার সময় তিনি অসুস্থ দেহে, অনাহারে, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ট্রলি করিয়া প্লাবনক্লিষ্ট অঞ্চলে ঘুরিয়াছিলেন। ইহার সহিতও তাঁহার অধীনস্থ কোন শাসন-বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই কঠোর পরিশ্রম শেষ করিয়া তিনি যখন দার্জ্জিলিংএ ফিরিলেন, তখন তাঁহার প্রবল জ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হইয়াছে। তবুও শরীরের এই অবস্থায় ট্রেন হইতে নামিয়াই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বিধান সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এবার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল, এবং সেই যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহার আর পুনরুদ্ধার হইল না। যখন তিনি এই ভাবে সমগ্র দেহ মন দেশসেবায় নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন অন্যদিকে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের নির্দ্দয় সমালোচনা চলিতেছিল—কিন্তু তিনি তাহাতে অসহিষ্ণু হন নাই বা আক্ষেপ করেন নাই।

কাজ করিয়া যাওয়া এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল; জীবনের সায়াহ্নেও বলিতেন যে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম কি আছে তিনি জানেন না। শেষ বয়সের নিভৃত নিবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মনের বলে ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন—বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তিও পূর্ব্বের মতই প্রখর ছিল। দেহ অশক্ত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের তেজ অথবা ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। প্রায়ই বলিতেন যে, আরো দশ বৎসর বাঁচিতে সাধ যায়—ম্রীয়মান জীবন আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে, পরন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার পরম পরিণতি দেখিয়া যাইবার জন্য—ভারত পুনরায় একতাবদ্ধ হইয়া স্বায়ত্ত-শাসনের পথে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে যাত্রা করিয়াছে ইহাই দেখিয়া যাইবার জন্য। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে তিনি বারবার বলিতেন যে, যদি আমরা বিরোধবিসম্বাদ ভুলিয়া একবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যাহা আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিরোধ করিতে পারে—বলিতেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অথবা ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বিদ্বেষ মনান্তরের সৃষ্টি করিয়া কি ফল হইবে, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। তথাপি তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বর্ত্তমানের কলহবিভেদ আমাদের জাতীয়-জীবনের একটা অস্থায়ী অধ্যায় মাত্র; আমাদের দেশের লোকে বুঝিতে পারিবে যে, একতা-বদ্ধ হইলেই আমাদের উন্নতি—অন্যথা বিচ্ছেদবিরোধে বিভ্রান্ত হইতে থাকিলে আমরা ক্রমশঃই দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতে থাকিব।

তাঁহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদের কাহিনী যখন লিখিত হইবে, তখন লোকে জানিবে এই মানুষটির চরিত্রে কত অসাধারণ মহত্ত্ব এবং সৌন্দর্য্য ছিল। চিরজীবনই তিনি জন-সাধারণের একান্ত আপনার

ছিলেন। কি বেঙ্গলী কার্য্যালয়ে, কি সেক্রেটেরিয়েট ভবনে মন্ত্রীশালায়, কি তাঁহার গৃহে, কি দুঃখদারিদ্র্যময় দুঃসময়ে, কি উত্তর-কালের সচ্ছলস্বচ্ছন্দ অবস্থায়, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই তাঁহার কাছে সমান আদর ছিল। কেহ দুঃখভার বহিয়া আনিয়াছে অথবা স্বদেশের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, এমন কাহাকেও তিনি কখনও ফিরাইয়া দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিয়াকৎ হোসেনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিয়াকৎ ইংরেজী কি বাংলা কোন ভাষাই জানেন না; বিগত বিশবৎসরকাল স্বদেশী প্রচার ও ছেলেদের লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছেন এবং নিজের মনোভাব উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ছেলেরা অল্পই বুঝিতে পারে; বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বারম্বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, অথবা মুচুলেকায় আবদ্ধ রহিয়াছেন; এবং লোকের স্বেচ্ছাদত্ত অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিয়া অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। এই লিয়াকৎ হোসেনের জন্য সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে একটি পরম প্রীতির আসন ছিল, এবং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ইঁহার কথা তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের 'কৃপা' নামে একটি প্রাচীন ভৃত্য ছিল, প্রভুর পূর্ব্বেই সে পরলোক গমন করে; সুরেন্দ্রনাথের পরিচ্ছদ এবং অভ্যাসাদি লইয়া এই প্রাচীন পরিচারক কেবলই বিদ্রূপ করিত, এবং সুরেন্দ্রনাথ, ভব্যতা ও শালীনতা সম্বন্ধে তাঁহার পুরাতন ভৃত্যের বিচিত্র ধারণাদি লইয়া কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেন। কঠোর পরিশ্রমের পর যখন দেহমন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িত, তখন তিনি এই ভৃত্যকে লইয়া রহস্যালাপ করিতেন; সেই চিরসঙ্গী

ভক্তকে হারাইয়া তাহার অভাব তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছিলেন। রঙ্গরস ও কৌতুক করিতে তিনি ভালবাসিতেন সত্য, কিন্তু যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন নিকটতম আত্মীয় বা প্রিয়তম বস্তুও তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। আবার যখন বিশ্রামসুখোপভোগে মতি হইত, তখন যৌবনসুলভ আনন্দউৎফুল্লতার সহিত নানাবিধ বাক্যালাপ করিতেন। তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক, তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত হাসি হাসিতে কম লোককেই দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত বিপীনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, সুবক্তা, সুলেখক ও কর্ম্মীদের সহিত তাঁহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতায় বা সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধে সময়ে সময়ে তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু তাহার দরুণ ইঁহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী মনমালিন্য ঘটিত না। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক ব্যঙ্গ, কৌতুক, রহস্য ও নিন্দাবাদ অতি সরস ও শ্রুতিমধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেন—"গুরুদেব, আজ নায়কে আপনাকে অনেক মিঠেকড়া গালি দিয়াছি। কি করি, সময়ে সময়ে আপনাকে গালি না দিলে লেখা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ে ও কাগজ কাটতির সুবিধা হয় না। পেটের দায়ে এই কুকার্য্য করি, ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতেন—"বেশ করেছ"। শ্যামসুন্দর যখন তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার উপর আদেশ ছিল, অসত্যের প্রতিবাদ করবে কিন্তু কেউ গালি দিলে

তার উত্তর দেবে না। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে "বেঙ্গলীর" বর্ত্তমান অন্যতম সম্পাদক শর্ম্মাকে পত্র লেখেন যে, যদি বেঙ্গলীতে তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কোন ব্যক্তির উপর কটূক্তি করা হয়, তাহলে তিনি বেঙ্গলীর সহিত কোন সংশ্রব রাখবেন না। আমাদের সব সর্ব্বনাশের মূল দলাদলি ও আত্মকলহ (সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত) ও তাহাই দূর করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধিকে প্রধানতঃ এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করেন।

গোখ্‌লে যে বলিতেন "বাঙ্গালা আজ যাহা ভাবে, কাল সমগ্র ভারত সেই এক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়," সে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের সময়। সম্প্রতি "টাইমস" প্রমুখ বিলাতের সংবাদ পত্র যে বলিয়াছেন যে সুরেন্দ্রনাথের সহিত একমাত্র গ্লাডষ্টোনের তুলনা চলে, সেও বড় কম কথা নয়। যশ এবং সাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি তিনি অযাচিতভাবে লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ভাষার ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, হৃদয়ের বৃত্তি এবং ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ শক্তি তিনি দেশ এবং দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও যশ অনুসন্ধান করিয়া ফিরেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্যনিষ্ঠা। এ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, জ্ঞাতসারে স্বজাতিকে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ তিনি কখনই দিবেন না, কিম্বা বিপথে চালিত করিবেন না। লোকের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়াও, যাহা তাহাদের পরমার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিতেন। শেষজীবনের সুগভীর প্রশান্তিতে তিনি নিজেকে সকল বিক্ষোভ বাসনা মোহ অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই

সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যতদিন শেষদিন না আসে, ততদিন তাঁহার চিরজীবনের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবেন; যতদিন সামর্থ্যে কুলাইয়াছিল, তিনি একনিষ্ঠভাবে এই সঙ্কল্প পালন করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় যেমন আধুনিক ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তিমন্ত্রের ঋষি, তেমনই সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের মন্ত্রগুরু; তিনিই ভারতবাসীকে জগতের উন্নতিশীল জাতিসমাজে একটি গৌরবের আসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আদর্শের অনুযায়ী কর্ম্মপথে চালিত করেন। রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এখনকার শিক্ষিত সমাজের সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারেন, কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, সেই ধর্ম্মের পরম প্রভাবে আমাদের চিন্তা কল্পনা শিক্ষা দীক্ষা আলোকিত হইয়াছে, প্রসারিত হইয়াছে? সেই ভাবে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান ভারতের সৃষ্টিকার্য্যে সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। দীর্ঘজীবনের শেষে পরম বিরামের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার দেশসেবা লইয়া কোন উত্তেজনাপূর্ণ অভিনয় দেখিবার বাসনা ছিল না। তাঁহার চিত্ত পরম শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কারণ তিনি অনুভব করিতেন যে, ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, একমাত্র কর্ম্মেই তাহার মুক্তি—এবং ভগবান ও মানুষের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। জীবনে কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল।

তাঁহার আবাস ছিল গঙ্গাতীরে। কতবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার চিতাভস্ম গঙ্গাসলিলে বাহিত হইয়া তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃভূমির

ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিবে; এবং তাঁহার আত্মা মানুষের সেই মনোমন্দিরে পরম আশ্রয় লাভ করিবে, যেখানে জাগ্রত ভগবান স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করেন। ৬ই আগষ্ট, যেদিন স্বদেশী আন্দোলনের ও ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিবার সঙ্কল্পের বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয়—সেই স্মরণীয় দিনের সন্ধ্যায়, যখন অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম-চ্ছটায় পশ্চিম গগন ভাস্বর, তখন তাঁহার চিতানলের উদ্দীপ্ত শিখা উর্দ্ধে আকাশ এবং নিম্নে তাঁহারই উদ্যানতলবাহিনী বর্ষার ভরাগঙ্গার উপর করাল রশ্মিপাত করিল। তারপর নদীতে সন্ধ্যার জোয়ার আসিল, উদ্বেল জলস্রোত নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ ধৌত করিয়া লইয়া গেল, ও গগন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া স্নিগ্ধকর বারিবর্ষণে চিতার প্রধূমিত অঙ্গারাগ্নি নিভাইয়া দিল। স্নেহময়ী প্রকৃতিজননী এইরূপ গভীর শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে অপার করুণাভরে ধরণীর মুখমণ্ডল ক্রমে নিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া এই মহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় জীবনের যবনিকা ধীরে ধীরে টানিয়া দিলেন।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

নবম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

'পাঠকের কথার' জের।

যেদিন ভাদ্রের 'সবুজ পত্রে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' পড়া শেষ হয়েছিল, সেইদিন থেকেই আশ্বিন সংখ্যার জন্য কতকটা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম; কারণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্র যে চক্রের তাড়নায় ভীমবেগে ঘূর্ণ্যমান, তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তারই বিরুদ্ধে অত বড় অপ্রিয় সত্য ব'লে যে কবিবর অক্ষত শরীরে ফিরে যাবেন, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। যা'হোক, আশ্বিন সংখ্যায় পাশাপাশি 'পাঠকের কথা' ও 'সম্পাদকের কথা' প'ড়ে ঔৎসুক্য নিবারণ ত হ'লই, উপরন্তু কিছু 'যাস্তি'ও মিল্‌ল। যাস্তি মিল্‌ল এই হিসেবে যে, দেখে প্রীত হলাম আমাদের সত্যপ্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁর 'পাঠকের কথায়' স্বয়ং সব্যসাচীকেও অতিক্রম করেচেন, যেহেতু তিনি বর্ত্তমান কালের নবীন কবি, গল্পলেখক এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেই যুগপৎ আক্রমণ করেচেন, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে এবং গরিষ্ঠ ভাষায়। তাঁর নির্ভীক লেখনীচালনা এবং সাহিত্যে সত্যপ্রিয়তার অজস্র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি নে, এবং না করলেও গুণের ও গুণীর অনাদর করা হবে। যদিচ এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করা, সাহিত্য-জগতে আমার মত অজ্ঞাতকুলশীলের মুখে শোভন হবে না জানি, তথাপি যতীন বাবু স্বয়ংই যখন দেখিয়ে দিয়েচেন, নিজের ধারণায় যা' সত্য বলে' মনে হবে, তা' নির্ভয়ে বলা বা লেখা যেতে পারে,—তা' যে মহারথীর বিরুদ্ধেই

হোক্,—তখন আমার এ দুঃসাহসে আশঙ্কার কারণ নেই। অবশ্য সম্পাদক মহাশয় যদি তাঁর 'কথাটা' আর একটু আগে থেকে আরম্ভ করতেন, তাহলে এ প্রবন্ধের প্রয়োজনই হ'ত না।

যতীন বাবু নাকি ভেবে পান নি, "এত লোক এত বাজে কথা কেন লেখে ও প্রকাশ করে।" না পাবারই ত কথা, কারণ কবিগুরু বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে' কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের অমর লেখা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জের মত বর্ত্তমান রয়েচে প্রত্যক্ষ করে'ও যখন ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র মনে লেখার প্রবৃত্তি জন্মে—শুধু তাই নয়, আবার সেই লেখা প্রকাশ করবার অমার্জ্জনীয় আকাঙ্ক্ষাও সে অন্তরে পোষণ করে—তখন যতীন বাবুর ও-কথা লেখবার সঙ্গত কারণ আছে বলতে হবে। কিন্তু কথা হচ্চে এই যে, যুগ যুগ ধরে' সকল দেশেই যখন মানুষ এই অপরাধটা সমান ভাবেই করে' আসচে, তখন মনে হয় এ দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য শুধু তা'কেই দোষী করলে নিরপেক্ষ বিচার হবে না; এই দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, বোধ করি তাঁরও এতে দোষ যথেষ্ট রয়েচে, কিন্তু তাঁকে ত আর শোধরাবার উপায় দেখি নে, কাজেই যে সব 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' সাহিত্যচর্চ্চায় অনধিকার চর্চ্চা করতে যাচ্চে, তাদের সংশোধন এবং সংযমন করবার জন্য একজন Censor বা Censorial প্রতিষ্ঠান করা আবশ্যক, যা'তে ক'রে 'অপ্রেরণা'ঘটিত কোন লেখা প্রকাশিত হ'তে না পারে; অথবা সাহিত্যব্যবস্থাপক সভায় এমন সকল আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক, যা'তে ক'রে 'কাজের কথা' প্রকাশ করবার মত ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন লেখক কোন লেখা প্রকাশ করলে তা'কে সোপর্দ্দ করা যায়, এবং এই অনর্থকারী স্রোতও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

নতুবা কালের দোষে বা গুণে দেশে যখন সাহিত্য-গঙ্গাবতরণ আরম্ভ হয়েচে, তখন ঐরকম একটা কোন ঐরাবতকে দাঁড় করাতে না পারলে আবর্জ্জনাসংস্পর্শে ভাগীরথী-বারি অপবিত্র ও 'ঘোলা' হওয়ার সম্ভাবনা।

যতীন বাবু লিখচেন, তিনি বুঝতে পারেন নি "এত ভাল ভাল লোক প্রতিদিন এত বস্তা বস্তা মিথ্যা কথা লেখেন কেন।" প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিষ্ণুশর্ম্মা এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে হাজির করেচেন। তাঁর এ কথায় আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, কারণ সাহিত্যকে এই মিথ্যা-কল্পনা-বহুলতার দোষ হ'তে মুক্ত করতে হ'লে, যে বনিয়াদের উপর এই যুগযুগান্তের মিথ্যা সাহিত্যকে দাঁড় করানো হয়েচে, সর্ব্বাগ্রে সেই বনিয়াদ নষ্ট করতে হবে,—অর্থাৎ মুর্ত্তিমতী মিথ্যা-কল্পনাদেবীকে সাহিত্যক্ষেত্র হ'তে নির্ব্বাসিত করতে হবে; এবং আবিলতাহীন স্বচ্ছ-সুগভীর নিছক সত্যপূর্ণ লেখা-বহুল সাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'লে প্রথমতঃ যে সব রোম্যান্স, ফিক্‌সন্, নাটক, নভেল, আখ্যান, উপাখ্যান সাহিত্যে রয়েচে, সে সবগুলিকে summarily বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হবে,—নৈলে মঙ্গল নেই। কিন্তু তা' কি সম্ভব হবে! তাই চিন্তা। তথাপি সান্ত্বনা এই যে, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

যতীন বাবু গল্পলেখকদের উপদেশ দিয়ে বিজ্ঞের মতই লিখেচেন, "অধিকাংশ গল্পলেখক গল্প লিখিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা না করিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের অথবা মেয়েছেলেদের নিকট নিজের বাহাদুরীর গল্প করিলেই বোধহয় ভাল হয়"। এ কথা সর্ব্বৈব সত্য, এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা সমর্থন করি। কারণ আজকাল কি পলিটিক্স, কি

সাহিত্য, কি সামাজিক ব্যাপার, সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের কাঁধে এই বাহাদুরী জিনিষটা ভূতের মত চেপে আছে। ইহা সত্যই আনন্দের বিষয় এবং আশার কথা যে, 'মরীচিকার' কবি যতীন বাবু এই ভূতমুক্ত হয়েচেন, এবং সাহিত্যিকদের মুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েচেন—যার জন্য তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেন নি। তিনি আরও লিখেচেন, "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) শিষ্যগণ আমাদের নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের 'মনসার কাঁদুনি' পাঠকদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে"। এবং তারই জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটু 'তাড়া' দিতে ইঙ্গিত করেচেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যতীন বাবুকে একটা কথা বলতে হচ্চে—বিশ্বকবি ত "বর্ণমাত্র বিপ্রলব্ধ" হয়ে পশুরাজ হন নি যে, তাঁকে কড়া হুকুম জারি করতে হবে চারিদিকে, যা'তে স্বজাতি কেউ কাছে ঘেঁসতে না পারে ; তিনি হয়েচেন পশুরাজ সিংহ হয়েই, কাজেই চারিদিকে সজাগ দৃক্‌পাত করবার জন্য দিক্‌পাল নিযুক্ত করবার তাঁর দরকার হয়নি। সহস্র অক্ষমতা মার্জ্জনা করবার মত বিরাট হৃদয় তাঁর আছে বলেই তিনি আজ সাহিত্যজগতে সম্রাট ; অপরন্তু তিনি ভাল ক'রেই জানেন, সাহিত্যে কোন্‌টি কাজের কোন্‌টি অকাজের, কোন্‌টি অচল কোন্‌টি চল ; তা' যাচাই করবার কাজ আর যারই হোক্—কবির নয়। তার জন্য ত রয়েচেন কাল স্বয়ং, আর চার যুগের বিজ্ঞ সমালোচক কেতাব-কীট। সাহিত্যের সকল আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে তার আসল জিনিষগুলোকে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে তারা যে কেমন ক'রে রক্ষা ক'রে আসচে, তা' কি আবার নূতন ক'রে বলতে হবে ?—তারপর 'মনসার কাঁদুনির' কথা। যতীন বাবু যাকে 'মনসার কাঁদুনি' বলে' নাসিকা কুঞ্চিত করেচেন, তা' সাহিত্যক্ষেত্রে

চার যুগেই ছিল এবং থাকবে। সাহিত্য-ঐশ্বর্য্য হিসাবে যে সব দেশকে আমরা শীর্ষস্থানীয় ও অগ্রণী বলে' মান্য করি, সে সব দেশেও এ 'মনসার কাঁদুনি' চলচে, এবং তারই মধ্যে থেকে ভারতীমাতার ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতও জন্মলাভ করচে। তারপর এত বড় স্পর্দ্ধা বোধকরি এ যুগে কোন despot-এর নেই যে, চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষকে এ অধিকার হ'তে বঞ্চিত করতে পারে। এই সূত্রে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। John Stuart Mill এক জায়গায় লিখেচেন—"If all mankind, minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person.........; the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race, posterity as well as the existing generation."

যতীন বাবু রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' সম্পর্কে যা বলেচেন, 'সম্পাদকের কথায়' তার দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গিয়েচে, সে বিষয় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে যতীন বাবু 'চরকা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-গান্ধীর মত-বিভেদের মূলে রামমোহন ও চরকা যে সমান স্থান লাভ করেচে, এই তথ্য আবিষ্কার করেচেন, এবং তার প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েচেন,--এর তাৎপর্য্য বোধগম্য হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধে রামমোহন রায় ও চরকা যে সমান স্থান লাভ করেচে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোচরে ত তা' আসেনি। চরকা বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি যদি মহাত্মার কর্ম্মপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মর্ম্মপ্রকৃতির কোথায় অমিল, সেই কথাটি পরিস্ফুট করবার জন্য কোন মহাপুরুষ

বিশেষের সম্পর্কিত কোন কথার অবতারণা করেন, তা'হলেই কি চরকার সঙ্গে তাঁর সমান স্থান দেওয়া হল বলতে হবে? অবশ্য এতদূর স্পর্দ্ধা আমার নেই যে, যতীন বাবুকে 'চরকা' প্রবন্ধের ঐ স্থানটী পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ করি, কাজেই সুধী পাঠকগণের উপর এ ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেম।

আর একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই একটা সীমা ও সৌষ্ঠবের দিক আছে, যা' কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। হাত চেয়ে আম মোটা হ'লে সুধু যে অশোভন দেখায় তা' নয়, হাতওয়ালাকেও অপরিণামদর্শিতার জন্য ক্ষোভ করতে হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ভারতচন্দ্র।

—:০:—

হে ভারত, বাঙ্গালার যাদুকর কবি,
কোন্ মালঞ্চের ফুল করিয়া চয়ন,
গাঁথিলে মোহন মালা, কেড়ে নিলে মন!
অকলঙ্ক কলা তব—অনবদ্য ছবি।
সুন্দর তোমার বিদ্যা—অসুন্দর কহে
কোন্ অরসিক! কাব্যের মাধুরী মাপে
নীতি দিয়া তারা। মধু—মিষ্টত্বের পাপে,
মানদণ্ডে পরিমিত করিবার নহে।
রসহীন জনে—অন্নদার অন্নদান
ব্যর্থ চিরদিন। অনঙ্গ-মঙ্গল গান
কি বুঝিবে, যাহাদের নাহি সুর-বোধ?
কলাগুরু, তাহাদের কোরো তুমি ক্ষমা,
যারা হেলা করে তব শিল্পের সুষমা;
—উপভোগে শক্তি নাই, সে-ই তার শোধ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

ক্ষুধা।

—:০:—

এম, এ, পাশ করবার পর অরুণের জ্ঞানের ক্ষুধা আরো চন্‌চনে হয়ে উঠলো। সে পণ করলে চিরকুমার থেকে বিজ্ঞানদর্শনের অনুশীলন করবে। সে ভিখারী দেখলে বল্‌তো কুঁড়ে, প্রেমিক দেখলে পাগল, আর সন্ন্যাসী দেখলে ভণ্ড। সে তার অর্থসামর্থ্য সমস্ত নিয়োগ করলে একটি প্রকাণ্ড জ্ঞানের মন্দির গড়ে' তুলতে— যাতে সকল যুগের সকল পণ্ডিতের চেলারা পূজারী হয়ে বসলো। কেউ বিদ্যুতের ঘণ্টা নাড়ে, কেউ মায়াবাদের ধুনো পোড়ায়, কারো মুখে পাস্তুরের স্তোত্র, কারো হাতে ভাস্করাচার্য্যের অর্ঘ্য। কি একটা আনন্দের গৌরবে অরুণের মুখকান্তি অরুণের মতই রক্তিম হয়ে উঠলো।

একদিন এক সুন্দরী তরুণী স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে অরুণের জ্ঞানের মন্দিরে ঢুকলো। সে তার অনুষ্ঠাননিপুণ হাত দুটীকে উপচার সম্ভারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে—কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই অরুণ তার জন্য এক অভূতপূর্ব্ব বেদনা অনুভব করতে লাগলো। একদিন সে যখন উদ্ভিদের সাড়া মাপবার যন্ত্রটাকে ধূলা ও মাকড়সার জালের কবল হতে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল, তখন অরুণ সহসা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—

"তোমার কর্ম্মক্লান্ত হাত দুটাকে কি একটুও বিশ্রাম দেবেনা লীলা?" লীলা চম্‌কে উঠে প্রশ্ন করলে—"কেন?"

"জানিনা কেন, কিন্তু মনে হয় তুমি একটু স্থির হয়ে বসো, আমি তোমার কাজ করে' দিই। এ কি সহ্য হয় যে তুমি কেবলই ঘাড় নীচু করে থাকবে, এক আধবারও মুখ তুলে চাইবে না, এক আধটীও কথা কইবে না ?"

এর পরেই একদিন জ্ঞানের মন্দিরের চূড়া হুড়মুড় করে' ভেঙ্গে পড়লো। পুঞ্জীভূত পুঁথিপত্র ও সজ্জোপকরণের স্তূপ জঞ্জালের মত অপসারিত হয়ে নীলামে চড়লো, এবং তারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী দিয়ে নির্ম্মিত হ'ল এক নবদম্পতির পুষ্পবাটিকা। অরুণের জ্ঞানের ক্ষুধা ছুটে গিয়ে ভাবের ক্ষুধা জেগেছে। এ ক্ষুধা আরো তীব্র, আরো অতৃপ্ত। কখনো সে সীবনরত লীলার অংসবিলম্বী লীলায়িত কুন্তলের গতি-ভঙ্গিমাটুকু তুলির ডগায় ফোটাবার চেষ্টা করে—কখনো লীলার যূথিকাপেলব অঙ্গুলির ক্ষিপ্র টানে বীণার বুকের তারে যে ঝঙ্কার ওঠে, তারই অবর্ণনীয় মাধুর্য্যটুকু গেঁথে ফেলে কবিতার ছন্দে।

এম্‌নি ভাবেই দিন যায়, কিন্তু বেশীদিন গেল না। কালের দণ্ডনিঃসৃত একটি নিষ্ঠুর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পুষ্পবাটিকার শ্রেষ্ঠ ফুলটীকেই ঝল্‌সে দিলে। অরুণের কাছে এক মুহূর্ত্তেই আকাশের তরল নীলিমা হয়ে গেল তাম্রপিঙ্গল, ধরণীর কোমল মৃত্তিকা প্রস্তরকঠিন।

অরুণের রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশ ও উদ্‌ভ্রান্ত চোখের তারা সকলকেই জানিয়ে দিলে যে সে এখন বৈরাগ্যপথের যাত্রী! অমনি আত্মীয় স্বজনেরা অনুকম্পাপরবশ হয়ে তার মানস-ঝুলিতে এমন সব তত্ত্ব-জ্ঞানের পাথেয় নিক্ষেপ করতে লাগলেন যে, সে অচিরেই তার বিপুল ঐশ্বর্য্য জনে জনে বিভাগ করে' দিয়ে, দীক্ষাগুরুর সন্ধানে বেরিয়ে

পড়লো। তার সকল ক্ষুধার নদী এখন আত্মার সমুদ্রে পড়ে' উত্তাল তরঙ্গে নেচে উঠেচে।

পর্ব্বত বন প্রান্তর ভেদ করে' অরুণ কেবলই চলেচে, কেবলই চলেচে। তার ক্ষুধিত আত্মা এখন কেবল নিত্য সত্যকেই চায়। এ ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারেন, এমন মনুষ্যগুরুর সন্ধান সে পেলে না। যারা নিজেরাই সংসারের মায়ামোহ-কটাহে ভাজা ভাজা হচ্চে, তাদের উপদিষ্ট কুম্ভকপ্রাণায়ামের উপর সে কেন না বীতশ্রদ্ধ হবে? সে ঠিক করলে প্রকৃতি-মায়ের দিগ্বলয় আঁচল লুট করে' আত্ম-রহস্যের চাবি ছিনিয়ে নেবে। এক কথায়—তার কিছু কিছু চিত্তবিকারের লক্ষণ দেখা দিলে।

সে বেরিয়েছিল গ্রীষ্মের প্রাক্কালে—এখন শীতের সূচনা। সচ্ছন্দ বন-জাত ফল এখন তার পক্ষে দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েচে। তার কঙ্কালসার শীর্ণ শরীরে আর যৌবনের চিহ্নমাত্রও নেই। লাবণ্যহীন বলিকুঞ্চিত জরা কখন যে তাকে অধিকার করে' বসেচে, তা' সে জানতেও পারেনি। হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল সে আর যষ্টি ভিন্ন হাঁটতে পারে না—তার চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সঙ্গে সঙ্গে তার এমনও একটা ইচ্ছা হতে লাগলো, সে নিজের রক্তমাংস নিজে কামড়ে চুষে খায়। তার বক্ষের নিম্নতন কোন প্রদেশে একটা বিরাট খাণ্ডবানলের মত আগুন ধূধূ করে জ্বলে উঠেচে।

এরই নাম কি দেহের ক্ষুধা?—সে বড় লোকের ছেলে, দেহের ক্ষুধা কা'কে বলে জানতো না, জানবার সময়ও কেউ তা'কে দেয় নি। কিন্তু আজ সে প্রথম বুঝলে দেহের ক্ষুধা আছে, সত্যই আছে, নিত্যই আছে। এক নিমেষে তার আত্মার ক্ষুধার স্বপ্ন ছায়াবাজীর মত

মিলিয়ে গেল। সে দেহের ক্ষুধার মধ্যে জেগে উঠেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সহরে ফিরে এল।

সে সারাদিন সহরের অলিগলির মধ্যে ঘুরে বেড়ালো মুষ্টিভিক্ষার জন্য। কিন্তু কে ভিক্ষা দেবে? তার চোখমুখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছিল একটা হিংস্র লোলুপ উন্মাদনা—একটা অসহিষ্ণু যথেচ্ছাচার। ছেলেরা তা'কে রাক্ষস মনে করে' ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো; গৃহিণীরা তা'কে মায়াবী মনে করে' তার মুখের উপরেই ধমাস্ করে দরজা বন্ধ করে' দিলেন। সন্ধ্যার সময় এক পাল রাস্তার কুকুর তা'কে চারদিক থেকে ঘেউ ঘেউ করে' ছেঁকে ধরলে।

রাত যখন খুব গভীর, তখন অরুণের দুই হাঁটু আপনা হতে কাঁপচে, ভেঙ্গে দুমড়ে আসচে। প্রখর শীতের কন্‌কনে বাতাস সে একটুকুও কষ্টকর বলে' অনুভব করতে পারচে না, কিন্তু তার মনে হচ্চে সমস্ত সহর একটা প্রকাণ্ড হাঁ করে' তা'কে গিলতে চাইচে—বড় বড় বাড়ীর প্রত্যেক ইঁটখানাও চীৎকার করে বল্‌চে—'খাই খাই—বড় ক্ষুধা।' সে একটা উঁচু প্রাসাদের ফটকের গোড়ায় ভারপিষ্ট বলদের মত বসে' পড়লো। রোগক্লিষ্ট মুমূর্ষুর ক্ষীণ আর্ত্তনাদের মত নৈশ আকাশে মিলিয়ে গেল তার শেষ প্রার্থনা—

"মা! দুটী ভিক্ষা—বড় ক্ষুধা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

মানবী।

——:০:——

দেবী বলে' আমি ভেবেছিনু তোমা,
নাহি যদি তুমি দেবতা হও,
মানবী হয়েই থাক চিরকাল,
প্রণয়িনী হয়ে হৃদয়ে রও।
যদিও তোমার শ্রীচরণমূলে
ভক্তি-অশ্রু-নিষিক্ত ফুলে
পূজিতে না পারি, তবু জানি তুমি
আমার হেলার যোগ্যা নও।
বেদী ছেড়ে আজ নেমে এস বুকে,
পূজা ছেড়ে আজ প্রণয় লও ॥

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
হয়ে থাকে যদি স্খলন ত্রুটি,
প্রলোভনে যদি পারনি জিনিতে,
পদতলে তার পড়েছ লুটি;
শ্লথ মুহূর্ত্তে অবসাদ-ভরা
যদি চেয়ে থাক সংযমহরা
আত্মদানের চরম রভস,
কেন লাজে ভেজে নয়ন দুটি?
বল উল্লসি, "ছিঁড়ে রসারসি
পেনু তো বারেক বিপুল ছুটি"!

পুণ্য ও পাপ মিছে পরিতাপ,
ব্যর্থ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নীতি;
সময়-অনলে সব যায় জ্বলে—
কুল-কলঙ্ক, দোষের স্মৃতি।
প্রতিবেশ তব ছিল প্রতিকূল,
হয়তো বা তাই হয়েছিল ভুল—
সুযোগ আসেনি, চরণ খসেনি,
তাই আমি সাধু, তাইতো কৃতী।
প্রলোভনে তুমি পরাজিত হয়ে
শিখেছ তাহার জয়ের রীতি॥

কিবা তব দোষ, কেন আফ্‌শোষ,
বিচার কে তার করিবে আজি?
কোন্ মদিরায় কোথা নিয়ে যায়,
ঠিকানা তাহার না জানে কাজী।
উদার, অমল চন্দ্রের সম
হৃদয়ে তোমার যদি অণুতম
রেখা পড়ে, হায়! কিবা আসে যায়?
ম্লান নাহি হবে কিরণরাজি।
চালানো তোমায় কাজ নহে মোর—
আমি কি জীবন-তরীর মাঝি?

দেবী বলে' যবে ভেবেছিনু তোমা,
ছিনু তোমা হ'তে সুদূরে অতি ;
ভালো করে' আজ চিনেছি তোমায়,
মানবী হইতে কিসের ক্ষতি ?
আজি আসিয়াছ অহমিকাহারা,
নয়নের কোণে অনুতাপ-ধারা—-
দেবী নহ আজ, প্রেম-ভিখারিণী,
সম্ভ্রমহীনা, বিগত-জ্যোতি ।
সমতার টানে টেনেছ আমারে,
বন্ধু আমি হে, নহি তো পতি ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ।

কোপাই।

——ঃ০ঃ——

তার সঙ্গে আমার ষোল বছরের পরিচয়। এই ষোল বছরের পরিচয়ে আজ সে ষোড়শী—ষোলটি বর্ষায় সে মত্ত, ষোলটি শরতে ক্ষীণ, ষোলটি শীতে সে স্বচ্ছ, ষোলটি গ্রীষ্মে শুষ্ক। সবাই তাকে ডাকে কোপাই—আমি তার নাম দিয়াছি কোপবতী; অনুরাগের রঙও লাল, রাগের রঙও লাল,—অনুরাগের পাত্রকে তাই মাঝে মাঝে দেখিতে সাধ যায় রাগাইয়া; কোপবতী আমার সেই সাধের নাম।

গঙ্গা পদ্মা যেন রামায়ণ মহাভারতের মত দেশের বুক জুড়িয়া পড়িয়া আছে—তাহারা কাহারো নিজস্ব নহে; কিন্তু কোপাই আমারই ছোট্ট একটি লিরিক। এতদিন দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রতিটি ভঙ্গি আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এই এক-অঞ্জলি নদীটির দুই তীরের তরুপল্লবে ছুঁই ছুঁই করে, ওপারের আখের বনে শালিকের বকাবকি এপার হইতে বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এই বনচারিণী তরলাকে কালিদাসের কালের নিপুণিকা চতুরিকাদের একজন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় এ আপনার আলোছায়ার ঢেউখেলানো ডুরে শাড়িখানিকে এমনভাবে জড়াইয়া লইয়াছে যে, প্রতি পদক্ষেপে ইহার কমনীয় তনুলতা আপনাকে প্রকাশ করে। কবি হইলে ইহাকে সম্বোধন করিতাম তন্বী বলিয়া।

এই দীর্ঘ পরিচয়ে কতরকমেই না তাহাকে দেখিয়াছি—কখনো আষাঢ়ের জটামুক্ত জলপ্লাবনে ফুলিতে ফুলিতে দুই তীরের কচি মাঠ

গ্রাস করিয়া, প্রাচীন আমবনের তলে তলে ভাসিয়া-আসা বাব্‌লার ফুল দুলাইয়া, ডুবিয়া-যাওয়া শণক্ষেতের হলুদবরণ ফুলগুলি নাচাইয়া তরঙ্গে উঠিতে, আবর্ত্তে ফুটিতে, সন্ত্রস্ত গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিতে। সে কি ঘোলা জল, সে কি মহা রাগ—সেই আমার কোপবতী। আবার দেখিয়াছি শীতকালে যখন বারির অপেক্ষা বালি বেশি; একটুখানি স্বচ্ছ ধারা আছে কি নাই! তখন তীরের শোভাই শোভা; বনকুলের গাছ কুলে ভরা; খেজুর রসের মৌতাতে বাতাস অবশ; শূন্য ক্ষেত হইতে শেষ গাড়ী ধান ঘরের মুখে চলিয়াছে। এই রকম কত না স্মৃতির জাল বুনিয়া এই নদীগর্ভে ফেলিয়াছি।

কিন্তু কেউ কি জানে কেন বারে বারে এই নদীর উৎস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছি?—ইহারি তীরে আমার তেপান্তরের মাঠ, ইহারি স্রোতে আমার তেরোটি নদী এবং সাতটি সমুদ্র। এতদিনে ইহার একটি মানচিত্র আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে আগে ওঠে মেঘ, সেখানে আগে ঝরে বর্ষা, সেখানে আসে বন্যা, সেখানে ফোটে ফুল—বাহিরে আর তাহার কতটুকু? সেখানে এ যমুনা গঙ্গা নির্ব্বিন্ধ্যা রেবার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে ইহার উৎস কৈলাস পাদমূলে মানস-হ্রদে, সেখানে ইহার অবসান ভারত মহা-সমুদ্রে। এমন আমার শক্তি নাই যে শিপ্রা রেবা নির্ব্বিন্ধ্যা বা পদ্মার মত ইহাকে কাব্যলোকে অমর করিয়া রাখি,—কিন্তু এই বড় সৌভাগ্য যে, সে বিশেষ করিয়া আমারই, একান্তই আমার, সে আমার কোপবতী, আমার কোপাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

গল্প লেখা।

—গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবছ ?

—একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনও গল্প আসছে না, তাই ব'সে ব'সে ভাবছি।

—এর জন্য আর এত ভাবনা কি ? গল্প মনে না আসে, লিখো না।

—গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কি না জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই !

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না।

—আমি লিখে খাই, তাই inspiration-এর জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে। ক্ষিধে জিনিসটে নিত্য, আর inspiration অনিত্য।

—লিখে যে কত খাও, তা' আমি জানি ! তা'হ'লে একটা পড়া-গল্প লিখে দেও না।

—লোকে যে সে চুরি ধরতে পারবে।

—ইংরেজী থেকে চুরিকরা গল্প বেমালুম চালানো যায়।

—যেমন ইংরেজকে ধুতি চাদর পরালে তা'কে বাঙ্গালী ব'লে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়।

—দেখ, এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্ট প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।

—অর্থাৎ ইংরেজও বাঙ্গালীর মত আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্ম-মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্‌ করে।

—আর এই ছট্‌ফটানিকেই ত আমরা জীবন বলি।

—তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিষটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্ততঃ ছোট গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যা' নিত্য ঘটে, এ দেশে তা' নিত্য ঘটে না।

—এইখানেই তোমার ভুল। যা' নিত্য ঘটে, তা'র কথা কেউ শুনতে চায় না; ঘরে যা' নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়?—যা' নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

—এই তোমার বিশ্বাস?

—এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দুপুরে একটা পড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম—আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে সে রমণী নয়! একেবারে তিলোত্তমা! এরকম ঘটনা বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি—আর পড়েই যা'ব যতদিন না কেউ এর চাইতেও বেশী অসম্ভব আর একটা গল্প লিখবে।

—তা'হ'লে তোমার মতে গল্পমাত্রেই রূপকথা?

—অবশ্য।

—ও দু'য়ের ভিতর কোনও প্রভেদ নেই?

—একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।

—তা'হ'লে বলি, ইংরেজী গল্পের বাঙ্গলা করলে তা' হ'বে রূপকথা।

—অর্থাৎ বিলেতের লোক যা' লেখে, তাই অলৌকিক।

—অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা' হ'তে পারে না, কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা' হ'তে পারে না ব'লে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।

—আমি ত বাঙ্গলা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি। তুমি এখন ইংরেজী গল্পের একটা উদাহরণ দেও।

—আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড় লেখকের বড় গল্পের উদাহরণ; আমি দিচ্ছি একটি ছোট লেখকের ছোট গল্পের উদাহরণ।

—অর্থাৎ যা'কে কেউ লেখক ব'লে স্বীকার করে না, তার লেখার নমুনা দেবে? —একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।

—ভালমন্দের প্রমাণ, জিনিষের ও মানুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মাণিকের খানিকও ভাল।

—এই বিলেতী অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মাণিক বেরয়?

—মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটী বেরয়, এ কথা কালিদাস জানতেন।

—এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার রত্ন বার করো।

—লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাৎ গরীব। কোথাও চাকরী না পেয়ে সে গল্প লিখতে ব'সে গেল। তা'র inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে। যখন তা'র প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হ'ল, তখন সমস্ত সমালোচকরা বল্‌লে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তা'র যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা প'ড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা ব'সে গেল যে, তাঁ'র চোখে এমন ভগবদ্দত্ত X-rays আছে, যা'র আলো স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তারপর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁ'র নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রী হৃদয়ের একজন অদ্বিতীয় expert। আর ঐ ধরণের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদেরও বিশ্বাস জন্মে' গেল যে, লেখক তাঁদের হৃদয়ের কথা সবই জানেন; তাঁ'র দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পান! মেয়েরা যদি শোনে যে কেউ হাত দেখতে জানে, তা'কে যেমন তা'রা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না—তেমনই বিলেতের সব বড় ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশের বেশের বিচিত্র রেখা ও রঙ সব দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোনও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁ'র কস্মিনকালেও কোনও কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনা-পাওনার হিসেব তাঁ'র মনের খাতায় একদিনও অঙ্কপাত করে নি।

তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দু'টি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সঙ্কোচে তাঁদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতেন। ইংরেজ ভদ্রলোকরা ডিনারে ব'সে যত না খায়, তা'র চাইতে ঢের বেশী কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিস্ট্‌টি কথা কইতেন না— শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ওরকম চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জীবনে কখনও চোখেও দেখেন নি। এর জন্য তাঁ'র স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তা'রা ধ'রে নিলে যে, তাঁ'র অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই। আর তাঁ'র নীরবতার কারণ তাঁ'র দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি একজন বড় লেখক ব'লে গণ্য হলেন, কিন্তু তা'তেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হ'তে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড় লেখক। তাই তিনি এমন কয়েকখানি নভেল লেখবার সঙ্কল্প করলেন, যা সেক্সপিয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে ব'সে লেখা যায় না; কেন না, লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাততাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন; কেন না, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেক্‌ট্রিসিটিতে ভরপূর। এ যুগের য়ুরোপের সব বড় লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তা'রা সকলেই স্বীকার করে যে, তা'দের যে সব বই Nobel prize পেয়েছে, সে সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধরলে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজী বেরয়, জার্ম্মাণের হাত থেকে সুবোধ জার্ম্মাণ, রাসিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাসিয়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেক্‌ট্রিসিটিতে

পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তা'র মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁ'র masterpiece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিস্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল, সবই আর্টিস্ট,—অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিস্ট হ'বার দিকে।

এই হবু-আর্টিস্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিস্টের চোখ পড়ল। তিনি আর পাঁচজনের চাইতে বেশী সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তা'দের তুলনায় ছিলেন ঢের বেশী জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশী, চলতেন বেশী, হাসতেন বেশী। তা'র উপর তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতেন, কোনরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁ'র সচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষজাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁ'র কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তা'দের নয়ন মন তাঁ'র প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'ত।

দু'চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগ্‌রা দেখলেই ভয়ে, সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হয়ে পড়তেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এঁদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হ'ল, সে শুধু মেয়েটির গুণে।

নভেলিস্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালবাসায় পরিণত হ'ল।

নভেলিষ্টের বুক এতদিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁ'র পরিচয় হ'ল, তিনিই অবলীলাক্রমে তা'-অধিকার ক'রে নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাক্‌ল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটি মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা ক'রে সে কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এই স্ত্রীহৃদয়ের বিশেষজ্ঞ এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারলেন না। শেষটা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি একদিন বিষণ্ণভাবে নভেলিষ্টকে বল্‌লে যে, সে দেশে ফিরে যাবে—টাকার অভাবে। আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয় তা'কে গিয়ে school mistress হ'তে হবে—পেটের দায়ে। তা'র সকল উচ্চ আশার সমাধি হ'বে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে, আর সকল আর্টিষ্টিক শক্তি সার্থক হ'বে মুদিবাকালির মেয়েদের grammar শেখানতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিষ্টের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। দু'দিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে ইংলণ্ডে চ'লে গেল। কিছুদিন পরে সে ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। তা'তে সে তা'র স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্তি ক'রে লিখেছিল যে, সে চিঠি পড়ে' নভেলিষ্ট মনে মনে স্বীকার করলেন মেয়েটি ইচ্ছে করলে খুব ভাল লেখক হ'তে পারে। নভেলিষ্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি ব'সে ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর এল না। এদিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা ক'রে ক'রে ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটা একদিন সে মনস্থির করলে

যে, যা' থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে। সেইদিনই সে প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চ'লে গেল। তা'র পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গাড়ী থেকে নেমেই সে দেখলে যে মেয়েটি পোস্ট-আফিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি এখানে?"

"তোমাকে একটি কথা বল্‌তে এসেছি।"

"কি কথা?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"সে ত অনেকদিন থেকেই জানি। আর কোনও কথা আছে?"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"এ কথা আগে বল্‌লে না কেন?"

"এ প্রশ্ন করছ কেন?"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কার সঙ্গে?"

"এখানকার একটি উকীলের সঙ্গে।"

এ কথা শুনে নভেলিষ্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

—বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল?

—অবশ্য! এর পরও গল্প আর কি ক'রে টেনে বাড়ানো যেত?

—অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে করলেই বল্‌তে পারতেন যে, ভদ্রলোক প্রথমতঃ থতমত খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' ব'লে চীৎকার করতে করতে মেয়েটির পিছনে ছুটতে লাগলেন, আর সেও

খিল খিল ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে লাগল। রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। তা'রপর এসে জুটল সেই solicitor স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তারপর যবনিকাপতন।

—তাহ'লে ও ট্রাজেডি ত কমেডি হয়ে উঠত।

—তা'তে ক্ষতি কি? জীবনের যত ট্রাজেড়ি তোমাদের গল্পলেখক-দের হাতে পড়ে' সবই ত comic হ'য়ে ওঠে। যে তা' বোঝে না, সে-ই তা' প'ড়ে কাঁদে; আর যে বোঝে, তা'র কান্না পায়।

—রসিকতা রাখো। এ ইংরেজী গল্প কি বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়?

—এরকম ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে অবশ্য ঘটে না।

—বিলেতী জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়—তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে?

—এ গল্পের আসল ঘটনা যা', তা' সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।

—আসল ঘটনাটি কি?

—ভালবাস্‌ব, কিন্তু বিয়ে কর্‌ব না, সাহসের অভাবে—এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।

—বিয়ে ও ভালবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনও দেখেছ? না শুনেছ?

—শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই, দেখেছি দেদার।

—আমি কখনও দেখিনি, তাই তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তুমি গল্পলেখক হয়ে এ সত্য কখনও দেখনি, কল্পনার চোখেও নয়?

—না।

—তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে।

—খুব সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে ?

—এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যা'রা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

—আমি ভেবেছিলুম তুমি বল্‌তে চাচ্ছ যে—

—তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালবাসার অমিল এ দেশেও যে হয়, সে কথা ত এখন স্বীকার করছ ?

—যাক্ ও সব কথা। ও গল্প যে বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা ত মানো ?

—মোটেই না। টাকা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিষ একই থাকে, শুধু তা'র ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদ্‌লে নিতে জানে, তা'র হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাঙ্গলা হ'বে। ভাল কথা, তোমার ঐ ইংরেজী গল্পটার নাম কি ?

—The man who understood woman.

—এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙ্গালী হ'তে পারবে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ the man who understood woman.

—এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর্ বকর্ ক'রে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ ?

—একাধারে ও দুই-ই।

—আর তা' পড়বে কে, পড়ে' খুসীই বা হবে কে ?

—তা'রা, যা'রা জীবনের মর্ম্ম বই প'ড়ে শেখে না, দায়ে পড়ে শেখে—অর্থাৎ মেয়েরা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

যজ্ঞফল।

—ও যে অট্টহাসি! ও কি মা-ই হেসে উঠ্‌লেন বাবা?

—হাঁ, বাবা। ও তিনি-ই।

—তারপর……

—তারপর সকল চিকিৎসা যখন শেষ হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হলুম।

—গুরুদেব! তা' তিনিও এসে খুব ঘটা করে'ই শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলেন নিশ্চয়!

—না বাবা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তিনি সত্যসত্যই মহাপুরুষ। তাঁর পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন; শ্মশানেই থাকতেন। এঁরা অবশ্য গৃহী, কিন্তু গুরুদেবের নিজের মুখেই শুনেছি গৃহী হ'তে পেরেছেন শুধু বৈরাগ্যে আর ভোগে তাঁর ভেদজ্ঞান দূর হয়েছিল ব'লে।

—এ সব কথা আমি ভালো বুঝি নে। তারপর বলুন শুনি…

—তিনি এসে যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের পর আমাকে ডেকে হেসে বল্‌লেন—"কালিকাপ্রসাদ, প্রত্যাদেশ পেলুম এই বছরেই পুত্রমুখ দর্শন করবে।" হৈম পাশের ঘরেই ছিল, এক মুঠো মোহর নিয়ে ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলে। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করলেন "সুপুত্রবতী হও।"

—তারপরেই বুঝি আমি হলুম…

—না, অত সহজে তুমি আমাদের দয়া করনি বাবা। গুরুদেব বল্‌তেন—“সুপুত্র কত আরাধনার ধন!” হৈম কি তোমার জন্য কম তপস্যা করেচে!

—তপস্যা?

—হাঁ বাবা, তপস্যা। গুরুদেব বল্‌লেন—“শুধু ছেলে হ’লেই তো হবে না, ছেলের মত ছেলে হওয়া চাই; নইলে এত বড় জমিদারী—একটা রাজ্য—এটা তো চালিয়ে যেতে হবে।”

—বটে! আমি যে অন্নের গ্রাসটিও মুখের ভিতর ঠিকমত চালনা করতে শিখি নি—সেও যে মাসিমারই কাজ ছিল বাবা।

—হবে, বয়স হ’লে সব হবে। বি-এ পাস দিলেই কি বয়স হ’ল বাবা?

—যাক্, তারপর?

—তারপর তিনি আমাকে একদিন বল্‌লেন—“কালিকাপ্রসাদ, হৈমীর মধ্যে মা যশোদার বিভূতি দেখতে পাচ্ছি।” এই ব’লে হ্লাদিনী, কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধার পদ্ম, ষট্‌চক্র…কি সব বল্‌লেন আমরা তো অত শত ধরতে পারিনে বাবা। শেষে বল্‌লেন—“সেই শক্তি ওতে সুপ্ত রয়েছে, তা’কে জাগ্রত করতে হবে।” বল্‌লেন—“যোগনিদ্রা তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আজকালকার hypnotic suggestion হয়ত বুঝতে পারবে…

—হাঁ, ওটা বুঝি বটে।

—তারপর হৈমকে নিয়ে তাঁর কি সাধনা! দুপুর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁদের…

—বাবা! ঐ···আবার! এবার চীৎকার করে’ কাঁদ্ছেন! মা, না? নিশ্চয়···

—হাঁ বাবা, তিনিই। ওতে ভয় পেয়ো না তুমি—

—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন না বাবা···

—ওটা একটু থামুক। সে-ই এ ঘরে আসবে নিশ্চয়।

—আমাকে তো চিন্‌তে পারবেন না! কি হবে?

—আমি চিনিয়ে দেব।

—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই কি চিন্‌তে পারবেন?

—বোধ হয় না। তবু চেষ্টা করে’ দেখ্‌ব। তুমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘট্‌ল। রাতদিন বিভীষিকা দেখ্‌ত—ঐ গুরুদেবকেই। গুরুদেবকে চিঠি লিখলুম, তিনি উত্তরে লিখলেন—"ভগবানের ভার সহ্য করতে পারছে না।"

—গুরুদেবকে নিয়ে এলেন না কেন?

—তার আর সুযোগ পেলুম কই বাবা? সন্ধান করে’ জানলুম তাঁর ডাক এসেছিল, তিনি হিমালয়ে চলে’ গেছেন।

—তারপর?

—তারপর উন্মত্ততা ক্রমে চরমে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ বিভীষিকা দেখতে দেখতে একদিন তোমাকে গলা টিপেই মেরে ফেলে আর কি!

—বেঁচে যেতুম বাবা তবে!

—ছিঃ বাবা! অক্ষয় অমর হও তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা তুমি, তোমার মুখের দিকে চেয়েই এখনো আমি সংসারে রয়েছি···কাছে এস বাবা, না আরো কাছে এস! যখন দেখলুম

প্রসূতির ঐ অবস্থা, আমি অগত্যা তোমাকে তোমার মাসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিলুম।

—হাঁ বাবা, আমার সেই বন্ধ্যা মাসিমা যাগযজ্ঞ না করে'ও আমাকে পেয়ে পুত্রবতী হবার আনন্দ পেয়েছেন! তারপর…

—তারপর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলুম। তুমিও চোখের আড়াল হ'লে—সেও ভালোমানুষটি হয়ে গেল! কে বল্‌বে যে সে মা হয়েছিল, পাগল হয়েছিল! যেন কিছুই হয়নি। সে যেন আমাদের সেই নববধূ হৈম—মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে যেন আমরা সবাই একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম—তার বেশী আর কিছু নয়। ডাক্তাররা দেখে বল্‌লে—'বেশ হয়েছে। ছেলের কথা আর মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই—হিতে বিপরীত হবে।' সেই থেকে তুমি তোমার মাসিমার ওখানেই মানুষ হয়েছ, আমিও চুরি করে' চুপি চুপি তোমাকে দেখে এসেছি। তুমিও এতদিন জেনে এসেছ ঐ মাসিমা-ই তোমার মা…যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল সে মরে' গেছে।

—বাবা, তবে আজ আমাকে এখানে আনা আপনার উচিত হয়নি, আমি মাসিমার ওখানেই ফিরে যাই।

—না বাবা, সে তোমাকে দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে…

—তবে তিনি শুনেছেন?

—শুনেছেন।

—কে শোনা'ল? কেন শোনা'ল?

—সেই কথাই বল্‌ছি। গত মঙ্গলবারেও বেশ শান্ত ছিল, রাত্রে বেশ ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠ্‌ল। আমার হাত দু'খানি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের উপর রেখে সহজ সরল ভাবে আমায় বল্লে

'সব সময় তুমি মুখখানি ভার ক'রে থাক কেন?' আমি একটু হাস্‌লুম, হাস্‌তে চেষ্টা করলুম। সে আমার হাত দু'খানি নিয়ে খেলা করতে করতে বল্লে, 'তোমার ছেলে হ'ল না' ব'লে—না?' আমি কোন কথা কইলুম না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সারাটি রাত ঘুমলো না। পরদিন সকালবেলা উঠে গড় হ'য়ে আমায় প্রণাম করে' নিজে জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিয়ে বল্লে 'আজ আমার এ সাধে বাদ সেধো না'—এই বলে' চুলের বেণী খুলে আমার পা দু'খানি মুছে দিলে। মনে পড়ল গুরুদেবই এ প্রথাটির প্রচলন করেছিলেন; তিনি বল্‌তেন 'ভক্তিমতী নারীর এই সেবাটুকু বড় মধুর।'

—তারপর...তারপর...

—তারপর উঠে আমায় পালঙ্কে বসিয়ে, সম্মুখে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে' বল্লে 'একটি পুষ্যিপুত্র নিলে হয় না?'—মূর্খ আমি...মূঢ় আমি! তখন আমি না ব'লে থাকতে পারলুম না তোমার কথা। যাগযজ্ঞ আর গুরুদেবের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে' বল্‌লুম 'তোমার ছেলে হয়েছিল হৈম...কিন্তু, সে হবার পরেই তোমার খুব অসুখ হয়, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না; ছেলের অযত্ন হবে জেনে তা'কে তা'র মাসিমার হাতে সঁপে দিয়েছি, তোমার সোনার চাঁদ ছেলে সেইখানেই মানুষ হচ্ছে'। শুনে সে যেন নেচে উঠ্‌ল! আনন্দে বিস্ময়ে সে অপরূপ হয়ে উঠ্‌ল! আর তখনি জিদ্ ধর্‌ল তোমাকে তার কোলে এনে দিতে হবে। আমিও স্বীকার হলুম। তার পর থেকেই নিজের হাতে তোমার জন্য ঘর সাজিয়েছে, খাবার তৈরী করেছে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-আলো-করা বৌ আনবে বলে'

ঘটক ডেকে পাঠিয়েছে, —কি যে করেছে আর কি যে না করেছে সে বল্‌বার নয়। আমি তোমাকে আনবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে' সব কথা বল্‌লুম; তিনিও বল্‌লেন 'না, আর ভয় নেই। আপনি সচ্ছন্দে ছেলে নিয়ে আসুন।' কিন্তু···

—কিন্তু?···

—কিন্তু পুরোহিতমহাশয় পঞ্জিকা দেখে বলে' পাঠালেন এ দু'দিন বড় খারাপ দিন, পুত্রমুখ দেখাবার পক্ষে বড়ই অশুভ। আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিলম্ব দেখে সে আবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে একদণ্ডও অপেক্ষা করবে না। আবার সেই পূর্ব্বের মত ক্ষেপে উঠেছে, কখনো কাঁদ্‌ছে, কখনো হাসছে, যা'কে দেখছে তারই হাত পা জড়িয়ে ধরে' বল্‌ছে 'আমার ছেলে এনে দাও···এখনি না এনে দিলে আমি বিষ খাবো···'

—বাবা, আপনার পঞ্জিকা রেখে দিন, আমি তাঁর কাছে এই চল্‌লুম···

—হাঁ বাবা, যাবে বৈ কি, শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে বোধহয়। র'সো, আমি ঘড়ি দেখচি···বাঃ, শুভ যোগের যে চার মিনিট পার-ই হয়ে গেছে দেখচি···যাও বাবা, এসো···

—আপনি···

—না বাবা, আমি ঠিক এ সময়টায় যেতে চাইনে···আমার কান্না পাচ্ছে···এসো বাবা, এসো···

রামচরণ, আরে রামচরণ! গেলি কোথা?

—এই এসেছি, আজ্ঞে···

—যে বাবুটি এই ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে গেল, দেখ্‌লি?

—আজ্ঞে…

—ও তোদের ছোটকর্ত্তা, আমারি ছেলে। সে সব শুনিস্ এখন। পথে আসতে নদীর ধারে হাঁস চরতে দেখে বাবা আমার শিকারের জন্য মেতে উঠেছিল। আমার বন্দুকটা আনবার জন্য কেব্‌লাকে কখন্ বলেচি, এখনো তো সে এল না…

—আজ্ঞে, সে বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমিও তো বন্দুকই খুঁজ্‌ছিলাম…

—এই যে কেব্‌লা…বন্দুক পেলি ?

—আজ্ঞে, বন্দুক মা'র হাতে…

—সে কি !

—হাঁ কর্ত্তা…

[পাশের ঘরে গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্]

—ওকি ! ওকি ! তবে কি আত্মহত্যা কর্‌ল ?

—না…না…না…হাঃ হাঃ হাঃ।…আত্মহত্যা করিনি…গুরুহত্যা…

—আমার ছেলে ? আমার ছেলে ?

—কে তোমার ছেলে ? হাঃ হাঃ হাঃ !…তোমার আবার ছেলে… গুরুদেব, গুরুদেব…অবিকল গুরুদেব !…সেই চোখ…সেই মুখ… সেই স্বর…হাঃ হাঃ হাঃ !—

শ্রীমন্মথ রায়।

বিজয়া দশমী

ভাউলে যাত্রা। *

—:০:—

বিজয়া দশমী আইল যেদিন,
লইয়া 'বিজয়া' ঘটি দুই তিন,
জগাই, বলাই, গউর বাউলে
চড়ায় নাবিয়া চড়িল ভাউলে ॥

তলে বিছাইয়া কাঁথা দুপুরু,
বাউলে করিল গাওনা সুরু ॥

গান।

আগে বল কোন্ রতনটি চাও,
তবে বাটোয়া খুলে করি-ঈ ভাও।
আগে বল কোন্ রতনটি চাও ॥ ধ্রু

---

* বিজয়া দশমী বছরের মধ্যে একদিন মাত্র; সেদিন বঙ্গবাসীদের মধ্যে টাকাকড়ির লেন-দেন নিতান্তই বেসুরা এবং বেতালা; তাহার পরিবর্ত্তে কোলাকুলি, বন্ধুগণের মধ্যে প্রণয়সম্ভাষণ, পানমশলা বিতরণ, গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, বিনা পয়সায় পরস্পরের হিতসাধন, সুন্দর শোভা পায়। এইরূপ বিবেচনায় বাউলের গানে জ্ঞানে প্রেমে কোলাকুলি ঘটিয়ে, আর তাহার কিছু পরে ভাউলের মাঝিকে জোয়ুসে বিনা পয়সায় পরোপকার করিয়ে নিয়ে কথঞ্চিৎ প্রকারে বিজয়ার দিনের মান বজায় রাখা হইল।

আছে এক অমূল্য হীর,
ভয়ে পিছোয় জঁহরীরা,
বলে বার বার এর খরিদার,
পাবে না হেথা কোথাও।

["বাপ্‌রে!" বলে বলাই শিহরি,
ও অজান রতন! হরি হরি হরি!]
আর আছে এক বাঁধন শিকলি,
ফণী শিরে মণি, চমকে বিজলি,
"সোনার এ ফণী লক্ষ্মী আপনি,
বলিবে—যাকে শুধাও।"
বল ওগো কোন্ রতনটি চাও ॥ ধ্রু ॥

[জগাই বলিল "প্রেম দড়ি এ
বলাইয়ের গলে দাও জড়িয়ে।"]

হাওয়া উঠিতেই উঠিল ঢেউ,
"হালে যে নৌকা" বলিল কেউ,
বলাইয়ের কানে গেল তা' যেই,
বলিল সে, "নায়ে চড়িতে নেই!"

জগাই বলিল "তরা মা তারা!
ভয় নাই—নাও যাবে না মারা।"
হাসি বলে মাঝি, "দ্যাখ নি তো কেউ
বৈশাখী ঝড়ে মেঘনার ঢেউ!"

বাউলে গউর একতারা থুয়ে,
বোচ্‌কা বালিসে ভর দিয়ে শুয়ে,
"পার কর হরি" ধরিল ধুও,
পোষ নাহি মানে ঢেউ তবুও ॥

সাজিয়া ছিলিম টানি দুটান,
তবে বাউলিয়া লভে পরাণ,
জিউ খুলি গেল তৃতীয় টানে,
মাতি গেল পুন ভাবের গানে ॥

দ্বিতীয় গান।

গোলে মালে মিশায়্যে আছে,
ও তার গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে ॥
শুনেছি বৈষ্ণবের করণ,
বালির সঙ্গে চিনির মিলন,
ও তা জানে দু' একজন।
ও তা মত্ত হস্তী টের পেল না
চেঁউটি* মরম জেনেছে।
গোলেমালে মিশায়্যে আছে ॥ ধ্রু ॥

[কি বল্‌ছে ওই মত্ত হাতীটা,
শুক্‌নো ডাল ওর জিভে লাগে মিঠা,
খুদে পিঁপ্‌ড়ে যে বলাই চাঁদ,
বোঝে ভাল তাই চিনির স্বাদ ॥]

* চেঁউটি কি না খুদে পিঁপ্‌ড়ে।

দু' মটি 'বিজয়া' আনিয়া তবে,
বলাইকে বলে জগাই "হবে এ এ !"
বলাই বলিল—ভ্যালা মোর দাদা,
তুমি লও আধা, মোরে দাও আধা ॥

দু' স্যাঙাতে পিয়া দু' ঘটি ভাঙ,
ঢুলু ঢুলু আঁখে পেরল গাঙ।
সট্‌কিয়া পড়িল জগাই বেমালুম,
দেখিয়া মাঝির হল আক্কেল গুড়ুম্‌ ॥

বাউলে গউর বলিয়া "হরি" !
ঝুঁটি বাঁধি, আল্‌খাল্লা পরি,
পালাবে যেমন পথিক সাজি—
"কোথা যাও" ! বলি রুখিল মাঝি।

বাউল বলিল "মোরে না ছুঁস্‌,
পারুণী দেবেন ওই মানুষ;
তুমি ভাই বলাই কর বিহিত,
লাখ টাকার আমি দিয়েছি গীত।"

এতেক বলিয়া চলিল হাঁটি,
বলাইকে মাঝি ধরিল আঁটি।
বলাই বলিল "আমার কাছে,
টাকাটুকি নাই, মশলা আছে ॥

গোটা গোটা গুয়া আছে দু'কুড়ি,
এলাচি লবঙ্গ আছে দু' ঝুড়ি।
জোয়ান মৌরি আছয়ে ঢের,
আছে সুগন্ধি কেয়া খয়ের ॥"

ঈষৎ হাসিয়া বলিল মাঝি—
"মিছা কেন করছ দম্‌বাজি!
টাকা চারি পাঁচ ফেলিয়া দ্যাও";
বলাই বলিল "দিচ্ছি ন্যাও।"

একটিও কথা না বলি দোসরা,
ভাউলের পিঠে সাজায়ে পসরা,
মশলা গছায় বলাই বেনে,
মাঝি হয় রাজি হাইর মেনে ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সনেট।

——[ঃ•ঃ]——

ভেবেছিনু যবে মোর বিরহ-নিশায়
মুছে যাবে স্বপ্নে-রচা মূর্ত্তিখানি তব—
কেমনে ছায়াটী তার হৃদে আঁকি লব
শুষ্ক-স্মৃতি মিলনের স্তিমিত শিখায়!
বিস্মৃতি ঢাকিবে সবি কুহেলি উনায়—
মরণে জীবনখানি রচি' দিবে নব,
নহে ত পরশ-ভীত বহুদূরে রব,
সংসার-সীমানা পারে, অরণ্যের ছায়।

প্রেম তো সুদূরে আজ কারে যায় যাচি'—
তুমি নাই, প্রেম নাই—তবু বেঁচে আছি।

তবু বাজিতেছে মোর কণ্ঠে অভিনব
কত না সুরের খেলা; কত রূপরস
জুড়িয়া রয়েছে হিয়া; অজানা বিভব
আমারে রেখেছে করি' নবীন সরস।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

ভক্তির ভারে।

বন্ধু

বহুকালপরে এসেছি দুয়ারে পরম ভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী, আর নাকে কানে দিই খৎ।
ফোঁটা মালা শিখা, ত্রিপুণ্ড্র রেখা, মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর কুল, কুশকাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য।
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,—
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু, হ'য়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুরমাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধ'রে সাধি শীতলার 'গাধী', বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
প্রাণপণে অবিরাম
জপি হনুমান, মুস্কিলাসান, শিব, শনি, কালী, রাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস ক'রে যে মূঢ় করিল কুমীরের সাথে বাদ।
তোমার উপরে সিধে সত্যেরে গর্ব্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল ভাই।
সৃষ্টির এই ঝুনা-নারিকেল যে জনা দেখিল নাড়ি,
হাটের মাঝারে স্পর্দ্ধা করিয়া যে জন ভাঙিল হাঁড়ি,
তোমার বিধান অঙ্কুশ পরে হানি ঘন অঙ্কুশ,
মত্ত হস্তীসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।

আজি দুর্ব্বল অক্ষম আমি, ভয় সংশয়যুত ;
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু ? হ'ল কি মনঃপূত ?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের পরে হানিছ রুদ্ররোষ,
ঘাড়ে ধ'রে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ।

নব নব তব অত্যাচারের মানিনিক বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তরে তাই ক'রেছ অন্তরীণ।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত মুখে,
ভুলও দেয়না সান্ত্বনাকণা থ্যাৎলানো এই বুকে।
নিবাইলে সব আলো,—
নির্জ্জন পুরী, অন্তর ভরি কল্লোলি আসে কালো।
শ্মশানের খাটে বাঁধা, কাটে চির-অনিদ্র আঁধা রাত,
আচম্‌কা পিঠে সুড়্‌সুড়ি দেয় মৃত্যুর হিম হাত !
মনে মনে যদি দৃঢ় ক'রে বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য,
বেজে ওঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ, বক্ষে বলির বাদ্য।
আঁধারের স্রোতে ফেণার মতন থেকে থেকে আসে ভাসি,
বিদ্রূপভরা সুহৃদ্‌কণ্ঠে ও-পারের কালো হাসি !

তবু মাঝে মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্ত্তা—অনিদ্রাম্রিয়মাণ !
চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে,
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।

প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ—যে জন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি করপুট,
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি—ঘোড়া পিটাইয়া উঁট!

আমি তাই হ'তে চাই
তব নিদারুণ প্রেমিক,—বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে—তোমার চরণ-তক্র।
ভক্ত হবার সকলরকম সাধিতেছি কস্‌রৎ,
দোহাই বন্ধু! আঘাতের ফাঁকে দিও কিছু ফুর্‌সৎ।
অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্ব্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ!
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,—
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

তরুণ পত্র।

——:০:——

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একখানি নবজাত মাসিকপত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এ পত্রের নাম তরুণ পত্র, ধাম ঢাকা। আমরা অবশ্য তরুণ পত্রমাত্রেরই পক্ষপাতী। কারণ ঐ নামের গুণেই আমরা আশা করি যে সে পত্র তরুণ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা আমাদের সব সময়ে পূর্ণ হয় না। এর জন্য দোষী প্রবীণদের করা যায় না। নিত্য দেখতে পাই তাঁরা আবার কেঁচে নবীন হবার জন্য কত মণি মন্ত্র ঔষধের শরণাপন্ন হচ্চেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, প্রবীণদের নবীন কলেবর ধারণ করবার লোভ যদি অনিবার্য্য না হত, তাহলে এদেশে কবিরাজী ও ইউনানীনামা চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকত না। যদি এ দুই শাস্ত্রের শাস্ত্রীদের সত্য সত্যই প্রকৃতির উল্টোটান টানবার বিদ্যে জানা থাকৃত, আর সে বিদ্যা তাঁরা খোলাহাতে দেশের লোকের উপর প্রয়োগ করতেন, তাহলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াত একবার ভেবে দেখত! দেশের সব লোক হয়ে উঠত দেহে যুবক ও মনে বৃদ্ধ। কারণ মনের যৌবন ফিরে পাবার দিকে কোনও প্রবীণেরই লোভ নেই, যদিচ এই মানসিক জরা দূর করবার শত উপায় আছে। আমার অনেক সময় মনে হয় যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণের দল দেহে তরুণ মনে বৃদ্ধ, ভাষান্তরে বয়েসে যুবক জ্ঞানে বৃদ্ধ। জরা ও যৌবনের আসল পার্থক্য কর্ম্মশক্তির পার্থক্য—চিন্তাশক্তিও

কর্ম্মশক্তি। আর ঐ হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল কর্ম্মশক্তি। আজ পৃথিবীর কর্ম্মজগৎ জুড়ে কল ঘুরছে, রেল ছুটছে, বিমান উড়ছে। জড় পদার্থকে এমন করে ঘোরাচ্ছে, ছোটাচ্ছে, ওড়াচ্ছে কোন্ শক্তি—বাহুবল না মনোবল ?—যে চিন্তার ধার ধারে না, সুধু সেই বলবে বাহুবল। জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করবার শক্তি লাভ করব আমরা চিন্তার কাছ থেকে।

শুনে মহা সুখী হলুম যে, এই সত্য প্রচার করবার জন্য তরুণ পত্র বদ্ধপরিকর হয়েছে। তরুণ পত্রের উদ্দেশ্য কি ?—এর উত্তরে তরুণের দল বলেছেন যে, "তরুণ পত্র চায় অন্নচিন্তার মধ্যে অন্য চিন্তাকে বড় করে তুলতে, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও চিন্তা করবার জন্য তরুণের বুকে একটা ক্ষুধা জন্মাতে, একটা প্রেরণা জাগাতে।" আশা করি এ সাধু সংকল্প তাঁরা কার্য্যে পরিণত করতে পারবেন। নিজের মনে চিন্তার আগুন জ্বালাবার মহা গুণ এই যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধর্ম্মই হচ্ছে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়া, আর যার মনে তা' গিয়ে পড়ে, তার মনের প্রদীপ তখনই জ্বলে ওঠে।

আমাদের সমাজে চিন্তার আগুনে জল ঢেলে দেবার দেদার লোক আছে। তাঁদের ভয় দেশে ও আগুন একবার জ্বলে উঠলে তাঁদের ভদ্রাসন সব জ্বলে যাবে। এ ভয়কে ভয় করলে মনের দুয়োরকে খুলেই আবার বন্ধ করতে হয়। যখন শুনব যে বাঙলার তরুণের দল সমস্বরে বলছেন 'খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কবাট'—তখনই বুঝব আমরা স্বয়ংমুক্ত হবার জন্য যথার্থ প্রস্তুত হয়েছি।

তরুণ পত্র পড়ে' আমি সুধু সুখী হই নি, সেই সঙ্গে বিস্মিতও হয়েছি। যেহেতু এ পত্র হচ্ছে বাঙলার মুস্‌লিম তরুণের পত্র।

আমরা হিন্দুই হই মুসলমানই হই, সবাই অতীতের পাঁকে পড়ে' আছি। তবে আমরা হিন্দুরা আচারের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও, আমাদের মাথাটা জেগে আছে। ফলে আমরা আচারে জড় হলেও বিচারে দড়। আমাদের মনোভাবের উপর সমাজ হস্তক্ষেপ করে না, যদি না সে মনোভাব অনুসারে কাজ করতে চাই। এই ধরুন না, 'অস্পৃশ্যতা দূর করো' বলে গগনভেদী চীৎকার করলে আমরা স্বজাতির কাছ থেকে কত না বাহবা পাই; কিন্তু অস্পৃশ্যদের যদি অন্নস্পর্শ করি, তখনই আমরা স্বজাতির সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হই। মুসলমান-সমাজে আচারের এত অত্যাচার নেই। কিন্তু আমার ধারণা যে সে সমাজ বিচারের পক্ষপাতী নয়, যদি না সে বিচার অতীতের চৌহদ্দির ভিতর কসরৎ করে। চিন্তাশক্তিকে বাড়াবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিচার। সুতরাং তরুণ পত্রের এই অধ্যবসায় দেখে আশায় আমার বুক ভরে' উঠেছে। হিন্দুমুসলমানের মৈত্রীর সম্বন্ধে পলিটিসিয়ানরা অনেক ভাল ভাল উপমা দিয়েছেন, কিন্তু তা'তে বড় ফল ফলে নি। "হিন্দু ও মুসলমান, ভারতমাতার দুটি চোখ"— এ ত একটা classical উপমা। এ উপমার ফল কি হয়েছে? অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এর এক চোখ কানা করলে আর একটি চোখের তেজ বাড়বে; আর এমন পণ্ডিত দেশে ঢের আছে যারা চোখের মাথা খেয়ে এ কথা বিশ্বাসও করে। কিন্তু এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না যে, এর কোনটিরও দৃষ্টিশক্তি আছে কি না। এ দুটি চোখ যদি গেলাসের চোখ হয়, অর্থাৎ সেই জাতীয় চোখ যার উপর সব জিনিষই ভাসে, আর যার ভিতর কোন জিনিষই ডোবে না? মনের সঙ্গে যে-নয়নের সন্ধিবিচ্ছেদ হয়েছে, সে চোখ রক্ত

মাংসের হলেও কাঁচের। তার সঙ্গে আবার মনের যোগসাধন করতে পারলে তবেই আবার দৃষ্টি লাভ করবে। আর উভয় চক্ষুর তখন আবার সমদৃষ্টি ও একদৃষ্টি হবে।

মানুষের চোখ ফোটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চিন্তারাজ্যে নিয়ে যাওয়া। সে রাজ্যে জাতিভেদ নেই। বাঙলার তরুণের দল যে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিচারে এই রাজ্যে প্রবেশ করতে উন্মুখ হয়েছেন, এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?

তরুণ পত্র যদি নতুন করে ভাবতে পারে, তাহলে সে ভাব সে কথায় বলতে পারবে। তার সহজ সরল ভাষা পড়ে' আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছি। এই ভাষাই পরিচয় দেয় যে মুসলমান হিন্দুর কত কাছে এগিয়ে এসেছে—আর ঢাকা, কলকাতার। সবুজ পত্র তরুণ পত্রকে তাই ডেকে বলছে—"ভাই, হাত মিলানা!"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পূজোর ছবি।

—:o:—

পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙলার মাসিক পত্রের পূজার সংখ্যার প্রধান সম্বল হচ্ছে গল্প। আর এই বিশ্বাসের বলেই আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আত্মশক্তিতে বাঙলা লেখকদের পক্ষ থেকে গল্প সাহিত্য বয়কট করবার প্রস্তাব করি।

লোকে বলে সাহিত্যের ছুটি উদ্দেশ্য আছে। এক শিক্ষা দেওয়া, আর এক আনন্দ দেওয়া। আনন্দ দান করার চাইতে শিক্ষা দান করা যে ঢের উঁচুদরের ব্যবসা, তার প্রমাণ সমাজে গুরুমশায়ের আসন মোসাহেবের আসনের তুলনায় বহু উচ্চে। এখন দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশের লোককে শিক্ষা দেবার ভারটা পড়েছে ইংরাজী লেখকদের হাতে, আর আনন্দ দেবার ভারটা আমাদের মত বাঙলা লেখকদের হাতে। ফলে ইংরাজি লেখকদের তুলনায় আমরা অতি হেয় হয়ে পড়েছি; যদিচ বাঙলা লেখকমাত্রেই লেখক,—অপর পক্ষে ইংরাজী লেখকদের মধ্যে বর্ত্তমানে এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কোনও লেখক নেই। অবশ্য বাঙালীর ভিতর অদ্বিতীয় ইংরাজী লেখক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ; কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করেছেন।

বাঙ্গালী ইংরাজী-লেখকদের অবশ্য কেউ ইংরাজী লেখা থেকে নিরস্ত করতে পারবেন না, যেমন কেউ মিশনরিদের বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না; যেহেতু এ উভয় দলই

আমাদের হিতের জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, উভয়েই মনে ঠিক দিয়ে বসে আছেন যে তাঁরা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। আর সবাই জানে পরোপকারের প্রবৃত্তি দমন করবার জন্য সভ্যসমাজে কোনও আইন নেই।

মনে মনে এই সব বিচার করে' আমি এই প্রস্তাব করি যে, "এস আমরা আনন্দ দান না করে শিক্ষা দান করতে আরম্ভ করি অর্থাৎ আর্টিকেল লিখি, তাহলেই ইংরাজী লেখকরা ইংরাজীতে গল্প ও কবিতা লিখতে বাধ্য হবেন, এবং ইংরাজী ভাষায় এমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করবেন, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"। অবশ্য তা হবে বিলেতি সুধা।

(২)

পূজার বাজারের সেরা মাল যে গল্প, এ ভুল সম্প্রতি আমার ভেঙ্গেছে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূজার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গল্প নয়—ছবি। ছবি—তা সে যত বড়ই হোক না কেন—এক নজরেই দেখা যায়; আর গল্প—তা সে যতই ছোট হোক্ না কেন—এক মিনিটে পড়া যায় না। তারপর গল্পের ভিতর থাকে বক্তৃতা, কিন্তু ছবির ভিতর আছে সুধু ব্যক্ততা। এই দুটি কারণেই কথার চাইতে ছবির রস ঢের বেশি অনায়াসলভ্য, অতএব লোভনীয়। আনন্দের কথা ছেড়ে দিলেও, ছবির শিক্ষাও ঢের বেশি মর্ম্মস্পর্শী। কারণ কথা হচ্ছে কর্ণগোচর, আর রূপ নেত্রগোচর। ইন্দ্রিয় হিসেবে নেত্র যে কর্ণের চাইতে শ্রেষ্ঠ, এ ত সর্ব্ববাদীসম্মত। লোকমত উপেক্ষা করলেও, দার্শনিকদের মতেও প্রত্যক্ষ করার চাইতে দর্শনের আর বড়

কথা নেই। ঐ হচ্ছে সাধনার চরম ফল। আর সাধনা মানে যে অশিক্ষা, এমন কথা অমরকোষে নেই।

বাঙালী যে কেবলমাত্র কলম না পিষে তুলিরও চর্চ্চা করছে, এ অতি সুখের কথা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা শ্রুতির যুগ কাটিয়ে দর্শনের যুগে এসে পৌঁচেছি।

এই সব পূজোর ছবির বিচার করতে আমি অপারগ। আলেখ্য ব্যাখানে কোনরূপ শিক্ষিত পটুত্ব আমার নেই। আর্ট ত আর ইকনমিক্স্ অথবা পলিটিক্স্ নয় যে অশিক্ষিত পটুত্বর উপর নির্ভর করে' এ বিদ্যায় বাচাল হওয়া যায়। কোন্ ছবির কোন্ রেখার গতি মুক্তচ্ছন্দ হতে গিয়ে ছন্দমুক্ত হয়েছে, শিল্পীর হাত কোথায় রঙের বেপর্দ্দায় পড়েছে, সে বিচার আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। আমার চোখে ধরা পড়ে সুধু বর্ণাশুদ্ধি। কিন্তু ছবিতে বানান ভুলের বেশি অবসর নেই। এ ক্ষেত্রে ষত্বণত্বের বালাই নেই; যা' গোল হয় সে সুধু হ্রস্বদীর্ঘ নিয়ে।

(৩)

আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আনন্দ দান করা। বাঙলার নব আর্টিষ্টরা যে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যদি তাঁরা সমাজের নয়নমন পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম না হতেন ত পূজোর কাগজ বাজারে এত কাট্‌ত না; আর কাগজ-ওয়ালামাত্রেই জানে যে কাগজ চলে ছবির টানে।

অপরপক্ষে যাঁরা আর্টকে "মিষ্টান্নমিতরে" বলে' অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করেন, অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞানমার্গের পথিক, তাঁদের কাছে

নিবেদন করি, এই নব-অভিব্যক্ত বঙ্গ-আর্ট থেকে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারি। যে-সকল সামাজিক ও ইকনমিক্ সমস্যা নিয়ে দেশের মহাপুরুষরা মাথা ঘামাচ্ছেন এবং তাদের মীমাংসার জন্য নানারূপ আন্দোলন ও আস্ফালন করছেন, সে সব বিষয়ে মুক্তি কোন্ পথে, তার প্রদর্শক হচ্ছেন এই সব আর্টিষ্ট। কাল যা' হবে, আজ তার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় আর্টিষ্টদের তুলির মারফৎ। সুতরাং এই সব ছবি দেখে আমরা কি জ্ঞান লাভ করি, তা নিম্নে বিবৃত করছি।

আমাদের এ যুগের একটা প্রকাণ্ড সামাজিক কর্ত্তব্য হচ্ছে female emancipation। এ বিষয়ে লেখায় ও বক্তৃতায় বহু গবেষণা, বহু আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু আমরা হাজার বকাবকির ফলেও অস্পৃশ্যতার মত পরদা দূর করতে পারিনি। পতিত জাতি যেমন অস্পৃশ্য ছিল তেমনি অস্পৃশ্য রয়ে গেছে, আর অসূর্য্যম্পশ্যারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। এ দুই সমস্যা যে আমাদের সব চাইতে বড় সমস্যা, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা চাই ডিমোক্রাসী। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার সাড়ে সাত আনাকে অস্পৃশ্য ও আট আনাকে অদৃশ্য করে রাখলে বাকী দু' পয়সা দিয়ে কংগ্রেস হতে পারে, কাউন্সিল হতে পারে; কিন্তু ও দু' পয়সায় ডিমোক্রাসী হয় না। এর হিসেব বুঝতে গণিতবিদ্যায় পারদর্শী হবার প্রয়োজন নেই, যোগ বিয়োগ জানলেই যথেষ্ট। এ অবস্থায় আমরা উভয়সঙ্কটের মীমাংসা করেছি এ দুই জাতের নূতন নামকরণ করে'। আমরা অস্পৃশ্যদের বলি দরিদ্র-নারায়ণ, আর অদৃশ্যদের বলি দেবী। এতে আমরা মনে করি যে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিই। কিন্তু দেবতাদের extern

আর দেবীদের intern করে' যে মনোভাবের পরিচয় দিই, তার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি নয়—অতিবুদ্ধি।

(৪)

এখন দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলার আর্টিস্টরা এ দু'য়ের মধ্যে একটি সমস্যার সরাসরি মীমাংসা তুলির দু' আঁচড়ে করে দিয়েছেন। ছবির রাজ্যে female emancipation একদম হয়ে গেছে। ও রাজ্যে পরদা বিলকুল নেই। আর্টের একটি মহা গুণ এই যে, আর্ট কোন বিষয়েই তর্ক করে না, সব বিষয়ই লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর্টের আদালতে রায় নেই—আছে শুধু ফয়সালা। আর সে ফয়সালা হয়েছে নারীদের Civil Jail থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে।

এ মুক্তি আর্টিষ্টরা এত চট্‌পট্‌ দিয়েছেন যে, অবরোধ-বাসিনীরা যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন, তিনি ঠিক তেমনি অবস্থায় লোক চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। কেউ আছেন দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে, কেউ বা শুয়ে। কেউ বা করছেন পূজো, কেউ বা গাচ্ছেন ভজন, কেউ বা তুলছেন ফুল, দেহলতা ও বাহুলতা আনমিত করে'; কেউ বা পুঁছ্‌ছেন চুল, দেহযষ্টি উত্তোলন ও বাহুযুগল ঊর্দ্ধে প্রসারণ করে'; কেউ বা পড়ছেন বই বুক দিয়ে, কেউ বা পোয়াচ্ছেন রোদ পিঠ দিয়ে। এঁদের প্রায় সকলেরই কুন্তল আকুল, অঞ্চল চঞ্চল।

মুক্তির ডাক সহসা অন্তঃপুরে এসে পড়াতে এঁরা নেপথ্যবিধানের অবসর পান নি। তাই আর্টিষ্টদের কৃপায় আমরা বঙ্গ-রমণীর রূপ ও দেহ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করেছি। অজ্ঞতার অন্ধকারই হচ্ছে

কল্পনার লীলাভূমি, সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো পড়লেই আমাদের সে দেশ থেকে কল্পনাকল্পিত ভয় ও ভরসা সব হুড়মুড় করে' পালিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাঙলার চিত্রকরদের তুলিকা হয়েছে আমাদের চোখের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা।

(৫)

এই নারীরাজ্যের রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত,—আমি কবি নই। আর যদিও হতুম, তাহলেও রমণীর দেহের উপর আমি হস্তক্ষেপ করতুম না। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আছোপান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা এ যুগের কাব্যে চলে না, চলে সুধু anthropology নামক বিজ্ঞানে। কারণ চোখের আর যতই গুণ থাক্, চোখের কম্পাস্ দিয়ে কোনও পদার্থের নির্ভুল মাপ-জোখ করা যায় না। এ কথা সেকালের কবিরাও জানতেন, তাই তাঁরা উপমার সাহায্য নিয়ে বর্ণনা করতেন। একালের কবিরা কিন্তু পটল, বেল, নারাঙ্গী, দাড়িম, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি ফলতরকারি উপমার খাতিরেও স্ত্রীদেহে অর্পণ করতে সাহসী হন না। ও সব অতি বাজারে, অতি সস্তা। নাসাবংশ করভোরু প্রভৃতি সনাতন উপমা এ-কালের কবিতায় কি পোরা যায়? মন্দ কবিরা যদি এ কাজ করতে প্রবৃত্ত হন, তাহলে স্ত্রীসমাজ উপমার বিরুদ্ধে আইন পাস করিয়ে নেবেন। মনে থাকে যেন, মেয়েরা ভোট পেয়েছে। তাই একালের কবিরা উপমা খোঁজেন সঙ্গীতরাজ্যে, উদ্ভিদ ও পশুজগতে নয়। আমার জনৈক কবিবন্ধু স্ত্রীজাতির চক্ষে দেখেন সুধু মীড় আর বক্ষে মূর্চ্ছনা। আমি তাঁর পদানুসরণ করে বলি যে, এই চিত্রসুন্দরীরা সব বাঙলা

"পটমঞ্জরী"। এখানে একটি কথা না বলে থাকতে পারছিনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তোমরা সবাই ভাল,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো।

এ কথা নিছক কবি-কল্পনা, এর ভিতর একবিন্দুও বস্তুতন্ত্রতা নেই। আর্টিষ্টরা যে সব মূর্ত্তি আমাদের দেখিয়েছেন, তার একটিও রূপো দিয়ে কি লোহা দিয়ে গড়া নয়, সবই হয় তামা নয় পিতল দিয়ে তৈরী। সবারই অঙ্গে ফ্রেঞ্চ পালিস, আর সে পালিসে কোথায়ও বা পিউড়ির ভাগ বেশি, কোথায়ও বা খুনখারাপির। বলা বাহুল্য যে ফ্রেঞ্চ পালিসের মূল ও স্থূল উপাদান হচ্ছে গালা, সুতরাং আর্টিষ্টদের হাত থেকে যে সব মূর্ত্তি বেরিয়েছে, তাদের গালার পুতুলও বলা যেতে পারে।

(৬)

থাক ও সব বাজে কথা। আমরা একালে কেউ সৌন্দর্য্য চাই নে, চাই সুধু স্বাস্থ্য; এ সত্য আমরা ধরে' ফেলেছি যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের বিরোধী। এর প্রমাণ সাহিত্য থেকেও দেওয়া যায়। যার বাণী যত সুন্দর, তার বাণী তত অস্বাস্থ্যকর—যথা কবির; আর যার বাণী যত কদাকার, তার বাণী তত স্বাস্থ্যকর—যথা বক্তার। খবরের কাগজের আর পলিটিকাল বক্তার সকল কথাই আমরা বিনা আপত্তিতে গলাধঃকরণ করি, কারণ আমরা জানি যে, ওষুধের ধর্ম্মই হচ্ছে একাধারে কটু ও তীব্র হওয়া। কে না জানে যে, বাঙলার মারাত্মক সমস্যা হয়েছে sanitation, ভাষান্তরে ম্যালেরিয়া দমন?

এই আর্টিষ্টদের প্রসাদে সানন্দে প্রত্যক্ষ করলুম যে, বাঙলার অন্তঃপুরে ম্যালেরিয়া নেই। এই চিত্রার্পিত রমণীদের একজনেরও পেটে পিলে যকৃত নেই, গায়ে কালাজ্বর নেই; এখানে ওখানে অবশ্য Scarlet fever-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—কিন্তু সে দেহে নয়, অধরে। বছর পাঁচ ছয় আগে বাঙালী আর্টিষ্টরা যে সব রমণীমূর্ত্তি প্রদর্শন করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ক্ষীণ ও পাণ্ডু, কারণ তাঁরা ছিলেন সব সংস্কৃত পটমঞ্জরী,—যথা শকুন্তলা, দময়ন্তী, উর্ব্বশী, মেনকা, ইত্যাদি। Aristocratic মহিলারা সকল যুগে সকল দেশেই সুকুমার হয়ে থাকে। কিন্তু হালের প্রদর্শিত বঙ্গরমণীদের সকলেরই democratic স্বাস্থ্য আছে। এ দেশে আমরা পুরুষরাই হচ্ছি সব জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন ভুগ্ন। এর কারণ আমরা ইংরেজী পড়েছি, তাঁরা খুব সম্ভবত বাঙলাও পড়েন নি। আর্টিষ্টরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের আবিষ্কৃত বঙ্গরমণীদের তুলনায় আমরা B. A. M. A.-র দল সব অবলা। ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

“মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া—
এখনো কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া”।

এখন বোঝা যাচ্ছে বাঙলা দেশে এত ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় কেন?

হায়! এই সব সুস্থ সবল নধর ও বেকার বীর-রমণীর দল একজোট হয়ে একমনে যদি চরকা কাটত, তাহলে ভারতবর্ষে আর বস্ত্র-সমস্যা থাকত না।

(৭)

আর্টিষ্টকল্পিত এই বঙ্গরমণীর দল এই গুরু[illegible] বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধে

অবশ্য মোটেই উদাসীন নন্। এ সমস্যার তাঁরা সমাধান করতে ব্রতী হয়েছেন অন্য উপায়ে—বসনের বস্তা বাড়িয়ে নয়, তার পরিমাণ কমিয়ে; ইকনমিক্‌সের ভাষায় বলতে হলে produotion বাড়িয়ে নয়, consumption কমিয়ে। এই অবলাজনোচিত পদ্ধতিই হচ্ছে এ দেশের সনাতন পদ্ধতি। East and West-এর বাণীর মূল পার্থক্য কোথায়?—West-এর মতে production বাড়ানোতেই পরম পুরুষার্থ, আর Eas'-এর মতে consumption কমানোতেই পরম পুরুষার্থ। যাক্, এ সব দর্শন বিজ্ঞানের বড় বড় কথা। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাঙলার আর্টের রাজ্যে কোন রমণী খদ্দর-মণ্ডিতা নন, সকলের পরণেই অনিলাম্বরী—ভাষায় যাকে বলে হাওয়া-কাপড়।

ভাল কথা, কাঁচের কি সূতা হয় না? আর সে সূতোয় কি শাড়ী বোনা যায় না? বস্তুগত্যা না হোক, আর্টের রাজ্যে তা হওয়া উচিত, কারণ ও রাজ্যে মোটা কাপড় চলে না।

তারপর বসনের আট আনা অংশ যে ফাল্‌তো, এ সত্যটা চিত্র রাজ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই চিত্র-সুন্দরীদের অঙ্গে অঞ্চল আর উত্তরীয় নেই—একদম উপবীত হয়ে উঠেছে। আর্টিস্টরা আদেশ করেছেন go back to nature, আর তাঁদের আদেশ অনুসারে সুশীলার দল simple life অবলম্বন করেছেন। Simple life-এর অর্থ অবশ্য বাহুল্যবর্জ্জন। অতীতে আমাদের যুবকের দল এই বাহুল্য বর্জ্জনের উদ্দেশে চাদরনিবারণী সভার সৃষ্টি করেন—এখন দেখা যাচ্ছে চিত্র-যুবতীর দল সব অঞ্চলনিবারণী সভার মেম্বর।

(৮)

এ স্থলে আর্টিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দিই, তাঁদের সুমুখে এক বিপদ আছে। তাঁরা নিরাবরণ প্রকৃতির দিকে আর একটু অগ্রসর হলেই নীতির সেপাইরা রুলহস্তে তাঁদের পথরোধ করবে। এ বিভীষিকা দেখে পশ্চাৎপদ হলে, তাঁরা নায়িকাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন না।

সুরুচি সুনীতির বিবাদ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের মতই সনাতন। এ বিবাদ ভঞ্জন করে' উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন কেউ করতে পারবে না—এমন কি League of Nations-ও নয়।

মনে পড়ছে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পর্ব্বতবাসিনী "জুমিয়া" রমণীদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "অর্দ্ধঅনাবৃত ওই চারু বক্ষঃস্থল"। ঐ শ্লোকার্দ্ধ নিয়ে সেকালের সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকেরা এত টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করেছিলেন যে, আমাদের মত লাষ্ট ক্লাসের ছেলেদেরও স্বাস্থ্যরক্ষকদের প্রসাদে ও ছত্রটি মুখস্থ হয়ে যায় এবং আজও তা আমাদের সমান মুখস্থ আছে—যদিচ নবীনচন্দ্রের কবিতার আর এক বর্ণও স্মরণ নেই। লেখনীর মুখের সেই আধো আধো কথা, তুলিকার মুখ দিয়ে এখন স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং আর্ট ও নীতির ভিতর আবার একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে।

এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ দেবার যোগ্যতা আমার নেই। সাহিত্যে আমি নীতিবীরও নই, আর্টিষ্টও নই। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভিতর মধ্যস্থতা করবারও আমার সাহস নেই। কারণ জানি যে, ওরূপ মধ্যস্থতা করতে গেলে, উভয় পক্ষের বাক্যবাণ একসঙ্গে আমার বুকে পিঠে পড়বে। তাতেও হয়ত রাজী হতুম, যদি জানতুম তাতে কোনও ফল আছে।

সুনীতি সুরুচির বিবাদ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের মত আবহমানকাল চলে আস্‌ছে আর যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চল্‌বে। ও বস্তু ঠাণ্ডা হবে সুধু প্রলয়পয়োধি জলে। এ যুদ্ধে অদ্যাবধি কোনপক্ষই পুরো জয়লাভ করে নি। কোথাও বা দিনকয়েকের জন্য জয়লাভ করেছে নীতি, কোথায়ও বা আবার আর্ট।

তুলি যে মাকু নয়, এ জ্ঞান যখন আর্টিষ্টদের হয়েছে, তখন আমি তাঁদের বলি—forward !

বীরবল।

গড্ডলিকা।

——[:০:]——

ইংরাজী ভাষায় passes in the crowd বলে' একটা বচন প্রচলিত আছে, এর অর্থ "ভিড়ের ভিতর চলে যায়।" আমরা অধিকাংশ লোকই ভিড়ে মিশে যাই। অনেকের নিজের এমন কোন চেহারা নেই, যা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ভিড়ের ভিতরেও এমন লোক কখনো কখনো দেখা যায়, যে আমাদের চোখে পড়ে, আর যাকে বার বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে যায়। যার বেশভূষা অসাধারণ কিম্বা অদ্ভুত, সে অবশ্য পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে যায় না—আমি সে লোকের কথা বলছিনে। আমি বলছি সেই লোকের কথা, যার বেশভূষা চালচলন হাবভাব সবই আর পাঁচজনের মত, অথচ সে যে পাঁচজনের একজন নয়, তা এক নজরেই ধরা যায়।

এ যুগে মানুষের মত বইয়ের ভিড়ও দেশময় বেড়ে গিয়েছে। ভগবান আমাদের প্রত্যেককেই রসনা দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন সেই ভগবদ্দত্ত রসনা চালনা করবার [illegible]দ্দত্ত অধিকার। লেখনী হচ্ছে রসনার প্রতিনিধি। তাই ছাপাকলের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমরা লেখনী চালাচ্ছি। ফলে বইয়েরও বেজায় ভিড় হয়েছে। এর ভিতর অধিকাংশ বই সম্বন্ধে বলা যায় যে, they pass in the crowd। কিন্তু এই বইয়ের ভিড়ের মধ্য থেকেই মাঝে মাঝে দু' একখানি এমন বই আমাদের চোখে পড়ে যাকে আমরা দেখবামাত্র a book বলে' চিনতে পারি। বলা বাহুল্য বাকী বেশির ভাগ exercise book।

এইরকম একখানি বাঙলা বই সম্প্রতি আমার চোখে পড়েছে। বইখানির নাম 'গড্ডলিকা', আর তার রচয়িতার নাম 'পরশুরাম'। যে বস্তু বিশেষ করে' আমাদের চোখে পড়ে, আর পাঁচজনের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য "বইখানি পড়ে' দেখ"—এই কথা বলাই যথেষ্ট। এ বই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে, আর তিনি আমাকে স্থধু ঐ ক'টি কথাই বলেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বইটি পড়ে' আমার কি মনে হয়, সে কথা লিখতে আদেশ করেছিলেন। তাই এ বই পড়ে' আমার কি মনে হয়েছে, সেই কথা সবুজপত্রের মারফৎ পাঠকসমাজের কাছে নিবেদন করছি। এ বইয়ের প্রধান গুণ এই যে, এখানি মনের আরামে পড়া যায়। আজকাল আমরা লেখকদের হাতে দিবারাত্র ধাক্কাধুক্কি খেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছি। আমরা পতিত জাত, তাই আমাদের ঠেলে তোলবার জন্য আমাদের গায়ে সকলেই হাত লাগান। আমরা দুর্ব্বল, আমরা রুগ্ন, তাই লেখকের দল আমাদের চিকিৎসা করবার জন্য সদাই ব্যস্ত। আর 'পরশুরামে'র ভাষায় বলতে হলে, তাঁরা আমাদের মাথায় "রোগন্ বব্বর" প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত। ও ওষুধ কি মহা বস্তু দিয়ে তৈরি, তা' 'গড্ডলিকা'র ভিতর প্রবেশ করলেই জানতে পাবেন। কিন্তু 'পরশুরাম' আমাদের চোখে পরিয়ে দেন নিরীহ "সুর্ম্মা সুর্খ্।" এতে আমাদের যে স্থধু "আঁখ ঠাণ্ডা" হয় তাই নয়, আমাদের চোখ ফোটেও, আর তার প্রসাদে আমরা দেখতে পাই নানারকম রঙীন ছবি। আর আমাদের এই সব রকমারি ছবি দেখানই 'পরশুরামে'র উদ্দেশ্য।

'গড্ডলিকা' আসলে একখানি ছবির বই। এর ভিতর একটিও

সুন্দরী নেই, তবুও এ দৃশ্য আমাদের নয়নের উৎসব। সুন্দরী যে নেই তার কারণ, 'গড্ডলিকা' Art Exh bition নয়—সিনেমা। 'গড্ডলিকা'র ভিতর যাদের সাক্ষাৎ পাই, তারা সব আমাদের চেনা লোক। চেনা লোক বলছি এই জন্য যে, যাকেই দেখি তাকেই "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" তার কারণ এই সব লোককে আমরা আইন-আদালতে, ডাক্তারখানায়, সেয়ারের বাজারে, পথে ঘাটে নিত্য দেখ্‌তে পাই। সেই চেহারা, সেই বেশ, সেই ভঙ্গী। এঁরা অবশ্য কেউ সত্য সুন্দর শিব প্রভৃতি বড় বড় জিনিষের ধার ধারেন না, তবুও এঁদের সাক্ষাৎ লাভ করে' আমাদের মেজাজ খুস্ হয়।

'পরশুরামে'র ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার। তিনি দুটি চারটি টানে এক একটি লোককে চোখের সুমুখে খাড়া করে' দেন। তাঁর ছবিতে রেখা ও বর্ণের বাহুল্য নেই। তার কারণ তাঁর হাতের প্রতি রেখাটি পরিস্ফুট, প্রতি বর্ণটি যথোচিত। এই সেহাই-কলমের কাজ কিসে উজ্জ্বল হয়েছে জানেন?—হাসির আলোকে। গুণীর হাত ছাড়া আর কারও হাত থেকে এমন হাল্‌কা টান বেরয় না। 'গড্ডলিকা'কে একখানি Sketch-book বলা যেতে পারে—কিন্তু Sketch-গুলি সম্পূর্ণ সাকার।

'পরশুরাম' পাঁচজনের যে সুধু দেহের ছবি এঁকেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাদের মনের ছবিও এঁকেছেন—নিজের কথা দিয়ে নয়, প্রত্যেকের নিজের মুখের কথা দিয়ে। তার প্রতি ছবিটিই কথা কয়। আর তারা হাঁ করবামাত্র তাদের বুকের ও পেটের ভিতরকার চেহারা দেখা যায়। 'গড্ডলিকা'র ছবি হচ্ছে সব ইংরাজিতে যাকে বলে living pictures। এ চেহারাও সুন্দর নয়, পাঁচজনের যেমন হয়ে

থাকে তেমনি, তবে ঠিক ফোটোগ্রাফ নয়। গণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়া, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, নেপাল ডাক্তার, এঁরা সবাই হচ্ছেন এক একটি type; অথচ 'পরশুরামে'র হাতের গুণে মনে হয় এর প্রত্যেকেই আমাদের চেনা লোক। যেখানে ব্যক্তিকে type বলে' মনে হয়, আর type-কে ব্যক্তি বলে', সেইখানেই ত আমরা আসল গুণীর হাত দেখতে পাই। গড্ডলিকার 'ভুশণ্ডীর মাঠের' তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য রকম realistic! আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভুশণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তা'কে very pleased to meet you sir না বলে' থাকতে পারতুম না। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্জ্জটি সাহেব নাদুকে কেন যে এত ভালবাসতেন, তা আমি নিজের হৃদয় দিয়েই বেশ বুঝতে পারছি।

যিনি 'পরশুরামে'র লেখনীর সঙ্গে তুলির সঙ্গত করেছেন, সেই যতীন্দ্র কুমার সেনের হস্তকৌশল দেখে সহজেই মুখ থেকে এই ক'টি কথা বেরয়—"বাহবা সঙ্গতী! জিতা রহ, তুহারী কাম!"

'পরশুরামে'র আর একটি মহাকীর্ত্তি এই যে, তিনি বাঙলা সাহিত্যের একটি লুপ্তধারার পুনরুদ্ধার করেছেন। গড্ডলিকা "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতুম পেঁচার নক্সা"র কুলোজ্জলকারী বংশধর। এ কথা যে সত্য, তার পরিচয় আমি বারান্তরে দেব। আজ 'গড্ডলিকা'র কাছ থেকে হাসিমুখে 'পুনদর্শনায়' বলে' বিদায় নিই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, পৌষ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সমসাময়িক সাহিত্য।

—[ః০ঃ]—

আয়র্লণ্ডের কবি ঈট্‌স্ (Yeats) যখন তাঁহার দেশে নূতন একটা সাহিত্যসৃষ্টির গোড়াপত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন যে প্রতিবন্ধকটি সকলের আগে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং যাহার সহিত তাঁহাকে বরাবর যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহা এই—ব্যবহারিক সংস্কারপ্রয়াসী সাহিত্যিক মন। আয়র্লণ্ডে তখন অন্যান্য দেশভক্তের মত সাহিত্যসেবীরও চিন্তাজগতে বিপুল অতিকায় হইয়া দেখা দিয়াছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সব—বিশুদ্ধ কবি যিনি, তিনিও তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকালে এই ভাবনাটি ভুলিতে পারেন নাই,—কি কাজ করিলে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে, সমাজের উন্নতি হয়। সত্যকার শিল্পসৃষ্টির জন্য দরকার যে একটা উদার নির্ব্বিকার উদাসীনতা, শিল্পীদের প্রায় তাহা ছিলই না; আশুকর্ম্মের আয়োজনে, নৈমিত্তিক প্রয়োজনের হিসাবনিকাশের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তমন এতখানি মজিয়া গিয়াছিল যে, সেখানে অহৈতুক আনন্দের সৃষ্টি হইবার কোন পথ প্রায় ছিল না। *

* "All fine literature is the disinterested contemplation or expression of life, but hardly any Irish writer can liberate his mind sufficiently from questions of practical reform for this contemplation."

কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের এই যে অবস্থা ছিল, আজ আমাদের দেশে ঠিক তাহাই দেখিতেছি। শুধু তাই নয়, ঈট্‌সের কথাগুলি আয়র্লণ্ড অপেক্ষা বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধেই বোধহয় বেশী প্রযুজ্য। আর আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে, ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছেন। প্রবীণতরদের মধ্যে বরং কিছু দেখতে পাই ঈট্‌সের সেই "disinterested contemplation" অর্থাৎ নির্লিপ্ত দৃষ্টির আভাস; কিন্তু নবীন যাঁহারাই আসিতেছেন, তাঁহাদের দেখি ভাবে ভঙ্গীতে কথায় ছন্দে কবির শিল্পীর লক্ষণ ক্রমেই লোপ পাইয়া চলিয়াছে, তাঁহারা যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন কেবল সংস্কারক হইয়া উঠিতে। আমাদের আজকালকার কাব্যজগৎ উপন্যাসজগৎ উপদেষ্টার ও প্রচারকের গর্জ্জনে মুখরিত, ঋষির প্রশান্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি সেখানে অতি বিরল। নিরাবিল রসসৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিতেছি কেবল "কাজের কথা"—পতিতের উদ্ধার, নারীজাতির উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শাসকের উৎপীড়ন, দরিদ্রের দুরবস্থা, রাষ্ট্রের ও সমাজের গলদ, ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ও আদর্শ—এই সকল সমস্যার মীমাংসা ও আলোচনা সাহিত্যেরও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল কথা, সাহিত্য আর সুকুমার শিল্প নয়, আমাদের হাতে আজ তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।

এরকমটি হওয়ার কারণ অবশ্যই আছে। কোন দেশের সাহিত্য এক হিসাবে সেই দেশের সমষ্টিগত মনের ইতিহাস বা আলেখ্য। আমাদের দেশের অবস্থা যেরকম, তাহাতে বাহ্যিক

জীবনের কাজের সমস্যাগুলিই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। রাষ্ট্রহিসাবে আমরা পরাধীন, এবং পরাধীনতার যত বিষময় ফল তাহা আমরা দেহে প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি। পরবশ্যতার চাপে আমরা যতই সচেতন হইতেছি, ততই দেখিতেছি কি নিদারুণ দৈন্য কত দিক হইতে আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। দেশের সমস্ত জাগ্রত চেতনা তাই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এই অধঃপতন হইতে মুক্তির প্রয়াসে। যতই আমাদের চোখ ফুটিতেছে, ততই ছোটবড় নানা অভাব অভিযোগ বিবিধ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে; দেশের প্রাণও তাই আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতির জন্য ইহাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে এক একটি প্রতিক্রিয়ার শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে; দেশের মন গড়িতে চাহিতেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আশু অব্যবহিত ফলের জন্য এক একটি ব্যবস্থা। জীবনমরণের সমস্যা সব সদ্য সদ্য মীমাংসা করিবার প্রয়াসে যে বিপুল তর্ক দেখা দিয়াছে—বাদ, প্রতিবাদ, উপদেশ, উচ্ছ্বাস—তাহাই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশের কণ্ঠসাহিত্যে। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার কথাটাই যেখানে সকলের বড় প্রশ্ন, সেখানে সাহিত্যে নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অবকাশ কোথায়?—আয়র্লণ্ডেও ঈট্‌স্ যে প্রকৃত সাহিত্যিক-ভাবের অভাব দেখিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আমাদের দেশেরই মত আর্লণ্ডের বাহ্যিক অবস্থা।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের অথবা আমাদের দেশের কথাই শুধু বলি কেন, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি সাহিত্যের সেই একই ধরণধারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাই না? মানবসমাজ দুঃস্থ পীড়িত; কিরকমে তাহার সংস্কার ও উন্নতি হয়, এই চিন্তাই দেশে দেশে সাহিত্যিক মনকে

আকৃষ্ট এবং অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যের বিশেষত্বই এই যে, তাহা সমস্যামূলক (à these)। নাটক ও উপন্যাসের ত কথাই নাই, আধুনিক কাব্যেরও প্রধান কথা দেখি হইয়া পড়িয়াছে আদর্শের ও কর্ত্তব্যের আলোচনা। বর্ত্তমান জগৎ ও মানব সমাজ অতীতের তুলনায় বাস্তবিকই অধঃপতিত কি না, তাহা হয়ত বিচারের বিষয়; কিন্তু বর্ত্তমানের শিল্পীরা যে জগতের মানব-সমাজের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী সজাগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্যে এই যে জিজ্ঞাসার ধারা, ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন বোধহয় ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের ইংরাজ-শিষ্য বার্ণার্ড শ ত মূর্ত্ত এই জিজ্ঞাসা। ষ্ট্রীণ্ডবের্গ, বোয়ের, গর্কি, ইবানেজ, দানুন্ট্‌সিও, রোলাঁ—ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই সকল শিল্পী কেহই ত কখন একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই যে তাঁহারা প্রধানতঃ মানব-সমাজের ও মানব-চরিত্রের সংস্কারক।

তবুও ইউরোপের সহিত আমাদের দেশের একটু পার্থক্য আছে। ইউরোপে শিল্প হিসাবে সাহিত্যরচনার একটা মাপ বা আদর্শ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত চর্চ্চার ফলে, বড় বড় স্রষ্টাদের কল্যাণে, সেখানে সাহিত্যের এমন একটা সাধারণ রূপ ও রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, সামান্য লেখককেও তাহার কাছাকাছি পৌঁছিতে হয়। সেখানে ব্যক্তিগত সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির অভাব দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া অনেকখানি পূরণ করিয়া দেয়। তাই সাহিত্যের মধ্যে অসাহিত্যিক ভাব ও ভঙ্গী প্রবেশ করিলেও তাহা সেখানে তেমন রূঢ় বা পীড়াদায়ক হইয়া উঠে না। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের শিল্প-মূর্ত্তি খুব সাধারণভাবেও কোনরকম মাপের বা

আদর্শের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়ায় নাই—এখনও তাহার যেন কাদা-মাটির অবস্থা। সুতরাং তাহা দিয়া আমাদের বেশীর ভাগ সাহিত্য-সাধক যে শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়িয়া ফেলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শিল্পী ও সংস্কারক দুই পৃথক জগতের জীব। শিল্পী যে সংস্কারকের কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়; কিন্তু অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য শিল্পকে তাঁহার ভুলিতে হইবে। আর যখন তিনি শিল্পরচনায় নিযুক্ত, তখনও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, তিনি সংস্কারক। আয়র্লণ্ডের ঋষিকল্প কবি জর্জ্ রাসেল co-operation farming-এর একজন প্রচণ্ড কর্ম্মী; এ বিষয়ে তিনি নিজে হাতেকলমে খাটিয়া আয়র্লণ্ডের জাতীয় জীবনে যে কতখানি স্বচ্ছলতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের সংস্কারকদিগের দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ত এ কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। কবি হিসাবে তাই বোধহয় পৃথক একটা নামেই তিনি নিজেকে পরিচিত করাইয়াছেন—তিনি তখন আর জর্জ্ রাসেল নহেন, তিনি এ, ই, (A. E.)। পূর্ব্বতন কবিরাও যে কখন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তাহা নয়—বাহ্যজীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য লইয়া কথা যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান পায় নাই, এমনও নয়। কিন্তু শেলী, বায়রন, হিউগো অথবা ব্রাউনিং এমন একটা নির্লিপ্ত বৃহৎদৃষ্টি দিয়া এ সব বিষয় দেখিয়াছেন, এমন একটি ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় এ সকল কথা না বলিয়া অন্য কথা বলিলেও তাঁহাদের আসল কবিত্ব বা দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। তাঁহাদের কাব্যের মর্ম্ম বস্তুনির্দ্দেশের মধ্যে ততখানি নয়; উহাকে শুধু আশ্রয়রূপে ধরিয়া,

উহাকে ছাড়াইয়া চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে আর একটি ঊর্দ্ধতন কল্পলোক, তাহাই তাঁহাদের কবিতার স্বরূপ। আধুনিক সংস্কারক-শিল্পীদের হাতেও মাঝে মাঝে দেখি অতর্কিতে যেন সাহিত্যের এই দিব্যশরীর ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বার্ণার্ড শ আর কোথাও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংস্কারকের সম্মার্জ্জনী হস্তাচ্যুত করিতে পারেন নাই; কিন্তু যখন কথঞ্চিৎ পারিয়াছেন তখন Candida-র মত এমন অপরূপ একখানি সুঠাম রসগর্ভ শিল্পমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। আর তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, শিল্পী ও সংস্কারকে পার্থক্য কি; চারিদিকের ঊষর ধূ ধূ মরুপ্রান্তরের মাঝে স্নিগ্ধ-তরুছায়া-মণ্ডিত কানন-ভূমির সৌন্দর্য্য অধিকতর স্পষ্ট ও মনোরম হইয়া দেখা দেয়। সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্ত্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি। উদাহরণ স্বরূপ এ বিষয়ে আধুনিক ফরাসী নাট্যকার বাতাই (Bataille) ও বের্ণ্‌ষ্টাইন (Bernstein) কে আমি শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চাই। *

* বেশীর ভাগ কতকগুলি অবান্তর কারণবশতঃ আমাদের দেশে আজকাল ফরাসীর প্রতিনিধিরূপে রোমাঁ রোলাঁ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমি যে দুইজনের নাম করিলাম, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের স্বরূপ তাঁহাদের মত এমন সংহত সামর্থ্যে, সুচতুর সুষমায় ও নিবিড় অর্থগৌরবে ভরিয়া আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। আনাতোল ফ্রান্সের কথা আলাদা। বাতাই'র "La Vierge folle" ও "La Femm Nue" এবং বের্ণ্‌ষ্টাইনের "La Griffe" ও "Montmartre" বাঙ্গালী শিল্পীকে আমি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধহয় শরৎচন্দ্র। কিন্তু যিনি শিল্পসিদ্ধ তাঁহার পক্ষেও এই ধারায় চলিয়া শিল্পত্ব রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি প্রয়াস—যথা; “মুক্তধারা” ও “রক্তকরবী”। তাই আমি বলিতেছিলাম বাংলার সাহিত্য-জগতে অনাবিল রসসৃষ্টির পথে সংস্কারকের জিজ্ঞাসা বৃহৎ অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক বাংলা যদি যথার্থ রূপদক্ষতা দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে চিত্রকলার ক্ষেত্রে। এখানে বাংলার প্রতিভা যেন সরাসরি উঠিয়া গিয়াছে শিল্পলোকের সমুচ্চ জ্যোতির্মণ্ডলে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে চিত্রজগৎ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই একটা সাক্ষাৎ প্রকাশ, একটা আবির্ভাব—এমনি স্বচ্ছন্দ, অকুণ্ঠ, আত্মস্থ, এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা—স্বে মহিম্নি। ইহার কারণ হয়ত একাধিক; কিন্তু আমার মনে হয় বিশেষ কারণ এই যে, সাহিত্যিকেরা যে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন, বাংলার নবীন চিত্র শিল্পীগণ সে দিক দিয়াই চলেন নাই; সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গিয়া ইঁহারা আদৌ প্রচারক হইতে চাহেন নাই—আদর্শ, উপদেশ বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা লইয়া ইঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই। ইঁহাদের রস-পিপাসু অন্তরাত্মায় যে সত্য, যে তত্ত্ব, আনন্দের বিগ্রহ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহাকেই একাগ্র চিত্তে, সরল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে তাঁহারা একটা সুচারু রূপায়নে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাইবেল কথিত মার্থার মত ইঁহারা বাহিরের বহু বিষয়ের মধ্যে আপন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া দেন নাই; কিন্তু মেরীর মত তাঁহারা তন্ময়

হইয়া আছেন আসল যে একটিমাত্র জিনিষ তাহারই ধ্যানে—the one thing needful।

আমি বলিয়াছি সাহিত্য হইতেছে সমাজের ইতিহাস বা আলেখ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। এক দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্য সমসাময়িক মনের প্রতিচ্ছবি বটে; কিন্তু আর একদিক দিয়া সাহিত্য চিরন্তনের বিগ্রহ। এই শেষোক্ত হিসাবেই সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য অর্থাৎ চারুশিল্প। সমসাময়িক মন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা পাদভূমি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের শীর্ষ বা অন্তরাত্মা হইতেছে চিরন্তন। সমসাময়িককে চিরন্তনের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া চিরন্তনের চক্ষু দিয়া দেখাই সাহিত্যের কাজ। সমসাময়িক মন সমস্যার অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। সেখানে সত্যের যাচাই বাছাই ঢালাই পেটাই হইতেছে, সেখানে নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এ কাজ দার্শনিক মনের হইতে পারে; শিল্প কিন্তু নূতন সত্যকে আবিষ্কার করে না, বা তাহাকে বিচারের কষ্টিপাথরে কসিয়া পরীক্ষাও করিতে বসে না। শিল্প দেখাইতেছে চিরন্তন সত্যের রূপায়ন; শিল্পীর কাছে সত্য আবির্ভূত একটা যেন চির-পরিচিত, চির-পুরাণো, সনাতন, নিত্যসিদ্ধ রূপ লইয়া। সাহিত্যের সত্য জন্ম লইয়াছে একটা প্রশান্ত স্থিতির মধ্যে, দেশকাল পাত্রাতীত একটা বৃহতের ভূমার মধ্যে। সত্যের এই যে স্বরূপ—সাংখ্যের পরিভাষায় তর্কের ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার কোন 'বিকৃতি' নয়, কিন্তু সাক্ষাৎজ্ঞানের মধ্যে তাহার যে 'প্রকৃতি'—তাহা দেখিয়া ও দেখাইয়াই শিল্পী নিশ্চিন্ত। তিনি আপনাকে সর্ব্বদা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রাখিয়াছেন আপন অন্তরাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতির নির্দ্বন্দ্ব মহিমায়। তাঁহার সত্য যে কতখানি সত্য, সে সত্যের প্রভাব যে কত

বহুল বিপুল, তাহা তিনি ফলাইয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত নহেন। সুন্দরের যে সত্তাগত সত্য, যে স্বভাবগত রসাত্মিকী শক্তি, তাহা স্বয়ম্প্রকাশ, স্বয়ং ক্রিয়াশীল—তবে হয়ত দার্শনিকের বা সংস্কারকের ইচ্ছামত লক্ষ্যে ও পথে নয়। কবির মনে তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসা, আলোচনা প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, থাকাও উচিত—কিন্তু শিল্প সৃষ্টিকালে এ সব থাকিবে গোপনে অন্তরালে। মাটির মূর্ত্তি গড়াইতে হইলে তাহাতে খড়কুটা অনেক জিনিষই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে সব জিনিষকে ত বাহিরে আর ধরিয়া দেখান যায় না। কবি গ্যেটের মত এমন একজন অতৃপ্তজিজ্ঞাসু, এমন একটি দার্শনিক মন খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়; তবুও এই গ্যেটেই বলিতেছেন—The poet needs all philosophy, but he must keep it out of his work।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

চিরন্তন।

—:০:—

নিবিড় অরণ্য মাঝে উচ্চ সুবিশাল
বনস্পতি কাটাইছে কাল,
কত বর্ষ, কত যুগ, তুচ্ছ করি স্মৃতি ইতিহাস
যেন তার আশ,
জীবনের মানদণ্ডে মাপিবারে অতল-গভীর
খরস্রোত সময়-নদীর।
দিকে দিকে করিয়া বিস্তার
লক্ষ সুভীষণ বাহু পেশীগ্রন্থীময়, বজ্রসার,
আছে তৃপ্ত নিজ দৃপ্ত কাঠিন্য-গরবে।
উৎসবে পরবে
দূর গ্রাম হতে আসে নরনারী করি কোলাহল,
গাগরী কলস ভরি সুপবিত্র জল
ঢালি দেয় মূলে তার, সিন্দূর চন্দন
পুষ্পমালা পরাইয়া করে নতি আরতি বন্দন।
দ্বিপ্রহরে বালকবালিকা
পলাতকবৃন্দ, মুখে ফুল্ল শেফালিকা,
প্রদক্ষিণ করে তারে ক্রীড়ামত্ত কৌতুক রভসে,
উদ্দাম হরষে;
আবার সহসা দূরে যায় পলাইয়া,
ত্রস্ত ভয়ে দুরু দুরু সকম্পিত হিয়া।

তার পত্র-শিবিরের ঘনচ্ছায়ে রবিরশ্মিহীন
অতীতের শোকাচ্ছন্ন দিন
কোলে লয়ে স্তব্ধতা নিঝুম
পাড়াইছে ঘুম।
অপরাহ্নে প্রেমিকযুগল
কভু বসি তলে তার কহে অনর্গল
কপোতকূজনস্বরে অর্থহীন প্রলাপের ভাষা,
অমৃতমধুর, কর্ম্মনাশা;
কভু চাহে পরস্পর পানে
অবাক পুলকভরা লজ্জারুণ বিলোল নয়ানে;
হেনকালে চমকি নেহারে
অতর্কিত সন্ধ্যা চারিধারে
নামিয়াছে ঘিরে,
লোকাতীত বিভীষিকা নৃত্য করে অজস্র তিমিরে।
অমনি উঠিয়া চলি যায়,
গাঢ় আলিঙ্গনশেষে মাগিয়া বিদায়।
তখন কেবল জাগে ঘুৎকার গর্জ্জন,
আর্ত্তনাদে জীবনবর্জ্জন,
কোটরে কোটরে শাখে উপবৃক্ষ-বল্লরী-বিতানে
নিশাচর-অধ্যুষিত কুহু রাত্রিমানে।
আসে ঝঞ্ঝাবায়ু,
উন্মাদ ভৈরব বেগে কাঁপাইয়া স্নায়ু
ক্ষুদ্র বিটপীর;

অটল অচল তবু বনস্পতি বীর
পিষ্ট করি তারে নিজ বিকট বন্ধনে
দেয় ছাড়ি, মর্ম্মর ক্রন্দনে
পলায় সে ঘুরি—
কেবল বিদূরি
তার পদপ্রান্ত হতে আবর্জ্জনা-স্তূপ,
ভৃত্যের স্বরূপ।
পলে পলে বাড়ে অহঙ্কার
তার শক্তিসুকঠোর দীর্ঘপ্রাণতার;
যেন মূক মৌন তার আবরণ টুটি,
বাসনা কহিতে চায় প্রতি পত্ররসনায় ফুটি,
—'আমি সত্য, আমি নিত্য অতি,
ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বলের বিশ্বে এক রতি
নাহি কোন স্থান,
হও সবে মোর তুল্য স্থিরসত্ত্ব চির-আয়ুষ্মান;—
তবে সে প্রেমিক, ভক্তদল,
ভিখারী পথিক, শিশু কৌতুক-চঞ্চল,
সেবা পূজা প্রণামের উপচার ঘটা
দিবে অযাচিত;'—কিন্তু ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পুষ্প এক রজনীর শেষে
তার শীর্ষদেশে
উঠিল হাসিয়া,

লাজক্ষুব্ধ বনস্পতি ধিক্কারিয়া কহিল শাসিয়া
পুষ্পের প্রসূতি লতিকায়,
আপনার অবরুদ্ধ নীরব ভাষায়,—
ওরে মূর্খ সাহসিকা তোর
পেলব-পলাশ পুষ্প, নাহি যার একবিন্দু জোর
রুধিবারে পবন মলয়,
যার ক্ষীণ লাবণ্য-বলয়
দিনান্তে পড়িবে খসি জীবনের বৃন্ত-বাহু হতে
বিরহ-শিথিল—তারে কোন্ স্বেচ্ছাব্রতে
দিলি গাঁথি অঙ্গে মোর দীপ্ত পরিহাসে ?—
হেনকালে পুষ্পের সুবাসে
কোথা হতে ত্যজিয়া কুলায়,
ক্ষুদ্র পাপিয়ার শিশু নিদ্রাহারা আসিল সেথায়,
স্ফুরিত কোমল বক্ষে, লক্ষ্যহীন পদে,
মৃদুলম্ফে, ধায় যথা ধরিবারে উর্ম্মি কোকনদে।
বসি পুষ্পপাশে
চাহিল সে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত আকাশে
পূর্ণিমার শশধর পানে,
তারপরে চঞ্চু মেলি বেদনার হিল্লোলের গানে
ভাসাইয়া দিল বনস্থল,
শিহরিল তারকায় প্রতিধ্বনি-তরঙ্গ তরল।
সচকিত বনস্পতি মানিয়া বিস্ময়,
মনে মনে ক্ষুব্ধ রোষে কয়,

—'একি এ করুণ, তীব্র, চপল, মৃদুল,
ভীম গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল
উঠে স্বর!—লুপ্ত হয়ে যাক্
সঙ্গীত, কুসুম দুই'! সহসা নির্ব্বাক্
হইল বিহঙ্গশিশু অজগর-গ্রাসে,
খসিল পবনে পুষ্প ত্রাসে।
জুড়াইল বনস্পতি-মন
স্বস্তি সুখে—মনে ভাবে আমি চিরন্তন।

* * *

তারপরে গেল কিছুদিন,
কোথা বনস্পতি?—হায়, কুঠার-বিলীন!
করে না প্রেমিক পান্থ ভুলিয়া স্মরণ
তার দীর্ঘ জীবনের কাহিনী—মরণ
লেপিয়া দিয়াছে মসী ঘোর
তার পরমায়ু-গর্ব্বে—নির্ম্মম কঠোর!

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পণের মুক্তি।

(অনৈতিহাসিক যুগের একটি ঐতিহাসিক চিত্র)

এ সেই আদিম যুগের কথা, দেশ ছিল যখন বনে জঙ্গলে ঢাকা এবং মানুষের লজ্জানিবারণের উপায় ছিল গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও পাতার আচ্ছাদন। সেই যুগে অকস্মাৎ একদিন বসন্তের আমেজ এসে লাগ্‌লো রাজ্যের ছেলে-বুড়ো, নর-নারী সকলের প্রাণে। উৎসব কর্‌তে তারা রাজার দরবারে এসে হাজির হ'লো।

রাজাকে ডেকে তারা বল্‌লে—মহারাজ, গহন বনের অন্ধকার ফাগুনের ফাগে রাঙা হ'য়ে উঠেছে, বনের মনে যে বাঁশী বাজ্‌ছে তারি সাড়া ডেকে এনেছে দোয়েলের শীষ আর বুল্‌বুলের গানকে। কৃষ্ণ-চূড়া আর অশোকের হাসির স্পর্শ পাচ্ছি আমরা আমাদের মনের ভিতরে—রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে। আপনি অনুমতি করুন, আমরা আমাদের হাসি-গান, আশা-আনন্দ দিয়ে উৎসবের দেবতাকে আজ মূর্ত্ত ক'রে তুলি।

রাজা বল্‌লেন—বেশ, রাজ-দরবার থেকেই সে উৎসবের মহড়া তবে সুরু হোক্!

(১)

রাজসভার আগাগোড়া উৎসবের আলোকে ভ'রে উঠ্‌লো। পাত্র-মিত্র-অমাত্য প্রভৃতি সভাসদেরা যে যার জায়গায় জাঁকিয়ে বস্‌লেন।

প্রজারা দলে দলে এসে ভিড় জমালো। দামামা বাজ্‌লো, নকিব হাঁক্‌লো। উৎসব সুরু হ'বে, হঠাৎ এমনি সময় চোখে পড়লো, রাজার ডাইনে বাঁয়ে দু'খানা সিংহাসন খালি প'ড়ে আছে—উৎসব-সভায় অনুপস্থিত র'য়ে গেছেন রাণী, আর তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মূর্ত্তিমতী উৎসব যিনি, সেই রাজকন্যা।

ওস্তাদের হাতে বাঁশের বাঁশী সুরের স্বপ্ন সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে গেল—ঝরণা আর তার বেরিয়ে আস্‌বার পথ খুঁজে পেলে না। নর্ত্তকীর পায়ের ঘুঙুর নাচ্‌নার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে নিজেই বজ্রাহতের মত নিঃসাড় হ'য়ে গেল—তার আর বিদ্যুৎ সৃষ্টি কর্‌বার উৎসাহ রইলো না। রাজ-অন্তঃপুরের পানে চেয়ে চেয়ে রাণী ও রাজকন্যার প্রতীক্ষায় সভার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো।

পলের সঙ্গে পল মিশে দণ্ড পেরিয়ে গেল। দণ্ডের সঙ্গে এসে দণ্ড মিশ্‌তে লাগ্‌লো, প্রহর গড়্‌বার জন্যে। তবুও রাণী ও রাজকন্যার দেখা নেই। অবশেষে রাজাও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি প্রতিহারীকে ডেকে বল্‌লেন—রাণীর কাছ থেকে খবর নিয়ে এস, সভাকে কেন তাঁরা বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন; প্রজারা সব তাঁর ও রাজকন্যার অপেক্ষায় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রতিহারী অন্তঃপুরের পথে পা বাড়াবার আগেই বল্কলের বসনে দেহ ঢেকে রাণী একা সভাগৃহে প্রবেশ কর্‌লেন—মুখ তাঁর ম্লান, চোখের কোলে জলের রেখা ছল্‌ ছল্‌ কর্‌ছে।

রাজা তাঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মহারাণী তোমার চোখের কোণে জল? তোমার সঙ্গে রাজকন্যাকেও ত দেখ্‌ছিনে?

উদ্গত অশ্রু দমন করতে করতে রাণী বললেন—আজকার এই সভা বন্ধ করে দাও মহারাজ। রাজকুমারী এ সভাগৃহে প্রবেশ করবে না।

বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

রাণী বললেন—উৎসবের জন্য সাজসজ্জা করে' সে বেরিয়েছে, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার পরণের বল্কল উড়িয়ে নিয়ে গেল, পাতার তৈরী কাঁচুলী ছিঁড়ে খসে' মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লজ্জায় সেই যে সে ঘরে ঢুকেছে, আর বাইরে পা বাড়ায় নি। আমি তাকে নতুন ক'রে বেশ রচনা করবার জন্যে আহ্বান করতেই সে আমাকে বললে—মা, তুমি মহারাজকে ব'লো, দেহের জন্য যত দিন না তিনি যোগ্য আচ্ছাদনের আবিষ্কার করতে পারবেন, ততদিন আমি ঘরের বাইরে পা বাড়াবো না। বাতাসের ঘায়ে যে আচ্ছাদন খ'সে পড়ে না, গায়ের ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মতো ক'রেই যে আচ্ছাদন জড়িয়ে থাকে, সেই ত নারীদেহের যোগ্য আচ্ছাদন! তোমরা যদি তাই দিয়ে আমার এই নগ্ন দেহ ঢেকে দিতে পার, তবেই আলো-বাতাসের সঙ্গে আবার আমার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে; নতুবা আলো-বাতাসের স্পর্শ আমরণকালের জন্যই আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হ'য়ে রইলো।

রাজ্যের যত লোকের আনন্দনির্ঝর ছিল, কুসুমের মতো সুকুমার এই তন্বী রাজকন্যাটি। তার মুগ্ধ দৃষ্টি বসন্তের হাল্কা হাওয়ার মতো হাসির দোলায় সকলের মন দুলিয়ে দিয়ে যেত। সহসা তার-ই এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নাগরিকদের মন হ'তে উৎসবের আলো ঝড়ের বাতাসে দীপের মতো ক'রে নিভে গেল। সুরের ওস্তাদের গানের উপর, নর্ত্তকীর নাচনার উপর, উৎসবের আলোর উপর তাদের আর

কোনোরকমের আসক্তি রইলো না। তাই মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা করলেন—রাজকন্যাকে বাদ দিয়েই তবে উৎসবের মহড়া আরম্ভ হোক্?—সভাসুদ্ধ লোক তখন সমস্বরে প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠলো—হাসি-গান আজ বন্ধ ক'রে দাও মহারাজ, তার বদলে উৎসবের সভায় বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হ'য়ে যাক্। রাজ্যের আনন্দ-দেবতা আজ ইঙ্গিত করেছেন, রাজ্যের লোকের দেহ আচ্ছাদনের সমস্যাটা সমাধানের জন্যে। সে সমস্যা সমাধান করতে না পারলে কোনো উৎসবই আজ আনন্দের রসদ যোগাতে পারবে না।

(৩)

মন্ত্রণার জন্য রাজ্যের যত বিজ্ঞ মাথা সব এক জায়গায় এসে জড় হ'ল। কিন্তু নতুন কোনো পথ কেউ খুঁজে বার করতে পারলেন না। বল্কলের চাহিদা যোগানের ভার যাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল, তিনি নিত্য নতুন বল্কলের সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন। সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর বল্কলে রাজবাড়ীর অন্তঃপুর ভরে উঠলো। কিন্তু যে বল্কল সমস্ত দেহকে জড়িয়ে দেহের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে থাকতে পারে, তেমন বাকলের সন্ধান কোথাও মিললো না। বল্কলের কারিগর রাজকন্যাকে বাইরে বা'র করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

পশুর চামড়া দিয়ে অঙ্গাবরণ তৈরী করা ছিল যাঁর ব্যবসা, তাঁর শিকারীর দল বনে বনে নতুন পশুর সন্ধানে ছুটলো। বাঘ, হরিণ হ'তে আরম্ভ ক'রে কত জানা-অজানা জন্তুর চামড়ায় তাঁর ভাণ্ডার ভ'রে গেল। রৌদ্রে শুকিয়ে, জলে ভিজিয়ে, অস্ত্রে চেঁচে, আগুনে সেঁকে, যত দূর সম্ভব মোলায়েম ক'রে তিনি সেগুলি রাজকন্যার কাছে পাঠিয়ে

দিলেন, কিন্তু তবু রাজকুমারী তাঁর অন্ধকার ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন না। বোঝা গেল, চামড়ার আচ্ছাদনও তাঁর পছন্দ হয় নি।

দেশের শিল্পীরা গাছের পাতা নানারকমে সাজিয়ে রাজকন্যার দেহের জন্যে আচ্ছাদন রচনা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। শিল্প-রচনার দিক থেকে তার শোভা ও সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু তা' অন্ধকার কক্ষের স্বেচ্ছাবরুদ্ধা রাজকন্যার মনোহরণ করতে পারলে না। দিনের পর দিন রাজপুরীর একটি আলোহীন, জনহীন কক্ষে বেদনা ও নিরানন্দের জাল বুনে বুনে রাজকন্যার দিন কাটতে লাগলো। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আনন্দের স্বচ্ছ ধারা, যা' মানুষের হাসির ভিতর দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে, ঝরণার মতো ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো—তাও কোথায় লুকিয়ে, শুকিয়ে, হারিয়ে, লুপ্ত হ'য়ে গেল।

কিন্তু দুঃখের ইতিহাসটা যে জায়গায় সুরু হয় সেই জায়গাতেই শেষ হয় না। রাজ্যের দুঃখের যে ইতিহাস রাজকন্যার পণের ভিতর দিয়ে সুরু হ'য়েছিল, রাজ-কন্যার কঠিন পীড়ার ভিতর দিয়ে তা' ক্রমে ক্রমে মর্ম্মান্তিক হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করলে। রৌদ্র-বাতাসের সংস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত ঘরের ভিতর রাজকন্যার তনু দেহলতা শিকড়-ছেঁড়া, রসের স্পর্শশূন্য লতার মতই শুকিয়ে উঠতে লাগলো। শুনে রাজবৈদ্য রায় দিলেন, রাজকন্যাকে যদি আলো-বাতাসের ভিতর আবার টেনে আনা না যায়, তবে যে ক্ষীণ রসধারা এখনো তাঁর দেহে জীবনের দীপশিখাটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে, তাকে আর দীর্ঘদিন জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

খবর শুনে রাণীর মুখের গ্রাস অর্দ্ধপথে থেমে গেল, রাজার চোখের

নি'দ্ দুঃস্বপ্নে ভরে' উঠ্‌লো; রাজ্যের আনাচে কানাচে যেখানে যতটুকু হাসি ছিল, তাও বিদ্যুৎদীপ্তির মতো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই মিলিয়ে গেল।

(৪)

রাজা এসে রাজকন্যার দুয়ারে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—মা, এই অন্ধকারের অতল হ'তে আলোর রাজ্যে, বাতাসের রাজ্যে তুই ফিরে আয়, নিজের জীবন দিয়ে একি অদ্ভুত ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে চাস্ তুই! রাজ্যের মুখের হাসি অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে গেছে, উৎসবের দেবতার চোখ দিয়ে অশ্রুজলের উৎস ঝর্‌ছে। আমার দিকে না চাস্ তোর মার দিকে তাকা; রাজ্যের প্রজা, যারা তোকে না দেখে অশ্রু-সাগরে ভাস্‌ছে, তাদের দিকে তাকা—এমন করে আত্মহত্যা করিস্‌নে!

ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে রাজকন্যা উত্তর দিলেন—বাবা, তোমার স্নেহ আমি জানি, তোমার দুঃখ যে কত গভীর তাও আমার অজানা নেই; কিন্তু স্নেহের খাতিরেও তো পণের মর্য্যাদা নষ্ট করা যায় না। আমার অন্তরদেবতাকে রুষ্ট ক'রে আমার আত্মাকে মেরে ফেলে যদি দেহটাকে বাঁচাই, তুমিই ব'লো সেই কি যথার্থ বেঁচে থাকা হবে?

মুখ লাল ক'রে রাজা দরজার প্রান্ত হ'তে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে স'রে গেলেন।

রাজা স'রে যেতেই রাণী একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে রাজকন্যার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বল্‌লেন,—ওরে, এই নাড়ীর সঙ্গেই একদিন তুই জড়িয়ে ছিলি। আজও তোর মুখ ম্লান দেখ্‌লে সেই নাড়ীতেই টান পড়ে, আবার সেই বুকের ক্ষত দিয়ে রক্তের ধারা ঝর্‌তে থাকে! পণভঙ্গের পাতক কি মাতৃহত্যার পাপের চাইতেও গুরুতর?

রাণীর মাথার চুলের গুচ্ছের ভিতর হাত বুলোতে বুলোতে রাজকন্যা বল্‌লেন—মা, আমি ত মর্‌তে চাইনে, আমার দেহের আচ্ছাদন দিয়ে আমাকে আলোয় নিয়ে চলো, বাইরে বাতাসের ঝাপ্‌টার ভিতর ছেড়ে দাও। কিন্তু আমার অনাবৃত দেহ নিয়ে তো বাইরে বেরোতে পার্‌ব না—তুমি মা হ'য়েই কি আমার সে লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে?

তারপর ধীরে ধীরে রাণীর চোখের জল মুছে দিতে দিতে রাজকন্যা আবার বল্‌লেন—তার চেয়ে মা তুমি রাজ্যের ভিতর ঘোষণা ক'রে দাও, যে আমার দেহের আচ্ছাদন গড়ে' দিতে পার্‌বে, এ দেহটাকে তোমরা তারি পায়ে উৎসর্গ ক'রে দেবে। যে শিল্পী এই রাজ্যের লজ্জার অভাব মেটাতে পার্‌বেন, তিনি হয়তো নিভৃতে সৌন্দর্য্যের ধ্যানে ডুবে আছেন—তোমাদের এই দুঃখের দুঃসংবাদ এখনো তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু রাজকন্যাকে যদি পণ রাখ, তবে হয়তো তাঁর ধ্যান-লোকের ভিতরে গিয়েও তার সংবাদ পৌঁছনো অসম্ভব হবে না।

পরের দিন রাজা রাজ্যের ভিতর ঘোষণা ক'রে দিলেন, রাজকন্যার দেহের যোগ্য আচ্ছাদন যে রচনা ক'রে দিতে পার্‌বে, অর্দ্ধেক রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যা তারি হাতে সমর্পণ করা হবে।

(৫)

সে ছিল শিল্পী। মনের আনন্দে জিনিষ গ'ড়ে তোলাই ছিল তার কাজ। এই শিল্পীর তপোবনে ফুল-ফলের গাছের ভিতর কি ক'রে যে কতকগুলি কাপাসের গাছ জন্ম নিয়েছিল, সে তা' খেয়াল ক'রে দেখে নি। কিন্তু কাপাসের গাছগুলোতে যখন ফুল ফুট্‌লো, তখন তা'

আর তার কাছে উপে ার বস্তু রইল না, এবং তারপর ফুলগুলো যখন ধীরে ধীরে ফলে পরিণত হ'ল, সেগুলো নিয়েও তার নাড়াচাড়া তার অজ্ঞাতসারেই সুরু হ'য়ে গেল। ফলগুলো নিয়ে সে ভাবতে লাগলো— এগুলোর প্রয়োজন কি? কোথায় এর সার্থকতা? তার মনের একদিকে সৌন্দর্য্যদেবতার পায়ের ছোঁয়ায় রূপের লীলাপদ্ম যেমন দলের পর দল ছড়িয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল, আর একদিকে তেমনি মানুষের প্রয়োজনের দেবতাও সেখানে প্রয়োজনের পর প্রয়োজনের রূপ সৃষ্টি ক'রে চলেছিলেন। সুতরাং ফুলের শ্রী তার মনকে যেমন দোলা দিয়ে গেল, ফলের চেহারাও তেমনি তার সার্থকতার কথাটা নিয়ে তার মনের তারে ঘা দিতে ভুল কর্‌লে না। শিল্পী ভাবতে লাগলো, যে ফল পেকে ক্ষুধার রসদ যোগায়, তার প্রয়োজন বোঝা যায়; কিন্তু যে ফল পেকে পশমের মতো কতকগুলো আবর্জ্জনার স্তূপ গড়ে' তোলে, কোথায় তার সার্থকতা?

সংশয়ের দোলায় দিনের পর দিন শিল্পীর মন দুল্‌তে লাগলো— অসোয়াস্তিতে মন তার ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। কাপাসের ফলের ভিতর হ'তে তুলাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা একটা ক'রে আঁশ বেছে সে সেইগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে দেখতে লাগলো, আবার খুলে ফেলে দিয়ে খুঁজ্‌তে সুরু করে দিলে কোথায় তার সার্থকতা! এম্‌নি অনিশ্চয়তার ভিতর মন তার যখন অন্ধকারের পর অন্ধকার রচনা ক'রে চলেছে, হঠাৎ সেই সময় একদিন তার চোখ প'ড়ে গেল মাকড়সার জালের উপরে।

এ কি! তার ফলের আঁশগুলো যে এই জালের লূতার মতই সরু! এ দিয়েও তবে লূতার জালের সৃষ্টি করা যায়। শিল্পী ভাবতে লাগলো,

এই আঁশগুলোকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একসঙ্গে পাকিয়ে দীর্ঘ করার উপায় কি!

এইবার শিল্পীর মন মেতে উঠলো সেইরকমের একটা যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যে, যা'তে ক'রে ফলের ভিতরকার আবর্জ্জনাগুলো পাকিয়ে সূক্ষ্ম লূতার তন্তুর মতো ক'রে তোলা যায়। দিন নেই, রাত নেই, শিল্পীর যন্ত্রাগারে চলেছে সূতা-কাটার যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা। কত কাঠ কতরকমে কাটা হ'ল, কত আকারে সেগুলো সাজানো হ'ল, কতরকমের যন্ত্র গ'ড়ে উঠলো, কত ভাঙ্গা পড়লো। অবশেষে একদিন শিল্পীর হাতে ধরা পড়লো সেই যন্ত্রটি, যাতে তুলা পাকিয়ে তা'কে সূতায় পরিণত করতে পারা যায়।

শিল্পী চলেছে সূতার পর সূতা কেটে। কাপাসের ফল থেকে বীজ ছাড়িয়ে মনের মতো ক'রে গুছিয়ে নিয়ে সে একেবারে মস্‌গুল হ'য়ে উঠেছে সূতা কাটার আনন্দে। পাঁজের পর পাঁজ ফুরিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে তার শ্রান্তি আস্‌ছে না—ক্লান্তি জাগছে না। সূতার স্তর সাদা ফুলের পাহাড়ের মতো হ'য়ে বেড়ে উঠলো—কোনোটি মোটা, কোনোটি সরু, কোনোটি মাঝারি।

হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল, বৃথা--বৃথা—সমস্তই বৃথা! কি হবে এই সূতার স্তূপ দিয়ে?—কোথায় এর সার্থকতা? কাটায় আনন্দ আছে, কিন্তু যে আনন্দ লোকের কাজে লাগানো যায় না, সে আনন্দ তো শিল্পীর ধ্যানের বস্তু নয়। এ দুনিয়ায় যে সকলের বড় শিল্পী, তার সৃষ্টি যে প্রয়োজনের ভিতর দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছে। আমার এ সূতা তো কারো কাজে লাগছে না—লাগার সম্ভাবনাও নেই। ক্ষোভে ব্যথায় সূতাগুলো ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে শিল্পী মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

(৬)

শিল্পীর দিন বড় দুঃখের ভিতর দিয়ে কাটছে। বিরাট উত্তেজনার পর একটা গভীর অবসাদের ভিতর তার মন তলিয়ে গেছে। শিল্প রচনায় তার আর স্পৃহা নেই; প্রকৃতির যে ইঙ্গিত ধ্যান ক'রে ধর্‌তে হয়, সে ধ্যানের উন্মাদনা তার কাছে কতবার এসে কোনো সাড়া না পেয়ে ফিরে গেল। শিল্পী কেবলি ভাবছে—এতদিন ধরে' এত সাধনায় যাকে গড়ে' তুল্‌লুম, সে যন্ত্রের কোনই সার্থকতা নেই! হঠাৎ এমনি সময় একদিন তার কাছে এসে পৌঁছলো রাজার ঘোষণার বার্ত্তা, আর তারি সঙ্গে রাজকন্যার পণের কথা।

বিদ্যুতের স্পর্শ লাগ্‌লে হঠাৎ মানুষের সমস্ত শরীর যেমন একসঙ্গে নাড়া দিয়ে ওঠে, রাজকন্যার পণের কথাটা তেম্‌নি শিল্পীর মনের ভিতরটা নাড়া দিয়ে গেল। সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—পেয়েছি—পেয়েছি—এইবার কার্পাশের সার্থকতার সন্ধান পেয়েছি! আমি এই তুলা দিয়ে রাজকন্যার দেহের আচ্ছাদন গ'ড়ে দেব। শিল্প দেবতার ইঙ্গিত এইবার আমার কাছে ধরা পড়েছে।

তারপর সে উঠে তুলাগুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে নিয়ে টেনে টেনে সেগুলিকে বল্কলের মতো ক'রে—পশুর চামড়ার মতো ক'রে বিছাতে লাগ্‌লো। দেহ ঢাক্‌বার আচ্ছাদন তা'তে তৈরী হ'লো বটে, কিন্তু সেও তো বাতাসের ঘা সহ্য করতে পারছে না—হাল্‌কা হাওয়াতে যে তা' খ'সে, উড়ে, স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়্‌ছে। তুলার পাতগুলোকে একসঙ্গে আট্‌কাতে না পার্‌লে কি ক'রে তা'তে অঙ্গের আচ্ছাদন তৈরী হবে?— শিল্পী সূতার স্তূপের দিকে ফিরে তাকালো। ঐ সূতা দিয়ে তুলার পাতগুলো বেঁধে রাখ্‌তে পারা যায় না? সূতা নিয়ে সে

আবার তুলার পাতগুলো বাঁধবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তুলা সূতার জোরে বাঁধা প'ড়ে এক হ'য়ে উঠলো না। শিল্পীর মুখের উপর অন্ধকার আবার মেঘের মতো ঘন হ'য়ে নেমে এল।

শিল্পী আবার ভাবতে সুরু করলে। হঠাৎ তার মনে হ'ল এক-টার পর একটা—তারপর আরো একটা—এমনি করে' যদি সূতা-গুলোকে একসঙ্গে গাঁথা যায়, তবে?—মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে শিল্পীর মুখ আবার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তার যন্ত্রাগারে আবার কাঠ, বাঁশ, লোহা-লক্কড়ের হাতিয়ারগুলোর ঠোকা-ঠুকি সুরু হ'য়ে গেল। এবার সে মেতে উঠলো, সূতাগুলোকে একসঙ্গে গেঁথে তোলবার যন্ত্র তৈরীর সাধনায়।

(৭)

রাজার দরবার আজো আবার লোকের মাথায় মাথায় ভ'রে গেছে। কিন্তু একটি লোকের মুখেও আনন্দের দীপ্তি নেই—সকলের চোখের পাতাই জলের ভারে ভিজে ভারি হ'য়ে উঠেছে। রাজবৈদ্য রায় দিয়েছেন, আজও যদি রাজকন্যাকে আলোকের ভিতর টেনে না আনা যায়, তবে হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। ঐ অন্ধকারের অতলেই তাঁর সমাধিক্ষেত্রও রচনা করতে হবে।

অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে একসঙ্গে সব প্রজার করুণ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠলো—মহারাজ, আমাদের রাজশ্রীকে তুমি ফিরিয়ে আনো; আলো-বাতাসহীন মৃত্যুপুরীর অন্ধকার হতে রাজ-লক্ষ্মীকে উদ্ধার ক'রে আনাই তো রাজধর্ম্ম। রাজকন্যাকে তুমি জীবন দান করো।

অশ্রু-বিহ্বল-কণ্ঠে মহারাজ উত্তর দিলেন,—বৎসগণ, আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি। অশনের মতো, দেহের লজ্জানিবারণ করবার ভারও রাজার। আমার সে কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পারিনি। বাপের স্নেহ নিয়ে আমি রাজকন্যাকে আলো বাতাসের ভিতর ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করেছিলুম, কিন্তু রাজার কর্ত্তব্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। যে ব্রত গ্রহণ করা আমার উচিত ছিল, তিনিই সেই ব্রত গ্রহণ ক'রে রাজার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। লজ্জায় ক্ষোভে বেদনায় আমি আমার পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আমার মাথার মুকুট ও হাতের রাজদণ্ড আমি পরিহার করছি—তোমরা যে পার রাজ্যের এ মহা সঙ্কটে তাকে উদ্ধার ক'রে এ সিংহাসন গ্রহণ কর।

সংক্ষুব্ধ জনতা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—রাজকন্যার কাছে আমাদের নিয়ে চল রাজা, আমরা তাঁর দুয়োরে হত্যা দিয়ে তাঁকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস্‌ব।

কান্নার মতো ম্লান হেসে মহারাজা বল্‌লেন—বেশ, তাই চল, তোমাদের আনন্দ-শ্রীকে তোমরাই ফিরিয়ে নিয়ে এস।

(৮)

স্রোতের ধারা যেমন ক'রে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ কেটে ছুটে চলে, জনতার স্রোত রাজপুরীর আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে তেম্‌নি ক'রে ছুটে চল্‌লো সেই রাজান্তঃপুরের অভিমুখে। রাজকন্যার রুদ্ধ দরজার উপর সেই ব্যথিত শোকবিদ্ধ জনতা বন্যার উচ্ছ্বাসের মতো ফেটে প'ড়ে আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—রাজকন্যা, তোমার শ্রী কল্যাণে করুণায় উদ্ভাসিত, প্রজার প্রাণের আনন্দ-স্পন্দন তুমি! আমরা যে

আলো বাতাস অজস্র ভোগ করছি, সেই আলো বাতাস হ'তে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে মৃত্যুর তুষার-শীতলস্পর্শে শীতের ফুলের মতো তুমি পলে পলে শুকিয়ে উঠে ঝ'রে পড়্‌বে, সে তো আমরা সইতে পারব না। আমরা এসেছি আলোর ভিতর বাতাসের ভিতর, প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের ভিতর তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—তুমি বেরিয়ে এস!

বীণার তারে ওস্তাদ বীণ্‌কার ঘা দিলে তার ভিতর হ'তে যেমন সুরের ছন্দ নেচে ওঠে, ঘরের ভিতর হ'তে কণ্ঠস্বরে বীণার ছন্দ বাজিয়ে রাজকন্যা ব'লে উঠ্‌লেন—ভাই সব, এই অন্ধকার, এই আলো-বাতাসহীন কারাকক্ষ আমার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি সেই কতকাল হতে উন্মুখ হ'য়ে ব'সে আছি তোমাদের এই আহ্বানের প্রতীক্ষায়। আজ তোমরা আমার দ্বারে এসেছ—জীবনের আশায়, জীবনের অপেক্ষাও বড় পণরক্ষার উল্লাসে আমার বুক ভ'রে উঠেছে। কিন্তু কৈ, এখনো তো তোমরা আমাকে আমার মুক্তির পণ চুকিয়ে দিলে না? আমাকে আমার দেহের আচ্ছাদন দাও—আমাকে পণ-মুক্ত ক'রে তোমাদের ভিতর, তোমাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আলো গানের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

সংক্ষুব্ধ জনতার বেদনা-ভরা-কণ্ঠ অশ্রুর বন্যায় আর্দ্র হয়ে উঠ্‌লো। অক্ষমতার লজ্জায় মাথা নত ক'রে তারা বল্‌লে—পারিনি বহিন, তোমার পণের কড়ি আমরা সংগ্রহ কর্‌তে পারিনি। জীবন দিতে বলো, তোমার জীবন বাঁচাবার জন্যে এই দুয়োরের গোড়ায় গোটা রাজ্যের জীবন আমরা ধূলিমুষ্টির মতো লুটিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু যা' আমাদের শক্তিতে কুলোয় না, বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তোমার পণ যে

সেই অসাধ্য সাধনের পিছনে ছুটে চলেছে—এ পণ তুমি পরিহার কর, রাজকন্যা।

হতাশ-ম্লান কণ্ঠে রাজকুমারী বল্লেন—ভাই সব, তোমরা ফিরে যাও। ঐ আলো, ঐ বাতাস, যা যুগ যুগ ধ'রে জীবনের রসদ যুগিয়ে চলেছে, তার ভাণ্ডার তোমাদের অক্ষয় হোক্, তোমরাই তা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ কর। আর এই অন্ধকারের অতলে, আলো-বাতাসের স্পর্শহীন রাজ্যে, সমস্ত আশার সঙ্গে আমার বিড়ম্বিত জীবনের সমাধি হোক্। কিন্তু এ কথাও আমি তোমাদের জানিয়ে রাখি যে, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি ক্ষোভ আমার সমস্ত চেতনাকে দগ্ধ কর্‌বে। সে ক্ষোভ এই যে, এত বড় শিল্পদেবতার সন্তান হ'য়েও এ রাজ্যে এমন শিল্পী একজনও জন্মাল না, যে তাঁর ইঙ্গিতকে অনুসরণ কর্‌বার ক্ষমতা রাখে। দুনিয়া জ্ঞানের পথেই ছুটে চলেছে। সে শিল্পী এক দিন নিশ্চয়ই আস্‌বে, যে নরনারীর যোগ্য আবরণ খুঁজে বের কর্‌বে—কিন্তু সে গৌরব আমার দেশের ভাইদের লাভ কর্‌বার শক্তি হ'লো না!

দূরে দৈববাণীর মতো সরল নির্ভীক ঋজু কণ্ঠস্বরের সাড়া ভেসে উঠলো—তোমার রাজ্য এখনো দেউলে হ'য়ে যায়নি, রাজকন্যা! মানুষের দেহের লজ্জার আবরণ যোগাবার গৌরব তোমারি ললাটে যুগ যুগ ধ'রে জয়ের মাল্য রচনা কর্‌বে। গ্রহণ করো তোমার পণের অর্ঘ্য। এই আচ্ছাদনে দেহ আবৃত ক'রে সমস্ত রাজ্যের মনের আলো-বাতাসের দেবতা তুমি, ধরার আলো-বাতাসের ভিতর বেরিয়ে এস—আমার শিল্প-সাধনা সার্থক হোক্।

ধীরে ধীরে শিল্পী এগিয়ে এসে জানালা গলিয়ে রাজকন্যার অন্ধকা-

কক্ষের ভিতর তাঁর দীর্ঘ সাধনার সম্পদ নিক্ষেপ কর্‌লেন। বিহ্বল জনতার লক্ষ নয়ন শিল্পীর দীর্ঘ ঋজু দীপ্ত দেহের দিকে ন্যস্ত হ'লো।

কার্পাশের তুলায় শিল্পীর সাধনা যে বস্ত্র রচনা করেছিল, তনু দেহখানি তা'তেই আবৃত ক'রে রাজকন্যা দীপ্ত দীপশিখার মতো বেরিয়ে এলেন সেই হতবাক্ জনতার সাম্‌নে ;—তারপর নতজানু হয়ে শিল্পীর সম্মুখে ব'সে প'ড়ে তিনি বল্‌লেন,—হে শিল্পের দেবতা, আমার সাধনা তোমার হাতে মূর্ত্তি লাভ করেছে—তুমি আমাকে নাও—আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

পরিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তপঃকৃশ অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণদীপ্ত রাজকন্যার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিল্পী বল্‌লেন—হয়নি রাজকুমারী, হয়নি—আমার সাধনা সার্থক হয়নি। ঐ পুষ্পের মতো পেলব তনু-লতাকে বেষ্টন কর্‌বার জন্যে যে আচ্ছাদন দরকার, আমার রূঢ় কর্কশ হাতে তার সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তুমি আমার সাধনাকে পূর্ণতা দান করো। কার্পাশের তুলাকে সূতার মত সূক্ষ্ম, সরু, ও মসৃন ক'রে তোমার উপযোগী আচ্ছাদন আমার যন্ত্রের সাহায্যেই তুমি তৈরী ক'রে নাও।

রাজকন্যা লজ্জিত হাস্যে উত্তর দিলেন—আমি আবার শপথ কর্‌ছি শিল্পী, আমার এই বাহু তোমার শিল্প-সাধনা সম্পূর্ণ ক'রে তোল্‌বার কাজেই উৎসর্গিত হবে।

শিল্পী ধীরে ধীরে আনন্দ ও সঙ্কোচের সঙ্গে রাজকন্যার বাহুলতা নিজের দৃঢ় সবল করতলের ভিতর গ্রহণ কর্‌লেন।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

ঝরণা ঝারা।

——:০:——

ঝরঝর ঝরণা   গিরি ঘরকরণা—
জ্বলজ্বল উজ্জ্বল   যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্‌ধব্‌   তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হ'তে নীচুতে   না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর   দিন রাত ঝর্ঝর
ঝরঝর ঝরছে   ধারা নাহি ধরছে।

হরদম হরদম   ধূলা বালি কর্দ্দম
লতা পাতা কুট্‌কাট্‌   চলে করে' লুট্‌পাট,
ফুরসুৎ নাই তার,   বিদ্যুৎ ভাই তার,
হিম জল-অঞ্চল   অবিরল চঞ্চল,
কিঙ্কিনী কঙ্কন   রামধনু রং কোন্!
বালা আর চুড়ীতে   বাজে শিলা নুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই   আস্‌মান কম্পাই।

শিখরীর উচ্চে   চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে   সিংহের জটাতে,
নামে মহা ঝম্পো   হরিণের লম্ফে,
ধর ধর ধর ধর   কই ঘর, সর সর—
আর নাই, আর নাই   ঘর বা'র তার নাই,

আঁকাবাঁকা ভঙ্গী শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে' ফিরে' চমকায় মাঝে মাঝে ধমকায়,
গাছে গাছে দোল খায় শিলাতলে টোল খায়,
পাকে পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে' ছুট্‌ছে।

সাপ সাপ, ঐ সাপ— সর্ সর্ বাপ বাপ!
সাপ নয়, সাপ নয় বরফেরও ধাপ নয়।
ওযে সেই ঝরণা গিরি ঘরকরণা—
ওযে মোর ঝরণা আপনার, পর না!

চিকমিক ঝিকমিক রবিকরে ধিক দিক,
ঝিকমিক চিকমিক কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম ঝম ঝম ঝম এযে দেখি কম কম,
কই কই, কোথা গেলা ইঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরি মাঝে ঝরিয়া!

ঐ ফের আলোতে সাদাতে ও কালোতে
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,
ফেনাময় মস্‌গুল বেল যূঁই কাশ ফুল—
কি ভীষণ তর্জ্জন মাঝে মাঝে গর্জ্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্ শাঁকচূন হাঁস বক
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্ বেটী কারো নয় বশ,
দুর্ম্মদ গতিতে পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে পাগলামি ছন্দে,
তড়বড় দড়বড় পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই কোথা কোন খুঁৎ নাই,

হরদম হরদম   ছুটে' চলে দুর্দ্দম,
ঝম ঝম, থম থম   ঐ বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে   ঠেকে বুঝি ডাহা রে।

তার পর তার পর   বা'র কর বা'র কর
চলিবার ফন্দী   ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার   হয় দেখি দুই ধার,
কই কই, সর্ সর্   দুধ দই ক্ষীর সর—

গদ্ গদ্ গদ্ গদ্   চলে যের তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্   কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল কল তল তল   আঁখি দেখি ছল ছল,
চোখে বুঝি আসে জল   বল্ বল্ ঠিক বল্;
থাম্ থাম্, আর না   থামা তোর কান্না—
ঐ দেখ গঙ্গা   তরলতরঙ্গা;
বিলিয়ে দে আপনায়   থাক্‌বেনা ভাবনাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মঁস্যো পিজনো।

(আনাতোল ফ্রাঁসের ফরাসী হইতে)

সবাই জানে আমি আমার সমস্ত জীবন মিশরীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় উৎসর্গ করিয়াছি। যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ বছর ধরিয়া এই পথে সসম্মানে অগ্রসর হইয়াছি; আজ এর জন্য আফ্‌শোষ করিতে বসিলে আমাকে যথার্থই স্বদেশের প্রতি, আমার আলোচ্য বিদ্যার প্রতি, এমন কি নিজের প্রতি অকৃতজ্ঞ পদবাচ্য হইতে হইবে। আমার শ্রমস্বীকার নিষ্ফল হয় নাই। আত্মপ্রশংসা না করিয়াও বলিতে পারি যে মৎপ্রণীত Mémoire sur un manche de miroir égyptien, du musée du Louvre* বইখানি প্রথম উদ্যমের শ্রেণীভুক্ত হইলেও আধুনিক কালে সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সেরাপেওঁ খনন কালে যে ব্রঞ্জ্ ওজন পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে মৎকৃত অতি বিস্তৃত গবেষণার উল্লেখ অবহেলা করিলে অসৌজন্য প্রকাশ পাইবে, কারণ উক্ত গবেষণার ফলেই Institut-র দ্বার আমার জন্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

এ বিষয়ে আমার গবেষণা বহু নবীন সহকর্ম্মীগণের নিকটে যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে, তাহাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া আমি একখানি গ্রন্থে টলেমী ও লেটের রাজত্বকালে (৮২-৫২) আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে ব্যবহৃত সকলপ্রকার ওজন ও তৌলপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাই। কিন্তু শীঘ্রই আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, এরূপ কোন সাধারণ বিষয় যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা

---

* Louvre মুজিয়মে রক্ষিত একটি মিশরী আয়নার হাতল সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

আলোচক হইতে পারে না, এবং ঐ [illegible] বিষয়াদি লইয়া যে বিজ্ঞানের কারবার তাহাকে এইরকম বিষয়ের আলোচনায় নামাইবার দুঃসাহসের ফল উদ্ভট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বুঝিতে পারিলাম যে, এককালে বহু বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া আমি পুরাতত্ত্ব আলোচনার মূল সূত্র সকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমার এই ভুল স্বীকার করিবার, ও যে অচিন্তনীয় উৎসাহফলে অসংযত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছিলাম তাহা জানাইবার উদ্দেশ্য তরুণ কর্ম্মীগণের উপকার সাধন, যাহাতে তাঁহারা আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কল্পনাকে জয় করিতে শিখেন। কল্পনাপ্রবৃত্তি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী শত্রু। যে পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় কল্পনাপ্রবৃত্তিকে গলা টিপিয়া মারিতে পারেন নাই, তাঁহার গবেষণায় কৃতকার্য্য হইবার আশা বৃথা। আমার কল্পনাশীল চিত্ত যে গভীর গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করে, সে কথা মনে করিলে আমি এখনও কম্পিত হই; লোকে যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহার ও আমার মধ্যে দুই আঙ্গুলমাত্র ব্যবধান ছিল। কি ভয়ানক অধোগতি! আমি প্রায় আর্টে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। ইতিহাস আর্ট ছাড়া কিছুই নহে; নেহাৎপক্ষে ভ্রষ্ট সায়ান্স্ মাত্র। আজ কে না জানে যে, যেমন জ্যোতির্ব্বিদের আগে গণক, রসায়ণবিদের আগে অপরসায়ণবিদ্, মানুষের আগে বানর বর্ত্তমান ছিল, তেমনি পুরাতত্ত্ব-বিদের আগে বর্ত্তমান ছিল ঐতিহাসিক? ভগবান রক্ষাকর্ত্তা! আমি সভয়ে পলায়ন করিয়াছি।

কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, আমার তৃতীয় গ্রন্থ পণ্ডিতোচিত ভাবেই লিখিত হয়। এটি একটি ইতিবৃত্ত; নাম, De la toilette d'une égyptienne, dans le moyen empire, d'aprés une

peinture inédite * কোনপ্রকারে ভুলপথে পা না পড়ে, এইরূপ সতর্কভাবে আমি উক্ত বিষয়ের আলোচনা করি। গ্রন্থে একটিও সাধারণ মতের অবতারণা করি নাই; যে সমস্ত ভাব, তুলনামূলক সমালোচনা ও মতের অবতারণা স্ব স্ব গ্রন্থে করিয়া আমার কোন কোন সহযোগী অতি চমৎকার আবিষ্ক্রিয়ার ব্যাখ্যারও সৌন্দর্য্যহানি ঘটাইয়া থাকেন, তাহা আমি পরিহার করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এমন সুচিন্তিত গ্রন্থেরও এমন অদ্ভুত পরিণতি কি করিয়া হইল? ভাগ্যের কি পরিহাসের ফলে এমন গ্রন্থও আমার মনের অতি অভাবনীয় যত ভুলের কারণস্বরূপ হইয়া পড়িল?—যাক্, এ সব পরবর্ত্তীকালের ঘটনা; আগে হইতে সে সকল কথা বলিব না, ঘটনার তারিখ গোলমাল করা ঠিক নহে। আমার এই ইতিবৃত্ত পাঁচটি পরিষদের এক সম্মিলিত বৈঠকে পঠিত হইবে স্থির হয়; এই সম্মান অধিকতর আদরণীয় এই কারণে যে, এ ধরণের লেখার পক্ষে তাহা দুর্লভ। কয়েক বছর হইল এই সকল পরিষদ-বৈঠকে সৌখীন শ্রেণীর লোকের ঘন ঘন যাতায়াত সুরু হইয়াছে।

আমার বক্তৃতা হইবার নির্দ্ধারিত দিনে সভা-গৃহ এইরূপ সৌখীন শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত হইলেন; গ্যালারীগুলিতে সুন্দর মুখ ও উজ্জ্বল পোষাক দীপ্তি পাইতে লাগিল। সকলে শ্রদ্ধাসহকারে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সাহিত্যিক চুট্‌কী সাধারণতঃ যেরূপ নির্ব্বোধ ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে, সেরূপ কোন হট্টগোল দ্বারা আমার

* একটি অপরিচিত চিত্র হইতে মধ্য সাম্রাজ্যের মিশরী নারীর বেশভূষা সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ।

বক্তৃতা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। যেরূপ প্রকৃতির বিষয় শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তাঁহারা যথার্থই তাহার উপযোগী ভাবই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে মনোযোগ ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল।

বক্তৃতার মধ্যে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনকালে পার্থক্য রক্ষার্থে যে বিশ্রামচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার অবকাশে সমস্ত কক্ষটি আমার চশমার উপর দিয়া মনোযোগসহকারে দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছিলাম। আমি বেশ বলিতে পারি যে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে চপল হাসি খেলাইয়া বেড়াইতে দেখি নাই। বরং বিপরীত! সব চেয়ে কচি কচি মুখগুলিতেও গভীর গাম্ভীর্য্য বিরাজিত। আমার মনে হইল যেন যাদুমন্ত্রবলে সমস্ত কাঁচা মনকে আমি পাকাইয়া দিয়াছি। আমার বক্তৃতা পাঠকালে মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তিনীগণের কানে মৃদুস্বরে কি বলিতেছিল। আমার ইতিবৃত্তে উল্লেখিত কোন বিশেষ ব্যাপারই যে তাহাদের কথোপকথনের বিষয় ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কি সৌভাগ্য! বাইশ তেইশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণী উত্তর গ্যালারীর বাম কোণে বসিয়া মন দিয়া বক্তৃতা শুনিতে ও নোট টুকিয়া লইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি রেখাটির সুস্পষ্ট ভঙ্গী ও ভাবব্যঞ্জনার স্ফুর্ত্তি বাস্তবিক আশ্চর্য্য। আমার কথা মন দিয়া শুনিবার যে ভঙ্গী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব মুখাবয়বের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে লোক ছিল। আসিরীয়া দেশের রাজগণের ন্যায় কুঞ্চিতশ্মশ্রু ও দীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশধারী, দীর্ঘ ও দৃঢ়কায় এক ব্যক্তি তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, এবং

মাঝে মাঝে নিম্নস্বরে দুই একটি কথা তাঁহাকে বলিতেছিল। আমার মন প্রথমে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের উপরে বিস্তৃত থাকিলেও, ক্রমশঃ তাহা উক্ত তরুণীর উপরেই সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার যেরূপ কৌতূহল হইয়াছিল, আমার কোন কোন সহযোগীর মতে তাহা আমার মত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু আমি বলিতে পারি যে, এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাও আমাপেক্ষা বেশী উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। আমার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানি ছোট পকেট-নোটবহিতে আঁচড় কাটিয়া যাইতে লাগিলেন; দেখিয়া মনে হইল যে, আমার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে পরস্পরবিরোধী নানা ভাব তাঁহার মনের মধ্যে দিয়া বহিয়া যাইতেছে,—সন্তোষ ও আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্চর্য্য ও অস্বস্তির ভাব পর্য্যন্ত। প্রবর্দ্ধমান কৌতূহলের সহিত আমি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আজ মনে হইতেছে সেদিন ঐ সভাগৃহে তাঁহাকে না দেখিলেই ভাল হইত!

প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম; আর পঁচিশ কি বড় জোর ত্রিশ পাত পড়িতে বাকী ছিল, এমন সময় আমার দুই চোখ ঐ আসিরীয় দাড়ীওয়ালার চোখের সঙ্গে মিলিত হইল। তারপরে যাহা ঘটিল আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিব? এই মাত্র বলিতে পারি যে, ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি এক নিমেষের মধ্যে আমাকে এক অভাবনীয় বিপদের মধ্যে ফেলিল। যে চোখের দৃষ্টি এইরূপে আমার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার দুই তারকা স্থির ও ফিকে সবুজ রংয়ের। আমার নিজের চোখ আর

ফিরাইয়া লইবার শক্তি ছিল না। আমি মুখ বন্ধ করিয়া "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি চুপ করিতেই হাততালি আরম্ভ হইল। তাহা থামিলে পুনরায় বক্তৃতা করিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ঐ দুইটি প্রজ্জ্বলিত আলোর প্রতি অজ্ঞাত কারণে নিবদ্ধ আমার চোখ দুটিকে কোন মতে সরাইতে সক্ষম হইলাম না। শুধু তাই নয়। ততোধিক অভাবনীয় ঘটনাক্রমে আমার আজীবন অভ্যাসের ব্যতিক্রম করিয়া মৌখিক বক্তৃতা জুড়িয়া দিলাম। ঈশ্বর জানেন সেটা কতখানি অনিচ্ছাকৃত! এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত, অদম্য শক্তির তাড়নায় আমি যুগে যুগে প্রচলিত স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাসের দার্শনিক তাৎপর্য্য তন্ময় হইয়া সুসঙ্গত ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, তথ্যবিবৃতি ছাড়িয়া সাধারণ মত প্রকাশ করিতে লাগিলাম, কবিত্ব দেখাইতে লাগিলাম,—ভগবান আমায় ক্ষমা করুন,—নারীর রূপ লুকাইয়া রাখিবার সুগন্ধী অবগুণ্ঠনের চতুঃপার্শ্বে সঞ্চরণশীল মৃদু পবনের সহিত চির অশান্ত কামনাকে তুলনা করিয়া "চিরন্তন নারী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ফেলিলাম।

আমি যখন বলিয়া যাইতেছি, আসিরীয় দাড়ীওয়ালা লোকটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিল। অবশেষে সে দুই চোখ নত করিল, আর আমিও থামিয়া গেলাম। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই মৌখিক বক্তৃতাটুকু আমার স্বকীয় প্রেরণার বহির্ভূত এবং বৈজ্ঞানিক মনের বিরুদ্ধ হইলেও সোৎসাহ প্রশংসাধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইল। উত্তর দিকের গ্যালারীতে উপবিষ্টা তরুণী হাততালি দিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

আমার পরে একাডেমীর একজন সভ্য বক্তৃতামঞ্চে উঠিলেন;

আমার বক্তৃতার পরে বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে কিছু যেন বিমর্ষ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার অতটা ভয়ের বোধহয় কোন কারণ ছিল না। তিনি যাহা পড়িলেন তাহা শ্রবণকালে কাহারো বিশেষ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায় নাই; আমার যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহার বক্তব্য যেন পদ্যে লিখিত হইয়াছিল।

বৈঠক শেষ হইলে কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে আমি সভাগৃহ ত্যাগ করিলাম, তাঁহারা নূতন করিয়া আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ প্রশংসা আন্তরিক বলিয়া গ্রহণ করাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

সিঁড়ির উপর, ক্রোজার সিংহমূর্ত্তির কাছে দুই একটি পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দ্দন করিবার জন্য দাঁড়াইতেই দেখিলাম যে, ঐ আসিরীয় দাড়ীওয়ালা ব্যক্তি ও তাহার সুন্দরী সঙ্গিনী গাড়ীতে উঠিতেছেন। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে আমি একজন নামী বাগ্মী দার্শনিকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি নাকি পার্থিব সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমান অভিজ্ঞ। তরুণী গাড়ীর জানালা দিয়া স্বীয় সুগঠিত মস্তক ও ক্ষুদ্র হস্ত বাহির করিয়া নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন ও ঈষৎ ইংরেজী উচ্চারণে তাঁহাকে বলিলেন,—

—"বেশ ত, আপনি ভুলে গেছেন আমাকে, ভারি অন্যায়!"

গাড়ী চলিয়া গেলে আমার বিখ্যাত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ সুন্দরী তরুণী ও তাহার সঙ্গীটি কে? তিনি বলিলেন—

"কিরকম! আপনি মিস্ মরগান ও তাঁহার চিকিৎসক দাউদকে চেনেন না? ঐ ডাক্তার ম্যাগ্নেটিস্‌ম্, হিপ্নোটিস্‌ম্ ও চিন্তাশক্তি দ্বারা সবরকম অসুখের চিকিৎসা করে। আনি মরগান

সিকাগোর সব চেয়ে ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে, দু' বৎসর হ'ল সে তার মায়ের সঙ্গে পারীতে এসেছে ও চমৎকার বাড়ী তৈয়ের ক'রে বাস ক'রছে। মেয়েটি সুশিক্ষিতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী।"

আমি বলিলাম "আপনার কথা শুনে বিশেষ আশ্চর্য্য হলেম না। এর মধ্যেই আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই আমেরিকান তরুণী অত্যন্ত চিন্তাশীলা বটেন।"

আমার খ্যাতনামা সহযোগী একটু হাসিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন।

আমি আমার রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িলাম। এইখানে একটা সামান্যরকমের বাড়ীতে আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছি। বাড়ীর ছাদ হইতে Luxembourg উদ্যানের বৃক্ষচূড়া চোখে পড়ে। গৃহে ফিরিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

তিনদিন ধরিয়া অধ্যবসায়সহকারে কার্য্যে মন দিলাম। সম্মুখে মার্জ্জারমুখী পাষ্ট্ দেবীর ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গে একটি অনুলিখন আছে, মঃ গ্রেবো উহা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন নাই। আমি ঐ বিষয়ে একটি সটীক বক্তৃতা প্রস্তুত করিতেছিলাম। যতখানি ভয় করা গিয়াছিল Institut-র ঘটনা আমার মনে ততখানি গভীর চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারে নাই; ঐ কথা মনে করিয়া আমি তেমন বিব্রত বোধ করিতেছিলাম না। সত্য বলিতে কি, আমি উহার কথা কতকটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, নূতন কোন ঘটনা না ঘটিলে উহার স্মৃতি আর পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই তিন দিনে আমার বক্তৃতা ও টীকা শেষ করিয়া আনিবার মত অবকাশ বেশ পাওয়া গেল। পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে বিশ্রাম লইতাম কেবল পত্রিকাদি পড়িবার সময়, সেগুলি সমস্ত

আমার প্রশংসায় পূর্ণ। যে-সব পত্রিকার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই, সেগুলিও আমার ইতিবৃত্তের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" স্বরূপ পরিশিষ্টটুকুর তারিফে মুখর। উহাদের মন্তব্যের এই সুর,—"জিনিষটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত; মঃ পিজনোর নিকটে ইহা পাইয়া আমরা এককালে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।" এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ কেন যে করিতেছি বলিতে পারি না, কারণ মুদ্রাযন্ত্রে আমার সম্পর্কীয় আলোচনার বিষয় আমি সম্পূর্ণ উদাসীন।

তিন দিন আমার ঘরে এইরূপে আবদ্ধ থাকিবার পর দরজার ঘণ্টা বাজিবার শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। ঘণ্টার দড়ি টানিবার মধ্যে আদেশব্যঞ্জক, অদ্ভুত ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব একটা ধরণ ছিল, তাহা আমাকে সংশয়ান্বিত করিয়া তুলিল; অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি নিজেই দরজা খুলিতে গেলাম। সিঁড়ির মাথায় এ কে?—আমার সেদিনকার প্রবন্ধের অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোত্রী আমেরিকান তরুণী মিস্ মর্গান স্বয়ং!

—মঁস্যো পিজনো?

—আমিই তিনি।

—সে সবুজে হাতা-ওয়ালা কোটটা গায়ে না থাক্‌লেও আপনাকে আমি খুব চিন্‌তে পেরেছি, তা দেখুন, আমি এসেছি ব'লে দয়া ক'রে সেটা আর পর্‌তে যাবেন না। এই পোষাকে থাক্‌লেই আপনাকে আমার বেশী ভাল লাগবে।

তাঁহাকে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি একবার কুতূহলী দৃষ্টিতে ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত নানাপ্রকার ভূর্জ্জপত্র, শীলমোহর, মূর্ত্তি ইত্যাদির দিকে চাহিলেন, নিস্তব্ধ ভাবে

কয়েক মুহূর্ত্ত আমার টেবিলের উপরিস্থিত পাস্‌ট্-দেবীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন ; অবশেষে বলিলেন,—

—এটি ত চমৎকার !

—মাদামো'জেল কি এই ছোট মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে কথা বলিতে ইচ্ছা করেন ? এর অনুলিখন সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে যা' শোনবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু আমার এখানে আপনার পদধূলি দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?

—ওঃ ! অনুলিখনের বিশেষত্ব আমার কাছে হাস্যকর বলে' মনে হয়। এই মূর্ত্তির বিড়াল অবয়বটির খোদাই চমৎকার। আচ্ছা, মঁস্যো পিজনো, এটি যে সত্যি একটি দেবী, আপনি তা' নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ?

আমি এইরূপ অনিষ্টকর অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইলাম। বলিলাম,—এরূপ বিশ্বাস পৌত্তলিকতার পরিচায়ক।

তাঁহার বড় বড় দুটি সবুজে চোখের বিস্ময়সূচক দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল।

—বটে ! আপনি পৌত্তলিক ন'ন ? আমি ভাবতেম পৌত্তলিক না হ'লে কেউ পূরামাত্রায় তত্ত্ববিদ্ হ'তে পারে না। পাস্‌ট্‌কে যদি আপনি দেবী ব'লে বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁর বিষয়ে আপনার আগ্রহ কিসের জন্য ? -সে কথা যাক্। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি একটা বিশেষ জরুরী কাজের জন্য।

—বেশী দরকারী কি ?

—হাঁ, একটা পোষাক সম্বন্ধে। আমার দিকে চে'য়ে দেখুন।

—সানন্দে।

—আচ্ছা, আমার মুখের চেহারায় আপনি কুশিৎজাতের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না ?

আমি হাঁ করিয়া রহিলাম। এ প্রকার আলাপ আমার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

—এতে অবাক হবার কিছুই নেই। আমার মনে পড়ে আমি মিশরী ছিলেম। আপনিও মিশরী ছিলেন না কি গঁস্তো ? কিছুই মনে পড়ে না আপনার? আশ্চর্য্য বটে! আচ্ছা, আমরা যে ক্রমাগত দেহ হতে দেহান্তর গ্রহণ করি, সে বিষয়ে আপনার নিশ্চয় সন্দেহ নেই ?

—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ, মাদামো'জেল্।

—আপনি যে আমাকে অবাক্ ক'রে দিলেন, গঁস্তো পিজনো।

—মাদামো'জেল, এখানে আপনার পদধূলি পড়বার কারণ·······

—ঠিক কথা, এখনও আপনাকে বলা হয় নাই যে, কঁতেস্ N-এর ফ্যান্সীড্রেস বল্ নাচের জন্য একটা মিশরী পোষাক তৈরী করবার সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। এই পোষাক সর্ব্বাংশে সত্যিকার মত ও খুব সুন্দর হওয়া চাই। আমি এর জন্য বহু পরিশ্রম করেছি। পুরাণো স্মৃতি মনে করে' করে' দেখেছি, কারণ এখনও আমার মনে পড়ে ছয় হাজার বৎসর আগে আমি থীব্‌সে বাস করতেম। লণ্ডন, বুলাক ও নিউইয়র্ক্ থেকে নক্সা আনিয়েছি।

—তাতেই ত জিনিষটা ভাল হ'ত।

—উঁহু, অন্তরের ভিতর যা' স্বতঃ প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে ঠিক আর কিছুই হতে পারে না। আমি Louvre-এর মিশরী ম্যুজিয়ম্‌ও দেখেছি। কি সব চমৎকার জিনিষ সেখানে! পাৎলা, সুছাঁদ

অঙ্গসৌষ্ঠব, অতি কোমল মুখাবয়ব, ফুলের মত চেহারার নারীমূর্ত্তিসকল, তা'তে যুগপৎ দৃঢ়তা ও কমনীয়তা কেমন ক'রে যেন প্রকাশ পাচ্ছে! আবার একটা বেস্ দেবের মূর্ত্তি আছে, যা' দেখ্‌তে সারসের মত! উঃ, সেখানে সব জিনিসই যে কি চমৎকার!

—মাদামো'জেল, আমি এখনও জান্‌তে পারিনি...

—এইখানেই শেষ করিনি। আপনার মধ্য সাম্রাজ্যের আমলে স্ত্রীলোকের বেশভূষা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি, ও সে সম্বন্ধে নোট নিয়েছি। আপনার প্রবন্ধটা একটু শক্ত হয়েছিল যদিও, বুঝতে আমাকে রীতিমত লড়াই ক'র্‌তে হয়েছে। এই সমস্ত নজিরের জোরে আমি একটা পোষাক খাড়া ক'রে তুলেছি, কিন্তু সেটা এখনও ঠিক অভিপ্রায়মত হয় নি; সেটার যা' ত্রুটি আছে আপনি শুধ্‌রে দেবেন, এই অনুরোধ আপনাকে ক'র্‌তে এসেছি। কাল আমার বাড়ী একবার আসবেন, প্রিয় মঁস্যো, আপনার মিশরপ্রীতির খাতিরে নাহয় এটুকু কষ্ট করবেন। কাল আবার দেখা হবে। তাড়াতাড়ি যেতে হ'চ্ছে, মা গাড়ীতে আমার অপেক্ষায় আছেন।

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি ছুটিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমি পাশের ঘরে যাইতে না যাইতে তিনি সিঁড়ির তলায় পৌঁছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার পরিষ্কার স্বর আমার কানে আসিল:—

—কাল দেখা হবে! ভিলা সাইদের মোড়ে থাকি।—আমি মনে মনে বলিলাম এই পাগলের বাড়ী কখনই যাচ্ছিনে।

পরদিন চারিটার সময় আমি তাঁহার বাড়ীর দরজার কড়া নাড়িলাম। একজন চাকর কাঁচের দরজাওয়ালা একটা প্রকাণ্ড

ঘরে লইয়া গেল ; সে ঘরে স্তূপাকার চিত্র এবং ব্রঞ্জ্ ও মার্ব্বেলের মূর্ত্তি ; বার্নিশ্-করা সিডান-চেয়ারের উপর চীনাপাত্র ; পেরুদেশীয় মমী ; বারটি বর্ম্মাবৃত মানুষ ও ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি ; অপেক্ষাকৃত ছোট সাদা ডানাওয়ালা ও টুর্নামেণ্টের পোষাকপরা একটি পোল অশ্বারোহী, উষ্ণীষের উপরে মধ্যযুগের শিংওয়ালা মস্তকাবরণভূষিত এক ফরাসী অশ্বারোহী, চিত্রিত ও ঘোমটাঢাকা এক স্ত্রী-মস্তক। ঘরের ভিতর খেজুর গাছের যেন একটা আস্ত বন গজাইয়াছে, তাহার মাঝখানে এক বিশাল স্বুবর্ণ বৌদ্ধ মূর্ত্তি আসীন ; ঐ দেবতার পাদমূলে বসিয়া ময়লা পোষাকপরা এক বৃদ্ধা বাইবেল পাঠ করিতেছে। এই অসংখ্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়া আমি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া আছি, এমন সময় মাদামোয়াজেল মর্গান হংসখচিত ড্রেসিংগাউন পরিয়া একটি লাল রংয়ের পর্দ্দা ঠেলিয়া হঠাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং আমার দিকে অগ্রসর হইলেন—পাছে পাছে লম্ব-নাসিক দুইটি ডেনিস্ কুকুর। তিনি বলিলেন,

—আমি জানতেম মঁস্তো আস্বেন।

আমি অস্পষ্ট স্বরে একটা চাটু বাক্য ব্যবহার করিলাম,—এমন সুন্দরীর কথা কেমন করে অমান্য করি ?

—ওঃ! আমি সুন্দর ব'লে যে লোকে আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে না, তা নয়। আমার অনুরোধ রাখ্তে বাধ্য করবার কতক গুলো রহস্য আছে।

তারপর বাইবেলপাঠে নিযুক্তা বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বললেন,—ওদিকে মন দেবেন না, উনি আমার মা। আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব না। আপনি কথা কইলে উনি উত্তর নাও দিতে পারেন ; উনি

যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তার নিয়ম হচ্ছে বাজে কথা না বলা। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুনচট্‌ পরেন, কাঠের পাত্রে আহারাদি করেন। মা এই সব আচারনিয়মের ভারি ভক্ত। যাক্, মার কথা বলবার জন্য আপনাকে আনি নি, তা' বুঝ্‌তেই পারছেন। আমি মিশরী পোষাকটা পরতে যাচ্ছি, বেশীক্ষণ লাগবে না। ততক্ষণ এই সামান্য জিনিষগুলো দেখতে পারেন।

তিনি একটা আলমারীর সম্মুখে আমাকে বসাইয়া দিলেন, তাহার ভিতর একটা মসীর আধার, মধ্য সাম্রাজ্যের আমলের কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তরপতঙ্গ (scarabées) এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়োচিত প্রার্থনাসম্বলিত কয়েক টুকরা লিখন।

একা বসিয়া বসিয়া আমি মনোযোগসহকারে এই ভূর্জ্জ পত্রটি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ উহার মধ্যে একটি নাম আমার চোখে পড়িল, ইতিপূর্ব্বে একটা শীলমোহরে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, এই নাম রাজা প্রথম সেতির একজন লেখকের। তৎক্ষণাৎ এই দলিলের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ যে এই কাজে ডুবিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না; হঠাৎ অনুভব করিলাম আমার পশ্চাতে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। ফিরিয়াই দেখিলাম এক আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি, মস্তকে স্বর্ণ-জালাবরণ, অঙ্গে শুভ্রবসন সংলগ্ন, তাহার ভিতর দিয়া তাহার যৌবনাঢ্য বরবপুর পরম সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। এই বসনের উপর পাৎলা গোলাপী অঙ্গ-রাখাটি রত্নভূষিত কটীবন্ধ দ্বারা কটীদেশে আবদ্ধ হইয়া ফুলিয়া সুবিন্যস্ত ভাঁজে ভাঁজে নীচে নামিয়াছে; বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত এবং বলয়াদি দ্বারা ভূষিত।

তিনি আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, ডান কাঁধের দিকে মাথাটি এমন সুন্দর ভঙ্গীতে হেলাইয়া যে, তাহাতে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ফুটিয়া উঠিল।

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—একি! মিস্ মরগান, আপনি? তিনি বলিলেন,—যদি না মানেন যে নেফেরু রা সশরীরে হাজির, তবে আমিই বটে। Leconte de Lisle-এর নেফেরু-রা, সূর্য্যের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জানেন?...

Voici q'uelle languit sur son lit virginal,

Très pâle, enveloppée avec des fines toiles *

কিন্তু না, আপনি জানেন না, আপনি ত কাব্যের খোঁজখবর রাখেন না। ভারি সুন্দর কবিতাটি কিন্তু...। আসুন, কাজ আরম্ভ করা যাক্।

বিস্ময় দমন করিয়া আমি তরুণীকে তাঁহার অতি চমৎকার পোষাক সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। উহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের দিক দিয়া সামান্য যাহা ত্রুটি আছে, দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। অঙ্গুরীয়ের মধ্যে যে পাথর দেওয়া হইয়াছে, তাহা বদ্‌লাইয়া মধ্য সাম্রাজ্যের আমলে সর্ব্বদাব্যবহৃত অন্য পাথর দিবার প্রস্তাব করিলাম। পরিশেষে অঙ্গসংলগ্ন একটি বিশেষ অলঙ্কার সম্বন্ধে আমি ঘোরতর আপত্তি করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত অলঙ্কার পরাতে নির্ম্মমভাবে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা

---

* কোথায় পালঙ্কে বালা আলসে শায়িত,
পাণ্ডু অতি, সূক্ষ্ম বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।

হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে সময়োপযোগী বহুমূল্য প্রস্তরখচিত সুবর্ণ অলঙ্কার দিবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি অতিশয় বাধ্য মেয়েটির মত আমার কথা শুনিতে লাগিলেন, এবং আমার উপর এতটা খুসী হইয়া উঠিলেন যে, আমাকে ডিনারে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। আমার নিয়মপালন, মিতাহার ইত্যাদির কথা বলিয়া আমি অসম্মতি জানাইলাম ও বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমি বাহিরের ঘরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—শুন্ছেন? আমার পোষাকটা মনোমত হয়েছে ত? কঁতেস্ N-এর বল্ নাচে এটা পরে' আর সব মেয়ের উপর টেক্কা দিতে পার্‌ব ত?

এরকম কথা শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার তাঁহার মোহে অভিভূত হইলাম।

তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—মঁস্যো পিজনো, আপনি ভারি ভাল লোক। আমাকে একটা গল্প লিখে দিন, আমি আপনাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাস্‌ব।—আমি আমার অক্ষমতা জানাইলাম।

তাঁহার সুন্দর দুই কাঁধ তুলিয়া তিনি বলিলেন—যদি গল্প তৈরী করাই না যাবে, তবে আর বিজ্ঞানের সার্থকতা কি? আপনি নিশ্চয়ই একটা গল্প লিখে দেবেন।

আবার অস্বীকার করা নিরর্থক হইবে বুঝিয়া আমি নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দরজায় দেখা হইল সেই আসিরীয় দাড়ীওয়ালা লোকটা, ডাক্তার দাউদের সঙ্গে, যাহার দৃষ্টি Institut-এ আমার অভূতপূর্ব্ব বিপদের

কারণ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সাধারণ লোক বলিয়া বোধ হইল। এই সাক্ষাৎ আমার মোটেই ভাল লাগিল না।

কঁতেস্ N-এর গৃহের বল্ নাচ আমার এই সাক্ষাতের প্রায় দিন পনেরো পরে। মিস্ মরগান নেফেরু-রার পোষাকে এক অভিনব উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খবরের কাগজে পড়িয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অবশিষ্টাংশে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনি নাই। নব বৎসরের প্রথম দিনে আমার ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি চিঠি ও একটি ঝুড়ি লইয়া উপস্থিত।

—মিস্ মরগান পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ঝুড়িটা আমার টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটা মিউ মিউ শব্দ আসিতেছিল। উহা খুলিতেই একটি ছোট কটা বিড়াল বাহির হইয়া পড়িল।

এটি অঙ্গোরাদেশীয় বিড়াল নহে, একরকম প্রাচ্যজাতীয়; আমাদের দেশীয় অনেক বিড়ালের তুলনায় অতি হালকা, এবং আমার মনে হইল থীব্‌সের মাটির নীচের ঘরগুলিতে যেরকম বিড়ালের 'মমী' প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকটা সেই জাতের। প্রথমে সে গা-ঝাঁকানি দিল, তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর গা-মোড়া দিল, তারপর হাই তুলিল, তারপর ঘর্ ঘর্ স্বরে আমার টেবিলের উপরের সুগঠিতা তীক্ষ্ণনাসিকা পাস্ট্‌দেবীর অঙ্গে গা ঘষিতে লাগিল। কটা রং ও ক্ষুদ্র লোমবিশিষ্ট হইলেও তাহার চেহারায় লালিত্য ছিল; তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধিমান বলিয়া মনে

হইল, এবং আচরণে তেমন অসভ্য বলিয়া বোধ হইল না। এরকম অদ্ভূত উপহার পাঠাইবার কি কারণ থাকিতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না। মিস্ মর্গানের পত্রও এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিল না। চিঠিখানি এইরূপ—

প্রিয় মঁস্যো,

আমি একটি ক্ষুদ্র বিড়াল আপনাকে পাঠাইতেছি, উহা ডাক্তার দাউদ মিশর হইতে আনিয়াছেন এবং আমার খুব প্রিয়। আমার খাতিরে উহাকে সুখে রাখিবেন। Stéphane Malarmé-র পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি Baudelaire বলিয়াছেনঃ—

Les amoureux fervents et les savants austéres
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil da la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. *

আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে আপনার কাছে আমার একটা গল্প পাওনা রহিয়াছে। আগামী বারো তারিখে সেটা আনিবেন। সেদিন আপনার ডিনারের নিমন্ত্রণ রহিল।

আনি মরগান।

* প্রেমিক উদ্দাম আর পণ্ডিত সংযতী,
সুপক্ক বয়সকাল তাঁদের যখন,
উভয়ে আকৃষ্ট হ'ন বিড়ালের প্রতি;
সবল কোমল যারা, গৃহের ভূষণ,
নিস্তেজ নিশ্চল যারা, তাঁদেরই মতন॥

পুনশ্চ। আপনার ক্ষুদ্র বিড়ালটির নাম "পোরু"।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া পোরুর দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া টান হইয়া তাহার দেব-ভগ্নী পাস্‌টু দেবীর নাসিকালেহনে নিযুক্ত রহিয়াছে। সে আমার দিকে চাহিল; আমার বলা কর্ত্তব্য যে আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিকতর বিস্মিতভাব আমারই ছিল।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—ওটা কি বল্‌তে চায়?

তারপরেই এ বিষয়ে কিছু বুঝিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। নিজেকেই উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম,—তুমি ত আচ্ছা লোক, যে একটা মাথা-পাগল মেয়ের পাগলামির অর্থ বাহির করিতে বসিয়াছ! কাজে লাগিয়া যাও। গৃহকর্ত্রী মাদাম মগোয়ার এই ঈশ্বরের জীবটির সম্যক তত্ত্বাবধান করিবেন। কোন একটা প্রাচীন ঘটনার কাল নিরূপণ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আমার হাতে ছিল, সেটা লইয়া বসিলাম; উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার একটু বেশী আগ্রহ ছিল এই যে, তাহাতে আমার প্রসিদ্ধ সহকর্ম্মী মঁস্যো মাস্‌পেরো মহাশয়কে একটুখানি সমঝাই-বার সুবিধা পাওয়া গিয়াছিল। "পোরু" আমার টেবিলের উপর বসিয়াই ছিল। পিছনে ভর দিয়া বসিয়া, দুই কান খাড়া করিয়া সে আমার লেখা দেখিতেছিল। বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, সেদিন আমার কোন কাজই হইল না। আমার মাথার ভিতর ওলট্ পালট্ হইয়া গেল; মনের ভিতর পুরাতন গানের ভাঙ্গা পদ ও রূপকথার টুক্‌রা আসিয়া ভিড় করিল। নিজের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শুইতে গেলাম। পরদিন দেখি "পোরু" সেইরূপ টেবিলের উপর বসিয়া পদলেহন করিতেছে। এদিনও আমার কাজ ভাল

হইল না; দিনের ভিতর সবচেয়ে ভাল সময়টা আমি ও "পোরু" পরস্পরের দিকে চাহিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিনও সেইরকমে গেল, তার পরের দিনও; সমস্ত সপ্তাহটাই এইরকমে গেল। ইহাতে আমার দুঃখিত হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই অঘটন ধৈর্য্যের সঙ্গে, এমন কি স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই সহ্য করিয়া গেলাম; ভাল লোক খারাপ হইতে কত কম বিলম্ব হয় দেখিলে ভয় হইবার কথা। পরের রবিবার অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি পাঠাগারে দৌড়িলাম—"পোরু" তাহার অভ্যাসমত আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। টেবিলে বসিয়াই সাদা কাগজের একখানা খাতা টানিয়া লইলাম, কলমটা কালিতে ডুবাইলাম, এবং আমার নূতন বন্ধুটির দৃষ্টির সাম্‌নে বড় বড় হরফে লিখিলাম—Mésaventures d'un commissionaire borgne (একচক্ষু মুটের বিপদকাহিনী)। তারপর "পোরুর" দিক হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া আমি সমস্ত দিন লিখিয়া চলিলাম, ভয়ানক দ্রুতবেগে কলম ছুটিল। সে গল্পের বর্ণিত কীর্ত্তিকাহিনী এমনই তাজ্জব, কৌতুকাবহ ও বিচিত্র যে, আমি নিজেই হাসিয়া আকুল হইলাম। আমার একচক্ষু মুটেপ্রবর মোট লইয়া নানা গোলমাল ও চূড়ান্ত মজাদার ভুল করিতে লাগিল। কয়েকজন রসিকা স্ত্রীলোক অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হইলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে তাহাদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিল। সে আলমারী ও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত পুরুষমানুষদের ঘাড়ে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল, লইয়া গিয়া নূতন জায়গায় ইয়া দিল, সেখানকার বৃদ্ধা মহিলাগণ ত আলমারী খুলিয়া ভয়েই যাই হোক্, এমন মজার গল্প কি বিশ্লেষণ করা চলে?

লিখিতে লিখিতে অন্তত বার কুড়ি উচ্চহাস্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। "পোরু" না হাসিয়া উঠিলেও তাহার গম্ভীর কান্তি অতিশয় আহ্লাদিত ব্যক্তির মুখের মতই দেখাইল। এই চমৎকার গল্পের শেষ লাইন যখন লেখা হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। ইহার এক ঘণ্টা আগে হইতে "পোরুর" দুই উজ্জ্বল চক্ষু ছাড়া ঘরে আর কোনরূপ আলো ছিল না। ভালরকম বাতির আলো থাকিলে যেমন সহজে লিখিতাম, অন্ধকারেও আমি তেম্নি সহজে লিখিতে পারিলাম। গল্প শেষ হইলে পোষাক পরিলাম; কালো কোট ও সাদা গলাবন্ধ লাগাইয়া, "পোরু"র নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রাস্তায় গিয়া পড়িলাম। কুড়ি পা যাইতে না যাইতে কোটের হাতা ধরিয়া কে টান দিল।

—খুড়োমশাই, দানোয়-পাওয়া ব্যক্তির মত ছুটে এসে এমন ভাবে কোথায় চলেছেন?

ফিরিয়া দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তা আমার ভাইপো মার্‌সেল। সে এক-জন বাস্তবিক সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সাল্‌পেট্রিয়ের চিকিৎসক। লোকের বিশ্বাস সে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নাম করিতে পারিবে। এ কথা ঠিক যে, নিজের খামখেয়ালী কল্পনাপ্রবৃত্তিকে আর একটু দমনে রাখিতে পারিলে তাহার মাথাটা আরো খেলিবে। আমি তাহাকে বলিলাম—আমি যাচ্ছি মিস্ মর্‌গানের কাছে, আমার রচিত একটা গল্প নিয়ে।

—সে কি! আপনি আবার গল্প লেখেন, আর মিস্ মর্‌গানের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক বটে। তা'হলে আপনি ডাক্তার দাউদকে জানেন, সেই যে লোকটা তাঁর সঙ্গে সর্ব্বত্র ঘোরে?

—বেটা হাতুড়ে বদ্যি, জোচ্চোর!

—তা হ'তে পারে, কিন্তু সে একজন অসাধারণ গুণী লোক, এ কথা নিশ্চিত। যে সকল ব্যাপার সে ইচ্ছামাত্র ঘটায়, Bernheim, Liegeois এমন কি Charcot পর্য্যন্ত তা'তে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। সম্মোহন ও ভাবসঞ্চালন-ক্রিয়া সে বিনা স্পর্শ দ্বারা, কোনরূপ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে, একটা জন্তুর ভিতর দিয়ে নিষ্পন্ন করতে পারে। সাধারণত সে এই সব কাজ ছোট লোমওয়ালা, ক্ষুদ্র বিড়ালের সাহায্যে ক'রে থাকে। তার কাজের ধরণ এইরূপঃ—প্রথমতঃ একটা বিড়ালের মধ্যে যে-কোন কাজের জন্য সে ভাবসঞ্চালন করে, তারপর একটা ঝুড়ির মধ্যে বিড়ালটাকে ভ'রে, যা'কে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায় তার কাছে পাঠায়। বিড়াল তার মধ্যে ভাবটা প্রেরণ করে, এবং রোগী ভাবসঞ্চালকের আদেশানুযায়ী কাজ করে।

—সত্যি?

—সত্যি, খুড়োমশাই।

—আর মিস্ মর্‌গান এই চমৎকার ব্যাপারে কোন্ অংশ অভিনয় করেন?

—মিস্ মর্‌গান দাউদকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নে'ন, এবং এই সম্মোহন ও ভাব-সঞ্চালন বিদ্যার সাহায্যে মানুষকে যতরকম নির্ব্বুদ্ধির কাজ আছে-তাই করতে প্রবৃত্ত করান, যেন তাঁর রূপ এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি আর কিছু শুনিলাম না। অদম্য একটা শক্তি আমাকে মিস্ মর্‌গানের বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীনলীমাধব চৌধুরী।

সম্পাদকের নিবেদন।

—:০:—

যেদিন রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে নিজ মত সবুজ পত্রে প্রকাশ করেন, সেই দিনই বুঝি যে রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করতে অনেকে উৎসুক হবেন। বাঙলা দেশে ক'জন চরকার সাধনা করেন জানিনে, কারণ যাঁরা করেন তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই সে সাধন গুপ্তসাধন। কিন্তু কেউ চরকার উপর হস্তক্ষেপ করলে যাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এমন লোক অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আর এ দলের ভিতর যাঁরা লেখক, তাঁরা যে তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন, সে ত জানা কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের দুটি প্রতিবাদ আমার হস্তগত হয়েছে, দুটিই ধীরভাবে লিখিত ও সুলিখিত। তবে সে দুটি প্রতিবাদ আমি দুটি কারণে সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে ইতস্তত করেছি।

প্রথমত চরকার আন্দোলনে সবুজপত্রের ক্ষুদ্রদেহ আন্দোলিত করবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার ছিল না। আর যতদূর জানি এই দীর্ঘসূত্র আলোচনার সূত্র আরও দীর্ঘ করবার অভিপ্রায় রবীন্দ্র নাথেরও ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কারণে আমার বিশ্বাস ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তর একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে দেওয়াই সঙ্গত। এ বাদানুবাদে আমাদের মত অগণ্য

নগণ্য চরকা-আস্তিক ও চরকা-নাস্তিকদের পক্ষে যোগ দেওয়া যেমন অনাবশ্যক তেমনি অনর্থক।

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন। অবশ্য তিনি সে উত্তর দিয়েছেন ইংরাজী ভাষায়। তাহলেও মহাত্মা গান্ধীর কথা দেশশুদ্ধ লোক শুনতে পেয়েছে। তাঁর লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের বাঙলা অনুবাদ ইতিপূর্ব্বেই নানা বাঙলা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর উত্তরের প্রত্যুত্তর দেবার কারও প্রয়োজন নেই। চরকার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান, তাঁদের অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বিন্দুমাত্র প্রয়াস পান নি,—সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, বাঙলায় কাপাসের চাষ করতে গেলে সেখানে জন্মাবে সুধু কাব্যের ফুল আর তর্কের ফল। তাই তিনি এ বিষয়ে কোন্ কথা পূর্ব্বে বলেছেন ও কোন্ কথা বলেন নি, সুধু তারই ফর্দ্দ দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ তাঁর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। মহাত্মার সঙ্গে কবির প্রভেদের কথাটাই এ প্রবন্ধের আসল বক্তব্য। বলা বাহুল্য যে, সে বিচারে যোগ দেবার অধিকারে আমাদের মত সামান্য লোকেরা বঞ্চিত। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রভেদটা কি?—এ জিজ্ঞাসার একমাত্র নিরুত্তর মীমাংসা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ দুটি, অপর একটি কারণে আমি সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে সাহসী হইনি। উভয় লেখকই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে আসল কথাটা তাঁর প্রবন্ধে বাদ দিয়ে গিয়েছেন। চরকার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতার বিষয় নাকি আবিষ্কার করতে হবে ইকনমিক্‌স্ শাস্ত্রের আঁকজোকের ভিতর। আমার

বিশ্বাস ছিল যে, চরকা ইকনমিক্‌সের যন্ত্র নয়, পলিটিক্‌সের অস্ত্র। চরকা চালানো যখন ভারত উদ্ধারের অনন্য উপায়, তখন চরকার সিংহাসন হচ্ছে পলিটিক্‌সের রাজ্যে। যদি ধরে' নেওয়া যায় যে, চরকার অব্যর্থ সার্থকতা আছে স্বধু ইকনমিক্‌সের ক্ষেত্রে, তাহলেও সে শাস্ত্রের বিচার আমি সবুজ পত্রে করতে ভয় পাই। উভয় লেখকই বলেছেন এই ইকনমিক সমস্যা অতি "জটিল সমস্যা"। এই "জটিল সমস্যার" বিচারে প্রবৃত্ত হলে সবুজ পত্র Economic Journal-য়ে পরিণত হবে। ইকনমিক্‌সের বিলেতে জন্ম, অথচ ইংরাজী সাহিত্যিকরাই ইকনমিক বিদ্যার নাম দিয়েছেন dry-as dust শাস্ত্র। আমরা চেষ্টা করলে হয়ত ধূলোর মত শুক্‌নো লেখা লিখ্‌তে পারি, কিন্তু সে ধুলি গলাধঃকরণ করবার লোক বাঙলায় বড় একটা পাওয়া যাবে না,—অবশ্য আমরা যদি ও শাস্ত্রের স্বরূপকথা নিয়ে বিস্তে ফলাই। ইকনমিক্‌সের রূপকথা আমরা সবাই শুনতে ভালবাসি, কিন্তু সে সব কথা এত বলা হয়েছে যে, তার আর পুনরুল্লেখ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ইকনমিক শাস্ত্রের নাগাল মস্তিষ্ক পায় কি না জানি নে, কিন্তু হৃদয় যে পায় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামমোহন রায়কে মহাত্মা pigmy বলেছেন শুনে আমরা দু' চার জন বাঙালী ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কিন্তু এখন জানতে পেলুম যে, এ গুজব ভুল। রামমোহন রায়কে তিনি positive pigmy বলেন নি, comparative pigmy বলেছেন, অর্থাৎ উপনিষদের ঋষিদের তুলনায় রামমোহন রায়ের ক্ষুদ্রত্বের কথা তিনি কটকের বালির চড়ায় উৎকলবাসীদের শুনিয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা একান্ত আশ্বস্ত হয়েছি। আমাদের বাঙলা দেশে মহাপুরুষ বড়

বেশি জন্মায় না। তাই যদি দেখতে পাই যে, এদেশেও দু' এক জন এমন লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা আমাদের চাইতে মাথায় একটু উঁচু, তাহলে তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ বলে মনে করি ও মান্য করি। আর তাঁদের কেউ বামন বল্‌লে আমাদের বাঙালী পেট্রিয়টিজমে আঘাত লাগে। এর মূল হচ্ছে অবশ্য ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য। কিন্তু রামমোহন রায় যে উপনিষদের ঋষিদের তুলনায় বালখিল্য, এ কথা আমরা সকলে সমস্বরে একবাক্যে বলতে প্রস্তুত আছি। আমি জোর করে বলতে পারি যে, স্বয়ং রামমোহন রায়ও মহাত্মা গান্ধীর উক্ত কথার নীচে সানন্দে সই দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করতেন না। বিংশ শতাব্দীর ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীরা যে উপনিষদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান হয়েছে, এ সংবাদ যেদিন কটক থেকে বে-তারে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছয়, সেদিন ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী শিষ্য রামমোহন রায়কে সম্বোধন করে বলেছেন—"জিতা রও বেটা, তুহারি কাম"! এ দেশে ব্রিটিশ আমলে তিনিই যে উপনিষদের মাহাত্ম্যের আদি প্রচারক, এ সত্য ত ইতিহাসের কপালে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

প্রজাস্বত্ব আইনের নূতন বিল।

(আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে লিখিত)

আপনাদের অনুরোধে প্রজাস্বত্ব আইনের নব সংস্করণের বিষয় লিখতে বসেই আমার মনে পড়ে গেল যে ভারতচন্দ্র বলেছেন,—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যে কি পড়েছিলেন, আর কি লিখতে চেয়েছিলেন জানিনে। কিন্তু প্রজাস্বত্ব আইনের এই নব সংস্করণ পড়ে, হয়ত চেষ্টা চরিত্তির করে সেই মত "লিখিবারে পারি",—তবে সে লেখা আনন্দবাজারে চলবে না, চল্‌তে পারে অমৃতবাজারে, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায়। আইন এ দেশে ইংরাজিতে লেখা হয়, আর ইংরাজী আমরা সবাই জানি; এর থেকে আমরা ধরে' নিই যে, আইনের ভাষা আমাদের সকলেরই বোধগম্য। এ বিশ্বাস শুধু তাঁদেরই আছে, যাঁরা ওভাষা আয়ত্ত করবার কষ্ট কখনো ভোগ করেন নি। কিন্তু আইনজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, আইনী ভাষা আর বে-আইনী ভাষা, এক ভাষা নয়। বে-আইনী ইংরাজীর অনুবাদ বাঙলায় করা যায়, কিন্তু আইনী ইংরাজীর করা যায় না। আর আইনী ইংরাজীর যদি বে-আইনী বাঙলা করি—তা'হলে আমার কথা লোকের যে "বুঝিবারে ভারী" হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে কথা যে রসাল কিছুতেই হবে না

তা বলা বাহুল্য। আইন উকীল বাবুদের কাছে ইক্ষু—কিন্তু আমাদের কাছে দণ্ড। এ ইক্ষুদণ্ডের তাঁরা খান রস, আমরা খাই মার। ইংরাজী আইনের বাঙলা ভাষ্য লিখতে গেলে সে লেখার ভিতর যে প্রসাদগুণ থাকবে না, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং প্রজাস্বত্ব আইনের বিষয় আমার বক্তব্য লোকের কাছে পরিষ্কার করতে হলে "যাবনী মিশাল" ভাষা আমাকেও কইতে হবে। যদিচ আমি আজকে দু-কথায় এর আসল হাল বোঝাতে চেষ্টা করব।

(২)

এই নূতন সংস্করণের বেশীর ভাগ সংস্কার শুধু আইনঘটিত। অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব যা ছিল তাই আছে, বদল হয়েছে শুধু তার ভাষা। উক্ত আইনের লেখা অধিকাংশ স্থলেই বড় অপরিষ্কার, তার ফলে আদালতে উক্ত আইনের যে ধারার যে রকম অর্থ করা হয়েছে, সে ধারার ভাষার তা নির্গলিতার্থ নয়। এই কারণে জজের নজিরের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আইনের অনেক স্থলে গরমিল হয়েছে, আবার অনেকস্থলে নজিরের সঙ্গে নজিরের মিল নেই। আইনের সঙ্গে নজিরের সামঞ্জস্য ঘটাবার উদ্দেশ্যে নানান ধারার ভাষার সংস্কার হয়েছে। এতে আদালতের কচ্‌কচি বাড়বে কি কমবে, সে কথা বল্‌তে পারেন উকীল ও উকীলের মুহুরী। প্রজাস্বত্ব আইনের ভাষার গোলকধাঁধার ভিতর প্রবেশ করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আর আশা করি, আনন্দবাজারের পাঠকরাও আইনের ভাষাপরিচ্ছদের বিচার শুন্‌তে ব্যস্ত নন। আমি ধরে' নিচ্ছি এ সকল কথার বদল উকীল বাবুদের মনঃপুত হয়েছে, যেহেতু উকিল-

বাবুরাও এসকল বদল করেছেন। কাউন্সিলের যে কমিটির প্রস্তাব সব বিল আকার ধারণ করেছে—সে কমিটিতে প্রবলপক্ষ ছিলেন, তাঁরা, Tenancy Act হচ্ছে যাঁদের অন্নদাতা। এ সব বদলে প্রজার লাভ হয়েছে কি ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে মৎফরক্কা মত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, প্রজার বাস্তুভিটার উপর নব আইনের হাত পড়েছে। অর্থাৎ বাস্তুভিটা এবার জোতের সামিল হয়ে যাবে। প্রজার একটা দখলীস্বত্ব যে এতে ক্ষুণ্ণ হল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে আদালতের একটা নতুন দুয়োর খুলে ল।

(৩)

প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধিত অংশের কথা ছেড়ে দিয়ে, এখন তার পরিবর্দ্ধিত অথবা পরিবর্ত্তিত অংশের দিকে নজর দেওয়া যাক্। এ আইনের আবশ্যক কি, উদ্দেশ্যই বা কি?—এই বিলের Statement of Objects and Reasons-এর ভিতর সে সন্ধান আমরা পাব। তা'তে লেখা আছে যে, মামলা মোকদ্দমা ও জরিপের অভিজ্ঞতা has revealed changes in agrarian conditions which demand a substantial modification of law; অর্থাৎ গত কয় বৎসরের ভিতর কৃষকের যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা'তে প্রজাস্বত্ব আইনেরও substantial পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

কৃষকের ও কৃষিকার্য্যের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সে কথার কোনও উল্লেখ নেই; তার কারণ উক্ত বিলের জন্মদাতারাও সম্ভবত সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। তাঁদের মনে বোধহয় একটা অস্পষ্ট

ধারণা ছিল যে—প্রজার ও জমিদারের স্বত্বস্বামীত্বের কিছু ঘোরফের না করলে আর চলে না। তার কারণ গত কয় বৎসরের মধ্যে এ সত্যটা প্রকট হয়েছে যে, প্রজার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অর্থাৎ যে সব দাবী তারা পূর্ব্বে করত না, এখন সে সব তারা স্পষ্টাক্ষরে করতে আরম্ভ করেছে। আর এই সকল দাবী রাখতে গেলেই আইন আর পূর্ব্বাবস্থায় বাহাল রাখা যায় না। এখন দেখা যাক্ প্রজার দাবী ছিল কি? তাহলে বোঝা যাবে যে, সে সব দাবীর কোন্‌টা ও কতটা নূতন আইনে মান্য করা হয়েছে। মোটামুটি দাবীগুলির ফর্দ্দ এই:—

(১) প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

(২) নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

(৩) প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর খুঁড়তে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

(৪) প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনত মৌরসী মোকররী বলে গণ্য হবে।

এ ফর্দ্দ আমি আমার লিখিত "রায়তের কথা" থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এ ক'টি ছাড়া প্রজার আরও দাবী থাকতে পারে, কিন্তু এ ক'টি যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(৪)

এখন নূতন বিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। যে কমিটি এই বিলের প্রসূতি, তার কাছে চার নম্বর দাবী বিলকুল না-মঞ্জুর হয়েছে। এই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আইনে জমিদারের জমাবৃদ্ধির অধিকার সম্পূর্ণ বজায় আছে। তারপর প্রজার তিন নম্বর দাবীটি মোটামুটি রক্ষা করা হয়েছে। পূর্ব্ব আইনেও প্রজার দখলী জমিতে কুয়ো খোঁড়বার, কোটাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার ছিল; অন্ততঃ হাই-কোর্টের নজিরের প্রসাদে সে অধিকার তারা লাভ করেছিল। নূতন আইন সে অধিকার তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয় নি। বরং ও আইনের ৭৭ ধারার যে অল্পস্বল্প বদল করা হয়েছে, তা'তে এ বিষয়ে লোভী জমিদারের উপদ্রব একটু কমবার সম্ভাবনা। প্রথম দাবীটি সম্বন্ধে "It is proposed to recognise the prevalent practice and give to the occupancy raiyat a right of transfer" উত্তম প্রস্তাব। তারপর দাখিল খারিজের নজর জোতের খরিদামূল্যের চৌথ ধার্য্য করা হয়েছে। একে বলে মন্দের ভাল। এর পরই এই সংশোধিত আইনের হুল বেরিয়ে পড়েছে। "The bill also gives him (the landlord) the right to have the holding transferred to himself on payment to the transferee of the consideration money and 10 per cent compensation"; অর্থাৎ নূতন আইন প্রজার হাতে যে স্বত্ব তুলে দিলেন, সে স্বত্ব, এই আইনের সাহায্যেই জমিদার প্রজার গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারবে। এরই নাম বোধহয় substantial modification। এ প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে হবে প্রজার সর্ব্বনাশ ও

উকিলের পোষমাস। তারপর প্রজার দ্বিতীয় দফা দাবী গ্রাহ্য করা হয়েছে এই ভাবে:—The bill gives to the occupancy raiyat and occupancy under-raiyat, complete right in trees on his land, except that in the case of valuable-trees, a fee of one-fourth of the value is to be paid to the landlord, when the tree is felled or disposed of.

অর্থাৎ—নূতন আইনের বলে গাছের উপর প্রজার নিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মাবে, কিন্তু সে গাছের ভিতর যদি কিছু মাল থাকে, তাহলে ভূস্বামী প্রজার কাছ থেকে তার মূল্যের চৌথ আদায় করতে পারবেন, যদি প্রজা সে গাছ কাটে কি বেচে। এ কিরকম complete right? —বলছি। প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাক্‌বে সুধু আগাছার উপর, গাছের উপর নয়। এ ধারাটা কি একটা রসিকতার মত শোনায় না? এর ফলে আদালতের আর একটা দুয়োর খুলে যাবে।

(৫)

আজকে আমি আইনের তর্ক তুলতে চাইনে। এ বিল সিলেক্ট্ কমিটি থেকে কি আকার ধারণ করে' বেরয়, তা' দেখে তখন তর্ক করা যাবে। আজ শুধু এই বিলের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং সেই সঙ্গে আমাদের কোথায় আপত্তি সেই কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই।

এ বিল জোড়া-তাড়া দিয়ে বানানো হয়েছে। জমিদারের অর্থের সঙ্গে প্রজার স্বার্থের গোঁজামিল দেবার চেষ্টাই এর ভিতর ফুটে উঠেছে। আমার বিশ্বাস এরকম আধাখেঁচড়া আইনে শুধু গোল বাড়ায়—কমায় না।

এই বিলে শরিকী সম্পত্তির গোলযোগ মেটাবার জন্য অনেক রকম নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ প্রজাকে জমি হস্তান্তর ও গাছ কাটবার অধিকার দিয়ে সেই সঙ্গে জমিদারকে সেই সব অধিকারের সিকি শরিক করা হয়েছে। ওতে যে নতুনরকম শরিকী বিবাদের সৃষ্টি করা হল—সে কথাটা বিলকর্ত্তারা খেয়াল করেন নি।

কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়ে এ বিল কি মুর্ত্তি ধারণ করে, দেখবার জন্য আমরা সবাই উৎসুক হয়ে রইলুম। তবে কাউন্সিলের দেশী মেম্বর-দের ভিতর কোনপক্ষই যে প্রজাপক্ষ হবেন, সে ভরসা আমাদের নেই। কারণ কাউন্সিলে যে দুই তিন দল হয়েছে,—তাঁদের মতভেদ শুধু রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে। প্রজা সম্বন্ধে তাঁদের ভিতর যে কোন মতভেদ আছে, তার প্রমাণ ত অদ্যাবধি একটা পাওয়া যায় নি।—কাউন্সিলারদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। এ বিলেরও গোড়ার কথা দু-ইয়ারকি—প্রজার সঙ্গে জমিদারের। এর ভিতরও যা' transferred তাই আবার ঘুরিয়ে reserved করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

নাতনীর উদ্দেশে।

যখন আমি উর্ব্বশীরে
করেছিলেম স্তব,
খুসি হলেন, তখন সেটা
হয়নি অনুভব।
তারপরে যেই বয়স হল,
নিলেম বানপ্রস্থ্য,
নানারকম সাধন নিয়ে
হলেম বাতিকগ্রস্ত,
তখন আমার ধ্যানের মধ্যে
হঠাৎ চেয়ে দেখি,—
পারিজাতের গন্ধখানি
শরীর নিয়েছে কি ?
এই ত গো সেই অপ্সরী,
তার সন্দেহ কার আছে,
স্বর্গস্মৃতি এনেছে তার
সর্ব্বদেহের নাচে।
সুরবীণার ঝঙ্কারে তার
লাগ্‌ল না আর মন;
মর্ত্ত্যের অঙ্গনে এসে
এই করেছে পণ—
নন্দন মন্দারবনে
মন্দাকিনীর তীরে,

কবির ছন্দ নিয়ে যাবে
চঞ্চল মঞ্জীরে।
সুরসভার মাঝে চন্দ্র
শুন্‌বে অবাক্ মানি,
বল্‌বে হেসে, "ফাগুন রাতের
এ ছন্দ যে জানি।"
পবনদেবের লাগ্‌বে চমক্,
কইবে শচীর কানে,
"এ ছন্দ যে শুনেছিলেম
শ্রাবণ দিনের গানে।"
প্রজাপতির পড়বে মনে,
ভাব্‌বে হাসিমুখে,
"এই ছন্দের দোল দেখেছি
নববধূর বুকে।"
ঊষা দেবী বল্‌বে হেসে,
"ওলো স্বর্গপ্রিয়া,
কেমন করে ভুলিয়ে এলি
মর্ত্ত্য কবির হিয়া?"
বল্‌বে শুনে, "করিনি ত
বিষম অধ্যবসায়,
আমি কেবল ডেকেছিলেম
তা'রে, দাদামশায়!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

——ঃ০ঃ——

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

সকালবেলার কুঁড়ি আমার
বিকালে যায় টুটে।
মাঝখানে হায় হয়নি দেখা,
উঠ্‌ল যখন ফুটে॥
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি
ধুলো থেকে আনিস্‌ তুলি,
শুক্‌নো পাতার গাঁথ্‌ব মালা
হৃদয় পত্রপুটে॥
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি,
এখন আন্‌ কুড়ায়ে দিনের শেষে
অসময়ের ছিন্ন বাকি।
কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা
আঁধারকে দেয় যে-সান্ত্বনা,
তাই নিয়ে মোর মিটুক্‌ আশা,
স্বপন গেছে ছুটে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

——

নবম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি।*

——[ঃ০ঃ]——

হে সমিতির কুমার ও কুমারীগণ—

তোমাদের সমিতির কর্ণধার ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সঙ্গে তোমাদের দু-কথায় পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। জিওগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত—সাহিত্যের নয়, আর এ কথা সবাই জানে যে, আমি সাহিত্যিক হলেও হতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নই। তবে যে আমি এ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তার কারণ অনধিকারচর্চ্চা করবার কু-অভ্যাস ও দুঃসাহস দুই আমার আছে।

কিন্তু প্রথমেই এক মুস্কিলে পড়েছি। সকল বিজ্ঞানের মত জিওগ্রাফিরও একটা বিশেষ পরিভাষা আছে। সে পরিভাষা মূলত ইংরাজি। এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে পরিভাষা আছে, তা হয় সংস্কৃত নয় ইংরাজীর অনুবাদ। সে সব সংস্কৃত কথার অর্থ বুঝতে হলে, তাদের আবার মনে মনে ইংরাজী ভাষায় উল্টে অনুবাদ করে নিতে হয়। একটি উদাহরণ দিই। অন্তরীপ ও Cape, এ দুটি কথাই বাঙালীর কাছে সমান অপরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ Cape শব্দটিই তোমরা স্কুলঘরে বেশিবার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপরপক্ষে "উত্তমাশা অন্তরীপ" বললে আমরা

* একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত।

ভাবতে বসে যাই, জিনিষটা কি? আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাইনে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে Cape of Good Hope-এর বাঙলা নাম। আর শৃঙ্গ অন্তরীপ (Cape Horn) শুনলে ত আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।

আমাদের পরিভাষার দশা যখন এরূপ মারাত্মক, তখন আমি যতদূর সম্ভব পরিভাষা পরিত্যাগ করে আমার কথা ভাষায় বলতে চেষ্টা করব। যেখানে অগত্যা পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হব, সেখানে ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করব। এ প্রস্তাব শুনে, আমার হাতে বাঙলা ভাষার জাত মারা যাবে ভেবে তোমরা ভীত হয়ো না। ইংরাজী বিজ্ঞানের পরিভাষাও ইংরাজী নয় — গ্রীক্। আর গ্রীক্ সভ্যতার বয়েস আড়াই হাজার বৎসর। সুতরাং তার স্পর্শে আমাদের ভাষার আভিজাত্য একেবারে নষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আর কোনও বিষয়ে মিল না থাকুক, বয়েসে মিল আছে।

ভূমণ্ডল।

প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে পৃথিবী নামক গোলকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

এ গোলকটি ক্ষিতি আর অপ্, মাটি আর জল এই দুই ভূতে গড়া। আর এ গোলকের চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, আর এক ভাগ স্থল।

আমরা অবশ্য পৃথিবী বলতে প্রধানতঃ মাটিই বুঝি। তার প্রমাণ আমরা একে ভূমণ্ডল বলি। এর কারণ আমরা ভূচর জীব—অর্থাৎ মাটির উপর বাস্ করি। জলচর জীবদের যদি শুধু জল-পিপাসা নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞান-পিপাসা থাক্‌ত ও সেই সঙ্গে তাদের জ্ঞান তরল ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাক্‌ত, তাহলে তারা জিওগ্রাফি না রচনা করে, রচনা করত Hydrography। আর তারা কবিতা লিখত "আমার জন্মজলের" উপর। আর আমরা যাকে বলি মধুর রস, তার নাম তারা দিত লবণ রস। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে প্রাণে কতটা জিওগ্রাফির অধীন।

এ সত্ত্বেও মানুষের কৌতূহল ক্রমান্বয় পঞ্চভূতের প্রথম ভূত ক্ষিতিকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের যে মনোভাবকে আমরা ধর্ম্ম-মনোভাব বলি, তার কারবার ত পঞ্চম ভূত ব্যোমকে নিয়ে। তা ছাড়া মানুষে আবহমানকাল এই পঞ্চভূতের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, কার পেটে কে জন্মেছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ও বকাবকি করেছে। যা আছে তাকে মুল সত্য বলে সে কখনও মেনে নিতে পারে নি। কোথেকে সে জন্মালো, এ প্রশ্ন সে যুগে যুগে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। এ পৃথিবী নামক গোলকটির সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, জলই আদি (অপ এব সসর্জাদৌ) সৃষ্টি। জল থেকেই মাটি উদ্ভূত। এ কালের বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ একই কথা বলছেন। তাঁদের মতে এ পৃথিবী আগে জলময় অথবা জলমগ্ন ছিল, পরে জল থেকে মাটি উদ্ভূত হয়েছে। ভাগ্যিস হয়েছে, নচেৎ জিওগ্রাফি নামক বিজ্ঞান আমাদের মন থেকে

উদ্ভূত হত না। যখন পৃথিবী জলময় ছিল, তখন পৃথিবী একাকার ছিল। একাকারের কোনরূপ জ্ঞান হতে পারে না, হতে পারে শুধু ধ্যান। এ কথা মনুও বলে গিয়েছেন—

"আসীদিদং তমোভুতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

যেদিন মাটির উদ্ভব হল, সেই দিনই পৃথিবীর নানা আকার ঘটল, সেই দিন থেকেই তা জ্ঞানের বিষয় হল।

পৃথিবীর ভাগ।

এখন শোনো, অপ্ থেকে যখন ক্ষিতির উদ্ভব হল, তখন মাটি একলপ্ত ভাবে উদ্ভূত হল না, হল খণ্ড খণ্ড ভাবে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেন যে, মেদিনী সপ্তদ্বীপ আকারে ব্যক্ত হয়েছে।

এই দ্বীপ শব্দটার অর্থ তোমরা সবাই জানো। যার চারদিকে জল আর মাঝখানে স্থল, তাকেই আমরা বলি দ্বীপ। এ হিসাবে আজকের দিনে পৃথিবীতে সাতটি নয়, অসংখ্য দ্বীপ আছে। সমুদ্রের মধ্যে থেকে অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ মাথা তুলে রয়েছে।

সুতরাং এ স্থলে সপ্তদ্বীপ অর্থে সাতটি মহাদ্বীপ বুঝতে হবে। এই মহাদ্বীপকে আমরা একালে মহাদেশ বলি। আজকের দিনে আমরা পৃথিবীকে চারটি মহাদেশে ভাগ করি—যথা ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা। অষ্ট্রেলিয়াকে আমরা আজও মহাদ্বীপ বলেই জানি, মহাদেশ বলে মানি নে।

মহাদেশ বলতে যদি মহাদ্বীপ বোঝায়, তাহলে পৃথিবীতে চারটি নয়, তিনটি মাত্র মহাদ্বীপ আছে:— প্রথম ইউ-রেসিয়া, দ্বিতীয় আফ্রিকা, তৃতীয় আমেরিকা। গ্লোবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে

যে, গোটা ইউরোপ ও গোটা এসিয়ার ভিতর কোথাও জলের ব্যবধান নেই। এ দুই দেশের জমি একলক্ত। আর এই আদি মহাদেশটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে Arctic S. দক্ষিণে Indian Ocean, পশ্চিমে Atlantic ও পূর্ব্বে Pacific Ocean; আর আফ্রিকার উত্তরে ও পশ্চিমে Atlantic এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে Indian Ocean। আর আমেরিকার পশ্চিমে Pacific, পূর্ব্বে Atlantic, উত্তরে উত্তর-Arctic ও দক্ষিণে দক্ষিণ-Arctic সাগর। Eurasia-র সঙ্গে অপর দুটি মহাদেশের গড়নেরও একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। Eurasia-র বিস্তার পূব হতে পশ্চিমে, অপর দুটির হচ্ছে উত্তর হতে দক্ষিণে। অর্থাৎ ইউরেসিয়া লম্বার চাইতে চওড়ায় বেশি। আফ্রিকা ও আমেরিকা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেশি। এই আকার ভেদ একদেশের সঙ্গে অপর দেশের অনেক প্রভেদ ঘটিয়েছে।

তোমরা সবাই জানো যে Eurasia ও আফ্রিকাকে আমরা প্রাচীন পৃথিবী বলি, ও আমেরিকাকে নবীন। এর প্রধান কারণ প্রাচীন পৃথিবীর লোক পাঁচ শ' বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না। তবে এ নাম শুধু লৌকিক নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবেও ঠিক। এই নবীন পৃথিবীর জন্ম প্রাচীন পৃথিবীর পরে হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক বিষয়ে এই নতুন পৃথিবী প্রাচীন পৃথিবীর ঠিক উল্টো। বিলাতে (Greenwich) যখন দিন দুপুর, আমেরিকায় (New Orleans) তখন রাতদুপুর। কেন এরকম হয়, সে কথা আর আজ বলব না; কারণ তা বোঝাতে হলে আমাকে মাটি থেকে আকাশে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যার ভিতর শুধু পৃথিবী নয়, সূর্য্যচন্দ্রকেও টেনে আন্‌তে হবে। কেননা জিওগ্রাফি কতক হিসেবে Astronomy-র

অন্তর্ভূত। আর Astronomy তোমরাও জানো না, আমিও জানিনে।

উত্তর খণ্ড দক্ষিণ খণ্ড।

আর একটি কথা শোনো। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে এই বিশ্ব আদিতে ছিল ব্রহ্মাণ্ড নামে একটি অণ্ড। পরে ভগবান সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করে, তার উর্দ্ধখণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন—আর এ দুয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু একালে আমরা পৃথিবীকে আধখানা ডিমের সঙ্গে তুলনা করিনে; আমরা বলি পৃথিবীর চেহারা ঠিক একটি কমলা লেবুর মত।

এই কমলা লেবুটিকে যদি ঠিক মাঝখানে কাটো, তাহলে এই কাটা জায়গাটার নাম হবে Equator; তার উপরের আধখানার নাম হবে উত্তর hemisphere, আর নীচের অংশটির নাম দক্ষিণ hemisphere. পৃথিবীর এই দুই খণ্ডের চরিত্র কোন কোন বিষয়ে ঠিক পরস্পরের বিপরীত। যথা, উত্তরাখণ্ডে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণাখণ্ডে তখন শীতকাল। তারপর এই দুই খণ্ডের গড়নেও ঢের প্রভেদ আছে। দক্ষিণাখণ্ডে যতখানি মাটি আছে, উত্তরাখণ্ডে প্রায় তার দ্বিগুণ মাটি আছে। এর থাকে অনুমান করতে পার যে, উত্তরাখণ্ডের জলবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণ খণ্ডের জলবায়ুর বিশেষ প্রভেদ আছে। আর জলবায়ুর প্রভেদ থেকেই ভৌগলিক হিসেবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রভেদ হয়। তোমরা সবাই জানো যে, জল ও বায়ু স্থির পদার্থ নয়—ও দুইই চঞ্চল, ও দুয়েরই স্রোত আছে। অপ্ ও মরুতের স্রোতের মূল কারণ হচ্ছে সূর্য্যের তেজ; কিন্তু ক্ষিতি এই দুই

স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডে বেশি পরিমাণ মাটি আছে, সে খণ্ডের জলবায়ুর গতি, যে খণ্ডে জল বেশি, সে দেশ হতে বিভিন্ন।

ইউরেসিয়া।

(১)

এখন ইউরেসিয়ার বিশেষত্ব এই যে, এ মহাদেশটি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উত্তর খণ্ডের অন্তর্ভূত। অপর পক্ষে আমেরিকা ও আফ্রিকার কতক অংশ উত্তর খণ্ডে ও কতক অংশ দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত। এর ফলে আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমের কৃপায় ইউরেসিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা সভ্যতার জন্মভূমি নয়। ও দুই মহাদেশে যে সভ্যতার আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে সভ্যতার ইউরেসিয়া হতে আমদানী। সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণ ভাগ ত ইউরোপের উপনিবেশ। আর পুরাকালে আফ্রিকার যে অংশে সভ্যতা প্রথম দেখা দেয়, সেই ইজিপ্ট উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভূত ও এসিয়ার সংলগ্ন। সুতরাং এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সে সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে এসিয়া, আর সেকালে ইজিপ্ট ছিল এসিয়ার একটি উপনিবেশ।

(২)

এর থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, কোনো দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের জিওগ্রাফিও আমাদের জানা চাই। এ যুগের মানুষ জিওগ্রাফির তাদৃশ অধীন না হলেও, আদিতে যে বিশেষ অধীন ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস

জান্‌তে আমরা সবাই উৎসুক। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের জমির উপরেই গড়ে উঠেছে, সেই জন্যই সেই জমির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যত হয়েছি। এখন এই কটি কথা তোমরা মনে রেখো যে, এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত ও তার সঙ্গে নানা রূপ যোগসূত্রে আবদ্ধ। তারপর এই পৃথিবীর উত্তরাখণ্ডে ইউরেসিয়া অবস্থিত। আর এই মহাদেশের যে অংশকে আমরা এসিয়া বলি, ভারতবর্ষ তারই একটি ভূভাগ। আর এই ভূভাগের রূপগুণ বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর পৃথিবী থেকে তার উত্তরাখণ্ডকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর তার উত্তরাখণ্ড থেকে ইউরেসিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর ইউরেসিয়া থেকে এসিয়াকে পৃথক করে নিয়ে, তারপর এসিয়া থেকে অপরাপর দেশকে বাদ দিলে তবে আমরা ভারতবর্ষ পাই। এ দেশ অপরাপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। সুতরাং একে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বর্ণনা করা যায়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বিদেশের সামান্য জ্ঞান না থাক্‌লে স্বদেশেরও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু অপর পক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, স্বদেশের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিদেশের সামান্য জ্ঞান লাভ করা কঠিন। ও ক্ষেত্রে আমরা নাম শিখি—কিন্তু দেশ চিন্‌তে শিখি নে। এই কারণে আজকাল এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রথমে বাড়ীর জিওগ্রাফি শিখে তার পর দেশের জিওগ্রাফি শেখাই কর্ত্তব্য। কারণ ছোটর জ্ঞান থেকেই মানুষকে বড়র জ্ঞানে অগ্রসর হতে হয়, ঘর থেকেই বাইরে যেতে হয়। আমি যে এ প্রবন্ধে তার উল্টো পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, বড় থেকে ছোটতে,

বাইরে থেকে ঘরে আস্‌ছি, তার প্রথম কারণ আমি বৈজ্ঞানিক নই—সাহিত্যিক; আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি তোমাদের মনে এই সত্যটি বসিয়ে দিতে চাই যে, ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়।

এসিয়া।

(১)

এসিয়া ব'লে ইউরোপ থেকে কোন পৃথক মহাদেশ নেই, এ কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু বহুকাল থেকে মানুষ এই এক মহাদেশকে দুই মহাদেশ বলে আস্‌ছে। ভৌগলিক হিসাবে না হোক্, লৌকিক মতে এসিয়া একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলে যখন গ্রাহ্য, তখন এ ভূভাগকে একটি পৃথক মহাদেশ বলে মেনে নেওয়া যাক্।

ভারতবর্ষ এই মহাদেশের অন্তর্ভূর্ত, অতএব এসিয়ার চেহারাটা এক নজর দেখে নেওয়া যাক্।

এ যুগের জাপানের একজন বড় কলাবিদ্ ও সাহিত্যিক কাকুজো ওকাকুরা, তাঁর Ideals of the East নামক গ্রন্থের আদিতেই বলেছেন যে, Asia is one। এ কথাটা East-এর ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।

ভৌগলিক হিসেবে এসিয়া চারটি উপ-মহাদেশে (sub-continent) বিভক্ত। কি হিসাবে এসিয়াকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়, তা এখন শোনো।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন যে, "জগৎ সরিৎ সমুদ্রা শৈলাত্মাত্মকম্" অর্থাৎ এ জগৎ নদী, সমুদ্র ও পাহাড় দিয়ে গড়া। জগৎ সম্বন্ধে এ কথাটা যে কতদূর সত্য, তা বলতে পারিনে—তবে

একেবারে যে বাজে নয়, তার প্রমাণ চন্দ্র উপগ্রহে পাহাড় আছে, Mars গ্রহে নদী আছে এবং সম্ভবত অপর কোন গ্রহে সমুদ্রও থাকতে পারে। সে যাই হোক্, পৃথিবী সম্বন্ধে মেধাতিথির উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আর এই তিন বস্তুই পৃথিবীকে নানাদেশে বিভক্ত করে রেখেছে।

সমুদ্রের ব্যবধানেই যে মহাদেশ হয়, তার কারণ সমুদ্র আগে ছিল অলঙ্ঘ্য আর এখন হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য। শৈলমালা সমুদ্রের চাইতে কিছু কম অলঙ্ঘ্য বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সুতরাং পর্ব্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।

কালিদাস বলেছেন যে, "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি-দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধ্যবগাহ্য স্থিত পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"। ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে পর্ব্বতশ্রেণীর স্বদেশী অংশকে আমরা হিমালয় বলি, তা অবশ্য এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করছে না। কিন্তু হিমালয় বলতে আমরা যদি সেই শৈলমালা বুঝি, যে পর্ব্বতশ্রেণী সমগ্র এসিয়ার মেরুদণ্ড, আর যাকে এ যুগের ভৌগোলিকরা Central Mountains আখ্যা দিয়েছেন—তাহলে আমরা কালিদাসের উক্তি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এ নগাধিরাজ সত্যসত্যই এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন করে অবস্থিতি করছে। পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর ও পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এ পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত। আর পৃথিবী বলতে যদি আমরা সুধু প্রাচীন পৃথিবী বুঝি, তাহলেও কালিদাসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ এসিয়ার এই Central Mountains হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর mid-world mountains-এরই অংশ। তারপর এ সমগ্র

পর্ব্বত শ্রেণীকে হিমালয় বলা যেতে পা:র; কেননা এ পর্ব্বতের অধিকাংশই চির হিমের আলয়।

এই হিমালয়, ভাষান্তরে Central Mountains-এর মত বিরাট প্রাচীর পৃথিবীর আর কোনও মহাদে‍শকে দু ভ গে বিভক্ত করে নি। এ প্রাচীরের উত্তরদেশকে এসিয়ার উত্তরাপথ বলা যেতে পারে, এবং দক্ষিণদেশকে দ ক্ষিণাপথ বলা যেতে পারে। এই প্রাচীর যে কত উঁচু তা ত তোমরা সবাই জানো। এই ভারতবর্ষের উত্তরেই এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে, যার প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশি। কাশ্মীরে নাংঘা পর্ব্বত উঁচুতে ২৬,৬০০ ফিট, তিব্বতে নন্দদেবী ২৫,৬০০, নেপালে ধবলাগিরি ২৬,৫০০ ফিট, Everest ২৯,০০০, কিন্‌চিন্‌জঙ্গা ২৮,০০০। এখন এ পর্ব্বত প্রস্থে কত বড় তা শোনো।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে দেশ আছে, সে দেশকে আমরা ইরাণ বলি; আর উত্তরপশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে তুরাণ বলি। ইরাণ ও তুরাণে এই পর্ব্বত কোথাও চার শ' মাইল, কোথাও আট শ' মাইল চওড়া। এ মহাপর্ব্বতের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাদের মিলন ভূমি হচ্ছে Pamir অধিত্যকা। এ অধিত্যকাও প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এই পামিরের উত্তরে এ পর্ব্বতের প্রস্থ হচ্ছে ১২০০ মাইল, এবং এর সঙ্গে এ পর্ব্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ উপত্যকাগুলি যদি যোগ দেওয়া যায়, তাহলে এ ব্যবধানের প্রস্থ হয় দু' হাজার মাইল— অর্থাৎ হিমালয় হতে কন্যা কুমারিকা যতদূর, ততদূর। এর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, এসিয়ার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে এক দেশ বলা কতদূর সঙ্গত।

এই কারণে এসিয়ার উত্তরাখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়। আর তার দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগকে দ্বিতীয়, পূর্ব্ব ভাগকে তৃতীয়, তার মধ্য ভাগকে চতুর্থ উপমহাদেশ বলা যায়।

এই মধ্যদেশই ভারতবর্ষ। ভূমধ্য পর্ব্বত থেকে এই চারটি উপ-মহাদেশ ঢাল হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। ফলে উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী, ও তারা সব গিয়ে পড়ে Arctic সমুদ্রে; পশ্চিম ভাগের জল গড়িয়ে পড়ে ভূমধ্য সাগরে, পূর্ব্ব ভাগের জল প্রশান্ত মহাসাগরে ও মধ্যদেশের জল ভারত মহাসাগরে। মধ্য এসিয়া পর্ব্বতময়। আর এ পর্ব্বত অর্দ্ধেক এসিয়া জুড়ে বসে আছে। আর তার চারপাশের চার ভাগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তর দেশ অর্থাৎ Siberia সমতল ভূমি কিন্তু জলবায়ুর গুণে মানুষের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। পশ্চিম একে পাহাড়ে উপরন্তু নির্জ্জলা দেশ। সে দেশের জমিতে ফসল একরকম হয় না বল্‌লেই চলে। ইরাণ তুরাণের অধিকাংশ লোক গৃহস্থ নয়—তারা অন্নের সন্ধানে তাঁবু ঘাড়ে করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাকী দুটি ভূভাগ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দুটি দেশ মুখ্যতঃ সমতল ভূমি, আর সে ভূমি কর্ষণ করে অন্ন বস্ত্র দুই লাভ করা যায়; অতএব এ দুই দেশের লোকই গৃহস্থ হয়েছে। আর শাস্ত্রে বলে মানুষের সকল আশ্রম গার্হস্থ্য আশ্রমেরই বিকল্প মাত্র।

(২)

এসিয়াকে ত্যাগ করবার পূর্ব্বে সে মহাদেশ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলছি, যা শুনে তোমরা একটু চম্‌কে যাবে। এ মহাদেশের

ম্যাপে একটি দেশ ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছে, যেটি ভৌগোলিক হিসেবে এসিয়ার নয়, আফ্রিকার অঙ্গ। সে দেশের নাম আরব দেশ। এই আরব দেশ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিরই একটি অংশ। তোমরা বোধহয় জানো যে, মরুভূমির একটি ধর্ম্ম হচ্ছে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে আক্রমণ করা। হাওয়ায় তার তপ্ত বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে চাপা দেয়। তার স্পর্শে গাছপালা তৃণ পুষ্প সবই মারা যায়। মরুভূমির সুধু বালুকা নয়—তার বায়ুও সমান মারাত্মক। যে দেশের উপর দিয়ে সে বাতাস বয়ে যায়, সে দেশের রসকস্ একেবারে শুকিয়ে যায়। সাহারার এই নিজস্ব বাতাসের নাম Trade winds। একবার Globe-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এই Trade winds চলার পথটি হচ্ছে আগাগোড়া পোড়ামাটি।

সাহারামরুভূমি আরব দেশের ভিতর দিয়ে এসে প্রথমে পারসিয়ার দক্ষিণ ভাগকে, তারপর আরও এগিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধু দেশকে আক্রমণ করে। ফলে আরব থেকে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এ আক্রমণে বাধা দিয়েছে রাজপুতানা। রাজপুতানার চিরগৌরব এই যে, এই রাজপুতানাই হিন্দুস্থানকে এই ক্রমবর্দ্ধমান আফ্রিকার মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

এই আরব দেশ যে ভুলক্রমে এসিয়ার ম্যাপে ঢুকে গেছে, তার কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত সমুদ্রকে আফ্রিকা ও এসিয়ার মধ্যে পরিখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায়, এ সমুদ্রও আসলে মরুভূমি। এর উপরে যেটুকু জল আছে, তা ভারত-মহাসাগরের দান।

(৩)

ভারতবর্ষকে যদি এসিয়াখণ্ডের একটি উপ-মহাদেশ না বলে, একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলা যায়, তাহলেও কথাটা অসঙ্গত হয় না।

ভারতবর্ষ মাপে ১,৫০০০,০০০ বর্গ মাইল। এক চীন ব্যতীত এত বড় দেশ এসিয়ায় আর কোথাও নেই। এসিয়ার রুসিয়া, ম্যাপে দেখতে প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু এর দক্ষিণাংশে এত বড় বড় হ্রদ মরুভূমি তৃণ কান্তার ও পর্ব্বত আছে যে, সে অংশটিকে একটি দেশ বলা যায় না। কারণ সে ভুভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য। আর এর উত্তরাংশের জমি সমতল হলেও আজও জমাট মাটি হয়ে ওঠে নি। এ দেশে গাছপালা অতি বিরল, যে দুটি চারটি আছে তারা সব বামন। এ রকম দেশ যে কৃষীকার্য্যের জন্য অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে সাইবিরিয়া একরকম জনশূন্য বললেই হয়।

ভারতবর্ষ যে আকারে বিপুল, সুধু তাই নয়! এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ থেকে একরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর উত্তরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী প্রাচীর; আর তিন দিকে ভারত মহাসাগরের অতলস্পর্শী পরিখা। তোমরা ভেবো না যে আমি ভুল করছি। আরব সাগর, বঙ্গ উপসাগর প্রভৃতি নাম আমিও জানি; কিন্তু ও-সব সাগর উপসাগর ভারত মহাসাগরেরই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ তার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব কোণে সুধু অপর দেশের সঙ্গে সংলগ্ন। তার উত্তরপশ্চিমে আফগানিস্থান, এবং উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু এ দুই দিকেই আবার অতি দুর্গম পর্ব্বতের ব্যবধান আছে। যে পর্ব্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে হিন্দুস্থান

থেকে পৃথক করে রেখেছে, সে পর্ব্বতশ্রেণীর অবশ্য দুটি দুয়োর আছে — Khyber Pass ও Bolan Pass, যার ভিতর দিয়ে এ দুই দেশে মানুষে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।

(৪)

দেখতে পাচ্ছ স্বয়ং প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ করে গড়েছেন।

এখন দেখা যাক্, এই সমগ্র দেশটার আকার কিরকম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলতেন। সম্ভবত পৃথিবী বলতে তাঁরা ভারতবর্ষ বুঝতেন। কেননা ভারতবর্ষ সত্য সত্যই ত্রিকোণ।

মানুষে যতক্ষণ জ্যামিতির কোনও মূর্ত্তির সঙ্গে কোনও দেশকে মেলাতে না পারে, ততক্ষণ তার মনস্তুষ্টি হয় না; যদিও জ্যামিতির কোন আকারের সঙ্গে কোন দেশই হুবহু মিলে যায় না। পৃথিবীকে আমরা বলি গোলাকার। কথাটা মোটামুটি সত্য। কিন্তু জ্যামিতির বৃত্তের উত্তরদক্ষিণ চাপা নয়। ইউক্লিডের তৃতীয় অধ্যায়ে কমলালেবুর কোনও স্থান নেই। এই কথাটা মনে রাখলে, মহাভারতে ভারতবর্ষকে যে একটি সমভুজ ত্রিকোণ দেশ বলা হয়েছে, সে উক্তিকে গ্রাহ্য করে নিতে আমাদের কোনও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে এমন কোনই দেশ নেই, যা সম্পূর্ণ একাকার। ভারতবর্ষও একাকার নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখি। রাজ্যের ভাগের

সঙ্গে ভৌগোলিক ভাগের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। অর্দ্ধেক পৃথিবী আজ ব্রিটীশরাজের অধীন; কিন্তু তাই বলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে পাগল ছাড়া আর কেউ এক দেশ বলবে না। আমি যে ভাগের কথা বলছি, সে ভৌগোলিক ভাগ।

আমাদের শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরাণকারদের মতে ভারতবর্ষ নবখণ্ড। বরাহমিহির প্রভৃতি গণিৎ-শাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত। যদিচ এ দুয়ের বর্ণিত নবখণ্ডের মিল নেই। মহাভারতের মতে এ দেশ চার খণ্ডে বিভক্ত। চারটি Equilateral triangle-এর সমষ্টি হচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বড় Equilateral triangle! জ্যামিতির হিসেব থেকে যদিও এ বর্ণনা সত্যের কাছ ঘেঁসে যায়, কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব থেকে অনেক দূরে থাকে। সে যাই হোক্, সংস্কৃত সাহিত্যে আর একরকম ভাগের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম উত্তরাপথ, অপরটির দক্ষিণাপথ। এই লৌকিক ভাগটিই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক। উত্তরাপথ ভৌগোলিক হিসেবে দক্ষিণাপথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন।

হিমালয় যেমন সমস্ত এসিয়ার মেরুদণ্ড, বিন্ধ্যপর্ব্বত তেমনি ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। এ স্থলে আমি সাতপুরা ও আরাবলি পর্ব্বতকে বিন্ধ্য নামে অভিহিত করছি। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশকে উত্তরাপথ বলা যায়—আর দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত থেকে ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী দেশকে দক্ষিণাপথ বলা যায়। কিন্তু তোমরা ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও রাজমহলের পুর্ব্বেও অনেকখানি

পড়ে রয়েছে। এই পশ্চিম অংশের নাম পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ, আর পূর্ব্ব অংশের নাম বঙ্গদেশ ও আসাম। এ দুটিকেও উত্তরা-পথের অন্তর্ভূত করে নিতে হবে।

উত্তরাপথ।

প্রথম জিনিষ যা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এই বিস্তৃত ভুভাগের ভিতর কোনরূপ পাহাড় পর্ব্বত নেই—সমস্ত উত্তরাপথ সমতল ভূমি। এর ভিতর এক জায়গায় সুধু একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আছে। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মিলনস্থল হচ্ছে সেই উচ্চ ভাগ। উত্তরাপথের এই জায়গাটার গড়ন কাছিমের পিঠের মত। ফলে এ স্থানের পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ব্বের যত নদী সব পূর্ব্ব-বাহিনী।

এই পশ্চিম ভাগের নদী পাঁচটির নাম ঝিলম, চেনাব, রাবি, বিয়াস ও সৎলেজ। এ পাঁচটিরও জন্মভূমি হচ্ছে হিমালয়, আর এ পাঁচটিই পথি-মধ্যে এ ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষটা ভারতবর্ষের সব চাইতে পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তোমরা বোধহয় জানো যে, পাহাড় থেকে নদী যে মাটি কেটে নিয়ে আসে সেই মাটি দিয়েই সমতল ভূমি তৈরী হয়। এই পঞ্চ নদের কৃপায় পঞ্চনদ দেশ ওরফে পাঞ্জাব তৈরী হয়েছে। আর এই দেশটাকে Indus Valley বলা হয়। কারণ সিন্ধুই হচ্ছে এই পঞ্চ নদের ভিতর মহানদ।

(১)

উত্তরাপথের পূর্ব্ব ভাগের প্রধান নদীগুলির নাম যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, গোগরা, গণ্ডক ও কুশি। এ সকল নদীরই উৎপত্তি

হিমালয়ে, আর এদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে গঙ্গা। অপর পাঁচটি একে একে গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। সিন্ধুনদের সঙ্গে গঙ্গার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সিন্ধুনদ তার আগাগোড়া জল হিমালয়ের কাছ থেকে পায়। গঙ্গা কিন্তু কিছু জল বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছ থেকেও পায়। চম্বাল ও সোন এই দুই নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে বিন্ধ্যপর্ব্বত। আর এই দুই নদীই উত্তরাহিনী হয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় জলের আর এক নাম জীবন। তাই বলছি গঙ্গাই হচ্ছে উত্তরাপথের জীবন। ও দেশের বুকের ভিতর দিয়ে গঙ্গা যদি রক্তের মত বয়ে না যেত, তাহলে উত্তরাপথের প্রাণবিয়োগ হত। এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।

আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে হচ্ছে মরুভূমি। সিন্ধুনদ দক্ষিণাংশে এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সিন্ধুনদীর দু' পাশের দেশের নাম সিন্ধুদেশ।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের একরকম গা ঘেঁসে পূর্ব্বে অনেক দূর এসে গঙ্গা রাজমহলের কাছে পর্ব্বতের বাধা হতে অব্যাহতি লাভ করে', দক্ষিণ বাহিনী হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তারপর দক্ষিণে অনেক দূর এসে গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়েছেন। এই ব্রহ্মপুত্রেরও জন্মস্থান হিমালয়। ব্রহ্মপুত্র লক্ষ্ণৌয়ের উত্তরে হিমালয়ে থেকে বেরিয়ে পূর্ব্বমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত হিমালয়ের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে, ভুটানের পূর্ব্বে এসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছেন। তারপর এই মিলিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র আরও দক্ষিণে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লেন।

মেঘনার জন্মভূমি হচ্ছে গারো লুসাই পর্ব্বত। এই তিন নদীতে মিলে বাঙলা দেশ গড়েছে।

উত্তরাপথের পশ্চিম দেশ সিন্ধুদেশ যেমন শুক্‌নো, তার পূর্ব্বদেশ বাঙলা তেমনি ভিজে। সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানের মত গরম জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তার পাশে রোড়ি নামক স্থানে গত বারো বৎসরে মোটে ছ'পসলা বৃষ্টি হয়েছে। অপর পক্ষে বাঙলার মত ভিজে দেশও ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

দক্ষিণাপথ।

(১)

এখন দক্ষিণাপথে যাওয়া যাক্।

এ ভুভাগ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এটি উত্তরাপথ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন।

অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা নীচু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে মাথাকে ভূমিলুণ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে এই দুই ভাগের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নেই। উত্তরাপথ থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এমন কোনও নদী নেই, সুতরাং এ দুই দেশের ভিতর জলপথ নেই। গঙ্গানদী বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে ও সিন্ধুনদ সে পর্ব্বতকে বাঁয়ে ফেলে রেখে তারপর সমুদ্রে এসে পড়েছে।

তারপর এ দুয়ের ভিতর কোনও স্থল পথও নেই। এক রেলের গাড়ী ছাড়া আর কোনওরকম গাড়ী—গরুর ঘোড়ার কি উটের—বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক পাশ থেকে অপর পাশে যেতে পারে না।

মানুষে পায়ে হেঁটে যখন হিমালয় পার হয়ে যায়, তখন বিন্ধ্যপর্ব্বত তার চলাচলের পথ বন্ধ করতে পারে নি। মানুষের অবশ্য অগম্য স্থান ভূ-ভারতে নেই--কিন্তু দুর্গম স্থান আছে। এই বিন্ধ্য অতিক্রম করবার পথ সেকালে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। রামচন্দ্র পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতি বেলায় তিনি বিমানে চড়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করাই বেশি আরামজনক অতএব সুযুক্তির কাজ মনে করেছিলেন।

সেকালে বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে আসবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিম দিয়ে আসতে হলে মরুভূমি অতিক্রম করে আস্‌তে হত। অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব্ব দিয়ে বাঙলায় এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে মাদ্রাজ পৌঁছতে অনেক দিন নয়, অনেক বছর লাগত। এক রাজা ও সন্ন্যাসী ছাড়া ও রকম দেশভ্রমণ বোধহয় সেকালে অপর কেউ করত না। সমগ্র ভারতবর্ষকে এ ভাবে প্রদক্ষিণ করতেন রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে, আর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে।

এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের ভিতর একটি ফাঁক আছে—খাণ্ডোয়া নামক স্থানে। এলাহাবাদ থেকে বম্বে যাবার রেল পথ এই খাণ্ডোয়ার ফাঁক দিয়েই যায়। এবং সেকালে এই দুয়োর দিয়েই বোধহয় উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি বড় কৌটোর মধ্যে আর একটি ছোট কৌটো।

(২)

দক্ষিণাপথ উত্তরাপথ থেকে সুধু বিচ্ছিন্ন নয়—বিভিন্ন, আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও।

উত্তরাপথকে একটি চতুর্ভুজ হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ। একটি উল্টো পিরামিড, যার base হচ্ছে বিন্ধ্য, আর apex কুমারিকা অন্তরীপ। এর উভয় পাশই পাহাড় দিয়ে বাঁধানো। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতের নাম পশ্চিমঘাট, পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বঘাট। এই দুই পর্ব্বত এসে মিলিত হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপের একটু উত্তরে। এর দক্ষিণে যে জায়গাটুকু আছে, তার পূর্ব্বে আর পাহাড় নেই, কিন্তু পশ্চিমে আছে Cardamom Hills।

উত্তরাপথ হচ্ছে সমতল ভূমি, কিন্তু দক্ষিণাপথ মালভূমি। অর্থাৎ ইরাণ দেশের মত এ দেশও হচ্ছে পর্ব্বতের উপত্যকা; সুধু ইরাণের উপত্যকা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু, ও দক্ষিণাপথের হাজার ফিট। সুতরাং এ পিরামিডকে পাথরে-গড়া বলা যেতে পারে। এ ভুভাগে সমতল ভূমি আছে সুধু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে ও সমুদ্রের উপকুলে, যে দেশকে আমরা মালবার দেশ বলি; ও পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকুলে, যে দেশকে আমরা করমণ্ডল বলি। দক্ষিণাপথের অন্তরেও কিছু কিছু সমতল ভূমি আছে, তার পরিচয় পরে দেব।

এই মালাবার দেশটি অতি সঙ্কীর্ণ, করমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যদি একটি বিমানে চড়ে দূর থেকে দেখা যায় ত দেখা যাবে যে, দক্ষিণাপথের পশ্চিম পাড় বেজায় মাথা উঁচু করে রয়েছে—পশ্চিমঘাট যেন সমুদ্র থেকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আর করমণ্ডল একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। এ অংশের তালিবন যেন সমুদ্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কালিদাস যে বলেছেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

সে বেলা হচ্ছে Coromandel Coast।

(৩)

দক্ষিণাপথের উত্তরে দুটি অপূর্ব্ব নদী আছে, নর্ম্মদা ও তাপ্তি। নর্ম্মদা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকার ভিতর দিয়ে, ও তাপ্তি সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ঘেঁসে পশ্চিমবাহিনী হয়ে Gulf of Cambay-তে গিয়ে পড়ছে।

এ দুই নদী মানুষের বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। এ নদী দুটি মানুষের যাতায়াতের জলপথ নয়। তারপর এদের পলিতে কোনও সমতল দেশ গড়ে ওঠে নি। এরা দুটিতে মিলে সাগর-সঙ্গমের মুখে খালি একটুখানি মাটি তৈরী করেছে।

এ দেশের দক্ষিণের নদী কটি সবই পূর্ব্ববাহিনী। প্রথম গোদাবরী, দ্বিতীয় কৃষ্ণা, তৃতীয় কাবেরী। এ তিনটি নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে পশ্চিম ঘাট, আর এ তিনটিই এসে পড়ছে বঙ্গ-উপসাগরে।

এই তিনটি নদীর উভয় কূলে অল্পস্বল্প সমভূমি আছে, যেখানে ফসল জন্মায়। এই তিনটি নদীর হাতে করমণ্ডল দেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণাপথের ভিতর থেকে মালাবার ও কোঙ্কন যাবার কোনও পথ থাকৃত না, যদি না পশ্চিম ঘাটের ভিতর তিনটি ফাঁক থাকৃত—উত্তরে থালঘাট ও বোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট। এইখানেই Coimbatore নামক সহর। এই Coimbatore-এর দুয়োরই দক্ষিণাপথের অন্তরের সঙ্গে তার পশ্চিম উপকূলের যোগ রক্ষা

করেছে। দক্ষিণাপথ ও বাঙলার ভিতর আর দুটি দেশ আছে—উত্তরে Central Provinces ও দক্ষিণে উড়িষ্যা।

Central Provinces পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা—উড়িষ্যার অনেকটাই সমভূমি। মহানদী এই সমভূমি গড়েছে। এ দুটি দেশ সম্ভবত কখনই দক্ষিণাভুক্ত হয় নি বলে একে উত্তরাপথের ভিতর টেনে আনা যায়। আজকাল আমরা যাকে Bombay Presidency ও Madras Presidency বলি, সে দুই এই দক্ষিণাপথেরই অন্তর্ভূর্ত। সুধু সিন্ধু দেশটি বম্বের গভর্ণরের অধীন হলেও দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূর্ত নয়।

(৪)

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপরে চারটি দেশ আছে, যেগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্ভূর্ত। পশ্চিমে কাশ্মীর, তার পূর্ব্বে নেপাল, তার পূর্ব্বে সিকিম ও পূর্ব্বপ্রান্তে ভুটান।

কাশ্মীরের লোকের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, নেপালেরও তাই; অপর পক্ষে সিকিম ভুটানের ভাষা চীন-বংশীয়। এই নেপালেই পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আর্য্যজাতি এবং পূর্ব্ব ও উত্তর থেকে আগত চীন জাতি মিলেমিশে একজাতি হয়ে গিয়েছে। এদেশে সুধু দুই জাতির নয়, দুই সভ্যতারও মিলন ঘটেছে। তাই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পাশাপাশি বাস করছে। কাশ্মীরে অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু এই দুই ধর্ম্ম পরস্পরের অস্পৃশ্য, ফলে উভয় ধর্ম্মই নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলেছে। অপর পক্ষে নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিকার অথবা নেপালের হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। সিকিম,

ভুটানের সংস্রব আসলে বাঙলা দেশের সঙ্গে। শুনতে পাই, বাঙলার লোকের দেহে চীনের রক্ত আছে। সেই সঙ্গে বাঙালীর মনেও কিঞ্চিৎ চৈনিক ধর্ম্ম আছে কিনা বলতে পারিনে।

দেশের পণ্ডিত লোক সব আজকাল বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন। বেদ উদ্ধারের পর আমাদের পণ্ডিতরা যদি তন্ত্রের সন্ধানে বেরন, তাহলে আমার বিশ্বাস তাঁদের উত্তর-পশ্চিম দেশকে গজভুক্ত কপিত্থ-বৎ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্বে আসতে হবে। তখন r search work-এর পীঠস্থান হবে প্রথমে ভুটান, পরে সিকিম। তন্ত্র-শাস্ত্রের পুঁথি খুললেই পাতায় পাতায় মহাচীনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। সে যাই হোক্, ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাণ ও উত্তরে তুরাণের মত তার পূর্ব্বে মহাচীনকেও পুরাতত্ত্ববিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি অবগত হয়েছি যে, পণ্ডিতরা আজকাল Tarim দেশ নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছেন। Tarim অবশ্য চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত তুর্কস্থানে। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা খোটান থেকে ভুটানে অচিরে নেবে পড়বেন।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

(১)

এতক্ষণে তোমরা ভারতবর্ষ নামক মহাদেশটির আর তার অন্তর্ভূত খণ্ড দেশগুলির আকৃতির মোটামুটি পরিচয় পেলে। এখন তার প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক্।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধ-হয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মত কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে। এই রেখাগুলির ভিতর দুটি রেখার একটু বিশেষত্ব আছে। সে দুটি একটানা নয়, কাটা কাটা। এ উভয়ের মধ্যে Equator-এর উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম Tropic of Cancer; আর Equator-এর দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম Tropic of Capricorn।

সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে, তাই দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাঙ্কিত জায়গাতেই সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে—অপর সব স্থানে তেরচা ভাবে। এই Tropic of Cancer-এর উত্তর দেশ শীতের দেশ, আর Tropic of Capricorn-এর দক্ষিণদেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব দারুণ গরম দেশ। ভারত-বর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই Tropic of Cancer-এর উত্তরে ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার নীচে। ফলে দক্ষিণাপথে শীত ঋতু বলে কোনও ঋতু নেই। জনৈক ইংরাজ বলেছেন যে, দক্ষিণাপথ হচ্ছে Nine months hot and three months hotter। কথাটা Kipling-এর মুখ থেকে বেরলেও মিথ্যে নয়। উত্তরাপথে কিন্তু শীতগ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকালে গরম যে উত্তরাপথের মত অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়তঃ তার তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা।

মাটি।

(১)

তারপর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয়, এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানতঃ মাটি নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়। এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সব জীবজন্তুর ন্যায় মানুষের আদি মাতা হচ্ছে ভূমি। এ মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা কোন্ জমিতে কে জন্মেছে তার থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ণয় করেন।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না,—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা বসুন্ধরা আসলে পাষাণী।

এই মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ হয় পাথরকে পুড়িয়ে না হয় গলিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। জলের কাজ হচ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা, ও অগ্নির কাজ হচ্ছে তাকে দ্রব করা।

নদ নদী পাহাড় থেকে বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণ পাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলি মাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানতঃ গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরী।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ, Peninsula বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশ তখন জলমগ্ন ছিল। তারপর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদ নদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরা-

পথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করলে। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন Geology পড়্‌বে, তখন এ দেশের বয়সের গাছপাথরের অথবা গাছ পাথরের বয়েসের হিসেব পাবে।

(২)

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি পলি মাটি নয়, অর্থাৎ নদ-নদীর দান নয় ; সে মাটি চূর্ণ পাথর নয়, গলা পাথর। আগ্নেয়গিরি হতে এ মাটি বহির্গত হয়েছে। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের (lava) উদ্গম হয়েছে, তাই হচ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এ দুই মাটি এক জাতেরও নয়, এবং এ দুয়ের ধর্ম্মও এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন দেশে, কোন দিক্ থেকে কি বাতাস বয়, তার উপর। তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি যে, সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্ত্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ, ও তার পূর্ব্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা monsoon নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এ বাতাস প্রথমে মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তারপর পশ্চিম ঘাটে বাধা পেয়ে ঘুরে এসে বাঙলায় ঢোকে, তখন তার গতি

হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব থেকে উত্তরপশ্চিমে। এই বাতাস বাঙলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তারপর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষা ঋতু দেখা দেয়। Monsoon কিন্তু পঞ্চনদ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এ জন্য বাঙলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো। পাঞ্জাবে শীত-কালই বর্ষাকাল।

(৩)

ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জন হচ্ছে কৃষিজীবী। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরেও একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালে গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্ত্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই সহুরে মনোভাব থেকে নিস্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকুল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে—অর্থাৎ যারা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিলেতের সাধারণ লোকের সামিল হয়ে গিয়েছে,—তারা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা জন্ম লাভ করেছে সহরে ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে; অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে।

এ দেশ যদি ঋষিক্ষেত্র হয়, তার কারণ এ দেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।

আজকাল অনেক ইংরাজীশিক্ষিত সদাশয় লোক village organisation করবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কৃষিকর্ম্মের জন্য যুগ যুগ ধরে যে organisation করেছে, তারই নাম কি village নয়? Village জিনিষটে শুধু Organised নয়, কালবশে প্রতি গ্রাম এক একটি organism হয়ে উঠেছে। Organism কে Organise করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ তেমনি নিরর্থক। Organismsও ব্যাধিগ্রস্ত হয়; যদি আমাদের দেশের গ্রামসমূহ তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার নাম Organisation নয়; Organise মানুষে করে শুধু কল-কারখানা। যে ভূভাগকে ভগবান চাষের দেশ করে গড়েছেন, তাকে আমরা পাঁচজনে কল-কারখানার দেশ তৈরী করতে পারব না,—তা চাষার মুখের গ্রাস কেড়ে টাটা কোম্পানীর লোহার কলের পেট যতই কেন ভরাই নে কেন। ভারতবর্ষ কখন বিলেত হবে না। মনে ভেবো না যে আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে সুরু করেছি। পুরাণকাররা বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্ম্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্ম্মের ভূমি, যে কর্ম্ম দেব-দানবরা করতে পারেন না। এ কর্ম্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম্ম। আর এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না, একালের অর্থশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না।—আর তখন তোমরা ধর্ম্ম বলতে

বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বলতে বুঝবে ধর্ম্ম; যেমন আজকালকার পলিটিসিয়ানরা বোঝেন।

উদ্ভিদ।

(১)

মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন। উদ্ভিদের কাছ থেকে যে আমরা স্থধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিষই যোগায়। উত্তরাপথ প্রধানতঃ আমাদের দেয় অন্ন আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্ব্বাংশ ভাতের দেশ। প্রথমতঃ ধান জন্মায় অতিবৃষ্টির দেশে, ও গম জন্মায় অল্পবৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টির দেশে। তারপর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাঙলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশী, তাই বাঙলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পঞ্জাবে প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। ধান বৃষ্টির জলে স্নান না করতে পেলে বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে হয় না। গোড়ায় রস পেলে ও গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ সাহারা মরুভূমি ও আরবদেশই আসলে খেজুরের দেশ। ও দুই মরুভূমির ভিতর যেখানে একটু জল আছে, সেইখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর—মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায়ও বারিবর্ষণ করবার দরকার

নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেই সেখানে গম জন্মায়, ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে সুধু পিপাসা আছে তাই নয়, ক্ষিধেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব সুধু জলের। তাই মরুভূমির অন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যে সব শস্যের সুধু গোড়ায় জল চাই, সে সব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়! সিন্ধুনদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধু দেশকে এমন শস্য-শ্যামলা করে তোলা হয়েছে।

(২)

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি পলি মাটি নয়, আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত পাথর-গলা মাটি। এ মাটিতে খাবার জিনিষ তেমন জন্মায় না, আর দক্ষিণাপথের অপর মাটিও অতি নিরেস মাটি, তাতে ধান জন্মায় না। গমও জন্মায় না, জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারি রুটি খেয়েই এ দেশের লোক জীবন ধারণ করে। এ দু ভাগের দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্ব্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্ব্বে করমণ্ডল উপ-কুল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তাল গাছের। তা ছাড়া এই দেশে শস্যও প্রচুর জন্মে। তবুও দক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক জুগিয়ে উঠিতে পারে না, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দক্ষিণাপথের আর একটি সম্পদ আছে। আগ্নেয়-গিরির পাথর-গলা মাটিকে Black cotton soil বলা হয়, কারণ ও

মাটির রং কালো ও তাতে কাপাস জন্মায়। এ দেশে এত কাপাস জন্মায় যে, দক্ষিণাপথ সুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ বিদেশকে তুলো যোগায়। বাঙলা যেমন ধানের দেশ, পঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দক্ষিণাপথ তেমনি মূখ্যত তুলোর দেশ। এ দেশ সুধু কাপাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ। "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী-তরু"—এ কথাটা সুধু গল্পের কথা নয়। দক্ষিণাপথের তুল্য বিশাল শাল্মলী তরু পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

এই থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ভারতবর্ষ, কি অন্ন কি বস্ত্র, কিছুরই জন্য অপর কোনও দেশের মুখাপেক্ষী নয়। আজকাল কেউ কেউ বাঙলা দেশে কাপাসের চাষ করতে চান। এ চেষ্টা দক্ষিণাপথে ধানের চাষ চালাবার অনুরূপ। এ ইচ্ছা অবশ্য অতি সদিচ্ছা, কিন্তু এ ইচ্ছা জিওগ্রাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতবর্ষকে ঢেলে সাজবার মহৎ বাধা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের ঐক্য।

(১)

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির পরিচয় দিতে হলে বোধহয় এক বৎসর কাল লাগে। আমি আমার বরাদ্দ এক ঘণ্টার ভিতর সে দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তাতে তোমাদের তরুণ জ্ঞানপিপাসা কতদূর মিটেছে বলতে পারি নে। যদি না মিটে থাকে ত আমার বক্তব্য এই যে—যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

এখন এই কথাটি তোমাদের বলতে চাই যে, এই সমগ্র দেশটি এক দেশ। পৃথিবীতে আর যে সব দেশ এক দেশ বলে গণ্য, সে সব ছোট ছোট দেশ। এক মহাচীন ব্যতীত অপর কোথায়ও এত বড় দেশ এক দেশ বলে গণ্য হয় নি।

প্রথমত এ দেশের চতুঃসীমা এ দেশকে যেমন পরিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য কোনও দেশকে তেমন করে নি। চীন দেশে এর তুল্য স্বাভাবিক সীমানা নেই, তাই চীনেরা তাদের দেশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেষ্টা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকে স্বদেশকে পৃথক করবার জন্য। এ চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

হিমালয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সব চাইতে বড় জিনিষ। পৃথিবীর আর কোনও দেশের অত বড় প্রাচীর নেই। তারপর ঐ হিমালয়ই ভারতবর্ষের সত্য সত্য ভাগ্যবিধাতা ও জলবায়ুর নিয়ন্তা। হিমালয়ের জলই হচ্ছে উত্তরাপথের প্রাণ। আর হিমালয়ই সমগ্র ভারতবর্ষের বায়ুর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন উর্ব্বর, এমন মানুষের বাসোপযোগী দেশ হয়েছে। তারপর ভারতবর্ষের অন্তরে কোনও সমুদ্র কিম্বা হ্রদ নেই, আর তার মধ্যস্থ একমাত্র পর্ব্বতশ্রেণী বিন্ধ্যশ্রেণী এত উচ্চ নয় যে, ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। তারপর এই এক দেশ এত বৈচিত্র্য-পূর্ণ যে এক হিসেবে একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত সার বলা যেতে পারে।

(২)

ভারতবর্ষ মহাদেশটি অতি সুরক্ষিত দেশ। প্রকৃতি নিজ হাতেই এ দুর্গের পর্ব্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা গড়ে দিয়েছেন। তবে

এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগশূন্য নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে উত্তরাপথের পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আছে—উত্তরে Khyber pass ও দক্ষিণে Bolan pass। অতীতে এই দুই রন্ধ্র দিয়ে ইরাণী তুরাণী শক হুন যবন বাহ্লিক মোগল পাঠান প্রভৃতি জাতিরা এদেশে প্রবেশ করেছে—কিন্তু সহজে নয়। Khyber pass দিয়ে ঢুকলে পাঞ্জাবের পঞ্চ নদ পার হয়ে এসে গঙ্গা-যমুনার দেশে পৌঁছতে হত, আর Bolan pass দিয়ে এলে বিদেশীদের বুকে মরুভূমি ঠেকত।

ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করবার আসল দ্বার হচ্ছে দিল্লি নামক সহর। কারণ যেখানে মরুভূমি ও আরাবলি পর্ব্বত শেষ হয়ে শস্য-শ্যামল সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। সেই মিলনস্থানেই মোগল পাঠানরা দিল্লি নগর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্য্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর দিল্লির উপকণ্ঠেই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পানিপথ এ সবই প্রায় এক জায়গায়। পুরাকালে দিল্লির গেট্ না ভেঙ্গে কোনও বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে যে সকল জাত ও দ্বার খুলতে পারে নি, তারা হয় দেশে ফিরে গিয়েছে, নয় সিন্ধু ও পঞ্চনদ দেশ অধিকার করে বসেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রকূলেও দুটি চারিটি ছাড়া আর প্রবেশদ্বার ছিল না, আর সে কটি বন্দর দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে; উপরে ভৃগুকচ্ছ ও সুরপারগ এবং নীচে কালিকট ও কোচিন।

এই কটি দ্বার দিয়েই ইউরোপীয় জাতিরা জাহাজে করে সমুদ্র পার হয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও

ফরাসীরা এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ঢুকেছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার স্থলপথ এখন বন্ধ। Khyber pass এবং Bolan pass এই দুই দুয়োরই এখন দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত, কিন্তু জলপথ এখন পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিন দিকে খোলা। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়ার যোগ ছিন্ন হয়েছে, তার পরিবর্ত্তে নূতন যোগ স্থাপিত হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে; সে যোগ অবশ্য দৈহিক নয়, মানসিক।

(৩)

এই এক ঘণ্টা ধরে তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের যে মোটামুটি বর্ণনা করলুম, সে বর্ণনার ভিতর থেকে তার একটা অঙ্গ বাদ পড়ে গেল। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। সুতরাং ভারতবাসীদের কথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবে যে ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের রূপগুণের পরিচয় দিতে চেষ্টা মাত্র করি নি, তার কারণ সে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। Anthropology নামক বিজ্ঞান আমি জানি নে, আর Anthropology নামক বিজ্ঞানেরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও জ্ঞান নেই। Anthropology এ বিষয়ে সত্য খুঁজছে, কিন্তু আজও তার সাক্ষাৎ পায় নি। আজ এক anthropologist যা বলেন, কাল অপর anthropologist তার খণ্ডন করেন। সুতরাং ও শাস্ত্রের মনগড়া কথা সব তোমাদের শুনিয়ে কোনও লাভ নেই, বরং সে সব কথা শোনায় তোমাদের ক্ষতি আছে। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমরা অজ্ঞান হই। অর্থাৎ ঐ নামে যে সব কথা চলে, সে সব কথাকে এ যুগে বেদবাক্য বলে মেনে নিই। আমাদের মত

বয়স্ক লোকদেরই যখন মনের চরিত্র এ হেন, তখন তোমাদের পক্ষে এ সব অনিশ্চিত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত কথা শোনায় ভয়ের কারণ আছে। তোমাদের মন স্বভাবতঃই বিশ্বাসপ্রবণ। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দেও, খবরের কাগজের কথাতেও তোমরা বিশ্বাস করো। বুজরুক শব্দটার মানে শুনতে পাই জ্ঞানী। বুজরুক নামক জ্ঞান নিয়েই কাগজ ওয়ালাদের কারবার। আর নিত্য দেখতে পাই যে, সেই সব বুজরুকী কথা তোমাদের নরম মনে এমনি বসে যায় যে, সে সব কথার কালির ছাপ অনেকের মনে চিরজীবন থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্ব নিয়ে তোমাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সকল লোক যে এক জাতির লোক নয়, এ সত্য ত সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এ দেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রূপের ও বর্ণের ভিতর কতটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেরই চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আমি পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি যে, পৃথিবীর জিওগ্রাফিকাল ভাগ ও পলিটিকাল ভাগ এক নয়। এ দেশের লোক পলিটিকাল হিসেবে এক জাত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এক জাত নয়। জিওগ্রাফির ভাগের হিসেবে তাদের জাতেরও স্পষ্ট ভাগ আছে। পলিটিক্সের হিসেবে কাশ্মিরী পণ্ডিত অবশ্য তামিল নাইডুর সহোদর, কিন্তু জিওগ্রাফির হিসেবে এঁরা পরস্পরকে কিছুতেই দেশকা ভাই বলতে পারেন না। আজ আমি তোমাদের কাছে যতদূর সংক্ষেপে পারি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জিওগ্রাফির বর্ণনা করলুম, বারান্তরে তোমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন জিওগ্রাফি ও প্রাচীন ভারতবর্ষে

জিওগ্রাফির কথা শোনাব। পুরাকালেও স্ব দেশের জিওগ্রাফি জানবার কৌতূহল লোকের ছিল এবং এ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরা লিখে রেখে গিয়েছেন, আর তার থেকেই জানা যায় যে, কালক্রমে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে সে বর্ণনা এ বর্ণনার চাইতে ঢের ছোট হবে, আর আশা করি ঢের বেশী সরস হবে। যে সব দেশের, যে সব সহরের, যে সব পাহাড়ের, যে সব নদীর নাম আমরা রামায়ণ মহাভারতে পড়ি, তারা কোথায় ছিল আর তাদের ভিতর কোনটি স্বনামে না হোক, স্বরূপে বিরাজ করছে, সে সব কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে কষ্ট করতে হবে আমাকে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বংশীধারী।

ভোরের বেলায় বংশীধারী তাঁর মোহন বাঁশীতে ফুঁক দিয়ে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত আলাপ করতে করতে চলেছেন, এক প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে।

বসন্তের এলোমেলো বাতাসে মধুর বংশীধ্বনি দশ দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

বাঁশগাছগুলোর আর সহ্য হলো না। তারা পরস্পরের গায়ে ঠ্যালাঠেলি করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করলে, তা' তাদের নিজের কানেই কর্কশ বলে' মনে হ'ল।

তখন তারা কানাকানি করে বলতে লাগল—একি! আমাদেরই অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড এমন সুন্দর সঙ্গীত করছে, আর আমরা এত প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী হয়েও তার কিছুই করতে পারছি না? এর মানে কি!

বাঁশগুলোর মধ্যে যেটী সবার চেয়ে বিজ্ঞ, সে বল্লে—মূর্খ তোমরা! বাদক না হলে কি বাজে? ডাকো ঐ বংশীধারীকে। ও নিশ্চয়ই আমাদের বাজিয়ে দিয়ে যাবে।

তখন সেই বংশীধারীকে ডাকা হলো এবং বলা হলো—যখন আমাদের ঐটুকু নিয়ে অমন সুন্দর সঙ্গীত করছ, তখন আমাদের সবটা নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি আরও মধুর ধ্বনি বের করতে পারবে। দেখ—কত বড় আমরা! কত উচ্চ শির আমাদের!

বংশীধারী বল্লেন—তোমাদের কিছুই হবে না। তোমরা বেজায় সংস্কারপুষ্ট হয়ে পড়েছ, আর তোমাদের অন্তরটাকে প্রবৃত্তির মশলায়

বেজায় নিরেট করে' ফেলেছ। যদি তোমাদের নিয়ে কিছু করতেই হয়, তবে আগে তোমাদের উচ্চ শির নত করে' ফেলতে হবে।

বাঁশগাছগুলো যেন সবাই চম্‌কে উঠ্‌লো। পাতাগুলো সব হাওয়ায় কাঁপতে সুরু করে দিলে। নেহাৎ কোমলপ্রাণ যারা, তাদের চোখ হতে শিশিরের অশ্রুবিন্দু বংশীধারীর অঙ্গে ঝরে' পড়তে লাগ্‌ল।

বংশীধারী তাদের অভয় দিয়ে বল্লেন—বাজতে আর তোমাদের হবে না। তোমরা যেমন আছ তেমনি থাক। সঙ্গীতের সঙ্গতি তোমাদের নেই।

তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে সাহসী, সে জিজ্ঞাসা করলে—সে সঙ্গতি কি?

বংশীধারী বল্লেন—দুঃখ। সব প্রথমে তোমাদের কেটে ফেলে উচ্চ শির নত করতে হবে। তারপর যে অংশটুকু ফোঁপ্‌রা, অর্থাৎ প্রবৃত্তির মশলায় নিরেট হয়ে যায় নি—সেইটুকু নিয়ে তার উপরে লোহার শলা পুড়িয়ে স্থানে স্থানে বিঁধ করতে হবে। তবেই তোমাদের ভিতর থেকে আনন্দসঙ্গীত বার হতে পারবে। কিন্তু এত দুঃখ সইতে পারবে কি?

একটা ঝড় উঠ্‌লো। বাঁশগাছগুলো সমস্বরে বলে' উঠ্‌লো—না, না, যাও, যাও তুমি। চাইনা আমরা তোমার আনন্দের সঙ্গীত।

বংশীধারী মুচ্‌কি হেসে বাঁশী বাজাতে বাজাতে আপন মনে নিরুদ্দেশের পথে চলে' গেলেন।

শ্রীপ্রমথ নাথ যশ-চৌধুরী।

কবি সুরেশচন্দ্র

ও

"ঐন্দ্রজালিক।"

A greater era of man's living seems to be in promise. * * * * The reason and observing intellect is a most necessary and serviceable instrument, but an excess of reason or intellectuality does not create an atmosphere favourable to moved vision and the uplifting breath of life; and for all its great stir of progress and discovery, this age, the carnival of industry and science, gives us who are in search of more living, inner and potent things, the impression of a brazen flavour, a heavy air, an inhibition of the greater creative movements, a level spirit of utility and prose. .... The Future Poetry (Aurobindo)

আমাদের দেশের তরুণ গদ্য-কবি সুরেশচন্দ্রের লেখা পড়তে পড়তে উপরোক্ত কথাগুলি বেশি ক'রেই মনে পড়ে—বিশেষতঃ তাঁর নূতন অপরূপ রূপক-কাব্য "ঐন্দ্রজালিকের" ইন্দ্রধনুর রঙফলানো উপ-ভোগ করতে করতে।

আমাদের দেশের মধ্যে কবি-প্রাণ সুরেশচন্দ্রের মতন প্রতিভাবান্, শক্তিশালী ও চিন্তাশীল লেখকের অভ্যাগমে বাংলার সাহিত্য-জগতে যে যথোচিত সাড়া পড়ে নি, এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। য়ুরোপে এরূপ অনন্যসাধারণ কল্পনাকুশলতা, রঙীণ ভঙ্গী ও স্বতঃ-প্রবাহিত উৎসধারা নিয়ে কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা, প্রশস্তি, এমন কি ছোটখাটো জীবনীও বা'র হ'য়ে যেত। সুরেশচন্দ্রের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী কবির ক্ষেত্রে বর্ত্তমান য়ুরোপে এটা ঘটেছে। উদাহরণতঃ ইংলণ্ডের যুগকবি Rupert Brook বা জার্ম্মানের বন্দী-কবি Ernst Toller-এর নাম করা যেতে পারে। এঁদের লেখার সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, বর্ত্তমান ইংলণ্ড ও জার্ম্মানিতে এঁদের কতখানি নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের চতুর্গুণ কবিশক্তি ও সাহিত্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মানো সত্ত্বেও বর্ত্তমান সাহিত্যজগতে সুরেশচন্দ্রের দানের গরিমা সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই যথোচিত সচেতন।

বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র যে একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী লেখক ও কবি, এ কথা উপলব্ধি করবার আমাদের সময় এসেছে। তাঁর "ঐন্দ্রজালিকের" ভাব ও ভাষার ইন্দ্রজাল পড়তে পড়তে এ কথাটা বোধহয় মনে বেশি ক'রেই না হ'য়ে পারে না। সুরেশচন্দ্রের "ঐন্দ্রজালিকের" বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হবার সময় মনে হয় যে, ইতিমধ্যেই তাঁর লেখার উচ্ছ্বাসের সুষমা, বর্ণের দ্যুতি ও ভাষার উদ্দাম প্রবাহ অনেকটা সংহত ও মূর্ত্ত হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অরবিন্দের পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী—"মানুষের জীবনে একটা বৃহত্তর যুগের চনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে।"

বৃহত্তর যুগটি কি ?—না মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধির (intellect) স্থলে সহজানুভূতির (intuition) উত্তরোত্তর প্রভাববৃদ্ধি। এই কথাটি আজ সাধ্যমত একটু বিশদ ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা পাব।

সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছিল, সে গত বৎসর পণ্ডিচেরীতে। তখন বাংলার একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে ব'লেছিলেন যে, সে লেখক-টির লেখা বিশুদ্ধ intellectual স্তরের জিনিষ, intuition-এর সঙ্গে তাঁর বড় বিশেষ সম্বন্ধ নেই। সুরেশচন্দ্রের নিজের লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করাতে তিনি অকপটভাবে বলেছিলেন যে, সে সব তাঁর কেমন যেন আপ্‌না থেকেই এসে যায়।

আপ্‌না থেকেই যে এসে যায় এ কথা তাঁর সুসম্বদ্ধ লেখার সঙ্গে যাঁরই পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটেছে, তাঁর কাছেই বোধহয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। সুরেশচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর মধ্যে যেন কোথাও ফাঁক নেই, কোথাও অন্যমনস্কতা বা সযত্ন চিন্তাসুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা নেই। তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থলে উচ্ছ্বাসের হয়ত একটু বাড়াবাড়ি থাক্‌তে পারে, কিন্তু কৃত্রিমতার আমেজ একেবারেই নেই; তাঁর লেখার মধ্যে হয়ত বর্ণগাঢ়তার একটু বেশি স্ফূর্ত্তি থাক্‌তে পারে, কিন্তু চেষ্টা ক'রে রঙের সুষমা আনবার প্রয়াস নেই; তাঁর নানা রূপকের মধ্যে হয়ত অন্য কোনও কবির ভাষার ও ভাবের সাদৃশ্য বা পুনরুক্তি থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভেবেচিন্তে আত্মসাৎ করবার চিহ্নমাত্রও নেই। এক কথায় তাঁর রচনা এক স্বতঃউৎসারিত নির্ঝরের মতনই উচ্ছলিত, যার কলনাদ ধারাসারের অভ্যাগমে হয়ত একটু বেশি উদ্বেল হ'য়ে পড়তে পারে;—কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের কলতানে

নিজেই আত্মহারা, নিজের গতির ছন্দে নিজেই মাতোয়ারা, নিজের স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার আগ্রহে বাধাবন্ধহারা। দু' একটি উদাহরণ দেব।

"কিন্তু হরিৎ দ্বীপের ব্যাপার উল্‌টো; ক্ষয়বৃদ্ধির চাঞ্চল্যে এর আকাশপাতাল আকুলিত, হাসি-কান্নার হিল্লোলে এর গিরি, কান্তার, উপত্যকা, অধিত্যকা—সব উদ্বেলিত। ঊষার নীলিমায়, সন্ধ্যার রক্তিমায় এর জলস্থল রঞ্জিত। দখিনা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে এর বুকে কত কত ফুল মোহন হাসি নিয়ে জেগে ওঠে, আবার উত্তুরে বাতাসের স্পর্শে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধূলোয় ঝ'রে যায়; বসন্তের স্পর্শে এখানে সব শ্যামল হ'য়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠে গান জাগে, অলির পক্ষস্পন্দনে গুঞ্জন তোলে, আবার প্রসূনপল্লব সব স্থবির হ'য়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়, অলির গুঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। প্রাণের এখানে হিসেব নেই, তাই মৃত্যু এখানে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু চিরন্তনের বেদনা রেখে যেতে পারে না। হরিৎদ্বীপের একদিনের রিক্ততা আর একদিনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভ'রে যায়, আক্ষেপের পাছে পাছে এখানে আনন্দের আয়োজন চল্‌তে থাকে।"

(হরিৎদ্বীপে—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৩২)

অথবা—"এই অনুভব-সাধনা মানবজাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য ব'লে শাস্ত্রবাক্যের চাইতে মানুষের জীবনকাব্য বড় হ'য়ে রইল। মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি পাদক্ষেপটি কি করে ফেল্‌বে, শাস্ত্রবাক্য তারই বিধি কঠিন করে' বসে' আছে। কিন্তু জীবনকাব্য হঠাৎ একদিন নবীন ঊষায় পুলক-কম্পিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে—আমি নতুন পথের অনুভব পেয়েছি, নতুন পথের নবীন রাগিণী

আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মা স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শ আমাকে সঞ্জীবিত করছে, আনন্দাপ্লুত করছে। ওই পথেই আমাকে চল্‌তে হবে, কারণ ওইখানেই আমার জীবন-অনুভব সত্য হ'য়ে উঠেছে, ওইখানেই আমি সত্য হ'য়ে উঠ্‌ছি। ও পথে কি আছে জানি নে। হয়ত সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে, আঘাত আছে, আশীর্ব্বাদ আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে—ওখানে নির্ব্বিঘ্নতা নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, প্রতিদিনের পরিচিত সহজ গতিভঙ্গী নেই; কিন্তু ওই সুখদুঃখ হাসি-অশ্রুতে আঘাত-আশীর্ব্বাদে আছে জীবনের উচ্ছ্বসিত রস-ধারা, যা আমার সঞ্জীবনী সুধা। ওর ছন্দ ও স্বর, বর্ণ ও গন্ধ আমার কার্পণ্য দূর করে আমাকে লীলায়িত করবে, অভ্যাসচক্র থেকে মুক্তি দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুল্‌বে, আমার সামর্থ্যকে সাকার করে' তুল্‌বে; তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমার মানবার উপায় নেই। শাস্ত্রবাক্য যেখানে সমাপ্তি টেনে শেষ হয়ে যাবে, মানুষের অনুভব সেখানে আবার নবীন আরম্ভের সুর তুলে নব যাত্রার আয়োজনে জীবনের অন্তরবাহির গতিশীলতার লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ করে' তোলে, বৃহৎ করে তোলে, স্বরাট করে' তোলে, যুগে যুগে লোকে লোকে।"

উদ্ধৃত অংশ দুটি একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, প্রধানতঃ দুটি কারণেঃ—(১) সুরেশ চন্দ্রের লীলায়িত বিশিস্ট ভঙ্গিমার সঙ্গে অনেক বাঙালী পাঠকই পরিচিত ন'ন বলে, তাঁর ভাষার ও রচনাভঙ্গীর স্বচ্ছ লালিত্যের সঙ্গে তাঁদের একটু সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া আবশ্যক মনে করি; ও (২) এ দুটি উদ্ধৃতাংশ থেকে সুরেশচন্দ্রের লেখার দুটো দিক্—অর্থাৎ কবিত্বের রঞ্জিতচ্ছটা ও চিন্তাশক্তির গাঢ়তার বড় সুন্দর সমন্বয় মেলে।

সুরেশচন্দ্রের রচনা-ভঙ্গীর উপর দুটি রচনা-ভঙ্গীর প্রভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়ঃ—(১) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ও (২) সুরসিক বীরবলের।

এতে অবশ্য দোষের বিশেষ কিছু নেই। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতি পদে মানুষ যখন অপরের ভাব, ভাষা, চাহনি ও সংস্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ লাভ করে থাকে, তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বা এরূপ প্রভাব না হবে কেন? কেবল একটা কথা।—সব মঙ্গল প্রভাবই শুভ হয় এক তখন, যখন মানুষ তাকে আত্মসাৎ (assimilate) ক'রে নিয়ে তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে মহনীয়তর ক'রে তুল্‌তে পারে। এক মাছি-মারা অনুকরণই আক্ষেপজনক—অপরের চিন্তা, লেখা বা সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নয়। অবশ্য অনেক সময়ে দেখা যায় বটে যে, সুধীজনও প্রতিভার দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হ'য়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যটি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সত্য প্রতিভা বিশ্বের প্রতিকূল ও অনুকূল প্রভাবসমষ্টির কেন্দ্রে বাস করলেও—হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ—তা থেকে যেটুকু লাভ করা যেতে পারে, সেইটুকুই আহরণ ক'রে এক সমুন্নততর বিকাশে গরীয়ান্ হ'য়ে ওঠে। কেননা এই-ই হচ্ছে প্রতিভার সংজ্ঞা বা চরিত্র-লক্ষণ (characteristic)। সুরেশচন্দ্রের "সবুজ কথা"র রচনার সঙ্গে তাঁর আজকালকার রচনার তুলনা করলে এ কথা যথাযথ ভাবে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বাহুল্যভয়ে তাঁর আগেকার লেখা থেকে উদ্ধৃত ক'রে তাঁর আজকালকার লেখার সঙ্গে তুলনা করতে সাহসী হ'লাম না। কিন্তু যে কেউ তাঁর "বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা," "অবরোধের কথা" প্রভৃতি আগেকার রচনার পাতা একবার উল্‌টে দেখেছেন, তিনিই বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে, সে সব লেখার ধারা রবীন্দ্রনাথের

বাক্যযোজনা-ভঙ্গী ও বীরবলের রসিকতাভঙ্গীর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত ছিল। আজও তিনি যে সে প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পেরেছেন তা নয়, কিন্তু তবু তাঁর আজকালকার লেখার মধ্যে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যটি যে ক্রমেই বেশি ক'রে ফুটে উঠছে, এ কথা পূর্ব্বোক্ত দুটি উদাহরণ থেকেই যথেষ্ট প্রতীয়মান হতে পারত। তবে তা সত্ত্বেও যে আমি তাঁর নূতন বই "ঐন্দ্রজালিকের" দু একটি স্থল থেকে উদ্ধৃত করতে অগ্রসর হচ্ছি, সেটা শুধু এই কথাটিরই উপর জোর দেবার জন্যে যে, সত্য প্রতিভা সব প্রভাবকেই গ্রহণ করে—তা থেকে নিজের মানসলোকের ও অন্তরজগতের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে।

"বছর ঘুরে গেল, আবার ফাল্গুনের সাড়া পড়ল। আমবনের বুকে বসন্তের বাতাস শিহরণ তুলল। সেই শিহরণে ভিড় ক'রে সব আমের মুকুল জেগে উঠল—তারই মিষ্টি গন্ধে দিক্ উদাস, আকাশ উদাস, বাতাস উদাস, মন উদাস। (ঐন্দ্রজালিক)

এইরকম ভঙ্গিমায় পুনরুক্তির মধ্যে একটা সুন্দর ব্যঞ্জনা সুরেশ-চন্দ্র প্রায়ই মূর্ত্ত ক'রে তোলেন। তাঁর "ইরাণী উপকথায়" ও অন্যান্য লেখার সঙ্গে যিনিই পরিচিত, তিনিই এ কথা জানেন। পূর্ব্বোক্ত গল্পটিতে প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরকম পুনরুক্তি পাওয়া যায়। এ কেমন ?—না, গানে নানা স্বরবিন্যাসের পরে প্রথম পংক্তিতে ফিরে আসা। এর ধ্বনিলালিত্যের পরিচিত সুরটির পুনঃপুনঃ ফিরে ফিরে ভেসে আসার মধ্যে মেলে—অনেকটা ধুয়া বা refrain-এর সুষমা। "ঐন্দ্রজালিক" গল্পটিতে বিশেষ ক'রে এ পুনরুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রতি পাণিপ্রার্থী আসেন আর বিফল হ'য়ে ফিরে যান, আর রাজকুমারীর মনের কোণে সুর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে :—

মৌন কথায় বাসুক ভাল গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে স্বপনে।

সুরেশচন্দ্র বর্ণের মাদকতায় মাতোয়ারা হ'য়ে চলেন, কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণোজ্জ্বলতাকে তুলি দিয়ে সযত্নে পরিস্ফুট করবার প্রয়াস পান না। কারণ বর্ণের ঝরনা তাঁর কল্পনাজগতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলেছে ব'লে চেষ্টা করে সে উৎসের ধারাকে উজ্জ্বল করবার তাঁর দরকার হয় না। যেমন,—

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ মালা আমি ধনীর হাতে দিতে পারি নে—দরিদ্রের ঘরে রাখতে পারি নে—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব.........

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ মালা আমি রূপসীর হাতে দিতে পারব না—কুৎসিতার কাছে রাখতে পারব না—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব......

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব? —এ যে নিজের কাছে রেখে তৃপ্তি পাইনে—পরের হাতে দিয়ে শান্তি পাইনে—হায়! এই আমার মালা—আমার মালা—আমা.........."

(বাঁশী ও বেহালা)

পুনরুক্তির এই ঢঙটির প্রেরণা সুরেশচন্দ্র পেয়েছেন অনেকটা আমাদের প্রচলিত রূপকথাদি থেকে, ও বর্ণোজ্জ্বলতার প্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রূপকথার পুনরুক্তির ঢঙকে

কিন্তু তিনি তাঁর কবিত্বের পরশমণিতে মুহূর্ত্তে স্বর্ণবর্ণ ক'রে তুলতে চেয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্যতাকে তিনি তাঁর নিজস্ব তরুণ মনের ভাবাবেগ দিয়ে একটু বেশি উৎসারিত ক'রে তোল্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য যে এ উভয় চেষ্টায়ই তিনি সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়েছেন, ও সেটা এই জন্যে যে, তাঁর মধ্যের মৌলিকতাটি এ সব প্রভাবকে যথাযথ ভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিতে পেরেছে। নইলে তাঁর লিখনভঙ্গীর মধ্যে জড়তা ও কৃত্রিমতাই বড় হ'য়ে উঠ্‌ত,—যেমন রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের প্রভাবিতদের মধ্যে প্রায় সকলেরই হ'য়ে উঠেছে—এক প্রতিভাবান্‌ শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ছাড়া। কারণ শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সম্পৎ ছিল। সুরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সুরেশচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের লেখা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও মনস্তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনের ভঙ্গী দিয়ে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এঁদের দুজনের ক্ষেত্রেই এ প্রভাবে কিছু যায় আসে নি। কারণ এঁদের দুজনের কারুরই লেখা কবীন্দ্রের অনুকরণ নয়—তাঁর প্রভাব আত্মসাৎ ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের গরিমায় ফুটে ওঠা মাত্র।

সুরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্ণাঢ্যতার গরিমাই যেন তাঁর তারুণ্যের গৌরব নিয়ে বেশি ক'রে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ণতুলিকার সংযমকে তিনি পরিহার ক'রে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছেন এই বর্ণপাতকেই গাঢ়তর ক'রে তুল্‌তে। এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যটি বিশেষ ক'রে ফুটে উঠেছে। যেমন :—

"প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গোপন গ্রন্থি আছে, জীবন ভ'রে যার চারপাশে তার সুখদুঃখের পশরা সজ্জিত হ'তে থাকে—যার চারপাশে তার জীবনের আলোছায়া, আশা নিরাশা, অনুরাগ

বিরাগের লুকোচুরি খেলা চল্‌তে থাকে—যে রহস্যগ্রন্থিকে ঘিরে তার জীবনের তপস্যা ও সাধনা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে।" (পরম আত্মহত্যা দ্রষ্টব্য, ২৮ পৃষ্ঠা).

অথবা—"রাজকুমারীর দেহের উপর দিয়ে ষোলটা বসন্ত ব'য়ে গিয়েছে। ষোল ষোলটা বসন্ত—তারি নিবিড় সোহাগ—সেই সোহাগের স্পর্শ রাজকুমারীর সারা দেহে মাথায়" ইত্যাদি।

(স্বয়ম্বর দ্রষ্টব্য, ৪৯ পৃষ্ঠা)

অথবা—"অপরূপ এক সুন্দরী রূপসী। * * * যেমন গলিত স্বর্ণের রঙ তেম্‌নি রমণীর গায়ের রঙ * * চোখের তারায় কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় ধরা যায় যায় যায়-না" ইত্যাদি

(মৃতসঞ্জীবনী দ্রষ্টব্য, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(এ সব অংশ আদ্যন্ত উদ্ধৃত করলেই ভাল হ'ত, কিন্তু স্থানাভাবে তা করতে পারলাম না।)

অনেকের মতে এত বেশি রঙ ফলানোটা আর্টের দিক্ দিয়ে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা বলেন বর্ণতুলিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সংযমের সঙ্গে, যেহেতু নৈলে মন সহজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। ওরূপ আপত্তি ভিত্তিহীন না হ'লেও সব ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে সমর্থনীয়ও নয়। কারণ সব শিল্পের ধারা, গতি বা প্রেরণা একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথের জাপানের পত্রে পড়েছিলাম জাপানী চিত্রকলায় ও কাজে সংযমের নাকি বড় বেশি বাড়াবাড়ি। তাদের কবিতা কেমন? না,

"একটি বনস্পতি, দুটি শাখা, বিহগদম্পতি।" বাকি সবটুকু পাঠক কল্পনা ক'রে নেবেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনা সম্বন্ধে যে কথা, কোনও মনোভাব বা নরনারীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ খুব কম বলা

দরকার, বাকিটুকু ইঙ্গিতে বলা হোক্। এইটেই হচ্ছে সেখানকার কলাসংযমবাদীদের মত।

এরূপ অত্যধিক সংযমে যে আর্টের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনাই পনেরো আনা, এ কথা বোধহয় কেউ জোর ক'রে অস্বীকার করবেন না। উচ্ছ্বাসের মতন সংযমেরও অতিচার (overdoing) সম্ভব, যার ফলে ললিতকলা নিরাভরণা হ'তে হ'তে শেষটায় রিক্ততায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। আর্ট পূরোদস্তুর সারল্যও নয়, বাড়াবাড়ি অলঙ্কারানুরক্তিও নয়। বড় আর্টের মধ্যে সরলতার সঙ্গে বর্ণগৌরব ও শোভার বিচিত্র শ্রীর একটা সহজ সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা দরকার।

কথা উঠ্‌তে পারে বাড়াবাড়ি সংযম কাম্য না হ'লেও, সুষ্ঠু সুসমাহিত সংযম মূলতঃ শিল্পকলার একটা প্রধান আনুষঙ্গিক। এর উত্তর এই যে, এরূপভাবে শিল্প মহনীয় হ'তে পারে মেনে নিয়েও বলা যায় যে, এইটেই উচ্চকলার একমাত্র সংজ্ঞা নয়। শিল্পের গতিভেদ আছে, রূপভেদ আছে, বিকাশভেদ আছে, ও প্রেরণাভেদ আছে। কাজেই শিল্পের একটা বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। শিল্প একটা জীবন্ত স্রোতে ওতঃপ্রোত সুষমামণ্ডিত জগৎ, যেখানে মানুষের কল্পনার আলোছায়া নিত্যনিয়ত নতুন নতুন পুলকশিহরণের খোরাক যোগায়। তাই শিল্পের একমাত্র কষ্টিপাথর এই যে, তাতে হৃদয়ের কোনও গভীর তৃপ্তিরূপ সার্থকতা বা অন্তরের কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা মেলে কি না। মানুষের অন্তর্জগত শান্ত নয়, তাই তার আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বেদনা তৃপ্তি অতৃপ্তিও অনন্ত। শিল্পী এই সবের চর্চ্চায় নিত্যে নিজের নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দেন। তাই সংযমের মধ্য দিয়ে বিকশিত শিল্পকলার এক রূপ, আবার

বাধাবন্ধহারা ভাবের নির্ঝরের মধ্য দিয়ে প্রেরণার প্রবাহের আর এক রূপ। দুই-ই মানুষের হৃদয়ের দুটি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করে। আত্মসমাহিত, সংক্ষিপ্ত, সংযমগম্ভীর আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্য্য একরকম; আবার চলার-টানে-মাতোয়ারা লাস্য, আবেগ কলনাদে মুখরিত রসোচ্ছ্বাস ও অন্তরের খচিত ভাবনিচয়ের উদ্দাম অভিব্যক্তির সৌন্দর্য্য অন্যরকম। সুরেশচন্দ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনাদি শেষোক্ত শ্রেণীর, শরৎচন্দ্রের গঙ্গার অন্ধকার রূপের ধ্যানমূর্ত্তিপরিকল্পনা বা শ্মশানে নরকঙ্কালের মধ্য দিয়ে আর্দ্র বায়ুর দীর্ঘশ্বাস বর্ণনের ভঙ্গী প্রথমোক্ত শ্রেণীর। দুইয়ের গতিভঙ্গী, বর্ণপাত ও নৃত্যছন্দ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। তাই একের মাপকাঠিতে অপরের বিচার সঙ্গত হ'তে পারে না। Wordsworth-এর প্রকৃতিদেবীর রূপবর্ণনার গাঢ় গাম্ভীর্য্য এক শ্রেণীর জিনিষ, আর Keats-এর Ode to a Nightingale বা Shelley-র Prometheus Unbound কাব্যের সঙ্গীত লহরীর উজ্জ্বল উন্মাদনা অন্য শ্রেণীর জিনিষ।

অবশ্য খানিকটা সংযম নিশ্চয়ই দরকার। সাহিত্যে প্রাকৃতিক বা মানসিক আলোছায়ার বর্ণনের অতিচারে যে মনটা অনেক সময়ে অধীর হ'য়ে ওঠে, এ কথা কে না জানে? কিন্তু শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শিল্পী সে সীমা বা সৌষ্ঠবজ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কারণ এরূপ শ্রেণীর শিল্পকলার প্রকৃতি একটু অনুধাবন ক'রে দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে, তার মধ্যে শিল্পী অনেক ভাবোচ্ছ্বাসকেই নিজে থেকেই সংযত করতে কৃতকার্য্য হ'য়ে থাকেন, ও তাই তাঁর রচনা যথার্থ শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম ব'লে গণ্য হ'তে পারে। সুরেশচন্দ্রের "মৃতসঞ্জীবনী" ও "রক্তদ্বীপ" কথিকা দুটির সংহত সৌন্দর্য্য পড়লে

বোধহয় এ কথা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; বোঝা যায় যে, সৌষ্ঠব জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বা সীমানির্দ্দেশ করতে পারার মূল্য সম্বন্ধে তিনি মোটেই উদাসীন নন। এ দুটি ছোট গল্পের মধ্যে সুরেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্যটি যে কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত ক'রেছেন, সেটা একটু ভেবে দেখ্‌লে তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবান না হ'য়েই পারা যায় না। বাংলার শিল্পানুরাগীদের প্রত্যেককেই আমি বিশেষ ক'রে এ দুটি গল্প একবার প'ড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ "মৃতসঞ্জীবনী" গল্পটি স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবে ব'লে খুবই মনে হয়। যেমন তার কল্পনা, তেমনি তার বর্ণোজ্জ্বলতা, তেমনি তার ভাবগাম্ভীর্য্য ও তেমনি তার বিদ্যুৎগতি পরিণতি—আগাগোড়া যেন ঝক্‌ঝক্‌ করছে। "রক্তদ্বীপ"ও ভাবে, অভিব্যক্তিতে ও ব্যঞ্জনায় চমৎকার; কিন্তু তার ভিতরকার আইডিয়াটি বিশেষ ক'রে অরবিন্দের। তাই প্রতিভার অভিব্যক্তির পূর্ণ গরিমায় বোধহয় 'মৃতসঞ্জীবনী'ই সুরেশ-চন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পটির ভাব, ভাষা, দ্যুতি ও ব্যঞ্জনা আদ্যন্ত এই উজ্জ্বল অথচ গভীর তৃপ্তিদায়ক কিরণ বিচ্ছুরিত করছে। তাই তার একটি অংশ উদ্ধৃত না ক'রে থাক্‌তে পারলাম না—তাতে প্রবন্ধের কলেবর সমূহ বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও:—

মৃত্যু বল্‌লে—"তাই ত আমি ছুটে এসেছি।" "—কেন?"

—"বিশ্বমানবকে ঐ মৃতসঞ্জীবনীর অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে।" —"অভিশাপ!"

—"বৃদ্ধ, অনন্তকালের ধারণা করতে পার?" —"অনন্তকাল?"

—"হাঁ, অনন্তকাল। হাজার বছর, লক্ষ বছর, কোটী বছর নয়—অনন্ত—অনন্ত—অনন্তকাল।"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ভুবন দত্ত উত্তর কর্‌লেন—"সুন্দরি! সত্য কথা বল্‌তে কি, মনের ধারণাশক্তি অতদূর পৌঁছয় না। যতদূর পর্য্যন্ত ধারণা করা যাক্ না কেন—তবুও যে অনন্ত শেষ হয় না। অনন্তের অনন্ত অংশ তবুও যে তার বাইরেই থেকে যায়।"

মৃত্যু বল্‌লে—"অথচ এই অনন্তকাল ধরে' একটা মানুষের একটানা জীবন—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বছরের স্মৃতি নিয়ে—মানুষের জীবনে আর বাল্য আস্‌বে না, কৈশোর আস্‌বে না, যৌবন আস্‌বে না—কেবল একটা অপরিবর্ত্তনীয় একটানা সুর—যার বিরতির কোনও আশা নেই, সম্ভাবনা নেই—যা থেকে মুক্তির আর কোন সম্ভাবনাই থাক্‌বে না—বল্‌তে পার মানুষের পক্ষে এ বর হবে, না অভিশাপ হবে? মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদ যাকে আকাঙ্ক্ষার করে' তুলেছে, সমাপ্তিহীনতার দারুণ বোঝা যে তাকে অসহ্য করে' তুল্‌বে। বৃদ্ধ, মৃত্যু অনিবার্য্য বলে' এখন ধারণা করতে পার না যে, মৃত্যু মানুষের কত বড় মুক্তি—মৃত্যু মানুষের কত বড় বন্ধু।"

বৃদ্ধ উত্তর কর্‌লেন—"সুন্দরি! আমার প্রতি অবিচার কোরো না। মৃত্যু মানুষের পরম বন্ধু আমি জানি। কিন্তু কেন? কারণ জরা আছে বলে'। মানুষকে যদি অনন্ত যৌবনের অধিকারী করে তোলা যায়, তবে মৃত্যু-মুক্তির সার্থকতা কোথায় থাক্‌বে?"

একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাসে সুন্দরীর বক্ষ উন্নত হ'য়ে উঠ্‌ল—সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' মৃত্যু বল্‌লে—"হায়! মানুষ কি কল্পনার জগতই না সৃষ্টি করে। চিকিৎসক, জান কি অনন্ত যৌবনের অর্থ? ওর অর্থ মানুষের অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ। কিন্তু এই অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ ভোগের জন্য মানুষের অনন্ত ভোগসামর্থ্য কোথায়?

মানুষের চোখের তারায় যখন এ পৃথিবীর কোন বস্তু কোন দৃশ্যই নতুনের রহস্য নিয়ে প্রতিফলিত হবে না, যখন তার হৃদয়বীণায় কোনও সুরই আর প্রথম প্রায়-স্পর্শের মতো ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বে না, যখন তার অন্তরের সহস্র আশা আকাঙ্ক্ষার মদিরা নিঃশেষে পীত হ'য়ে যাবে, তখন যে মানুষের অনন্ত যৌবন একটা অনন্ত মরুভূমির মতো হ'য়ে উঠ্‌বে।"

গদ্যকবি সুরেশচন্দ্র ছন্দকাব্যে এখনও বেশি কিছু দেন নি। কিন্তু তবু যা দু-চারটে কবিতা তিনি লিখেছেন, সে-সম্বন্ধে দু-একটি কথা না লিখে থাক্‌তে পারছি নে, কেননা তাঁর এ প্রারম্ভের মধ্যেও একটা সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যে কবিশক্তির মধ্যে চক্ষুধাঁধাকর ক্ষণস্থায়ী দ্যোতনা নেই বটে, কিন্তু আছে—সমাহিত সত্যপ্রেরণার অবিসংবাদিত আভাষ, যেটা সত্যসাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। যদিও অদ্যাবধি তাঁর বর্ণযোজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একটু বেশি হ'য়ে এসেছে ব'লে তাঁর মৌলিক কবিপ্রেরণা তেমন ক'রে স্বয়ম্প্রকাশ হ'তে পারে নি, কিন্তু তবু ইতিমধ্যেই তাঁর মৌলিক গরিমা যে গতিতে প্রকট হ'য়ে উঠেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে গণ্য হবেন, এ কথা খুবই মনে হয়। এ কথাটি বিশদ ক'রে তোলবার জন্যে দু একটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করব। তাঁর "রমণী" কবিতাটির মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব সুর বড় মনোজ্ঞ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ—

বিদ্রোহের কণ্ঠে আজি করি অস্বীকার—
নহ নহ নহ তুমি কামকামনার,
হে রমণী! বক্ষ ঘেরা সৌন্দর্য্য নিবিড়,

নহে নহে নহে কভু দুরন্ত ভোগীর
সুপ্ত পশু জাগাইতে ; বলয়-নিক্কণ
আজি মোর চক্ষে আনে সুদূর স্বপন,
যেন কোন্ অতি দূর দূর অতীতের
বিস্মৃত সঙ্গীত সনে ; আঁধারের ঘের
মোর রুদ্ধ বক্ষ হ'তে, গ্রীবার হেলন,
চূর্ণিত কুন্তল তব, বাহুর দোলন,
নিমেষে খসায়ে নেয় ; মোর মর্ম্মতল
অনন্তের গীত শোনে ধরি' তব ছল।
বিদ্রোহের কণ্ঠে তাই করি অস্বীকার—
নহ নহ হে রমণী ! কামকামনার।

কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বড় বেশি, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কবিতাটির মধ্যে যে ভাবের দিক দিয়ে সুরেশচন্দ্রের একটি নিজস্ব সুর আছে, এ কথা বোধহয় সত্যকার রসগ্রাহীর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। তিনি যে ক্রমেই তাঁর কাব্যে এই নিজস্ব সুরটি ফুটিয়ে তুল্‌ছেন, এই কথাটি সুস্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যে তাঁর আর দু-একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত ক'রেই এ প্রবন্ধ সমাপন করব। তাঁর "অনুরোধ" কবিতাটিতে কবিবিরহী চিরপ্রণয়ীর চিরন্তন অতৃপ্ত অধীর আকুলতা তিনি বড় সুন্দর ফুটিয়েছেন :—

বালা ! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে,
সারা জীবন একটীবার একটী নিশার অভিসার একটী দীর্ঘশ্বাসে

একটী সাঁঝের মাদকতা এক নিমেষের আকুলতা
নিবিড় করি ধর আনি পরম বিশ্বাসে ॥
বালা! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে।

বালা বালা বালা! গাঁথ মালা বসন্ত ঐ গেল
নাইরে নিমেষ নাইরে সময় আর কি সাজে জয় পরাজয়
ফেল সরম ফেল।
একটী দৃঢ় আলিঙ্গনে গাঢ় সোহাগ সচুম্বনে
একটি চরম দৃষ্টি হানি হৃদ্‌কমলটি মেল,
বালা বালা বালা! গাঁথ মালা বসন্ত ঐ গেল।

এ কবিতাটিতে সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব সুরটি যে কত বেশি স্পষ্ট, সেটা দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে স্ব-সুরভরা কবিতা এটিও নয়; সেটি বোধহয় গত মাসের প্রবাসীতে অপর্ণা নদীর উদাসকরা, নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা কবিতাটি। কবিতাটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করবার লোভ হচ্ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে দুটি পদ মাত্র উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হ'ল :—

কূলের মায়া করিস্ কে রে অকূলে কার নাইরে টান?
এই অকূলেই সত্য যত, বৃহৎ যত মিল্‌বে দান।
একটুখানি আশার ভাষা, একটু কাঁদা, একটু হাসা,
কূলের দেওয়া আঁক্‌ড়ে-ধরা একটা শুধু দিনের প্রাণ।
কূলের মাটি আঁক্‌ড়ে ধ'রে অন্তিমে সুখ মিল্‌বে না,
বাঁধন যদি আঁক্‌ড়ে থাকিস্ খুল্‌বে না তা খুল্‌বে না,
আমার মতো সকল ছাড়ি দীর্ঘ পথের দীর্ঘ পাড়ি
ধর্‌তে হবে, নইলে কভু বাঞ্ছিত রে টল্‌বে না।

(হরিৎদ্বীপে দ্রষ্টব্য)

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে বিশেষ ক'রে মনে হয় যে, সুরেশচন্দ্রের কবিতা প্রেরণালব্ধ, লেখার-জন্য-লেখা নয়। কারণ কবিতাটির মধ্যে একটা নিটোল পূর্ণতা বড় অপূর্ব্বভাবে সংহত হ'য়ে এক অপরূপ ঐক্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। তাই মনে হয় যে, যদিও অদ্যাবধি সুরেশচন্দ্র তাঁর কাব্যে নিজেকে ঠিক্‌মত খুঁজে পান নি, তবু ছন্দকাব্যে আত্মোপলব্ধি মেলার দিনও তাঁর সুদূর নয়।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

সম্পাদকের দরবার।

শ্রীযুক্তা ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া

মাননীয়াসু—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর সম্পাদকের দরবারে যে সব প্রশ্ন পেশ করেছেন, সেগুলি ন্যাসনাল কংগ্রেস ও ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের যুক্ত-দরবারে পেশ করা উচিত ছিল; কারণ প্রশ্ন ক'টিরই জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ethicsএর সঙ্গে politicsএর সম্বন্ধ কি?—এ প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব তিনিই দিতে পারেন, যিনি একাধারে চূড়ান্ত পলিটিসিয়ান ও পরম ধার্ম্মিক। কিন্তু পৃথিবীতে যদি এমন কোনও ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকেন ত, তাঁকে কোনও প্রশ্ন করা হয় নি; কেননা এক দেহে ও দুই ব্যক্তি বাস করতে পারেন কি না—এই হচ্ছে প্রশ্ন-কর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য।

এ পশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এ যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন যে একই লোকের ভিতর কখনো কখনো দুই ব্যক্তি বাস করে; এমন কি অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সে দুটি পরস্পরের বিপরীত। আর এই যুগল-মিলনের ফল কি হয়, এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পৃথিবীতে moral politics আর political morals ব'লে দুটি আলাদা আলাদা ধর্ম্ম আছে। এর কোন্‌টি কার কাছে গ্রাহ্য হবে,

তা অবশ্য নির্ভর করে তার প্রকৃতির উপর। যে ধর্ম্মপ্রাণ, সে প্রথমটি অবলম্বন করবে; আর যে রাজনীতিপ্রাণ, সে দ্বিতীয়টি অবলম্বন করবে। তবে যার অন্তরে double personality আছে, সে এ দুটোর ভিতর একেকে আর বলে ভুল করতে পারে।

The end justifies the means, এই হচ্ছে political-morals-এর চূড়ান্ত কথা। যেমন "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়" নিষ্কাম ধর্ম্মের চূড়ান্ত কথা। ফল নিরপেক্ষ হয়ে কর্ম্ম করার অর্থ—end নিরপেক্ষ হয়ে ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। নিষ্কাম ধর্ম্মের এ যদি অর্থ না হয়, তাহলে তার কোনও অর্থ নেই। কারণ জেনেশুনে নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার মানে ছেলেখেলায় প্রবৃত্ত হওয়া।

যদি প্রশ্নকর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য এই হয় যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ কি? তাহলে তার উত্তর আমরা কেউ দিতে পারব না। এর কারণ পলিটিক্স আমরা আজও শিখিনি, অপর পক্ষে ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছি।

আমরা ভাবি পলিটিক্স মানে মুক্তি, আর ধর্ম্ম মানে বাধা। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, এই বাধার মধ্যেই জন্মায় শক্তি, আর তার থেকে মুক্তি আনে বিশৃঙ্খলা—অর্থাৎ দুর্ব্বলতা। স্ব পদার্থটি বাদ দিয়ে স্বাধীন শব্দের কোনও অর্থ নেই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আপনার কাগজের মারফতই আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতের যোগ-উপনিষদে এই "স্ব"র উন্নতি ও মুক্তির নামই স্বরাজ।

সেই সেকেলে স্বরাজের সঙ্গে অবশ্য একেলে স্বরাজের স্পষ্ট যোগ নেই। আর সেই জন্য সেকাল আর একালকে এক হাঁড়িতে চড়িয়ে

আমরা যে খিচুড়ি পাকাই, তা সকলে গলাধঃকরণ করতে পারে না। এ খিচুড়ির নাম meta-politics—অর্থাৎ তা politics'ও নয়, metaphysics'ও নয়, অথচ নামে ও দুইই।

প্রশ্নকর্ত্তা পলিটিক্স সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেছেন, সে সবই হচ্ছে এই meta-politics সম্বন্ধে প্রশ্ন। আগেই বলেছি ও-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধু ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস একত্র বসলে ও একমত হলে। চাণক্যকে এবং বুদ্ধদেবকে বগলদাবা করে দুজনের মুখ এক করে দেবার শক্তি আমাদের নেই, আছে শুধু ক্ষণজন্মা পুরুষদের। শুকদেব পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যাঁর ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে, তাঁর চরিত্র যেমন অলৌকিক তেমনি অদ্ভুত; ও চরিত্র ভক্তি করবার জিনিষ, অনুকরণ করবার জিনিষ নয়। আমি সেই সঙ্গে বলি যে, ও চরিত্র আমাদের পক্ষে বোঝবার জিনিষও নয়। লৌকিক মন অলৌকিক মনের সাক্ষাৎ পেলে শুধু "হাঁ" করে থাকতে পারে—রা কাড়তে পারে না।

এই সূত্রে প্রশ্নকর্ত্তার আর একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তিনি জানতে চেয়েছেন যে, মহাপুরুষকে দিবারাত্র পথেঘাটে শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ দিয়ে পূজা করলে তাঁর অহমিকা বাড়ে কি না? মহাপুরুষের মনের উপর কোন্ জিনিষের কি ফল হয়, সে কথা বলতে পারেন শুধু মহাপুরুষ। ওরকম ভক্তির বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়িতে যদি সত্যই কোন কুফল ফলে, তাহলে তার জন্য দায়ী মহাপুরুষের হুজুগে ভক্তরা।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে—স্বদেশপ্রেম কাকে বলে? এর উত্তর, আপনার দেশের প্রতি যে মমতা মানুষের পক্ষে থাকা স্বাভাবিক তাকে। স্বদেশ-

প্রেম ও পলিটিক্স অবশ্য এক জিনিষ নয়। স্বদেশপ্রেমিক সবাই হতে পারে, কিন্তু পলিটিসিয়ান সবাই হতে পারে না। তাই অনেক স্বদেশ প্রেমিক আছে যারা পলিটিসিয়ান নয়, আবার তেমনি অনেক পলিটি-সিয়ান আছে যারা স্বদেশপ্রেমিক নয়। স্বদেশপ্রেম হচ্ছে একটা মনোভাব—আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা কাজ। কবি ও কর্ম্মীর ভিতর প্রভেদ কি, সে বিষয়ে ত অনেক লেখালিখি হয়েছে; তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কবি স্বদেশপ্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মীই হচ্ছে একমাত্র পলিটিসিয়ান। পৃথিবীতে ও দুই চাই, কারণ পৃথিবী নামক দেশটা আধখানা ভাবের আর আধখানা কাজের দেশ। কথাটা যে ঠিক, তা বোঝাতে গেলে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয় যার উপর অনবরত তর্ক চলে। অতএব সে সব বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

আমার বিশ্বাস যে-সব জিনিষ নিয়ে প্রশ্নকর্ত্তার মনে খট্‌কা লেগেছে, সে সব আসলে কথার মানে নিয়ে। ধর্ম্ম শব্দের নানারকম মানে হয়, সুতরাং এ কথা দিয়ে নানারকম মানসিক গোলযোগের সৃষ্টি করা যায়। পলিটিক্স কথার অর্থও স্পষ্ট নয়। কারণ পলিটিক্স বল্‌তে আমরা ইকনমিক্সও বুঝি। রাজনীতির উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, অথবা অর্থনীতির উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত, তা নিয়ে আজও তর্ক চলেছে। সুতরাং politicsএর সঙ্গে religionএর বিবাহ দেওয়ার অর্থ ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের অসবর্ণ বিবাহ দেওয়া। এ মিলনের ভিতর কিছু না কিছু বিরোধ থাকবেই থাক্‌বে, কিন্তু তাই বলে কেউ ধর্ম্মচ্যুত অর্থ ও অনর্থক ধর্ম্মের পক্ষপাতী হতে পারেন না।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, সাত্ত্বিক লোকে পলিটিসিয়ান হতে পারে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, সাত্ত্বিক শব্দের অর্থ

কি ? এ দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, যা তামসিক তাও সাত্ত্বিক নামে চলে যায়। ইতি *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

* ভারতী-পত্রিকার মারফৎ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় আমাদের পাঁচজনকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, দু চার কথায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। এ সব প্রশ্ন দেশের কত লোকের মনে উদয় হয়েছে তা জানি নে, তবে কারও কারও যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমার মৎ-কৃত উত্তরগুলি কারও কারও অনুমত হতে পারে, এই বিশ্বাসে সেগুলি সবুজপত্রে প্রকাশ করছি। প্রশ্নগুলি গুরুতর, সুতরাং সেগুলির হাল্‌কা ভাবেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শীত।

——::০::——

শূন্য-শাখা, বিশীর্ণ বনানী—
উত্তর বাতাস মূর্ত্ত হতাশ্বাস,
বলে গেল বিদায়ের বাণী

ভানু ভোলে জগতের হিত ;
ভোরে কুয়াশায় দিগন্ত ভাসায়,
আলোক সুদূরে সমাহিত

মুছে গেছে চন্দ্রমার হাসি,
গোধূলি লগন তিমির মগন,
তারাদল হ'ল পরবাসী ॥

চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসে,
নয়ন শিশির ঝরিছে নিশির,
শ্লথ তনু ঘেরা শ্বেতবাসে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।।

ক্ষণিক স্বপন।

এ দেহ মাটির দেহ, ধূলি দিয়ে গড়া,
ধূলির সহিত ধূলি মিশে হবে লয়;
এই বসন্তের হাসি পত্র-পুষ্পে ভরা—
কে জানে হবে না কাল বিস্মৃত-বিস্ময়!
তাই আজ যত পারো ক'রে নাও পান
ধরার অধর-সুরা-সুধা সমুজ্জল,
কাল যদি শেষ হয় জীবনের গান—
তবু মনে হবে জন্ম হয়নি নিষ্ফল।
পরিপুষ্ট দ্রাক্ষাসম দুঃসহ উচ্ছ্বাসে
যৌবন তনুর তটে মেলেছে নয়ন,
নিপীড়িয়া নিঙাড়িয়া নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
তারি মধু করি' লহ নিঃশেষে চয়ন।
কুসুমের দল ঝরে বাতাসে বাতাসে,—
জীবন ধরার বুকে ক্ষণিক স্বপন!

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

চাবুক।

চাবুকের চোটে যখনই বন্ধু, পিঠে ফুটে ওঠে রক্ত,
কোন সংশয় থাকে না যে আমি তোমারই পরম ভক্ত।
দারুণ দুঃসময়,—
অশ্রুর আড়ে তোমার উপরে প্রেমসঞ্চারই হয়।
অসংখ্য কাজে ব্যস্ত যে তুমি,—চাবুক রাখিলে তুলি,
কি জানি কোথায় হারাইয়া যায় নাম জপিবার ঝুলি।
এই সবিরাম-ভক্ত পক্ষে অতএব সিদ্ধান্ত—
চাই অবিরাম-ভক্ত হইতে চাবুক অবিশ্রান্ত।
চলুক্ চাবুক, চলুক্ চাবুক, জ্বলুক্ পিঠের ত্বক্ ;
কবি হ'তাম ত আজই রচিতাম শুভ চাবুকাষ্টক।

দেবতা আছে কি না-আছে, সে কথা জানা নেই কারো ঠিক,
চাবুক-মহিমা না মানে যে জনা, সেই হ'ল নাস্তিক।
নব চাবুকের প্রেম,—
বিদ্যুৎ হেন তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, নমনীয়, মোলায়েম।
অদৃষ্ট হাতে পশ্চাৎ হ'তে পড়িছে তীব্র কশা,
করিছে পৃথক যত বদ্ ত্বক-রক্ত-মাংস-বসা।
হতাশ হ'য়োনা পিঠের বাহিরে দেখিয়া রক্তারক্তি ;
হৃদয়ের মূলে বাড়িছে গোকুলে অহেতুকি পরাভক্তি।

আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান্ পড়ে আলোকের প্রেমে,
তার জগৎ ত স্বপ্নচিত্র,—বাঁধানো ঘুমের ফ্রেমে।
মোর মত হতভাগা চিরজাগা, শতে নিরানব্বই;
তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই?
সোণা পায় উদ্ধার,—
শিখার চাবুকে জ্বলিয়া পুড়িয়া গড়িয়া অলঙ্কার।
ফুলের বরাত খুলে,—
মাল্য রচনে বেছে বেছে যবে চড়ায় সূচীর শূলে।
বেঁচে যায় চন্দন,—
ক্ষয়রোগ বরি, তিলে তিলে মরি, রচি পরপ্রসাধন।
দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রায় আর নাই কোন সংশয়,—
চাবুক-সূত্রে তোমার আমার হবে গূঢ় পরিচয়।
বাণে বাণে কার কাটামাথা কবে লভিল পিতার কোল,—
চাবুকে চাবুকে পরম চরমে চলেছি, মিটিছে গোল।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

দু'খানি চিঠি।

——:০:——

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে একখানি পত্র লেখেন। সে পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল। তার থেকেই পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, দিলীপকুমার উক্ত পত্রে একটি বড় কথা তোলেন। সে কথাটি হচ্ছে এই যে—to be-র সঙ্গে to do-র সম্বন্ধ কি? ভাষান্তরে কৃ-ধাতুর সঙ্গে ভু-ধাতুর যোগাযোগটিই বা কি, আর পার্থক্যই বা কোথায়?—এ বিচার অবশ্য জীবনব্যাকরণের আলোচনা।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র উক্ত পত্রের যে উত্তর দেন, তা পড়ে' রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে একখানি চিঠি লেখেন। সে দু'খানি পত্রই আমি বাঙালী সমাজের নিকট ধরে দিচ্ছি এই বিশ্বাসে যে, উক্ত আলোচনা থেকে আমরা আমাদের স্বজাতির মনের একটা ধারার স্পষ্ট পরিচয় পাব। আর কোথায়ও না হোক্, বাঙলা দেশে যে কবি ও কর্ম্মীর মন এক ছাঁচে ঢালাই হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলা দেশে কর্ম্ম শব্দটা একমাত্র তার ইকনমিক অর্থে আজও গ্রাহ্য হয় নি, আর আশা করি কখনই হবে না।

সুভাষচন্দ্রের পত্র ইংরাজি ভাষায় লিখিত। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র সে পত্র সবুজপত্রের জন্য বাঙলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রকে আমি যে পত্রটি লিখেছিলাম, তার ভিতরকার কথাটি ধরতে পারলে সবুজপত্রের পাঠকপাঠিকাদের পক্ষে সুভাষ-চন্দ্রের পত্রটির মর্ম্মকথা বোঝাবার সুবিধা হবে ব'লে আমি আমার মোট কথাটি সংক্ষেপে লিখে দেওয়া দরকার মনে করছি। আমি যা ব'লেছিলাম তার সারমর্ম্ম এই :—

দেশের সেবা অর্থে আমরা অনেক সময়ে বুঝি একটা অশ্রান্ত বিবেচনাহীন কর্ম্মসাধনা। দেশের শ্রেষ্ঠ সেবা তখনই হ'য়ে থাকে, যখন মানুষ তার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য উন্মুখ হ'তে পারে। অথচ বাহ্যতঃ একাগ্র আত্মবিকাশের সাধনাকে মানুষ অনেক সময়েই স্বার্থকেন্দ্র (ego-centric) ব'লে ভুল ক'রে বসে। এটা হ'য়ে থাকে প্রায়ই আমাদের এই ভুল ধারণাটির দরুণ, যে ইচ্ছা করলে ও প্রাণপণ পরিশ্রম করলেই বুঝি দেশের যথার্থ সেবা একরকম না একরকম করে হ'য়ে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি পাতায় এ ধারণার অসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য মেলে। মানবহিতৈষী দেশভক্ত কর্ম্মী প্রভৃতিরা কত খ্রীষ্ট, গালিলিও, ব্রুণো, জোয়ান অফ আর্ক, লুথারকেই না উৎপীড়ন ক'রেছে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, তারা উৎপীড়ন ক'রেছে মূলতঃ সেটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভেবেই। তাই মনে হয় যে, সেবাধর্ম্মে সচলতা লাভ করতে গেলেও শুধু দেশের হিত কর্‌ব এইটে জপ করলেই হয় না; কি উপায়ে স্থায়ী দেশ-সেবা হ'তে পারে, তার জন্য সাধনা দরকার, এবং এ সাধনা অনেক সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালেই সব চেয়ে ভাল উদযাপিত হ'তে পারে। তাই একটু তলিয়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মনের নিহিত লোকে এ

সত্যটি বোধহয় অবিসংবাদিতভাবে স্পষ্ট হ'য়ে না উঠেই পারে না যে, দেশের সব চেয়ে বড় সেবা করে সেই বীর, যে দেশের কথা না ভেবে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে সব চেয়ে বড় একাগ্র সাধনা করবার শক্তি ধরে। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে প্রাণপাত করে বক্তৃতাদি কর্ম্ম করা, বা কলেজ স্কুল হাঁসপাতাল তৈরি করবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়াই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ নয়। দেশকে বা সমাজকে মানুষ যাই দান করুক না কেন, সে দান কখনই তার সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হ'তে পারে না, যদি না সে নিজের সর্ব্বোচ্চ বিকাশে যত্নবান হয়। সেবা তখনই সব চেয়ে সত্য হ'য়ে ওঠে, যখন মানুষ নিজেকে সব চেয়ে পূর্ণভাবে পেয়ে সেবায় ব্রতী হয়।

শ্রী দিলীপকুমার রায়।

পত্র (১)

ম্যাণ্ডেলে জেল।
৯।১০।২৫

এ কথা কিছুতেই মনে কোরোনা যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive", নয় "unproductive"; তবে কোন্ কাজ যে "productive", তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিস্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক্, এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হলুম্ না তার কারণ, হতে পারলুম্ না; আর আমার বিশ্বাস, "শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না," এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই; আর কোনও কলার সমঝদার হতে গেলে তা'তে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' এ আক্ষেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্ষপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint।" বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা' আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লইল বলতেন সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সেরকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও করে' তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তা'তে আর্ট নিস্তেজ ও খর্ব্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে

আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন্ অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তা'তে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে বলে' ত আমি জানিনে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে তা সহজ, সাধাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনও পূরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদআহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না। সে

সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তা'তেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয় আরও কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার ওরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতারূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশীর-ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিলনা বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি অরবিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয় বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও

তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে অতিমানুষ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীর-ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের "double dose"। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তাহলে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবনা। কিন্তু আমরা যেন "sicklied o'er with the pale cast of thought" না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার চেলারা? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবেনা?

আমি এ কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এ-মার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তা'তে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত

করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পূরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্ব-মানবের প্রতি অসত্য কেউ হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে; সুতরাং আত্ম-বিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

পত্র (২)

—:•:—

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞ-দের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্ব্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের স্রষ্টিকর্ত্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিষ তৈরী করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্ব্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে—ভালো জিনিষ এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্য্যাদা সমান বোঝে, এ কথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলো না বলেই কি তাকে

দোষ দেব? বলব, তুমি কুমড়ো হলে না কেন? বলব কি, গরীবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা; সব ফুলেরই বেগুণের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্ত্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগযুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্ব্বসাধারণদের জন্যেই সফোক্লীস্ এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্টসাধারণের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে তারা কোনো গ্রীসীয় দাস্থরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভালো জিনিষ দিতে থাক্‌লে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিষ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি—তোমার যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্ব্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে জিনিষ শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে—বিশিষ্ট সাধারণের পথ্য ও ইতরসাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সাম্‌নে নেই। শেক্‌স্‌পীয়র সর্ব্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্ব্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানিনে, কিন্তু তাঁকে আপামরসাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তাহলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলে আস্‌তে পারে না? সর্ব্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের

সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য করতেন, তাহলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরী হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, এ সমস্যার মীমাংসা কি ? আমি বলব মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশ জনে মেঘদূতে নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চকমকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্‌টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এটা অশ্রদ্ধেয়। সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণসভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যেই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি বলেই শিশুসাহিত্যের রচনা ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের উপর। তারা ছেলেমানুষীর ন্যাকামি করাকেই ছেলেদের সাহিত্য বলে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এই জন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই, তখন তাদের জন্যে যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি—এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। চেষ্টা করে আমি বিফল হয়েছি, তা বল্‌তে পারি নে।

এত কথা তোমাকে বলবার দরকার ছিল না,—বাচালতা ক্রমে বেশি করে অভ্যস্ত হয়ে আস্‌ছে বলে বন্ধুসমাজে কথার মাত্রা রাখ্‌তে

পারি নে। যাহোক্, সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ—সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জ্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেললুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পেনাঙের পথে

১৯১২ সালে আমি একবার মালয় উপদ্বীপে পেনাঙে গিয়েছিলুম। তখন আমি এম্ এ পড়ি। যাবার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাই, আস্‌বার সময় ফিরি তৃতীয় শ্রেণীর বা ডেকের যাত্রী হ'য়ে। যেতে আস্‌তে দিন পনেরো ষোলো ধ'রে বাইরের জগতের একটা অংশ বেশ একটু দেখা-শোনা গিয়েছিল, বিশেষতো আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার নানা জাতের যাতায়াত সম্বন্ধে স্বল্প একটু অভিজ্ঞতা লাভ ঘ'টেছিল। এখন এক যুগ কেটে গেলেও এই ভ্রমণের সব দৃশ্য আর ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে।

ক'ল্‌কাতা ঈডেন-গার্ডেনের সাম্‌নের ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়্‌ল এক শুক্রবার বেলা তিনটে আন্দাজ। ক'ল্‌কাতা থেকে কালাপানী হ'চ্ছে আনুমানিক নব্বুই মাইল নদীপথ, কিন্তু কালাপানী পঁউছুতে জাহাজ আমাদের নিয়ে ফেল্‌লে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টার উপর—রবিবার-দিন দশটা আন্দাজ আমরা সমুদ্রে প'ড়্‌লুম। শুক্রবার যাত্রা ক'রে জাহাজ খিদিরপুরের ডকের কাছে আট্‌কে রইল সারারাত। রাতে কিছু কিছু মাল নিলে, আর বিস্তর ছাগল ভেড়া তুল্‌লে। জাহাজের ব্যাপার, সব একেবারে নোতুন, তার উপরে আবার নানারকমের আওয়াজ, গোলমাল। এ সবে রাত্রে ঘুম হ'ল না। তার পরদিন ভোরে জাহাজ ছেড়ে ডায়মণ্ড-হার্‌বর পেরিয়ে বিকালের দিকে সাগ-

রের কাছে এসে আবার দাঁড়াল। শুন্‌লুম সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, তাই জাহাজ আর সেদিন এগোবে না। জাহাজ লঙ্গর ফেলে দিলে, আর সমস্ত বিকাল আর রাত্রিটা সাগরের মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাটাতে হ'ল। গঙ্গার মোহানায় বিকালে নদীর বুকে ব'সে দূরে ডাঙ্গার সবুজ গাছপালার পিছনে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে-ঢাকা আকাশে সেদিন অতি চমৎকার সূর্য্যাস্ত দেখা গেল।

এই দেড়দিন তো ভাগীরথীর মধ্যেই আট্‌কা প'ড়ে গেলুম। সময়টার সদ্ব্যবহার করা গেল আমার সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জ'মিয়ে। নানান্ জাতের লোক, আর তর-বেতরর। ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না। যে কয়জন যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী হিঁদু আমি একাই ছিলুম। আর জাহাজের ডাক্তারটী ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণসন্তান।

প্রথমেই আলাপ জমানো গেল আমার ক্যাবিনের সহযাত্রী একটী বিহারী মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি যাচ্ছিলেন জাপানে, সাবান না কি তৈরী করা শিখ্‌তে। বেশ সদালাপী প্রিয়ংবদ শিক্ষিত যুবক, ন্যাশানালিষ্ট, নানা দিকে খোঁজখবর রাখেন। সব বিষয়ে বেশ বুদ্ধিমান ব'লে মনে হ'ল। আরো দেখলুম যে ইনি একটু ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। দেখতুম যে নমাজ-টমাজ নিয়মমত প'ড়তেন, আর মাঝে মাঝে বেশ মন দিয়ে কোরাণও প'ড়তেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে তিনি আরবী জানেন না, যা দু চার কথা যা জানেন তা কিছুই নয়, তবুও তিনি কোরাণ প'ড়ে মনে শান্তি পান। এ ভাবটী আমি আরও অনেক মুসলমানের দেখেছি—আরবী না বুঝেও ভক্তিভাবে কোরাণ প'ড়ে সহজেই পুণ্যের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ

লাভ করেন, আর ঈশ্বরের অনুমোদিত ধর্ম্মকার্য্য করছেন জেনে বেশ একটু আধ্যাত্মিক আরাম পান। হিন্দুদের মধ্যেও এই ভাবটা বিরল নয়। বহু পূর্ব্বে ক'ল্‌কাতায় দেখেছিলুম, এক neo-ক্ষত্রিয় স্বর্ণকারের দোকানের ভোজপুরী দরওয়ান, সদর সড়কের উপরে টুলে ব'সে, ট্রামের ঘড়ঘড়, মোটরের ভেঁপু, পথচ'ল্‌তি লোকের কথাবার্ত্তা প্রভৃতি নানারকম আওয়াজের মধ্যে তারস্বরে সংস্কৃত গীতা প'ড়্‌ছে। দেখে মনে ভারী পুলক হ'ল। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার পাঠ শুনে, তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, আপ গীতা পঢ়্‌তে হৈঁ, আচ্ছী বাত ; আপ সন্‌স্‌ক্রিৎ জানতে হৈঁ ?" তাতে সে একটু বিরক্ত-মতন হ'য়ে বল্‌লে, "আরে বাবু, সন্‌স্‌কিরিৎ জান্‌লা-সে কা হোই, খালি একরা পাঠসে জৌন্‌ পুন্‌ বায়, উ সমুঝ্‌লাসে কম নৈখে,—সংস্কৃত জেনে কি হবে, খালি এর পাঠে যে পুণ্য হয়, সে বোঝার চেয়ে কম নয়।" অর্থাৎ কিনা "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" এই যে না বুঝে শাস্ত্র বা মন্ত্র আওড়ানো, এটা হচ্ছে যে জাতীয় culture অর্থাৎ মানসিক আর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন কোনও মানুষ মেনে নিয়েছে, সেই culture-এর সঙ্গে যোগ রাখার একটা প্রয়াসের বিকার মাত্র। সমাজগত cultural জীবনে হয়তো এর একটা স্থান আছে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনে এর স্থান কতটা, সে বিষয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে। আবার কোনো জাতির পক্ষে কোন্‌ ভাষায় মন্ত্র আওড়ানো বা কোন্‌ রকমের অনুষ্ঠান তার যথার্থ নিজস্ব culture-এর পরিপোষক হ'তে পারে, তা নিয়েও বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু সে সব তর্ক, সে-সব বিচার এখন এক্ষেত্রে তুল্‌বো না। বিষয়টি বিশেষ জটিল। আপাততো, যাঁরা সংস্কৃত বা আরবী না বুঝেও খুব নিবিষ্ট

মনে বা ভক্তিভাবে গীতা বা কোরা পড়েন, তাঁরা aesthetes in sound, অর্থাৎ কেবল ধ্বনিবিশেষ থেকে আনন্দ-রস সংগ্রহ করবার শক্তি রাখেন ব'লে, তাঁরা শব্দের মোহ থেকে ধর্ম্মের ভাব-বিলাসে পঁউছুতে পারার যোগ্য সরল আর বিশ্বাসপূর্ণ মনোবৃত্তির অধিকারী ব'লে, আর তাঁদের একটা দিকে একাগ্রচিত্ততা আছে স্বীকার ক'রে, আমি তাঁদের অশ্রদ্ধা করি না।

অবান্তর কথা থাক্। আমাদের এই বিহারী সহযাত্রীটী নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা ক'রতেন। এক ডাক্তার-বাবু ছাড়া শিক্ষিত লোক আর কেউ জাহাজে ছিলেন না, তাই এঁর সঙ্গে জাহাজে ক'দিনে একটু ঘনিষ্ঠতা ঘ'টেছিল। এখন কিন্তু এঁর নামটা মনে প'ড়ছে না, যদিও বারো তেরো বছরের পরেও ভদ্রলোকের মুখটা ও চেহারাটা স্পষ্টভাবে মনে আঁকা র'য়েছে। জাহাজের বন্ধুত্ব, আর কোনও শহরে এক বাসায় থাকার জন্য বন্ধুত্ব, এ দুটী বড়ো চমৎকার জিনিস। যতদিন জাহাজে আমরা একসঙ্গে ভাস্‌ছি, বা যতদিন একত্র এক বাড়ীতে বাস ক'রছি, এক ঘরে সকালসন্ধ্যা খাওয়াদাওয়া ক'রছি, এক বৈঠকখানায় ব'সে আড্ডা দিচ্ছি, ততদিন কী ঘনিষ্ঠতা, কী বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলা, পরস্পরের সঙ্গে চিরদিন ধ'রে চিঠির আদানপ্রদান রাখবার কী প্রতিশ্রুতি! তারপর জাহাজ গন্তব্য স্থানে পঁউছে গেলেই, বা বাসা বদ্‌লালেই, সব ইতি। বেশ মনে আছে এই আট দিনের মধ্যেই পরম-অন্তরঙ্গ-হ'য়ে-ওঠা বিহারী বন্ধুটীর নামধাম সব লিখে নিয়েছিলুম, তিনিও আমার নামঠিকানা নিয়েছিলেন,—কিন্তু আট দিন পরে পেনাঙে যে ছাড়াছাড়ি, তারপর আর দেখা হয় নি, চিঠি লেখাও হয়

নি। বিহারী ভদ্রলোকটী জাহাজের কথা বেশ বড় একখানি উর্দূ চিঠিতে লিখ্‌ছিলেন। ব'ললেন যে "জমানা" ব'লে এক উর্দূ সাময়িক পত্রিকা বার হয়, তাতে প্রকাশ করবেন। এই "জমানা" কাগজ কয় খণ্ড এঁর কাছে ছিল। বানান ক'রে ক'রে তখন উর্দূ প'ড়তে শিখ্‌ছি। এই কাগজের উদ্দেশ্যসূচক বচন হিসেবে একটী ফারসী বয়েৎ তোলা র'য়েছে দেখ্‌লুম—"অগর্ জুমানহ্ বা-তূ ন-সাজ্‌দ্, তূ বা-জ্‌মানহ্ সাজ্" —যার ভাবার্থ হ'চ্ছে, "যদি যুগ তোকে না মানে, তুই যুগকে মেনে চল্।" বেশ জ্ঞানবানের মতো কথা; সকলেই এই কথা মেনে চল্‌লে দুনিয়া বড়ো শান্তির দুনিয়াই হ'ত!

আমাদের জাহাজের ডাক্তার বাবুটী বেশ লোক ছিলেন। ফর্সা চেহারা, গোঁফ ছাঁটা, চোখে সোনার চশমা, দোহারা গড়ন, একটু ভারিক্কে রকমের লোক। তাঁর নিজের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে তাঁর বেশ একটী স্বাভাবিক বোধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য ক'রে তাঁর ক্যাবিনে প্রবেশ ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার অধিকার আমায় দিয়েছিলেন। জাহাজে ডাক্তারী ক'রলে লোকে ডাক্তারী ভুলে যায়, এরকম একটী কথা শুনেছিলুম;—দেখেশুনে মনে হ'ল কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জাহাজে শ'দুই যাত্রী চ'লেছে, আইন-মোতাবেক জাহাজওয়ালা কোম্পানীকে একজন ডাক্তার রাখা চাইই। দশ বারো বছর আগে, যখন আমি পেনাঙ যাই, তখন পূর্ব্ব এসিয়া অঞ্চলে যে-সব জাহাজের ক'লকাতা বন্দরের সঙ্গে যোগ ছিল, সে-সব জাহাজে ডাক্তারীর কাজ বেশীর ভাগ বাঙালী এল্-এম্-এস্ এম্-বি-রাই ক'রতেন। এখন কি অবস্থা জানি না। আমাদের ডাক্তার বাবু সকালে উঠে ডেক-যাত্রীদের মধ্যে গিয়ে একবার রোঁদ

ঘুরে আস্‌তেন। অসুখটসুখ তেমন তো কারু একদিনের জন্য দেখিনি। একদিন ডাক্তারের ঘরে ব'সে আছি, এমন সময়ে দেখি, একজন ইংরেজ অফিসার এসে হাজির। কলে আঙুল কেটে গিয়েছে, কি ওষুধ লাগাতে হবে তা নিজেই ব'লে চেয়ে নিয়ে গেল। পেনাঙের পথে মাঝে এক বিকাল এক রাত ধ'রে খুব ঝড়বৃষ্টি হ'য়েছিল, তাতে ঠাণ্ডায় হাওয়ায় পরিশ্রমে একজন খালাসীর নিউমোনিয়া হয়, ডাক্তার বাবুকে গিয়ে তাকে দেখ্‌তে হ'য়েছিল। যাই হোক্, প্রায়ই বেকার হ'য়ে ডাক্তার বাবুকে ব'সে থাক্‌তে হ'ত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এটা ওটা কথা কইতুম। অনেক বিষয়ের সন্ধান চাইতুম, যা তাঁর প্রমাণের অভিজ্ঞতায় পড়া উচিত ছিল ব'লে মনে হ'ত। ডাক্তার বাবুর কিন্তু বড়ো বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখ্‌তুম না। তবে তিনি সাহিত্যানুরাগী লোক ছিলেন, সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রেই সময় কাটাতেন। সঙ্গে তিনি নিয়েছিলেন মাদ্রাজের কোন পাকা ব্যবসাদার প্রকাশক কর্ত্তৃক ছাপিয়ে প্রকাশিত, রেনল্ডসের "মিস্‌ট্রীজ্ অভ্ দি কোর্ট অভ্ লণ্ডন," বারো না ষোলো ভলুমে। জাহাজ খানা যাচ্ছিল জাপান অবধি—জাপান পর্য্যন্ত যাওয়া আর জাপান থেকে ফিরে আসা, এ কয় সুদীর্ঘ সপ্তাহ কাটাবার জন্য তিনি একমাত্র সম্বল ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন এই বইখানি, যতদূর মনে আছে আর কোনও বই তাঁর কাছে ছিল না। আর দেখতুম এটা তিনি বেশ তারিয়ে তারিয়ে প'ড়তেন।

ডাক্তারেরই স্বগোষ্ঠীর আর একটী লোক জাহাজে ছিল—একটী পাঞ্জাবী মুসলমান যাত্রী—সে নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে, ব'ল্‌লে যে মালয় উপদ্বীপে কোন রবারের বাগানে ডাক্তারী করে—

সিঙ্গাপুরে যাবে। লোকটা নিজেকে ডাক্তার ব'লে পরিচয় দিলে বটে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চালচলনে বুদ্ধিমত্তায় ভব্যতায় ৫।৬।৮ বছর ধ'রে কলেজে-পড়া ছেলের মতো কিছু দেখলুম না। আমাদের ডাক্তার বাবু একে অবিমিশ্র তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন—আর এও তাতে কোনরকম আপত্তির বা অপছন্দর ভাব দেখায় নি; বরং ডাক্তার এলে বেশী কথাটথা ব'ল্‌ত না, একটু সমীহ ক'রেই চ'ল্‌ত। ডাক্তার বাবু আমায় ব'ল্‌লেন যে, বিস্তর মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী শিশি-ধোওয়া বা কম্পাউণ্ডার মালয় দেশে গিয়ে ডাক্তার ব'নে বসে, আর কফি রবার বা নারকলের বাগানে গিয়ে চাকরী নিয়ে ভারতীয় আর চীনে কুলীদের মধ্যে সহস্রমারী হ'য়ে থাকে। আমাদের এই পাঞ্জাবীটী যাচ্ছিল তার কর্ম্মস্থলে, সস্ত্রীক। লোকটাকে দেখে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বয়সের ব'লে মনে হয়, কিন্তু মাথার চুল অনেক পাকা, থুঁতিতে একটু দাড়ী, রঙ কালো, খর্ব্বাকার, গালে মুখে না-কামানোর দরুণ খোঁচা খোঁচা দাড়ী, মাথায় একটা ময়লা কালো ভেড়ার চামড়ার আস্ত্রাকান টুপী, পরণে লাল ডুরে ছিটের ঢিলে ইজের, গায়ে গলা-খোলা ক্যানানোর চেক-কাপড়ের কোট, আর খুব বাহারে এক টাই গলায়, অতি ময়লা এক কলারকে অবলম্বন ক'রে। পাঞ্জাবী ব'ল্‌লে যে দীর্ঘকায় সৌষ্ঠবময় গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, তলোয়ারের মতো-নাক, শ্মশ্রুমান শিখ বা রাজপূত বা মুসলমানের ছবি আমাদের মানসচক্ষে এসে পড়ে, এ লোকটীর চেহারায় তার কিছুই নেই। নোতুন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে কর্ম্মস্থানে যাচ্ছে; সঙ্গে একটি বৃদ্ধা, ঝীও হ'তে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হ'তে পারে। বছর তেরো চোদ্দর গৌরবর্ণ একটি মেয়ে, অতি হ্রস্বকায়, পরণে গোলাপী

রঙের জাপানী বা ফরাসী রেশমের পাজামা, জরীদেওয়া নাগরা জুতা পায়ে, গায়ে সবুজ রঙের ছোবানো মল্‌মলের পিরিহান, তার উপরে সাদা সুতোর ফুলতোলা বিলিতি মল্‌মলের দু'পাট্টা বা চাদর—এই পোষাকে দু' একবার জাহাজের মধ্যে সরু পথে আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিল। এই পোষাকের লাল সবুজ রঙের দুটো তুলির পোঁচ যেন জাহাজের ভিতরে বাইরে সুন্দর জগতের একটা স্বপ্ন জাগিয়ে তুল্‌ত। জাহাজের খোলের দুর্গন্ধের মধ্যে, কয়লার গুঁড়োর ছড়াছড়ির মধ্যে, এক পাশে জড়ো ক'রে রাখা চীনে বাবুর্চীখানার আর গোয়ানীজ রান্নাঘরের এঁটোকাঁটা আলুর খোসা কপির পাতার মধ্যে, ইঞ্জিনের রকমারি বিকট ভীষণ কর্কশ ধ্বনির মধ্যে, হঠাৎ একবার আধবার দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ত যেন মোগল যুগের ছবি থেকে কোনও শাহজাদী নেমে এল,—যদিও মোগল শাহজাদীদের পোষাকটা ঠিক এরকম নয়, আর ছবিতে তাদের মুখ বোর্‌কা বা চাদরে ঢাকা থাকে না, খোলা ক'রেই আঁকা হয়। জাহাজে তুলে দিতে এদের সঙ্গে আত্মীয় কেউ আসে নি, দূর পাঞ্জাবেই এদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হ'য়েছিল বোঝা গেল। মেয়েটী আর তার সঙ্গের বৃদ্ধা দু'জনকেই বোর্‌কা বা ঘেরাটোপ পরিয়ে জাহাজে তোলা হয়; "মক্কা-বুড়ীর" সাজে এদের পা কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা, এই সব যখন দেখ্‌ছিলুম, তখন এক-গলা ঘোমটাদেওয়া বাঙালী মেয়েদের—ছেলেমেয়ে কোলে কাঁধে ফেলে, তাঁদের মাঝে মাঝে ঘাড়-ফিরিয়ে মুখ-খিচায়মান কর্ত্তাদের পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ট্রেণে ওঠবার সময়ের অবস্থা স্মরণ ক'রেও, এই ঘেরা-টোপ পরা, প্রতি মুহূর্ত্তে (না দেখতে পাওয়ার জন্য বোধহয়) প্রায়

হুমড়ী-খেয়ে-পড়া বেচারীদের জন্য একটু বেশীরকম দুঃখু হ'য়েছিল। জাহাজে ক্যাবিনের যাত্রী বেশী ছিল না, তাই এরা স্বামী স্ত্রীতে একটী ক্যাবিন পেয়েছিল। কিন্তু ক্যাবিনের ভিতরের গরম আর ভাপ্‌সা দুর্গন্ধের কথা স্মরণ ক'রলেও আমাদের উপর ডেকের খোলা বাতাসে ব'সে থেকে হৃৎকম্প হ'ত; আর সেখানে এই মেয়েটীকে সমস্ত দিন ব'সে থাকতে হ'ত—নিরুপায়, ভারতীয় আশ্‌রাফ বা ভদ্র মুসলমান ঘরের পর্দ্দানশীন মেয়ের আব্রু রাখতেই হবে—একি যে-সে কথা! তার স্বামীর সঙ্গে দূর দেশে ঘর ক'র্‌তে চ'লেছে—এটা ভেবে যে একটু আনন্দ হবে মনে, তার জো ছিল না—কারণ এই লোকটার মুখখানা আর ধরণ-ধারণ মনে প'ড়্‌ত, আর সঙ্গে সঙ্গে উপরে ডেকে এসে আমাদের কাছে তার রবার আর কফী বাগানের মান্দ্রাজী কুলীমেয়েদের সম্বন্ধে দুটো রসিকতার কথা ব'লে আমাদের খুশী ক'রে দেবার চেষ্টার দৃশ্যটীও মনে আস্‌ত।

আমরা এই ক'জন তো হ'লুম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—বিহারী, জাপানযাত্রীটী, এই পাঞ্জাবওয়ালা, আর আমি। দু'জন কচ্ছী খোজা ব্যবসায়ী, বোম্বাইয়ে মুসলমান, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হ'য়ে যাচ্ছিলেন। একজনের নাম হাজী মোমিন ভাই, আর একজনের নাম হাজী আব্দুল্লা ভাই—না ঐরকম একটা কিছু। দু'জনেই সুপুরুষ দেখতে—মুখে চাপদাড়ী, মুসলমানী কায়দায় গোঁফ খুব ছোট্ট ছোট্ট ক'রে ছাঁটা,—বেশ অভিজাত শ্রেণীর উপযুক্ত, রূপকারের উপযুক্ত লম্বা সরু সরু আঙুল, গায়ের রঙ্ বেশ ফর্সা,—আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে, আঙ্টীতে চেনেতে, আতরের খোশ-বো'তে ধনী ব'লে বুঝতে বেশী দেরী হ'ত না। একটু comfortable

bourgeois-সুলভ স্থূলোদর,—সঙ্গে চাকর ছিল, রোজই মুর্গী মেরে পোলাও কোর্ম্মা রেঁধে খেতেন। নেমাজ পড়তেন নিয়ম মতো, আর তসবীর মালা নিয়ে ঘুরুতেন। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পালনের আর কোনও বালাই রাখেন নি। আমরা যে সময়ে যাত্রা করি, সেটা তখন হ'চ্ছে মুসলমানদের রমজান মাস, রোজার উপবাসের সময়। এঁরা তখন রোজা রাখেন নি। আর এদিকে আমি দেখেছি, জাহাজের বাঙালী মুসলমান খালাসী সারাদিন উপোস ক'রে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটুছে, আর সন্ধ্যের সময় চাঁদ দেখে, বড়ো টিনের পরাতের উপর ছোলা ভিজানো আর পেঁয়াজরশুনের কুচী রেখে চার পাঁচ জনে মিলে চারদিকে ঘিরে ব'সে সমস্ত দিনের পর নাস্তা ক'র্ছে। আমি মোমিন ভাই আব্দুল্লা ভাইদের জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—"সাহেবান্, আপ্‌লোগ্ হাজী হোকর্ রোজা রখ্‌তে নেহীঁ কোঁ্যা ?" তার উত্তরে এঁরা বেশ ব'লেছিলেন, "বাবু সাহেব, মোসাফেরের আবার রোজা কি ?"—অর্থাৎ "পথি শূদ্রবৎ আচরেৎ।" মোমিন ভাই আব্দুল্লা-ভাইরা যাচ্ছেন যবদ্বীপে। এঁরা লাখো লাখো টাকার চিনি যবদ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে আমদানী করেন প্রতি বৎসর, অনেক তল্লাটের ছোটোখাটো সহরের বাজার এঁদের মুঠোর মধ্যে,—বোম্বাইয়ে, ক'ল্‌কাতায়, পূর্ব্ববঙ্গে নানা জায়গায় এঁদের আড়ৎ আছে। যবদ্বীপে গিয়ে এঁদের চিনির কারবারের সম্বন্ধে কি সব ব্যবস্থা ক'রে আস্‌বেন ব'লে যাচ্ছেন। এই কোম্পানীর জাহাজেই এঁদের চিনি আসে। আমার মনে হ'ল, এঁরা বিনা খরচার টিকিটে যাচ্ছেন, কোম্পানী বড়ো খ'দ্দের ব'লে খাতির ক'রে স্থান দিয়েছে। জাহাজওয়ালারা যে সব মহাজনের মাল-টাল বেশী ক'রে বয়, মাঝে মাঝে প্যাসেজ্‌টা-আস্‌টা

দিয়ে তাঁদের মান্য রাখে। আর স্বভাবতই এই সব মহাজন দরকার প'ড়লে নিজেদের প্রাপ্য এই সম্মানটুকুর অধিকার ছাড়েন না। পোন্নাবালাস্ বেঙ্কটাপ্পা পিল্লেই হ'চ্ছেন তামিল চেট্টী মহাজন, ক'লকাতা থেকে মাদ্রাজ, টুটিকোরিন, জাফ্না, কোলোম্বো তাঁর মস্ত আম্‌দানী রপ্তানী কারবার আছে, অনেক লাখ টাকার ব্যবসা—তিনি কালীঘাটের চেট্টীদের মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিক ঠাকুরের অনেক টাকার জহরতের গয়না ক'রে দিয়েছেন; তিনি তাঁর ছেলে আর ভাইপোকে কোলোম্বো পাঠাতে চান ক'লকাতা থেকে—তাঁর দুখানা প্যাসেজ টিকিটের দরকার। ক'লকাতার এক বড়ো ইংরেজ সওদাগর আর জাহাজওয়ালা কোম্পানী তাঁর মাল বয়—চেট্টীমশায় টিকিটের দরবার করবার জন্য একেবারে আপিসের বড়ো সাহেবের ঘরে এসে হাজির। কি? না, "চাব্, দোটো টিক্কিট্ দেও, জাট্টী নেই মাঙ্গতা, দোটো ফাট্টু কিলাচ, কোড়োম্বো।" কালো ভাতের হাঁড়ির মতো গায়ের রঙ্, মাথার আদ্ধেকটা কামিয়ে উড়ে খোঁপা বাঁধা, তার উপরে লাল জরীপাড় মাদ্রাজী পাগড়ী, সমস্ত কপাল জুড়ে সাদা বিভূতির চিহ্ন, গোঁফ-দাড়ী পরিষ্কার ক'রে কামানো, খালি গায়ে বুকে হাতে বিভূতির ছাপ, গলায় মস্ত চওড়া জরীপাড়ের ধব্‌ধ'বে সাদা মল্‌মলের চাদর জড়ানো, পরণে আধ হাত আল্‌তারঙের পাড়ওয়ালা কাপড়, তার কাছার একটা খুঁট্ ঝুল্‌ছে—নখের মতন বড়ো বড়ো হীরের দুই কানফুল কালো রঙের মধ্যে দুই কানে জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে, খালি পা—এ হেন দ্রাবিড় সভ্যতার মুর্ত্তিমান অবতার এসে আমাদের ক্ষীণকায় স্কচ্ বড়ো সাহেবকে জড়িয়ে ধরে আর কি! সাহেব চেয়ারে ব'সে তটস্থ, ন যযৌ ন তস্থৌ! পিল্লের কদর তিনি বেশ বোঝেন, তাকে

চটাতে চান না, অথচ দুখানা ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট দিতেও একটু ইতস্ততো ক'রছেন—এমন সময়ে, "চাব্, তুম্ দো টিকিট্ দেও, জাস্তি নেই" ব'ল্‌তে বল্‌তে, মুখে চুম্‌কুড়ি দিতে দিতে চেট্টি অনর্গল্ সাহেবের সাম্‌নে এসে, টেবিলের ওধারে সাহেব ব'সে আছে, ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তার থুঁতী ধ'রে চুমু নিতে লাগ্‌ল! সাহেব তো তখন প্রমাদ গণে' চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—Roberrtson, Roberrtson, come quick, tak' this fellow awa', gie him twa firrst-class to Colombo—man, he is trryin' to kiss me! আপিসের যে বাবুটী ফ্রী প্যাসেজের টিকিটে নামটাম লিখে সাহেবের দস্তখত করিয়ে টিকিটটা পাস করিয়ে আন্‌লেন, চেট্টীমশায় খুশী হ'য়ে তাঁকে দুটী বাঁধা সিকি উপহার দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন, পাছে আর কেউ কিছু চেয়ে বসে, বা যাঁকে এই অর্থ তিনি দিলেন, তিনি ফিরিয়ে দেন।

ক্যাবিনের যাত্রী এই ক'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। জাহাজ কালাপানীতে পড়বার পরে ক্যাবিনের যাত্রী আর একটী হ'ল—একটী বাঙালী মুসলমান ছেলে। জাহাজে বিস্তর ভেড়া ছাগল যাচ্ছিল। কে পাঠাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোনও খবর আমার জানা ছিল না। পরে সব জান্‌তে পারি। বেলিলিয়স্ ব'লে একজন ইহুদী এই জানোয়ার চালানের কাজ ক'রে এককালে খুব দু-পয়সা রোজগার করে। ছাগল, ভেড়া বাঙলা দেশে বা পশ্চিমে কিনে, জাহাজে ক'রে ক'ল্‌কাতা থেকে মালয় উপদ্বীপে পেনাঙ্, সিঙাপুর অঞ্চলে চালান হয়, সেখানে সব কেটে বিক্রী হয়। (গরু বোধহয় যায় না, কিন্তু ক'লকাতা থেকে নুন দিয়ে জারিয়ে গোমাংস

খুব যায় ওদেশে,—সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়া গেল যে, এই রকম jerked beef বছরে কত লক্ষ মণ ক'রে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী হয়—নিখিল ভারত-গোরক্ষণী-সভার দৃষ্টিও নাকি এদিকে আকর্ষিত হ'য়েছে)। বেলিলিয়স্ এখন পরলোকে। বেলিলিয়সের বাড়ী ছিল হাওড়ায়, বেলিলিয়সের বংশে কেউ নেই, মাত্র তাঁর বিধবা স্ত্রী ছিলেন,—কিছুকাল হ'ল তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁর মস্ত বাড়ী, বাগান সব তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীকে দান ক'রে গিয়েছেন, কিছু টাকাও দিয়ে গিয়েছেন, সেই বাড়ীতে এখন হাওড়া বেলিলিয়স্ স্কুল স্থাপিত হ'য়েছে। বেলিলিয়সের ব্যবসা এখন চালাচ্ছেন—অর্থাৎ ১৯১২ সালে চালাচ্ছিলেন—হুগলী না বর্দ্ধমান জেলার কতকগুলি মুসলমান। শুনলুম অন্য রপ্তানী আর আমদানি কাজও এঁদের আছে। এঁরা বেশ ভদ্রলোক। পেনাঙে এঁদের এক আফিস আছে। পেনাঙে নেমে এঁদের আফিসেই আমায় ডেরা নিতে হ'য়েছিল, এঁদের বিশেষ সৌজন্যের পরিচয়ও পেয়েছিলুম। পেনাঙে এই তিন চারজন বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ী, তাঁদের বাঙালী হিন্দু কেরাণী দু একজন নিয়ে একটা আড্ডা জমিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে জাহাজের বা হাঁসপাতালের ডাক্তার আর অন্য অন্য ভ্রাম্যমাণ বা 'থিতু' বাঙালী ভদ্রলোকের সমাগম মাঝে মাঝে হ'ত। বেলিলিয়স্ কোম্পানীর নামে তখনও ব্যবসাটা ছিল। জানোয়ারগুলোকে জাহাজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, তাদের ঘাস জল দেয় ৪।৫ জন ক'রে নীচ শ্রেণীর ক'লকাত্তাই মুসলমান—যারা বেশীর ভাগ পশ্চিম থেকে এসে ক'লকাতার অধিবাসী হ'য়ে গিয়েছে, বাঁকা বাঙলা বা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী যারা বলে, ক'লকাতার যত বাবুর্চ্চীখানা আর কাফীখানা যারা সরগরম

রাখে, যাদের মধ্যে থেকে গাড়োয়ান, কসাই, ইংরেজ আর ফিরিঙ্গি বাড়ীর চাকর-খানসামা, আর গাঁটকাটা গুণ্ডা প্রভৃতি হয়। এখন আমাদের জাহাজে এই বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীদের একটী ছেলে যাচ্ছিল, ১৮।১৯ বছর বয়সের হবে, পেনাঙে তাদের আফিসে কাজকর্ম্ম শিখ্‌বে ব'লে। এদের ফার্ম্মের একজন বুড়ো চাকর, যে অনেকবার ছাগল-ভেড়ার তদারকে ক'লকাতা পেনাঙ যাওয়া-আসা ক'রেছে, সে ছিল সঙ্গে, আর বুড়ো ছেলেটিকে খুব যত্ন করে' নিয়ে যাচ্ছিল। ভেড়া ছাগলের মধ্যে, ষ্টীমারের শামিয়ানা-ঢাকা খোলা ডেকের উপর, কল্‌-কব্‌জার আশেপাশে, জানোয়ারগুলির তদারক করবার জন্য লোক-গুলো যেখানে মাথাগোঁজ্‌বার জায়গা ক'রে নিয়েছিল, সেখানে এদেরই মধ্যে ছেলেটীও প্রথম ২।৪ রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কালাপানীতে জাহাজ প'ড়লে পর, ছেলেটীর চক্কর লাগে। তখন বুড়ো চাকরটী জাহাজের একজন সারেঙের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে, তার সুপারিশে জাহাজের সাহেব কেরাণীকে ব'লে ছেলেটীকে একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস ক্যাবিনে, যেখানে আমাদের আব্দুল্লা ভাই মোমিন ভাইরা ছিলেন, সেখানে এনে হাজির ক'র্‌লে। তখন জাহাজ নীল জল কেটে বেশ মৃদুমধুর দুল্‌তে দুল্‌তে চ'লছে; সকালবেলা, প্রথম শরতের মিষ্টি রোদ্দুর, আমরা উপরের ডেকে ব'সে কজনে কথাবার্ত্তা আলাপ-সালাপ ক'রছি —বিহারী মুসলমান ভদ্রলোক, খোজা দুজন, আর আমি; মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু এসে দু চারটী কথা কইছেন। এমন সময়ে আমাদের এই বাঙালী মুসলমান ছেলেটীকে সঙ্গে নিয়ে তার অনুচর old Adam তার মালপত্র ঘাড়ে ক'রে উপস্থিত হ'ল—সঙ্গে সারেংও ছিল,—আশ্বাস দিচ্ছিল ছেলেটীকে।—ক্যাবিনটা বড়ো;

এক্‌টা খালি বাক্সের তলায় আসবাবগুলি রাখ্‌লে—একটা টিনের তোরং, আর একটা বিছানা। ছেলেটী অতি কাচুমাচু ভাবে এল। বুড়ো তাকে বেশ উৎসাহ দিয়ে ব'ল্‌লে—"এসো, ভিৎরে এস্‌তে ভয় ক'রো না—এই তো খোজারা র'য়েছে—এনারাও মোসলমান,—লাও, এক কাজ করো—তোমার তোরং থেকে কোরাণ-শরীফখানা বের করো—বেশ, এখন এক কাজ করো, ওইখানে ওই বাতীটার গায়ে ওখানা টেভিয়ে রাখো।" তার কথামতো ছেলেটী রঙীন ছিটের আর লাল সালুর থ'লেয় ঢাকা, ফিতে দিয়ে বাঁধা মস্ত একখানা বই বার ক'রে বিজলী আলোর ডাঁটীতে ঝুলিয়ে দিলে। তাকে ঠিকঠাক করে' বসিয়ে দিয়ে বুড়ো চ'লে গেল। কোরাণ-শরীফখানা হঠাৎ বার ক'রে বাতীটার গায়ে "টেভিয়ে" রাখবার উদ্দেশ্যটা বুঝলুম না—তবে বোধহয় ক্যাবিনের দখলদার খোজা-মিঞাদের কাছ থেকে স্বধর্ম্মী-হিসাবে বাঙালী মুসলমান ছেলেটি যাতে একটু সহানুভূতি পেতে পারে, সেই ইচ্ছেয় বুড়ো তার মনিবের বাড়ীর ছেলের ইস্‌লামীত্ব এই রূপে জাহির ক'রে গেল। খোজারা কিন্তু সে কারণে যে তার প্রতি বিশেষ "আর্ত্তি" দেখালে, তা মনে হ'ল না। যাক্‌—ছেলেটী অতি নিরীহ ভালোমানুষ ধরণের; ভদ্রঘরের বাঙালী হিন্দু ছেলের থেকে কোনও পার্থক্য চেহারায় চালচলনে কথাবার্ত্তায় ধরা যায় না। আমি এর সঙ্গে আলাপ জমালুম। তখন বেলিলিয়স্‌ কোম্পানীর খবর পেলুম। কিন্তু ছোকরা বড়ো লাজুক—বেশীক্ষণ সে তার ভেড়ার রাখালদের মধ্যে গিয়েই কাটাত, ক্যাবিনে বোধহয় রাত্তিরে খালি ঘুমোবার জন্য আস্‌ত। এর অনুমতি নিয়ে কোরাণ-খানা দেখলুম—চামড়ায় বাঁধা বড়ো বই, মোটা মোটা হরফে আরবী মূল, সঙ্গে সঙ্গে নীচে উর্দুতে

তরজমা; পাতার আশে-পাশে উর্দূতে টীকা। মূল বা তরজমা দুইয়ের একটীও বইয়ের মালিক প'ড়তে পারে না। বইখানি সঙ্গে আছে, ইস্‌লামীর নিশানা হিসাবে—আর বোধহয় potent charm হিসাবে;—রামায়ণ-মহাভারতের মতন কোরাণ ঘরে রাখ্‌লে বা সঙ্গে থাক্‌লে বিপদ-আপদ হয় না, ভূত-প্রেত জীন-শয়তানের অদৃশ্য উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ছোকরা বছরখানেক, কি তার বেশীর জন্য পেনাঙে যাচ্ছে। সঙ্গে কিছু বাঙলা বই নিয়ে যাচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তার তোরং থেকে কতকগুলি বাঙলা বই বার ক'রে আমায় দেখালে। মীর মশার্‌রফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" বোধহয় একখানা ছিল, আর ছিল "তজকিরাৎ-আল্‌-আওলিয়া"র বাঙলা অনুবাদ, গিরীশচন্দ্র সেন কৃত, নববিধান সমাজ থেকে প্রকাশিত। বইখানি হ'চ্ছে সূফী ভক্ত আর সাধকদের জীবন-চরিত নিয়ে, মূল বই ফার্‌সী ভাষায়। অতি উপাদেয় বই, আগে আমার একটু আধটু পাতা-উল্‌টানো ছিল, জাহাজে ব'সে বইখানা ছেলেটীর কাছ থেকে নিয়ে একবার ভালো ক'রে পড়ে ফেল্‌লুম। বইখানার নামপত্রে ইংরিজি অক্ষরে বইয়ের নাম লেখা ছিল—Tazkirat Al-Awliya। গুজরাটী খোজাদ্বয় ইংরিজি প'ড়তে পারেন দেখাবার জন্য বইখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে বানান ক'রে ক'রে নামটী প'ড়লেন; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—"ইয়ে ক্যা হৈ?" আমি তাদের ব'ল্‌লুম যে এই বিষয়ের বই। তখন তাঁরা বিষয়ের গুরুত্বটি উপলব্ধি ক'রলেন, তাঁরা বেশ ধর্ম্মপ্রাণভাবে খুশী হ'লেন, আর বাঙলা ভাষারও তারিফ ক'রলেন, যাতে এমন সব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বইয়ের অনুবাদ হয়। আমিও সুযোগ পেয়ে দু চারটে আধ্যাত্মিক বচন—যেমন তাপসী রাবেয়ার জীবন-চরিত থেকে

—তাঁদের সমঝে দিতে লাগলুম; তাঁরা শুনে ইস্‌লামের মধ্যে কতো সব ভালো ভালো কথা আছে তা হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে আমাকে উপদেশ দিলেন, নিজের ধর্ম্মের গৌরবে একটু গদ্‌গদ ভাবও হ'লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবের একটু অংশ, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই সব ভালো ভালো কথার বাহন-হিসাবে বাঙলা-ভাষাকে, আর সমঝদার-হিসেবে বাঙালী জাতকেও দিয়ে ফেল্‌লেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ।

পদ্মার একটু বিশেষত্ব আছে—ইহা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী। গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে—কিন্তু পথের যোগ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া কেমন যেন দুর্দ্দম গতিতে, ভগীরথের শঙ্খ-স্বনিত পথকে উপেক্ষা করিয়া, স্বৈর-শাসনে পাগ্‌লী কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিল। এ যেন মণিপুর রাজকন্যা পুরুষাচারিনী মৃগয়ামত্তা চিত্রাঙ্গদা। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ পৌরাণিকতার গ্রানিট্‌স্তরের ভিত্তিতে সুদৃঢ়; বাংলার সমুদ্রমন্থন এখনো শেষ হয় নাই। সমুদ্রের অঙ্ক হইতে নূতন মাটি প্রতিদিনই এখানে আলোতে উদ্ভাসিত হইতেছে। বহু শাখানদীর সঞ্চিত পলিতে বাংলার জমি নিত্য নবগঠিত, ও প্রতিমুহূর্ত্তেই সরস। ভারতের অন্যান্য নদীর একটি নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, কিন্তু পদ্মার মানচিত্র কোনদিন প্রস্তুত হইবে না। এই পথভ্রষ্টা নদী পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত ত্যাগ করিয় পাণ্ডববর্জ্জিত অনাচারী ব্যাধকিরাত অধ্যুষিত বাংলাদেশে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। ইহা কবির মতই খামখেয়ালী। মেঘে ম্লান, শরতে স্বচ্ছ, শীতে শান্ত এই পদ্মা; কূলে শস্য, জলে নৌকা এই পদ্মা; বর্ষার প্রথম বারিসমাগমে সমাকুল; বৈশাখের মেঘপতাকার দূর সঙ্কেতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিস্তব্ধ; উভয় তীরের ঝাউঝাড়গ্রাসী ঘনায়মান কলগর্জ্জিতা; স্নেহশীলা জননীর

ন্যায় কোলের নৌকাগুলিকে দোলাইয়া নত-নয়না; কখনো নৃত্যশীলা নটিনীর মত দ্রুত চরণচাঞ্চল্যে কলহাস্যময়ী; কখনো শবরীদুহিতা শ্যামা শর্ব্বরীর মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে ধনুনিবদ্ধপাণি যুগ্মতীর-তূণীরা; শ্রান্ত-অঞ্চলা শরৎশেষের ক্ষীণশশিকলাটির প্রায় কখনো দিক্‌শয্যাপ্রান্তলগ্না। বর্ণবৈচিত্র্যহীন বাংলার সমুদায় প্রান্তরতল-শায়িনী, একাকারা, বিরাট, বিশাল, উদাস, উদার এই পদ্মা; জগতের সব চেয়ে পুরাতন, সব চেয়ে দীর্ঘ, সব চেয়ে করুণ, সব চেয়ে একঘেয়ে একখানি আদিঅন্তহীন কাহিনীর মত এই পদ্মা।

এ হেন পদ্মার তীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিশু-কাব্যকলাকে লইয়া গিয়া বসিলেন। প্রত্যক্ষ সচলতার মত, পৃথিবীর স্পন্দমান নাড়ির মত বিরাট নদীটি বহিতেছে; উভয় তীরে মৌন লোকালয় চিরদিন নিশ্চল। পদ্মার ও পদ্মাতীরের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অধিকাংশ লোককেই বিচলিত করে- আর ইনি তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ইহা কবির চিত্তে গভীর রেখা অঙ্কিত করিল। নদীর এই অপ্রতিহত অনবচ্ছিন্ন গতি একটি অখণ্ড সচলতা সমর্পন করিল তাঁহার হৃদয়ে ও কাব্যে।

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তাহলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষপশুর মধ্যে যে চলাচল, তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগা-গোড়াই চল্‌চে; সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা করে, অঙ্গ চালনা করে, আমাদের মনটার আগা-গোড়াই চলেছে। সেইজন্য এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল

মানস শক্তির মধ্যে বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙচে চুরচে এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মত সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মত, আর বিচিত্র শস্য-শালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মত।"

(ছিন্ন-পত্র)

বাংলার আব্‌হাওয়াতে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে অনায়াসে সংস্কারকে সে উত্তীর্ণ হইতে পারে। পদ্মাতে যেমন দেখিলাম—তেমনি দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গীত-কলাতে। অন্যত্র যাহা ধ্রুপদ, এখানে আসিয়া তাহা খেয়াল হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মা যেমন বিশেষ করিয়া বাংলার—কীর্ত্তন তেমনি বিশেষভাবে বাঙালীর—তাহা কিছুতেই আর প্রাচীন রীতিকে না মানিয়া, খোলে করতালে উদ্দাম নৃত্যভঙ্গীতে উত্তাল হইয়া উঠিল।

প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাঙ-লার সমাজ ও সাহিত্যকে নানা দিক হইতে স্পর্শ করিয়াছে।

এই সচলতা কবির আর্ট ও কাব্যকে জড়তা হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর্টের পক্ষে জড়তার মত বালাই আর নাই; কোনো অবস্থাবিশেষে বদ্ধ হওয়াতেই তাহার সমাধি; গণ্ডি-বদ্ধ আর্ট সকল অবস্থার সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারে না—আর সকলেই জানেন একাত্ম-তার (Sympathy) অভাবই আর্টের মৃত্যুবাণ। এই সদাসচলতাই তাঁহার কাব্যকে চিরনূতন করিয়া রাখিয়াছে। যৌবনে পদ্মার তীরে এই গতির মন্ত্র তিনি লাভ করিয়া সমস্ত জীবন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; অবশেষে জীবনের সায়াহ্নে একদিন শ্রীনগরে মানসোৎকণ্ঠবলাকার

পক্ষবিধূননে সেই গতিকেই প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিলেন "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।" আর একদিন সেই পুরাতন পদ্মার গতিকেই মূর্ত্তিমতী দেখিলেন প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনায়। তিনি তাই বলিলেন "তাকাস্‌নে ফিরে, সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি মহাস্রোতে।"

এই চির-জাগ্রত গতিতেই তাঁহার কাব্যের নবীনতার বীজমন্ত্র। তাঁহার সমগ্র কাব্য-অধিকারের ভিতর কেহ এমন একটিও কবিতা বাহির করিতে পারিবেন না, যাহা গতিমন্ত্রচ্যুত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের পক্ষে এই গতির মূলমন্ত্রটি কতখানি তাহা মনে রাখিয়া, আমরা সোনার তরীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

প্রসাধন।

——ঃ০ঃ——

সৃষ্টির আদিযুগ থেকে স্বভাবসুন্দর রমণীমুখকে সুন্দরতর করবার জন্যে অজস্ররকম চেষ্টা চল্‌ছে। দেশে দেশে যুগে যুগে কত প্রসাধনদ্রব্যেরই যে আবিষ্কার হয়েছে, তার আর সংখ্যা করা যায় না; এবং এই আবিষ্কারকার্য্যে কবি থেকে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীই সমানভাবে হাত মিলিয়ে আস্‌ছে।

প্রাণীজ, খনিজ, জলজ, উদ্ভিজ্জ—কোন বস্তুই এই প্রসাধন-তালিকা হ'তে বাদ পড়েনি। চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী, লোধ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সিন্দুর, কজ্জ্বল, কাঁচপোকা, গুব্‌রেপোকা, রুজ পাউডার, রং, এমন কি গোবর পর্য্যন্ত ফেলা যায় না—এম্‌নি কপালের লেখা!

যুগে যুগে রুচি অনুযায়ী প্রসাধনদ্রব্যের বিভিন্নতা থাক্‌লেও ভিতরের ভাবটি কিন্তু চিরন্তন—রমণীমুখকে সুন্দর করতে হবে। চেষ্টা যত্নের প্রাবল্য দেখে এক এক সময় সন্দেহই হয় যে, রমণীমুখ আসলে বোধ করি সুন্দর নয়, আর রমণীরা তা জানেন বলেই আভরণ এবং আবরণের এত ঘটা!—এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য অসম্ভব; কারণ পুরুষের চোখ রমণীমুখের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করবার জন্যে সৃষ্টি হয় নি, আর রমণীর মন পুরুষের কাছে ঠিক মনের কথাটা ভুলেও স্বীকার করবার জন্যে প্রস্তুত নয়। কিন্তু আসল জিনিষকে বাড়াবার নামে

নকল দিয়ে আসলকে ঢেকে ফেলাটা প্রসাধনের একটা গোপন উদ্দেশ্য, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে হিসাবে গুণ্ঠনকে শ্রেষ্ঠ প্রসাধন বলা যেতে পারে, কেননা তা পূর্ণ-আবরণ; সুতরাং সৌন্দর্য্য বাড়াবার চরম উপায়। গুণ্ঠনমোচনে সৌন্দর্য্যের নানা ফাঁকি ধরা প'ড়ে যায়। প্রসাধন বাদ দিলেও রূপের অনেক ত্রুটি ধরা পড়বে, এই আশঙ্কা রমণীর প্রসাধনপ্রিয়তার একটা কারণ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু পুরুষেরা এ বিষয়ে এত সাহায্য করবে কেন? চন্দন চয়ন, মুক্তা উত্তোলন, কস্তুরী অন্বেষণ থেকে আরম্ভ করে' কাঁচপোকা-শিকাররূপ দুঃসাহসিক কাজ সমস্তই পুরুষে সম্পাদন করেচে ও করচে। আমার মনে হয়, পুরুষের কর্ম্মপ্রিয়তার ন্যায় সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাও মজ্জাগত; কিন্তু আশেপাশে সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের অভাবও একান্ত পরিস্ফুট। সকলে কবি হ'লে হয়ত কোন অসুবিধা থাকৃত না; চাঁদের দিকে চেয়েই মাসে অন্ততঃ পঁচিশটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন যা কাছে আছে, তাকেই মেজে ঘসে' সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে জেনেশুনেও ঠক্‌বার পরিতৃপ্তি থেকে পুরুষ নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। সেই জন্যেই পুরুষ চিরদিন প্রসাধন-বস্তুর আবিষ্কার-নিরত, আর রমণী তারই প্রয়োগপটু; প্রকৃতির এই প্রধান দুটি পক্ষের প্রবল তাড়নায়, প্রসাধন-শিল্পটা প্রায় পাগ্‌লামি লোকের কাছাকাছি পৌঁছেচে।

প্রসাধন ব্যাপারটা যে নকলের সেরা, তা'তে আর সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু আসলের কাঠামো না পেলে নকলটা কি এতদিনকার পরমায়ু পেতে পারত? নাক, মুখ, চোখ, কান, গণ্ড, ভ্রূ ললাটের গঠন সম্বন্ধে দেশ ও কালভেদে রুচিভেদ অবশ্য চিরকালই রয়েচে ও

থাক্‌বে। এক দেশের নিন্দিত কটা চুল অন্য দেশে স্বর্ণালকরূপে বন্দিত। তথাপি রুচির এই পার্থক্য সত্ত্বেও মানবমনে নিশ্চিতই সৌন্দর্য্য-বোধের একটা কোন স্থির মাপকাটি আছে। সেই মাপকাটিতে আমরা যার পরিমাপ করি, তা রূপ নয়,—শ্রী। রূপ ও শ্রী দুটি ভিন্ন বস্তু। রূপের বিচার চোখে, শ্রীর পরখ মনে। রূপের রুচি পরিবর্ত্তনশীল, শ্রীর রুচি চিরন্তন। সেই জন্যই বোধ করি, প্রকৃত শিল্পীর হাতে আঁকা বিদেশী সাজে সজ্জিত, বিদেশী ভাবাপন্ন রমণীচিত্রেও মন মুগ্ধ হয়; যদিচ চোখ বলে, সে রূপ নিয়ে ঘর করা চলে না। রূপ শ্রীর সহায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক সময় শ্রী হচ্ছে রূপনিরপেক্ষ। এমনতর প্রায়ই দেখা যায়,—বর্ণ গৌর নয়, মুখচোখের ঢং মাপ ও ছন্দ কবিজনের উপমাবস্তু থেকে অনেক তফাতে,—তবু সেই মুখ দেখেই মন মুগ্ধ হচ্ছে। আবার নাক কান চোখ চুল রং সবই ভালো, অথচ মন ঠিক প্রসন্ন হচ্ছে না,—এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। মুখশ্রীর তারতম্যই এর কারণ। এমন-কিছু একটা তফাৎ দুখানি মুখের মধ্যে কোথাও আছে, যাতে সৌন্দর্য্যের উপকরণসত্ত্বেও একখানিকে মন সুশ্রী ব'লে উঠ্‌তে পারছে না, এবং অন্যখানিতে তার অভাব জেনেও আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ এমন-কিছু পদার্থটিকেই আমি শ্রী বলতে চাচ্ছি; স্বাস্থ্য হয়ত বা এর আংশিক উপকরণ, কিন্তু সে স্বাস্থ্য ঠিক দেহের স্বাস্থ্য বল্‌তে যা বুঝায়, তা নয়। এই মুখশ্রীর স্বরূপ কি ভাব্‌তে গিয়ে আমার মনে হয়, মুখের উপর মনের যে ছাপ পড়ে, তাই মুখশ্রী। সাপের ফণা সুন্দর কিন্তু সুশ্রী নয়, কারণ হিংস্রতার ছাপ তাতে মাখানো। বাঘের মুখ সুন্দর তা'তে সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কি একটা উগ্রতা তাতে আছে যে, প্রাণ তা দেখে প্রসন্ন হয়ে ওঠে না।

মুখের ত্বক কোমল না হলে'ও, মনের কোমলতা অনেক মুখে সুপরি-স্ফুট থাকায় তা:কে শ্রীসম্পন্ন মনে হয়। স্নেহ, প্রীতি, দয়া, উদারতা প্রভৃতি শান্ত পবিত্র সুমনোভাবের আশ্রয়ে কুরূপার মুখেও যে ক্ষণিকের শ্রী ফুটে ওঠে, তা অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। সেদিনও কয়লাখাদের এক কুলী রমণীকে দেখে কুরূপের দৃষ্টান্তস্থল মনে হবার পরক্ষণেই, সে যখন তার কোলের কচি ছেলেটিকে নতমুখে স্তন্য-পান করাতে আরম্ভ করলে, আমি তার মুখের সৌন্দর্য্যশ্রী দেখে চম্‌কে উঠ্‌লাম। দেখ্‌লাম সেই মলিন দর্পণেও মাতৃস্নেহের অপরূপ আলোকের প্রতিবিম্ব পড়ে' তাকে প্রকৃতই সুন্দর করে' তুলেছে। মনে আছে, অশ্রুভারাক্রান্ত এক ভিখারিণীকে দেখে যেদিন সুন্দরী মনে হয়েছিল, ঠিক পরের দিনই তাকে হাস্‌তে দেখে মনের মধ্যে বিরোধ জেগে উঠেছিল,—ভেবেছিলাম, একটি দিনে এর চেহারা এমন খারাপ কি করে' হল! বেদনার বিষণ্ণ-মুখশ্রীকে হাসি কি এম্‌নি করেই হাল্‌কা করে দিয়েছে?—অনেকেই লক্ষ্য করে থাক্‌বেন, স্ত্রী ও ধীশক্তিতে যে রমণীকে আজ পরমাসুন্দরী বলে' মনে হয়েছে, কাল কলহ করতে দেখে তারি কুৎসিত মুখশ্রীতে মনটা কি পরিমাণ আঘাত পেয়েছে।

যে সুরূপা নয়, তার রূপের প্রসাধন:চেষ্টায় সঙ্গতি আছে, কেননা ঘন রং পাউডারে ফিকে হয়, ছোট চোখ কজ্জলে টানা দেখায়, কোন কোন কেশতৈলে নাকি টাকের উপরও চুলের বন্যার ঢেউ খেলে। কিন্তু প্রকৃত সুরূপারও প্রসাধনচেষ্টার অর্থ কি? আমি অনুমান করি, রূপ জানে শ্রীই আসল, আর সেই জন্যে নিজেকে শ্রী বলে' চালিয়ে দেবার চেষ্টাতেই রূপ প্রথমে প্রসাধনের আশ্রয় নিয়েছিল।

লজ্জার আশ্রয়ে গণ্ডে যে অপূর্ব্ব রক্তশ্রী ফুটে ওঠে, তাকেই অনুকরণ করতে গিয়ে সাদা পাউডারের উপর লাল রঙের ছোপ; স্নেহপ্রীতির নিবিড়তায় নয়ন পল্লবে যে কোমল ছায়া পড়ে, তাকেই মূর্ত্ত করবার চেষ্টায় চোখের কোলে কজ্জল।

কিন্তু বাহিরের কোন প্রসাধনে শ্রী আজও ধরা দেয়নি; তার প্রসাধন স্বতন্ত্র। সদ্‌বৃত্তি, কোমলতা, উদারতা, উচ্চচিন্তার অনুশীলন ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই শ্রীর প্রসাধন। নিত্যনিয়ত সৎচেষ্টার সাহায্যে শ্রী অধিকতর উন্নত হয় তা নয়,—কুৎসিৎও সুন্দর হ'তে পারে, যা রূপ-প্রসাধনের রাজ্যে অসম্ভব। বুদ্ধ চৈতন্য কৃষ্ণ খৃষ্টের শ্রী নাকি অনুপম ছিল। সে কথা যে অলীক নয়, তার প্রমাণের একান্ত অভাব জগতে আজও হয়নি। প্রচুর শ্বেত শ্মশ্রুতেও রবীন্দ্রনাথের মুখের চিররহস্যময় যৌবন-স্বপ্ন-শ্রী ঢাক্‌তে পারে নি; শীর্ণতা ও বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও মহাত্মার মুখ বিরাট কোমল বিশ্বপ্রেমে পরম শ্রীমান। আমার মনে হয়, ভারতের নারীসমাজ বহুদিন পূর্ব্বেই প্রসাধনের এই রহস্য-টুকু ধরতে পেরে সীতাসাবিত্রীকেই সৌন্দর্য্যেরও আদর্শ বলে' মেনে আস্‌ছেন, আর আজও রূপমতী না লিখে' শ্রীমতী বলেই সই করে থাকেন। প্রসাধনের এই দিক্‌টার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিলে তাঁরা যে সত্যসত্যই শ্রীমতী আখ্যার যোগ্যতর অধিকারিণী হবেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; অন্ততঃ অভিভাবকের অর্থব্যয় বাঁচিয়ে তাঁরা যে তাঁদের সমধিক শ্রদ্ধাভাগিনী হবেন, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বিদায়ে।

——:*:——

জীবন-ঘাটের আধেক সোপান প্রায় ত হলাম পার,
যে ক'টা ধাপ রয়েছে আর বাকী,—
ভাঙন-ধরা শেওলা-পিছল তাও যে চারিধার—
পার হ'তে আর পারব সে ক'টা কি ?
দিনের আলো নিবিয়ে আসে ক্লান্ত আঁখির পাতে,
আস্‌ছে কানে কালো জলের ডাক ;
তবু আমায় ফিরতে বলিস্ তোদের খেলাঘরে,
ওরে পাগল, হাতছানি তোর রাখ্ !

(২)

প্রথম যেদিন তরুণ প্রাণের যাত্রা হ'ল সুরু,
সঙ্গে সেদিন কেউ ছিলনা আর ;
নূতন চলার আবেগভরে বক্ষ দুরু দুরু,
চক্ষে তরল দৃষ্টি সুষমার ;
কানের কাছে কোকিল ডাকে আকুল কলতানে,
ব্যাকুলতায় এগিয়ে চলে পা ;
দখিন বায়ু বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে আনে,
কিছুই যেন নিষেধ মানে না।

(৩)

পথের মাঝে জুট্‌ল সাথী, কেউবা খানিক চলে'
সঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে গেল আগে,
কেউ-বা কোথাও পড়্‌ল বসে' কিছুই নাহি বলে',
জানিনা কোন্ গোপন অনুরাগে !
কেউ বা চলে, কেউ-বা আসে, কেউ-বা ফেলে যায়,
সঙ্গী বলে' কারেও নাহি পাই ;
আপন বেগে চল্‌ছে চরণ চলার আকাঙ্ক্ষায়,
ফিরে' দেখি—সময় তারো নাই !

(৪)

প্রথম কুড়ির চাতাল পরে লাগ্‌ল নূতন নেশা,
পথের চেয়ে পথের সাথী পরে,
ফুলের গন্ধ যেন বা কার কেশের গন্ধে মেশা—
জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশ ভরে।
চল্‌তে গিয়ে বসে' পড়ি, বস্‌তে গিয়ে চলি,
ভুল হয়ে যায় চলায় না-চলায়,
কানের কাছে বউ কথা-কও প্রথম কথা বলি',
বলাতে চায় কোন্ সে অ-বলায় !

(৫)

এম্‌নিতর নেশার ঝোঁকে কাট্‌ল কতদিন,
হাতের সাথে হাতটি দিয়ে বাঁধা,

দুই কুড়ি ধাপ পেরিয়ে এলাম, দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ,
পায়ে পায়ে পাই যে শেষে বাধা !
পাখীর কণ্ঠ মিলিয়ে আসে ঝোড়ো হাওয়ার হাঁকে,
ফুলের গন্ধ মিলায় সে যে ধীরে ;
সঙ্গীজনের টুট্‌ল নেশা কালো জলের ডাকে,
চোখের দৃষ্টি মিলায় নদীনীরে।

(৬)

সম্মুখের ঐ চাতাল ভরি' নানা লোকের ভিড়—
মন্দিরেতে উঠ্‌ছে কলরব ;
চলার গতি সবার যেন আস্‌ছে হয়ে থির,
আসন নিতে ব্যস্ত দেখি সব ;
ঠেলাঠেলির কলধ্বনি উঠ্‌ছে চারিভিতে,
তারি মাঝে নদীর গরজন ;
নিরুৎসাহ মূর্ত্তিগুলি জাগায় শুধু চিতে
অর্দ্ধমৃতের চিত্র সুভীষণ।

(৭)

ঐ যেখানে ঢেউএর শেষে নদীর পরপারে—
ঝাপ্‌সা আঁখির দৃষ্টি-অন্তরালে,
অজানা ঐ আঁধার-ঘেরা অচিন বেড়ার ধারে
সন্ধ্যাবধূ তারার বাতি জ্বালে,—
ঐখানে ঐ সুদূর পারের নূতন পথের শেষে
মোর তরে কি বাজ্‌ছে সাঁঝের শাঁক !

এ পার—সে ত দেখাই গেল—যাব যে ঐ পারে—
যেখানে ঐ নীল মোহানার বাঁক !

(৮)

লাগ্‌ছে গায়ে শীতের হাওয়া, জাগ্‌ছে শিহরণ,
ভাব্‌ছি আজ এ জীবন-সীমানাতে—
নূতন সাথীর নূতন রূপটি কি মনোহরণ,
কি পরিচয় হবে বা তার সাথে !
যে ক'টা ধাপ রইল বাকী, হোক্ বা না হোক্ সারা,
পার পাব ত—যতই বাধা থাক্ ;
তোরা আমায় করিস্ ক্ষমা, ভালোবাসিস্ যারা,
পেছন থেকে দিস্‌নে আজ আর ডাক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

অবাধ্য।

(গোড়ার কথা।)

সুশীল যখন আট বছরের ছেলে, তখন বাপ ম'য়ের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।

দশমাসের সুশীলকে দাদামশাই ও দিদিমার কাছে রেখে আশুবাবু দূরদেশে চলে যান। সঙ্গে গিয়েছিল সুশীলের মা ও বড় ভাই। কি কারণে হঠাৎ তিনি বিদেশবাসী হলেন, তা' ভদ্রসমাজে প্রকাশ না করাই ভাল।

সুশীলের দাদামশাই ও দিদিমা অপুত্রক। কাজেই সুশীলকে পেয়ে তাঁদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলে গেল। সুশীল সেই স্নেহের নীড়ে আশ্রয় পেলে। সেখানে সে আদরযত্নের কোলে মানুষ হতে লাগ্‌ল।

বছরের পর বছর কেটে চল্‌ল। ক্রমেই আশুবাবু ও তাঁর স্ত্রীর দেশে ফের্‌বার দিন যতই ঘনিয়ে আস্‌ছিল, দিদিমার মন ততই একদিকে যেমন আনন্দে ভ'রে যাচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি কিসের আতঙ্কে তাঁর বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল—প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছিল। গভীর রাতে ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চুমোর পর চুমো দিয়ে তাকে কাতর করে তুল্‌তেন; সুশীল কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ত কিনা জানিনা, কিন্তু এ স্নেহের পীড়ন সে অবাধে সহ্য কর্‌ত।

শেষে সুশীলের মা বাপ দেশে ফিরে এলেন। সুশীলকে তাঁরা সহর থেকে দিদিমার কাছ হ'তে গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে

গেলেন। সুশীল অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল নিছক কৌতূহলের বশে মা বাপের সঙ্গে গেল। দিদিমার স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় গোপন বেদনার ভারে নুয়ে পড়ল, বুকফাটা কান্নার চাপে কণ্ঠে স্বর ফুট্ল না, মুখ থেকে কথাটী পর্য্যন্ত বের হ'ল না; নীরবে নতমুখে ছেলেকে বিদায় দিলেন। সুশীল জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে দেখ্লে—তাদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, সদরমহল অন্দরমহল, বড় বড় বাগান—শান-বাঁধানো পুকুর। এ সবেতে কিন্তু তার মন বস্‌ছিল না। সুশীলের নতুন নতুন খেলার সাথী জুট্‌তে লাগ্‌ল—তার নিজের দুই ভাই এক বোন—পাড়ার কত ছেলে, তাদের কতরকমের খেলাধূলা হাসিগল্প। এতেও সুশীলের মন পাওয়া গেল না। সে সহরে দিদিমার সেই ছোট্ট বাড়ীখানিতেই ফিরে যেতে চায়। বাপ মা কত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লে—সে বৃথা চেষ্টা। সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হ্যাঁরে সুশীল, তুই নাকি চলে যাবি?" সুশীল উত্তর কর্‌লে "হাঁ, কল্‌কাতায় মায়ের কাছে যাব।" "আবার কবে আস্‌বি?" "আর আস্‌ব না।" "সে কিরে, তোর ভাইবোনের জন্যে, বাপমায়ের জন্যে মন কেমন কর্‌বেনা?" সুশীল এর কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে যেন কত অপ্রতিভ হ'য়েই চুপ ক'রে রইল।

সেদিন দিদিমার কি আনন্দ, যেদিন স্থির হ'য়ে গেল যে সুশীল দিদিমার কাছে থেকেই কলকাতায় স্কুলে পড়াশুনা কর্‌বে। আশু-বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন, "বেশ ত, ছেলেটাকে পর ক'রে দিলে?" "পর ক'রে দেব কেন? সুশীল এখনও ছেলেমানুষ, যার কাছে শিশুকাল থেকে মানুষ, তাকে ছাড়া কি থাক্‌তে পারে? বড় হ'লে জ্ঞান হ'লে কি আর অমনটা থাক্‌বে?" "কি জানি আমার কেমন

ভয় করে।" পাড়ার লোকেরা কানাকানি কর্‌লে—"আচ্ছা ভাই, বাপের পয়সাটাই বড় হ'ল, ছেলেটাকে পর ক'রে দিলে?" "তোমরা মনে করছ ছেলেটা পর হ'য়ে যাবে—ভুলেও তা মনে স্থান দিও না। এ হ'ল বুদ্ধিমান লোকের 'পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা'। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে উপায় কর্‌তে শিখ্‌লে, তখন দেখ্‌বে বাপমায়ের কেমন আপনার হ'য়ে যাবে; দাদামশাই দিদিমার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না।"

সুশীল স্কুলে লেখাপড়া শিখ্‌তে লাগ্‌ল। লম্বা ছুটী পেলে সে বাপমায়ের কাছে এক একবার গিয়ে বেড়িয়ে আস্‌ত। ক্রমেই সে উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশ'ন পেলে। দাদামশাই ভাল private tutor খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। দিদিমার এক ভাইপো এসে সুশীলের পড়াশোনা দেখবার ভার নিলে—অবশ্য বিনা বেতনে। নিকটেই কোন্ লেনে তাদের বাড়ী। সে একজন graduate। এখনকার দিনে graduate বল্‌তে যা বোঝায়, হরেন মোটেই তা' নয়। যে বিশ্ব-বিদ্যালয়-কারখানা থেকে বৎসর বৎসর ছাপমারা graduate কাতারে কাতারে বেরিয়ে আস্‌ছে, graduate হরেনের জন্মস্থান অবশ্য সেইখানেই, কিন্তু তা'হ'লেও সাধারণ B. A. M. A.-দের সঙ্গে হরেনের আকাশপাতাল তফাৎ—সে সত্য সত্যই শিক্ষিত। তার ভাগ্যে জুটেছিল সেই সত্য শিক্ষা, যাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। এই শিক্ষিত যুবক সুশীলের guardian tutor-এর মত তাকে দেখাশোনা কর্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় দাদামশাই মারা গেলেন।

সুশীলের মা আশুবাবুকে বল্লেন—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম

কি যে, সুশীলকে এইবারে এইখানে নিয়ে এলে ভাল হয় না?” “কেন?” “সেখানে মা ত একা—বাড়ীতে কোন পুরুষ অভিভাবক নেই—সুশীল যদি লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়, বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যায়?” “না গো না, সে ভয় করবার কোন কারণ নেই, সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে।” “তাহলেই হল। দেখ্‌ছ ত বড় ছেলেটা লেখাপড়া শিখলে না, আর তুমিও চেষ্টা করলে না; তা' নাহ'লে কি আর শিখ্‌ত না? কিছু না কিছু শিখ্‌ত বই কি? একটা পাশও নিদেন পক্ষে কর্‌তে পার্‌ত।” আশুবাবু এবার একটু গরম হয়েই বল্লেন—“পাশ ক'রে কি হবে? আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে?” সুশীলের মা বেশ একটু বিস্মিত হ'য়েই উত্তর কল্লেন—“কি বল্‌ছ তুমি?” “বল্‌ব আমার মাথামুণ্ডু—বল্‌তে কিছুই চাইনা আমি। দেখে নিয়ো পরে তোমার কোন্ ছেলে মানুষের মত হয়। লেখাপড়াই বল আর যা'ই বল, পয়সা উপায়ের জন্যেই ত সব? দেখে নিয়ো তোমার কোন্ ছেলে পয়সা উপায় ক'রে দশজনের একজন হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে—তোমার বিদ্বান ছেলে কি মূর্খ ছেলে—সেটা দেখে নিয়ো।”

সুশীল যখন Matricu'ation পড়ে, তখন একদিন এমন একটী ঘটনা ঘট্‌ল, যা' যাদুদণ্ডের স্পর্শের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে হরেনের পুনঃ পুনঃ-বলা একটা কথাকে জীবন্ত ক'রে তুলে সুশীলের চক্ষের সাম্‌নে খাড়া করে ধর্‌লে। হরেন তার সঙ্গীদের প্রায়ই বল্‌ত—অনেক কিছুর অভাবে আমাদের জাতি আজ পতিত, তার মধ্যে সকলের চাইতে বড় এবং বেশী অভাব হচ্ছে—স্বাধীন চিন্তার অভাব। বর্ত্তমানে দেশের প্রতিভাবান ও ভাবুক পুরুষেরা এই কথাটাই

আমাদের বারবার বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। সত্যই আমরা ভাবতে ভুলে গিয়েছি—নতুন কিছু চিন্তা ক'র্‌তে হ'লেই আমরা শিউরে উঠি।

শনিবার দিন স্কুলে Debating Club-এ সুশীলের কোন সহপাঠী সীতাকে বনবাস দেওয়ার জন্যে রামচন্দ্রকে খুব বাহাদুরী দিচ্ছিল, নিজেও ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী উভয়ের কাছ থেকেই বাহবা পাচ্ছিল। এমন সময় সুশীল উঠে প্রতিবাদ করলে। শিক্ষকেরা এর পূর্ব্বেও লক্ষ্য করেছিল সুশীলের নির্ভীক স্বভাব এবং কোন কোন বিষয়ে তার স্বাধীন উক্তি। তাহলেও বিশেষ কোন তিরস্কার তা'কে সহ্য করতে হয়নি, কেননা সে 'ভাল ছেলে'। কিন্তু আজ আর রক্ষা নেই—দেব-চরিত্রে দোষারোপ! ভগবানের লীলাখেলার নিন্দাবাদ! হেড্ মাস্টার বিষম ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ ক'রে, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কর্কশ কণ্ঠে—"থাম থাম জ্যাঠা, ফাজিল over-ac ive কোথাকার" ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার ক'রে তাকে বসিয়ে দিলেন। সুশীল তৎক্ষণাৎ Club হতে বেরিয়ে এল—আর কখনও ঢোকে নি।

সন্ধ্যাবেলা সুশীল হরেনকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা মামা, পাঁচ জনের কল্যাণের খাতিরে একজনের কল্যাণকে বিসর্জ্জন দেওয়া যেতে পারে কিনা? "যেতে পারেও বটে, আবার না পারেও বটে। কেন, কি হয়েছে?" "আজ Debating Club-এ রামচরিত্র আলোচনা হচ্ছিল"—ব'লে সুশীল সব কথা আগাগোড়া খুলে প্রকাশ করলে। হরেন মুচকে হাস্‌লে—সে হাসিতে রাগেরও আমেজ ছিল। তারপরে বল্লে—"যাক্, ওরকম graduate"—সুশীল বাধা দিয়ে বল্লে "তিনি M A., B. L." "তাইত, ভদ্রলোক ওকালতি কল্লেই ভাল করতেন না? শিক্ষক সাজবার কি দরকার ছিল? আর ওঁর একারই বা দোষ দিই

কেন? পেটের দায়ে কত ভদ্রলোক ঐরকম শিক্ষকতার অভিনয় করছেন। যাক্‌গে ও কথা, এখন আসল কথা শোন। তুমি যদি দিদিমার শত বারণ না মেনে, আদৌ তাঁর মুখ না চেয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়, আর সেই অপরাধে তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ড হয়, এবং তোমার বিরহ সহ্য করতে না পেরে দিদিমা মারাও যান—তাহ'লেও তোমার এতটুকুও অপরাধ নেই। কিন্তু তাই বলে রামের সীতা নির্ব্বাসন কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। প্রজারা সীতার চরিত্রে যে সন্দেহ ক'রেছিল, রামচন্দ্র ভালরূপেই জান্‌তেন সীতাচরিত্র তার কত উপরে; তবুও তিনি প্রজার সন্তোষের খাতিরে, রাজ্যে শান্তিরক্ষার জন্যে সত্যের অপমান করলেন। কিন্তু Victor Hugo-র Jean Valjean কি করেছিলেন? যখন তাঁর কানে গেল যে তাঁরই গা-ঢাকা দিয়ে থাকার ফলে একজন নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড হবার উপক্রম হ'য়েছে, তিনি তখনই মরণের মুখে ছুটে গেলেন সেই নিরপরাধীকে বাঁচাতে। তিনিও বেশ বুঝেছিলেন যে, তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে-তোলা যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান—যার উপর নির্ভর করছিল কত নরনারীর জীবিকা—তাঁর অবর্ত্তমানে তা' অচিরে ভেঙে পড়বে, এবং কত নরনারীকে অনশনে শুকিয়ে মরতে হবে। তবুও তিনি সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন। মাত্র একটী লোকের দাবী এতগুলা লোকের দাবীর চাপে মারা পড়েনি। তাইত বিচার কল্লেই বল্‌তে হয় যে, বাল্মীকীর রামচন্দ্রের চাইতে Victor Hugo-র Jean Valjean জীবনের ওই জায়গাটাতে বড় আদর্শের অনুসরণ ক'রেছিলেন।"

বিদ্যুৎগতিতে স্কুলের এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হ'য়ে সুশীলের মা

বাপের কানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তাঁরা শুন্‌লেন—সুশীলকে যে পড়ায়, যার সঙ্গে সে দিবারাত্র মেলামেশা করে, সেই যুবকটী ধর্ম্ম মানেনা, সমাজ মানেনা, মা বাপের অবাধ্য, একেবারে স্বেচ্ছাচারী। কাজেই সুশীল যে অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌বে, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আশুবাবু তখনই কল্‌কাতায় এসে শাশুড়ীকে বোঝালেন—"আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যা ভয় ক'রেছিলুম তাই হয়েছে—ছেলেটা অধঃপাতে যেতে বসেছে। আর একদণ্ডও ওকে এখানে রাখা উচিত নয়। তবে ওর পরীক্ষা নিকটেই, এখন স্কুল পরিবর্ত্তন করায় ওর নিজেরই ক্ষতি হবে। পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলেই ওকে এখান থেকে সরাব।" তারপরে সুশীলকে ডেকে কড়া সুরে তিরস্কার ক'রে, তাকে হরেনের সঙ্গে মেলামেশা করতে বিশেষ ক'রে বারণ ক'ল্লেন, এবং হরেনকেও দু একটা মৃদু শ্লেষোক্তি ক'রে বিদায় দিলেন। সুশীল 'হ্যাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়ে, বাপ যা যা ব'লে গেলেন, নীরবে নতমুখে সব শুনে গেল।

শেষ কথা।

আশুবাবু অনেক টাকার মালিক হলেও, বিশেষ দায়ে না পড়লে খাওয়াপরা ছাড়া কোন কিছুতে এক পয়সাও ব্যয় করতে কেউ কখনও তাঁকে দেখে নি। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে যাওয়া তাঁর মতে একটা বাজে খরচ। হিসেব করতে পারা আর চিঠি লিখতে পারা—এই হলেই যথেষ্ট হ'ল, কেননা তাহলেই তাঁর ব্যবসার কাজ বেশ চলে যাবে। কল্‌কাতা সহরে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি দেখে, তাদের মত দোকানদার ব'নে যাওয়াটাই জাতীয় উন্নতির একটা প্রশস্ত

পথ ব'লে যাঁরা গলাবাজী করে থাকেন, আশুবাবু তাঁদেরই শিষ্য। বড় ছেলেকে ব্যবসায় শেখাচ্ছেন। মেজ ছেলেটার পরীক্ষা হয়ে গেলেই তাকেও ঐ কার্য্যে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন—এই তাঁর মতলব।

সুশীলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আশুবাবু তাঁর মতলব খুলে বল্লেন। এ জায়গা ত্যাগ কিম্বা ব্যবসায় শিক্ষা কোনটাই তার দ্বারা হবে না; সে চায় লেখাপড়া শিখতে—সুশীল ধীর নম্রভাবে এই কথা বাপকে জানালে। আশুবাবু রেগে আগুন হ'য়ে, এই অবাধ্যতার জন্যে দিদিমা ও হরেনকে দায়ী ক'রে তাঁদের দুজনকেই শ্লেষোক্তি করতে লাগলেন। এর প্রতিবাদ করতে গেলে পাছে রাগের বশে পিতার অপমান ক'রে ফেলে, এই ভয়ে সুশীল কথাটী না ক'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আশুবাবু বুঝলেন ছেলে তাঁর বাধ্য নয়। তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর স্ত্রী বল্লেন,—'তা বেশ ত, ছেলে যদি লেখাপড়া শিখতেই চায়, শিখুক না।" "দেখ তুমি মেয়ে-মানুষ, যা বোঝনা তাই নিয়ে কথা কইতে এস না।" বকুনি খেয়ে তিনি চুপ করলেন। আশুবাবু তাঁর এই দুঃখের ইতিহাস পরিচিত মাত্রকেই জানালেন। একদিন তাঁর অনুরোধে হেড্-মাষ্টার মশাই হরেনকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবার জন্যে তার বাড়ীতে এলেন। দুজনে কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা হওয়ার পর, মাষ্টার মশাই হঠাৎ আজকালকার ছেলেদের অবাধ্যতার কথা তুল্লেন, তুলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বল্লেন,—"আপনার সুশীল যে পিতৃদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে।" হরেন মাষ্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। তাই সে এ অভিযোগের সরল উত্তর না দিয়ে বল্লে—"কি করব বলুন, এটা যে বিদ্রোহেরই যুগ। সুশীল সেই

যুগধর্ম্মেরই মানাক্ষা ক'রেছে।" "তাই বলে কি বিদ্রোহের দমন কর্‌তে হবে না?" "কি উপায়ে?" "সমাজের বাঁধন এখন আল্‌গা হ'য়ে গেছে। আবার কঠোর আইনে সমাজকে শক্ত ক'রে বাঁধুন দেখি, ছেলেরা কেমন অবাধ্য হ'তে পারে।" "অর্থাৎ আপনি চান ছেলেদের মানুষ না গ'ড়ে তুলে পোষা জানোয়ার বানিয়ে তুল্‌তে। তা' ত পারবেন না, মাষ্টার মশাই। অসম্ভব! যে বান ডেকেছে! আপনাদের 'সামাল' 'সামাল' চীৎকারই সার হবে। সাম্‌লাতে পারবেন না কিছুতেই—ভেসে যাবেই যাবে।" "আপনি তাহলে দেখছি বিপ্লব চান?" "হ্যাঁ, তাই চাই। আপনিই বা বিপ্লবের নামে আঁৎকে উঠচেন কেন? বিশ্ব-সভ্যতার বিকাশ ত বিপ্লবেরই মধ্য দিয়ে।"

এ সব কথা হেড-মাষ্টারের মনের মত না হ'লেও, প্রতিবাদ করার মত তাঁর পুঁজি না থাকায় তিনি চুপ ক'রেই রইলেন। যে উদ্দেশ্যে এলেন তা' যখন সফল হ'ল না, তখন তাঁর গলার চড়া সুর কোমল পর্দ্দায় নেমে এল। তিনি বেশ শান্ত সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন —"আচ্ছা হরেন বাবু, ও সব কথা ছেড়ে দিন; আমি বলি কি, পিতার প্রতি পুত্রের ত একটা কর্ত্তব্য আছে?" নিশ্চয় আছে"। "কিন্তু আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় সুশীল সে কর্ত্তব্য পালন করছে না।" "আপনি কি শুনেছেন?" "আমি শুনেছি আশুবাবু সুশীলকে যা করতে বলেছিলেন, তাতে তা'র ভালই হ'ত। অথচ"—হরেন বাধা দিয়ে বল্‌লে—"ভাল হ'ত? তার সর্ব্বনাশ হ'ত! ছেলের যে কিসে ভাল হয়, তা' এ সমাজের ক'জন বাপ জানেন? পয়সা উপায়, বিবাহ আর পরিবার পালন কল্লেই ত ছেলে একটা মানুষ হ'য়ে উঠেছে বলে

তাঁদের ধারণা। সুশীল চায় লেখা পড়া শিখ্‌তে, তার বাপ তাতে বাধা দিয়ে চান তাকে দোকানদার বানাতে। সুশীল তাতে কিছুতেই মত দেয়নি—এই তার অপরাধ। তার কর্ত্তব্যের ত্রুটি যে কোথায়, আমি ত খুঁজে পাই না। বাপের অর্থপিপাসার শান্তি কর্‌তে গিয়ে নিজের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তি না ক'রে চিরকাল মূর্খ থাকাটা কারুর কোনমতেই কর্ত্তব্য হ'তে পারে না। বরং নিজেকে ও-ভাবে বঞ্চিত করা—পাপ। বাপের আদেশ—দিদিমাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। তাঁর ধারণা তাহ'লেই ও বাধ্য হবে। সুশীল তাতেও নারাজ। অতএব সুশীলের ভারী অন্যায়। বলে দিতে পারেন মাস্টার মশাই, পিতা হ'লেই তার এত বড় অধিকার কোথা হ'তে আসে যে, পুত্রকে তার বিচারশক্তি, তার স্বাধীনতা, তার ভালমন্দ জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায়বোধ সমস্তই পিতার খেয়ালের অথবা স্বার্থের পায়ে বলি দিতে হবে? যিনি সুশীলকে মানুষ ক'রেছেন—যিনি তার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে যদি সুশীল পিতার আদেশে সত্য সত্যই ত্যাগ ক'রে যায়, তবে সে যার পরিচয় দেবে তা কখনই পিতৃভক্তি নয়—তা' নিছক কৃতঘ্নতা। এ কথা স্বীকার কর্‌তে চান্ না তাঁরাই, যাঁদের পিতৃভক্তির মূলমন্ত্র হচ্ছে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম', যাঁরা পিতৃভক্তির আদর্শ রাখ্‌তে জঘন্য বর্ব্বরোচিত মাতৃহত্যারও অনুমোদন ক'রে থাকেন।" "আপনি কি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন, না নেবেন?" "কেন বলুন দেখি? সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই বুঝি হয় ব্রাহ্ম না হয় খৃষ্টান হ'তে হবে?" "খৃষ্টানদের কথা আর কইবেন না। তারা আবার সত্যি কথা কয়? এত বড় ভুল বিশ্বাস আপনার কি ক'রে হ'ল জানি না। খৃষ্টানদের কাগজখানা পড়ে দেখবেন দেখি, তাতে হিন্দুদের কিরকম মিছামিছি

গালাগালি করে ?" "তা করে বটে। কিন্তু সময় সময় আবার সত্যি কথাও বলে। যেমন একদিন একজন লিখেছিল মনে আছে— সে দেশ রসাতলে যাবে, যেখানে নারীজাতি ছেলেমেয়ে সৃষ্টির যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। শুন্‌তে কটু হ'লেও কথাটা বড় বেশী সত্যি না মাষ্টারমশাই ?" হেড্‌-মাষ্টার জবাব না খুঁজে পেয়েও কথা চাপা দেবার জন্যে বল্লেন—"শুনেছিলুম আপনি নাকি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নেবেন ?" "যা শুনেছিলেন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর দীক্ষা নেবার আমার কি প্রয়োজন হ'ল, আমি নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।" "ধর্ম্মান্তর গ্রহণ কর্‌তে গেলে"—হরেন বাধা দিয়ে বল্লে—"ধর্ম্মান্তর আবার কি ? ধর্ম্ম ত এক। আমারও যা', আপনারও তা', মুসলমানেরও তা', খৃষ্টানেরও তা'—সকল দেশে সকল যুগে সকল মানুষের সেই একই ধর্ম্ম। তা' ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না।" "আপনি কোন্ ধর্ম্মের কথা বল্‌ছেন ?" "আমি বল্‌ছি সত্যের পথে চলা আর মানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ত ধর্ম্ম। আমরা ভিতরের এই সার তত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের খোসাকে নিয়েই হুড়োহুড়ি কোলাহল ক'রে মরছি। তাইতেই ত এতরকমের ধর্ম্মমত গড়ে উঠেছে। আর তারই ফলে ত কত না বাদবিসম্বাদ, কত না কাটাকাটি রক্তারক্তি। তবে এমন দিন আস্‌ছে—সেদিনের হাওয়া বইতে সুরু হ'য়েছে—যেদিন মানুষ সত্য-ধর্ম্মকে চিন্‌বে—ধর্ম্মান্তর ব'লে আর কিছু থাক্‌বে না।" হেড্‌-মাষ্টার দেখলেন গতিক ভাল নয়—তিনি যা শুনেছিলেন তা' বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্যই এ যুবক ভগবান মানে না, ধর্ম্ম মানে না, সমাজ মানে না, শিক্ষা দীক্ষা কিছুই মানে না।

এত বড় নাস্তিক উচ্ছৃঙ্খল যুবক কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। তিনি আর বিশেষ কিছু না বলে বিদায় নিলেন।

সুশীলের বাপ হেড্‌মাষ্টারের মুখে সব কথা শুনে ত স্তম্ভিত! ছেলেটাকে এই বেলা বশে না আন্‌তে পার্‌লে ভবিষ্যতে ছেলেটাও ত ঐরকম কিম্ভূত কিমাকার জীব হ'য়ে উঠ্‌বে। আরও দু'একবার সুশীলকে ফেরাবার চেষ্টা কর্‌লেন। সুশীলের সেই একই উত্তর। আশুবাবু তখন নিরুপায় হ'য়ে গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'লেন। গুরুদেব নাকি বড় বুদ্ধিমান। তাঁরই যুক্তিতে আশুবাবু কতবার কত মুস্কিলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেবার খাতিরে তিনি সারাদিন আদালতে ঘুরে বেড়ান। কেননা মোকদ্দমা মামলায় তিনি পাকা ওস্তাদ। আপনার লোককে পর ক'রে দিয়ে পরকে আপনার কর্‌তে তাঁর মত মাথা ঘামাতে কাউকে দেখা যায় না। তিনি আশুবাবুকে যুক্তি দিলেন ছেলের বিবাহ দিতে। তিনি নিজেই ঘটকালী করে তাঁর এক ধনী শিষ্যের মেয়ের সঙ্গে সুশীলের বিবাহ স্থির কর্‌লেন। পাশ্‌করা ছেলে—দর অনেক টাকা, আশুবাবু দাঁও মার্‌বার আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলেন। কিন্তু যে বিয়ে কর্‌বে তার মত করাবে কে?—গুরুদেব নিজেই গেলেন। গুরুদেব কত শাস্ত্রবচন আওড়াতে লাগ্‌লেন—সুশীলকে সম্মত করাবার জন্যে। কিন্তু যা' উত্তর পেলেন, তাতে তাঁর পিত্তি অবধি জ্বলে উঠ্‌ল। অথচ রাগ প্রকাশ কর্‌লে ত চল্‌বে না। কাজেই ভিতরের রাগ সাবধানে ভিতরে চেপে রেখে বেশ প্রসন্ন মুখেই বল্লেন —"দেখ বাবা, তুমি শিক্ষিত; তোমাকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের জীবনে একটা প্রধান কর্ত্তব্য। জানত

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, দ্বাপরে ভীষ্মদেব,—" "দেখুন ভীষ্মের ত্যাগস্বীকার খুবই বড়; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা যায় না। তাঁর অতবড় ত্যাগস্বীকারের কাছে তাঁর উদ্দেশ্যটা যেন লজ্জায় মুখ ঢেকে আছে। হলেনই বা বাপ—তাই ব'লে তাঁর অন্যায় অসংযমের পথ খোলসা ক'রে দিতে হবে?" "বাবা সুশীল, তোমার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটেছে। ভগবান তোমায় সুমতি দিন"—উদাসীনভাবে এই শুষ্ক আশীর্ব্বাদ ক'রে গুরুদেব চলে গেলেন।

হতাশ হ'য়ে গুরুদেব ফিরে এলে আশুবাবু ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—Rascal আপনারও অপমান ক'রেছে? আজ হ'তে সে আমার কেউ নয়!" "ছি বাবা, ওকথা বল্‌তে নেই। এখনও এক যুক্তি আছে ওকে ফেরাবার। দেখ বাবা! টাকা বড় জিনিষ। তা'কে গিয়ে ভয় দেখাও যে, এরকম অবাধ্য হ'লে বাপের বিষয়সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার থাক্‌বে না, দেখি ছেলে বশে আসে কি না।" আশুবাবুর অন্তরটা রাগের আগুনে তখনও টগ্‌বগ্ ক'রে ফুট্‌ছিল—বল্লেন "কিন্তু জান্‌বেন গুরুদেব! এততেও যদি ও পাজি নচ্ছার বাধ্য না হয় ত সত্যিই ও আমার ত্যজ্য পুত্র। এই আপনার পা ছুঁয়ে আমি শপথ কল্লুম।" গুরুদেব ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে দূরে সরে গিয়ে পরিতাপের সুরে বলে উঠলেন—"ছি ছি ছি বাবা, কি করলে! রাম! রাম! রাম! নারায়ণ! একি হ'ল ঠাকুর? যাক্ বাবা, রাগ না চণ্ডাল! এখন চল স্নান আহার ক'রে ঠাণ্ডা হবে চল।"

কিন্তু আশুবাবুর রাগ অত শীঘ্র ঠাণ্ডা হবার নয়। তিনি কল্‌কাতায় এসে সুশীলকে ডেকেই আরম্ভ করে দিলেন "পাজি নচ্ছার কোথাকার! এতখানি যে স্পর্দ্ধা হবে তোমার, তা' আমি স্বপ্নেও

ভাবিনি। তুমি এতদূর উৎসন্ন গিয়েছ, এমন অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়েছ যে, গুরুদেবকে পর্য্যন্ত অপমান করতে তোমার বাধ্‌ল না! আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মাত্র একটা কথা; তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি—তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা?" সুশীল ধীর নম্র ভাবে কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, আশুবাবু বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"কোন কথা শুনতে চাইনা আমি! তুমি আমায় এক কথায় বল—আমার বাধ্য হবে কিনা?" সুশীল তবুও কি জিজ্ঞাসা করতে গেল, আশুবাবু আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন—"চোপ্‌রাও! আর একটা কথাও না। শুধু বল তুমি আমার বাধ্য হবে কিনা? বল 'হ্যাঁ' কি 'না'।" এবার বেশ শান্ত গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল 'না'। "না? আচ্ছা জেনো আজ হ'তে তুমি আমার কেউ নও—আমার বিষয়সম্পত্তির একটা কানাকড়িতেও তোমার এতটুকু অধিকার নেই—আর জীবনে কখনও আমার বাড়ীতে ভুলেও মাথা গলিও না।" আবার তেমনই শান্ত গম্ভীর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল "আচ্ছা।"

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কেদারাছায়ানট্—যৎ।

তোমার ব্যথার দানে উঠ্‌ল ভরি' চিত্ত আমার যবে,
বল কার চরণে নিবেদিব এই সে ডালি তবে ?
আজি আকাশ বাতাস কুসুম লতা
গুঞ্জরে কোন্ ম্লান বারতা,—
কি অপরূপ ব্যথা জাগায় মর্ম্মরের রবে ?
যাতে ভ'রে ওঠে চিত্ত রাঙা ব্যথারই গরবে !

আজি ভুবন-জোড়া বেদন-তারে
রণিয়ে ওঠে বারে বারে,
তাই বুঝি মন আন্‌মনা আজ হাটের কলরবে ?
দিতে জীবন-বীণায় ব্যথার রাগে সাড়া উছল স্তবে !

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

চাষী।

——ঃ০ঃ——

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত খোঁড়া হয়েছে লাঙ্গলের ফলায়। মানুষ যে আদিতে অসভ্য যাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতিশীল সভ্য হয়ে তার প্রাণে বাঁচবার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রম কর্‌তে হ'ত। পরিচিত ভূভাগ স্বল্পপশু ও তৃণবিরল হয়ে উঠলে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা চল্‌তো না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত করে' তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র করে' তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে উঠেছে। এই সব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্ম্মকুশলতা অজস্র ধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় ছাবা-পৃথিবী থেকে অন্ন চুঁয়িয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন।

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন ক'রে এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষীকে বহন করতে পারে নি। চাষী চিরদিনই সভ্যতার ভারবাহী মাত্র হয়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস

টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে,—কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জানবে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ান রয়েছে। মানুষের যাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়—ধনের এমন আকার ছিল না বলে', ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ করবে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এ জন্য সমাজের মধ্যে দাসপ্রভু সম্বন্ধ গড়ে' উঠ্‌তে পারে নি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন করতে হ'ত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও স্বর্গরাজ্যও সেইদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে' খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা ক'রে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চল্‌তে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেষ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিস্বাদ ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অখণ্ড আলস্য,—এই ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষীর শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম,—অনভ্যস্তের কাছে যা সব চেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্ত্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের

আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্ত্তমানের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে এই অনভ্যস্ত, চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্ব্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এর উদাহরণ ছড়ান রয়েছে। সভ্য গ্রীসের রাজ্যগুলিতে চাষী ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কি করে' টিঁকে থাক্‌তে পারে, গ্রীক পণ্ডিতেরা তা ভেবে পান নি। রোমান সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসদের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও রুশিয়াতে সেদিন পর্য্যন্ত চাষী ছিল নামে ও কাজে দাসেরই রূপান্তর। হিন্দুর শাস্ত্রে চাষের কাজ বৈশ্যের, অর্থাৎ আর্য্যের—যার বেদে অর্থাৎ বিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুঁথিতেই লেখা আছে, কিন্তু সুদূর অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেল্‌ছে শূদ্রে, যে শূদ্রকে "দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা"—স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্ত্তা দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক—ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ; সভ্যতারও তেমনি দুই দিক—সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা পুষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড় ছোট, ভাল-মন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও শ্রেষ্ঠ অংশ ভাগ হয় অল্প ক'জনার মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকী সকলের জন্যে,—যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশী।

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক বলে' গর্ব্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের

প্রধান দাবী এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আনছে। জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প ক'জনার জন্যে তুলে না রেখে, যার শক্তি আছে তারই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। শরীরের জন্য যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাগা ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হ'লেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়,—সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই; এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুলছে। পূর্ব্বে যা ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য্য করেছে। তার জন্যে ধনীর ব্যসনের আয়োজন ও পরিমাণ কমাতে হয় নি, তা বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগ। এই কৌশলের বলে স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে, অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রীসম্ভার উৎপন্ন করতে পারে, ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্'।

আধুনিক 'ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল' সভ্যতার এই দাবী, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের যোগান যতই নগণ্য হোক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের তুলনায় ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশী

পরিমাণে সে সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার যারা মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উদারতায় ঘটেছে তা নয়। যারা ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে' উঠেছে তাতে ভারবাহীদের দল বাঁধবার সুযোগ ঘটেছে, এবং দলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে যোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে শ্রমিকের থলি ভরান কিছুতেই চল্‌তো না।

কিন্তু ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষীকে নিয়ে প্রাক্‌-ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্‌ তার কোনই সমাধান কর্‌তে পারে নি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব্ব যুগের সভ্যতা যে গোঁজামিল দিয়ে এর মীমাংসার চেষ্টা করতো, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোঁজামিলই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপকরণ আবিষ্কার হয়েছে, কি করে' তা যথেষ্ট উৎপন্ন করে' সমাজের মধ্যে এমন করে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কি করে' ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর

করে সভ্যতার স্থিতি, অন্যটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্য্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাতে বাকী অংশটা ঐ পরিশ্রম থেকে মুক্ত হ'য়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ঐ পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্য সকলের উপর ভাগ করে' দিলে, সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হয়ে উঠ্‌বে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগ্যে জুট্‌বে না, ওর বৃদ্ধির সংযোগ ও অবসর কারও ঘট্‌বে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য বলে হোক, ছলে হোক, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী কর্‌তেই হবে, এবং খুব সম্ভব সে দল লোক হবে সংখ্যায় সব চেয়ে বড় দল।

ইন্‌ডষ্ট্রিয়াল যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্য সমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষী। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। ইন্‌ডষ্ট্রিয়ালিজম্ হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌ল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরণের কারুশিল্পে সমাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ করলে তার ফল ফলে বেশী। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশী পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশী ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়,

এ ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকতে হয় না, স্থানে স্থানে অল্প জায়গার মধ্যে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়। এবং গ্রাম্য হ'ল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্ব্বর, আর নাগরিক তার ফলভোগী বিদগ্ধজন। সহরের দলবদ্ধ লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা' সহজসাধ্য, সারা দেশে ছড়ান চাষীর জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজ-হিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বল্‌ছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের দাবী কমান যায়, এবং কাউকেও অলস থেকে পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে না দিয়ে পরিশ্রমের ভার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হতে পারে। আর সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগ্যের দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অন্নপাক কি করে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ,—পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুসঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজকে মুক্ত করতে। অথচ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌মের আদি ও অন্ত চাষীর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে। তার শিল্পের উপাদানও যোগাবে কৃষি, বিনিময়ও যোগাবে কৃষি। সুতরাং ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সমাজ

থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ—অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম দ্বিগুণ করে চাপান, প্রতি সমাজে চাষীর যে সমস্যা ছিল, কতকগুলি সমাজ থেকে তা সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তুলে দেওয়া; পৃথিবীর প্রতি সভ্যদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না করে', কতকগুলি সভ্যদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করানো; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্য সমাজের একভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করতো, সেই ছল ও বল আত্মীয়তার বাধা নিরপেক্ষ হয়ে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করতে বাধ্য করা।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এই সংঘর্ষেই রোমান সভ্যতা ধ্বংশ হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বগ্‌দাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে। ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ সেই সংঘর্ষেরই এক মূর্ত্তি। চাষের পরিশ্রম অস্বীকার করে' এও চাষীর পরিশ্রমের ফল লুটতে চায়। যে ধন ও ধনী একে চালনা কর্‌ছ, তারাও মুখ্যতে যাযাবর। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমত চলে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই। এবং এর হাতে বিনিময়ের বাটকাড়া থাক্‌লেও, অন্য হাতে যাযাবরের শাণিত অস্ত্র বাহাল রয়েছে।

সভ্যতার যা সমস্যা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্ তার মীমাংসা নয়; কারণ ও ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক ক'রে দেখে না এবং দেখ্‌তে পারে না। মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত না করে', সভ্যতাকে কেমন ক'রে বাঁচান ও বাড়ান যায়, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিজমের এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষী। যেদিন চাষীকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেইদিন সভ্যতার সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রীকপাণ্ডিত্যের কথাই সত্য,—দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা অচল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র (১)।*

শান্তিনিকেতন,

২২শে জুন, ১৯১৮।

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার ১৯শে জুন তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে আমি যতদূর বুঝি, তাহা এই :—

(১)

পশুপক্ষীদিগের জ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন নাই; তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারই তাহাদের গুরু।

(২)

মনুষ্যের অন্নবস্ত্রাদির অভাবমোচনের জন্য কৃষিবিদ্যা, বস্ত্রবয়ন-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করা আবশ্যক; এবং আধ্যাত্মিক অভাবমোচনের জন্য আত্মা-বিষয়ক এবং পরমাত্মা-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক।

* মহৎ হৃদয় সামান্য জিনিষেও আপনাকে প্রকাশ করে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র-নাথের চিঠিপত্রে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি, আমার বিশ্বাস তা সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য। দ্বিতীয় পত্রখানিতে আত্মশক্তির উদ্বোধন সম্বন্ধে অল্প দু-চার কথায় তিনি যা বলেছেন, সেই জ্বলন্ত বাণী আমাদের মধ্যে নব চেতনা সঞ্চারিত করুক। অসীম করুণাময়, সদানন্দ মহর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মরণে প্রণাম করে' এই ক'খানি চিঠি সকলের কাছে নিবেদন করছি।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৩)

শিক্ষা দুইরূপ, শুনিয়া শেখা এবং দেখিয়া শেখা। অন্নের ভিতর নানাপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এটা আমাদের শুনিয়া শেখা; অন্নের ভিতর কতপ্রকার কি কি পুষ্টিকর পদার্থ আছে—রসায়ণবিৎ পণ্ডিতের তাহা দেখিয়া শেখা। শুনিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—পরোক্ষ-জ্ঞান; দেখিয়া শেখা বিদ্যাকে বলা যায়—অপরোক্ষ জ্ঞান।

(৪)

অপরোক্ষ জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের এবং বর্ত্তমানকালের সাধুসজ্জনের নিকট হইতে শুনিয়া শেখা পরোক্ষ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়।

(৫)

আপনি চা'ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। তাহার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান।

(৬)

সকলেই আমরা ন্যূনাধিক পরিমাণে আত্মাকে জানি। আদবেই যদি আমরা আত্মাকে না জানিতাম, তবে আত্মার অভাব-মোচনের জন্য আমাদের মাথাব্যথা হইত না; তাহা হইলে আপনিও আমাকে ১৯শে তারিখে পত্র লিখিতেন না, আমিও এ-পত্র লিখিতাম না। আত্মা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বস্তু, অথচ আত্মাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, এইটিই আমাদের দুঃখ—একেবারেই যে জানিনা তাহা নহে।

(৭)

সমুচিত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের নিকটতম এই আত্মাকে চৈতন্যময় আত্মারূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেই সঙ্গে আপনাতে এবং সর্ব্বজগতে চৈতন্যময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে পারি। আপন আত্মাকে আমরা ছায়া-ছায়ারূপে বা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রূপে দেখি বলিয়া পরমাত্মাকেও অন্ধ শক্তিরূপে দেখি।

* * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র (২)।

শান্তিনিকেতন,
১লা জুলাই, ১৯১৮।

সাদর নিবেদন—

আপনার ২৯শে জুন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার সকল কথার সবিস্তরে উত্তর দিতে আজ পর্য্যন্ত কেহ পারিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানিনা। আমি তাহার সম্বন্ধে যাহা সার বুঝি, তাহাই সংক্ষেপে বলি; বোধ করি তাহাতে আপনার আকাঙ্ক্ষা কতকটা মিটিতে পারিবে।

(১)

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

(২)

যাঁহার যে অবস্থা, তাহা কতক পরিমাণে তাঁহার অনুকূল, কতক পরিমাণে প্রতিকূল।

(৩)

এইরূপ অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া মনুষ্য নিতান্ত পশুবৎ অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হইতে সভ্যতর অবস্থায় ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনো অগ্রসর হইতেছে।

(৪)

অগ্রসর হইতেছে কিসের জোরে? নৌকা অগ্রসর হয় কিসের জোরে? দাঁড়ের জোরে এবং বায়ুর জোরে। মনুষ্য অগ্রসর

হইতেছে আত্মার প্রভাবে এবং পরমাত্মার প্রসাদে। বায়ু অদৃশ্য—দাঁড় দৃশ্য; তেম্নি পরমাত্মার প্রসাদ অব্যক্ত—আত্মপ্রভাব ব্যক্ত। আত্মপ্রভাব কি? না—আত্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি।

(৫)

মনুষ্য যদি আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইত—তুফানে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিত— তাহা হইলে মনুষ্য, হয় অনেককাল পূর্ব্বে মারা পড়িত, নয় বংশপরম্পরাক্রমে পশুদিগের ন্যায় মোহান্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

(৬)

ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য হাল ছাড়িয়া দেয় নাই—সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হয় নাই—ঈশ্বরদত্ত আত্ম-শক্তিকে কাজে খাটাইতে বিরত হয় নাই। বিজ্ঞান-বীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া দূরতম নক্ষত্রগণের গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন, অদৃশ্য পরমাণু অপেক্ষা "কোটিগুণ সূক্ষ্মতর তড়িতাণুর" (Electron-এর) গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন; জীবশরীরের মধ্যে ব্যাধিজনক এবং আরোগ্যজনক জীবাণুদলের মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার গুপ্ত সমাচার অবগত হইতেছেন। ধর্ম্মবীরেরা আত্মশক্তি খাটাইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রিপুদমনাদি করিয়া আত্মার নিগূঢ় তত্ত্বসকলের গুপ্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, আত্মা পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় সুখদুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখদুঃখ হইতে নির্লিপ্ত। আত্মার দর্শন পাওয়ার গুণে ইহাঁদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

(৭)

প্রতিকূল অবস্থা মনুষ্যের প্রসুপ্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া তোলে—এই হিসাবে প্রতিকূল অবস্থাও অনুকূল অবস্থারই আর এক মূর্ত্তি। প্রতিকূল অবস্থা যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের ইচ্ছা-শক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিত।

আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানিনা। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোনো অভাবই থাকেনা। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার আত্মশক্তির নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মশক্তি—অর্থাৎ, জগৎব্যাপারে যে শক্তি খাটিতেছে সেই ঐশীশক্তি—কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

(৮)

আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা যতক্ষণ না পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততক্ষণ বুঝিতে পারা সম্ভবে না।

(৯)

গীতাশাস্ত্রে আছে "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং। নাত্মানং অবসাদয়েৎ"॥ আত্মাদ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। একবার যদি রাশি রাশি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে আত্ম-শক্তিকে রীতিমত উদ্দীপন করিয়া তুলিতে আমি পারি বা তুমি পার, তবে

দেখিতে পাইবে যে, জাগ্রত আত্মশক্তির ন্যায় মঙ্গল জগতে আর কিছুই নাই। তাহা সকল রোগের মহৌষধ। তা শুধু না—আমার আপন আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল জানিতে পারিলে পরমাত্মার আত্মশক্তি যে কত বড় মঙ্গল, তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের আপনার আত্মশক্তিকে আমরা যদি মনে করি যে, তাহা অতি সামান্য বস্তু—তাহা থা'ক্; আত্মশক্তি যেমন ঘুমাইতেছে ঘুমা'ক্; এখন আমার যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্—কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করা যাক্ আগে, আত্মশক্তিকে জাগাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে তাহার পরে; হীরাকে যদি মনে করি কাঁচের বেলোয়ারি-তবে আমরা আপনারই বা কি, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই বা কি--কিছুরই মধ্যে সার কিছুই পাইব না; সবই আমাদের নিকট অসার এবং অপদার্থ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের আপনার আত্মশক্তি কত বড় মঙ্গল, তাহাই যদি আমরা না বুঝিতে পারি—তবে পরমাত্মা যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব ?

* * * * * *

আমি আপনি সাধনার পথে ততটা অগ্রসর হই নাই যে, অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে পারি। মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্ত্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র (৩)।

শান্তি নিকেতন।
১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১।

কল্যানীয়েষু,—

* * * * * *

* * গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাহার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই তোমার নিকট তাহা ঢাকা থাকিবে না। প্রথমেই রহিয়াছে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ওঁকার একটি মাত্র শব্দ, কিন্তু তাহার অর্থ সমস্ত জগৎ ছাড়াইয়া উঠিয়া পূর্ণব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সমস্তের মূলাধার সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম—ঐ একটি শব্দের মধ্যে সমস্তই সম্ভুক্ত রহিয়াছে। পত্রে সে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিতে আমি অসমর্থ,—সেইজন্য তুমি এখানে আসিলে তোমাকে উপনিষৎ খুলিয়া তাহা আমি দেখাইয়া দিব। ওঁকারের এইরূপ নিগূঢ় অর্থ অন্তশ্চক্ষুর গোচরে আনিবার জন্য ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মোট-বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের এই সূর্য্য যেমন একাই সমস্ত সৌরজগতের সার সর্ব্বস্ব, তেমনি আদি সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মার আদ্যাশক্তি সমস্ত জগতের সার সর্ব্বস্ব। তৎ

সবিতুর্ব্বরেণ্যম্ ভর্গঃ—সেই আদ্যাশক্তি, তাহাই সর্ব্ব জগতের জ্ঞান প্রাণ এবং জ্যোতিঃ। তাঁহাকে ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতেন। এবং তাঁহার নিকট হইতেই সেই ধীশক্তি প্রার্থনা করিতেন যাহা মর্ত্ত্য জীবগণের মাথার মণি এবং সর্ব্বমঙ্গলের আকর।

এইটুকু আপাততঃ তোমাকে লিখিলাম, কিন্তু এর মধ্যে ঢের কথা লুকান রহিয়াছে—দেখা হইলে বলিব। * * * * *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮ নাটোরের মহারাজ।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মৃতদেহের শেষ সংস্কারের পর আমরা পাঁচজন যখন শ্মশান থেকে ফিরছিলুম, তখন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ আমাদের বলেন যে, আজ বাঙলার শেষ ভদ্রলোককে আমরা হারালুম।

এই কথাই স্বর্গীয় মহারাজা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনের কথা।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, অর্থাৎ—বাঙলায় যাকে ভদ্রশ্রেণী বলে, আমরা সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ভদ্রতা নামক গুণটি আমাদের সকলের মধ্যে সমান পরিস্ফুট নয়। ও বস্তুটি যে কি তা বলা কঠিন, যদিচ ও গুণের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই তা চিনতে পারি। গত নাটোরের মহারাজার চরিত্রে ও ব্যবহারে এ গুণটি এতই অসামান্য ছিল যে, তাঁকে বাঙলার শেষ ভদ্রলোক বলাটা অত্যুক্তি নয়।

আমরা এ যুগে ভদ্রতা নামক গুণের যতই কেন না আদর করি, আমাদের ভিতর সকলে সে গুণে গুণান্বিত হতে কোনরূপ চেষ্টা করেন না। ভারতবর্ষ থেকে নানারকম আর্ট দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এবং এ কথাও আমরা সকলেই জানি যে, ভদ্রতা নামক জীবনের আর্টটাও আমরা অনেক অংশে হারিয়ে ফেলেছি। এর নানা কারণ আছে,

কিন্তু এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ও চর্চ্চা করবার আমাদের প্রবৃত্তিও নেই, অবসরও নেই। আমরা ভাল লোক হতে পারি মন্দলোক হতে পারি; কিন্তু সৌজন্য গুণটিকে আমরা তেমন লোভনীয় মনে করিনে, বা তার যথার্থ চর্চ্চাও করিনে। সুতরাং যে জগদিন্দ্রনাথ সৌজন্যের অবতার ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা যে তার শেষ ভদ্রলোক হারালে, এ কথা বলায় মিথ্যা কথা বলা হয় না। অন্ততঃ তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা এ কথার কোনও প্রতিবাদ করবেন না। আর তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বাঙলা দেশে কম নয়। কারণ যাঁর সঙ্গে তাঁর মাত্র দুদিনের পরিচয়, তিনিও মহারাজকে বন্ধু হিসেবেই দেখতে শিখেছিলেন। কারণ মহারাজ স্বভাবতই মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে বন্ধু হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই উদার অমায়িকতা আভিজাত্যেরই একটি বিশিষ্ট গুণ।

মহারাজের সকল ব্যবহার সকল কথাবার্ত্তার ভিতর যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর আভিজাত্য।—আমরা এ যুগে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সকলেই অল্পবিস্তর ডিমোক্রাসির ভক্ত হয়ে উঠেছি। এ ভক্তিরও যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে, এবং কোন কোনও হিসেবে ডিমোক্রাসিই যথার্থ আদর্শ। কিন্তু এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জন-সাধারণের আর যা গুণ থাকুক না কেন, আভিজাত্য নামক গুণটি তাদের শরীরে নেই। আমরা আজও এতটা ডিমোক্রাট হয়ে উঠি নি যে, আভিজাত্যের মর্য্যাদা আমরা বুঝতে পারি নে। বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষে আভিজাত্য লাভ করে না। সব ফুলই ফুটে ওঠবার জন্য অনুকূল অবস্থার অপেক্ষা রাখে। বাহিরের অবস্থা মানুষের ভিতরকার গুণকে ফুটিয়ে তোলবার সাহায্য করতে পারে অথবা বাধা দিতে পারে; কিন্তু যার প্রকৃতিতে যা নেই, তার সৃষ্টি

করতে পারে না। সুতরাং মহারাজার চরিত্রের যে গুণ তাঁর বন্ধুবান্ধবকে বিশেষ করে মুগ্ধ করত, সে গুণের বীজ তাঁর অন্তরেই নিহিত ছিল।

আমরা সকলেই ভদ্রলোক, ও সমাজে বাস করতে হলে আমরা সকলেই কতকপরিমাণে সৌজন্যের চর্চ্চা করতে বাধ্য এবং করেও থাকি। তবে যে গুণ ভদ্রসমাজ সামান্য—সে গুণ এ ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ জনের কাছে অসামান্য বলে ঠেকত কেন? এর কারণ তাঁর ব্যবহারের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব শ্রী ছিল, যা আমাদের ব্যবহারের ভিতর নেই।

এই শ্রী জিনিষটি কি, তা কথায় বুঝিয়ে বলা কঠিন। বড় জোর একটা ইংরাজী কথার সাহায্যে বলতে পারি, এটি হচ্ছে একটি æsthetic quality। মহারাজার সকল কথায় সকল কাজে সকল ব্যবহারেই যা বিশেষ করে ফুটে উঠত, সে হচ্ছে তাঁর প্রকৃতির এই æsthetic ধর্ম্ম। শ্রী জিনিষটি হচ্ছে প্রাণের একটি ধর্ম্ম। ও বস্তু জড়জগতে নেই। তাই জড়পদার্থে যখন আমরা প্রাণের এইরূপ আরোপ করি, তখন তার নাম হয় পালিস। কিন্তু পালিসের চাকচিক্য চিরকালই বাইরের জিনিষই থেকে যায়, আর শ্রী জিনিষটি ভিতর থেকে বাইরে ফুটে বেরোয়।

মহারাজা নাটোর যে সঙ্গীতের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, এ কথা সর্ব্বলোক-বিদিত। এ বিষয়ে তিনি একজন বড় গুণীও ছিলেন। পাখোয়াজি হিসেবে তিনি বাঙলার ভিতর একজন অগ্র-গণ্য গুণী ছিলেন। তাঁর চাইতে ঢের বড় ওস্তাদ পাখোয়াজি এ দেশে অবশ্য আছে, বিশেষত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে। এই বড় বড় ওস্তাদরা পাখোয়াজে যেরকম ঝড় বইয়ে দিতে পারতেন, মেঘগর্জ্জন করতে

পারতেন—মহারাজার পক্ষে তা করা অসাধ্য ছিল। কিন্তু এ যন্ত্রে তাঁর তুল্য মিষ্টি হাত আর কারও ছিল না। এক কথায় তাঁর মৃদঙ্গ বাদনের ভিতর শ্রী নামক গুণটি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিত।

বাজনায় তাঁর হাত যেমন মিষ্টি ছিল, আলাপে তাঁর মুখ তেমনি মিষ্টি ছিল। যাঁরা তাঁর যৌবন-সুহৃদ—তাঁরাই নর্ম্মসুহৃদ কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সেকালে তাঁর কথাবার্ত্তার ভিতর যে রস ছিল, শুধু তাই নয়—তেজও পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর প্রতি কথা একটি সরস সতেজ মনের পরিচয় দিত। আমি জীবনে এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতীত জগদিন্দ্রনাথের তুল্য সুরসিক দ্বিতীয় ব্যক্তি আর দেখি নি। সামান্য আলাপের ভিতরও যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—তা যিনি মহারাজার সঙ্গে কখনো মনখুলে আলাপ করেছেন, তিনিই তা জানেন।

সংসার-বিষবৃক্ষের যে কাব্যামৃতরসাস্বাদ ও সজ্জনের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে দুটিমাত্র অমৃতোপম ফল, এ কথা মহারাজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ও-দুটি ফল সকলে ভোগ করবার অধিকারী নয়। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পেনাঙের পথে।

——:০:——

আমরা যে জাহাজে যাচ্ছিলুম সেটা হ'চ্ছে এই ধরণের:—সাম্নেটা দোতলা; উপরের তলায় জাহাজের যন্ত্রপাতি লোহালক্কড় দড়িদড়া এই সব ভরা ছিল, আর নীচের তলায় কতকগুলি ক্যাবিন, সেখানে খালাসীদের থাকবার জায়গা। এই সামনের অংশে যাত্রীদের থাকবার স্থান ছিল না। তার পরে হ'চ্ছে একতলা খোলা ডেক; সেখানে মাঝে একটু সরু পথ রেখে দু'ধারে ফাঁকা জায়গায় ভেড়ার পাল রাখা হ'য়েছে। তার পরে হ'চ্ছে জাহাজের মধ্যভাগটা; সেখানে সব নীচে ইঞ্জিন-ঘর, তার উপরে খোলা ডেকের সঙ্গে একতলায় কতকগুলো ক্যাবিন, সেখানে জাহাজের অফিসাররা কেউ কেউ থাকেন, আর কতকগুলি ক্যাবিন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে; তার উপরে প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন, আর প্রথম শ্রেণীর খাবার জায়গা, আর তার চারধারে খোলা ডেক; আবার তার উপরে হ'চ্ছে কাপ্তেনের ঘর, জাহাজ চালাবার চাকা, এই সব। এই মাঝের অংশের পরে আবার খানিকটা মাথা-খোলা খালি জায়গা—ডেক। এর তলায় সব মাল পোরা হয়; এইখানটায় ভেড়া ছাগলের জন্য শুখ্নো ঘাসের বোঝা, মুরগীর খাঁচা, একটা গুম্টীর মতো ঘরে চীনে বাবুর্চ্চী-খানা, আর এক পাশে মস্ত একটা লোহার সিন্দুকের মতন, সেটা হ'চ্ছে ডেকযাত্রীদের জন্য উনুন। এই লোহার বাক্সের ভিতর পাথুরে

কয়লার আগুন দেওয়া হ'ত, বাক্সর ডালাটী তেতে উঠ্ত, সেইটে চাটুর মতন রুটী সেঁক্‌বার জন্য ব্যবহার হ'ত, আর ডালাটীর তিন চার জায়গায় গোল গোল ক'রে কাটা, তার উপর হাঁড়ী চড়িয়ে ভাত ডাল তরকারী সিদ্ধ করা যেত। বিস্তর যাত্রী বিছানা কম্বল বিছিয়ে এই খোলা ডেক দখল ক'রেছিল, কিন্তু মাঝসমুদ্রে ঝড়-তুফান হাওয়ায় পরে সবাইকে সেখান থেকে স'রে অন্য আশ্রয় নিতে হয়। যখন আকাশ পরিষ্কার থাক্‌ত, তখন রোদ্দুর আট্‌কাবার জন্য এই দু'ধারের খোলা ডেকের উপর ত্রিপলের শামিয়ানা টাঙানো হ'ত। পিছনের এই খোলা ডেকের পরে হ'চ্ছে জাহাজের পশ্চাদ্ভাগ—এটা সামনের মতন দোতলা; নীচের তলাটা--যেটা খোলা ডেকের সামিল—সেটা হ'চ্ছে একটা ছাতওয়ালা হল বিশেষ—এই জায়গাটা ডেক্‌-যাত্রীতে ভর্ত্তি; উপরের তলা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা, এখানেও বিস্তর ডেক্‌-যাত্রী যে যেখানে পেরেছে বিছানা বিছিয়ে একটু ক'রে জায়গা দখল ক'রে আছে। ঝড়ের সময় এই উপরতলার ডেক-যাত্রীদেরও নীচে এসে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। জাহাজে ডেক্‌-যাত্রীদের মিঠে জল দেবার জন্য একটা পাম্প্‌ ছিল, সকাল বিকেল দু'ঘণ্টা ক'রে সেই পাম্প্‌কল খুলে রাখা হ'ত। পাম্প্‌টা ছিল জাহাজের সেই ওপাশে খালাসীদের ঘরের কাছে; এদিক থেকে ডেক-যাত্রীদের জলের দরকার হ'লে জাহাজের মাঝের ইঞ্জিনঘরের ভিতর দিয়ে, ভেড়া ছাগল পেরিয়ে, তবে তারা পাম্পের কাছে পৌঁছতে পারত। জল নেবার জন্য সরু-মুখ একরকম টিনের তুম্বী প্রায় সবাই ক'লকাতা থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল।

ডেক-যাত্রীদের কথা এইবার একটু বলা যাক্। এদের মধ্যে

প্রথমেই চোখে প'ড়্‌ল চীনেদের। প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন চীনে ছিল, অধিকাংশই কাণ্টনের যাত্রী—হঙ্‌কঙে নাম্‌বে; তারা ক'লকাতায় বেশীর ভাগই মুচীর কাজ করে। ক'লকাতায় ছুতোরের কাজ যে সব চীনেরা করে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শুনেছিলুম শাঙ্‌হাইয়ের লোক। চীনেরা আরাম, ভোগসুখ—যাকে বলে creature comforts—তা বেশ বোঝে। এরা ডেক-টিকিট কেনে, তাতে খাবারের দাম ধরা থাকে, হাত পুড়িয়ে রান্না করার ধার ধারে না, ষ্টীমার থেকেই এদের খাবার যোগায়। এদের জন্য চীনে রান্নাঘরের ব্যবস্থা আছে, তার কতকগুলো চীনে বাবুর্চ্চীও আছে। আর দু' একজন চীনে কেরাণীও থাকে, এদের চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের জাহাজ তখনও গঙ্গাতেই র'য়েছে, রাত্রে বন্ধ ক্যাবিনে ঘুম হ'চ্ছে না; জাহাজে এই প্রথম রাত্রি, মনে ভাবছি উঠে ডেকে গিয়ে একটু পায়চারী ক'রে আসি,—এমন সময়ে চমৎকার বাঁশীর আওয়াজ কানে এল। এ বাষ্পযানের ভেঁপু নয়, একেবারে আমাদের দেশের বাঁশের বাঁশীর আওয়াজ। বিছানা থেকে উঠে আওয়াজ ধ'রে ক্যাবিনের পাশের সরু পথ দিয়ে গিয়ে দেখি যে, এই বাঁশী বাজ্‌ছে অন্য এক ক্যাবিনে—মস্ত বড় ক্যাবিন এটা, তাতে গোটা ছয় আট বাঙ্ক বা বিছানা; পরে বুঝ্‌লুম সেটা হ'চ্ছে চীনে কেরাণী আর বাবুর্চ্চীদের থাকবার জায়গা। রাত্রি প্রায় দশটা হবে তখন, কাজকর্ম্ম চুকিয়ে চীনেরা ঘুমতে যাবার আগে একটু আমোদপ্রমোদ ক'রছে। Chinaman at work খুব দেখেছি, Chinaman at play দেখবার এই প্রথম সুযোগ ঘট্‌ল। ক্যাবিনটার দরোজা খোলা, আমি সরু পথটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের রকমটা দেখ্‌তে লাগলুম।

এরা আড়চোখে দু' একবার আমার দিকে তাকালে, কিন্তু কিছু ব'ল্‌লে না। ক্যাবিনের মাঝে একটা ছোটো টেবিলের চারধারে বাঁশের মোড়া কুরসীতে ব'সে জন চারেকে মিলে কি একটা খেল্‌ছে—ছোটো ছোটো ডমিনো খেলার পাশার মতো কি নিয়ে; হয়তো সেটা আজকাল ইউরোপে আর আমেরিকায় যা খুব চ'লেছে, সেই "মা-জঙ্" খেলা হবে। অনেকেই কালো রেশমের থোকা-ঝোলানো লম্বা চীনে নল দিয়ে তামাক খাচ্ছে। খেলার মধ্যে গল্প গুজবও চ'লেছে, মাঝে মাঝে বোধহয় দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটু কলরবও উঠ্‌ছে। কোণে একটা উঁচু তেপায়ার মতন, তাতে একটা ছোটো তোলা উনুনের উপর চা-দানে চা ফুট্‌ছে, পাশে সবুজাভ চীনে মাটির দু'তিনটে ছোট্ট ছোট্ট পেয়ালা—একটী পেয়ালায় দু' তিন ঢোকের বেশী পানীয় ধ'রতে পারে না, বিলিতী liqueur glass ব'ল্‌লেই হয়। খেলোয়াড়-দের মধ্যে একজন না একজন মাঝে মাঝে উঠে এসে একটু ক'রে ফুটন্ত চা পেয়ালায় ঢেলে খেয়ে যাচ্ছে। বড্ড গরম, তায় ক্যাবিনের ভিতর,—প্রায় সকলেরই কোমর পর্য্যন্ত গা খোলা। ক্যাবিনের বিছানাগুলিতে এক একজন চীনে শুয়ে বা আধশোয়া হ'য়ে আছে—একজন নীচের বাঙ্কে পা ঝুলিয়ে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—লম্বা তল্‌তা বাঁশের মতো পাত্‌লা বাঁশের বাঁশী, তাতে কালো আর লাল রেশমের গোছা বাঁধা; আর একজন চীনে, সারেঙীর মত একটা যন্ত্র,—অতি অল্পসংখ্যক তার তাতে আর বেজায় কর্কশ ধ্বনি তার,—সেইটা নিয়ে বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গত ক'র্‌ছে। জন দুই এই সব হট্টগোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বই প'ড়্‌ছে—চীনে বই—বেশ নিবিষ্টচিত্তে প'ড়ছে দেখলুম। ক্যাবিনের একদিকে দেয়ালে লম্বা লালরঙের একটা

কাগজে কালো চীনে কালীতে তিন চারটে চীনে হরফ লেখা র'য়েছে দেখলুম—কোনও শুভ বচন হবে। ভীষণ গরম, ক্যাবিনের ভিতর আর বাইরে চীনে তামাকের উৎকট গন্ধ, কথাবার্ত্তার কলরব, দূরে ষ্টীমারের বাইরে গঙ্গার উপর সমাগত নৌকার মাঝিদের চেঁচামেচি, এই সব ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে বাঁশীর তানটুকু উঠ্ছিল—সুরটা একঘেয়ে হ'লেও বেশ মিস্ট আর করুণ লাগ্ল। মোটের উপর এই চীনে বাবুর্চ্চীদের আমোদে চিত্তবিনোদনে একটা উঁচুধরণের culture-এর হাওয়া আছে ব'লে মনে হ'ল।

তখন নোতুন চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হ'য়েছে, মাঞ্চু রাজারা আর সিংহাসনে নেই। চীনে যাত্রীরা প্রায় সবাই হ'চ্ছে নিম্নশ্রেণীর লোক—জুতাওয়ালা, ছোটোখাটো ব্যবসাদার, ফেরিওয়ালা। দু' চার জনের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বাঙ্লা ইংরিজিতে আলাপ ক'র্লুম। চীনা রিপাব্লিকের কথা—"চুঙ্-হুবা" অর্থাৎ মধ্য দেশ, পুষ্পদেশ—চীনের "মিঙ্-কোয়" অর্থাৎ গণ-রাষ্ট্রের কথা সকলেই খুব ফুর্ত্তির সঙ্গে, খুব গর্ব্বের সঙ্গে উল্লেখ ক'রলে। এরা প্রায় সকলেই দখিনে চীনে। মাঞ্চু রাজবংশের উপর এদের জাতক্রোধ। গায়ের শক্তিতে, চেহারায় লম্বাই চওড়াইয়ে উত্তরের চীনেদের চেয়ে খাটো হ'লেও, বুদ্ধিতে এরা খুব দড়, আর এরা যে বড্ড গোঁয়ার-প্রকৃতির, তাও প'ড়েছিলুম। এদের দুর্দ্ধর্ষতার দু' একটী প্রমাণ জাহাজেই পাওয়া গেল।

পিছনের দিকের উপরের দোতলা ডেকে বহু যাত্রী আশ্রয় নিয়েছে। কতকগুলি তথা-কথিত নীচ জাতির পাঞ্জাবী—চুহড়া—আর কতকগুলি শিখ আর পাঞ্জাবী মুসলমান, যে যেখানে পেরেছে কম্বল বা গুণচটের

বিছানা পেতে শুয়ে আছে। এই দোতলা ডেকটীর মাঝখানটা হ'চ্ছে জাহাজের যন্ত্রপাতি, লঙ্গরের মোটা শিক্‌লী, কপিকল, ক্যাপ্‌স্‌ট্যান্‌ প্রভৃতিতে সমাকুল। তার মধ্যে মধ্যে যেখানে একটু খালি জায়গা আছে, সেখানেই এক একজন মোটঘাট বসিয়ে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। কতকগুলি চীনা "হ্যামক্‌" বা দড়ীর ঝোলা টাঙিয়ে তার ভিতর শুয়ে র'য়েছে, আর কতকগুলি বাঁশের বেঞ্চি পেতে বিছানা বানিয়ে নিয়েছে। এরি মধ্যে এক পাঞ্জাবী মুসলমান ফৌজী লোক, ছ'ফুটের উপর ঢ্যাঙা হবে, নিজের স্ত্রীর আর নিজের জন্য জায়গা ক'রে নিয়েছে। স্ত্রীটী হ'চ্ছেন পর্দ্দানশীন। একখানা দড়ির চারপাই খাট উপরে তুলে নিয়ে মিঞাসাহেব স্ত্রীর জন্য জায়গা ক'রেছে, আর একটা মশারি টাঙিয়ে দিয়ে বিবির আব্রু রক্ষা ক'রেছে। খোলা সমুদ্রের হাওয়ায় প'ড়ে মশারি প্রতি মুহূর্ত্তে দড়ি ছিঁড়ে উড়ে পালাবার চেষ্টায় আছে, তাই তাকে তলায় দড়ি-দড়া দিয়ে ইঁট বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। পরে জোর ঝ'ড়ো বাতাসে মশারি ঢাকা দিয়ে আব্রু রাখা আর সম্ভবপর হয় নি—সেটা হচ্ছে পরেকার কথা। যাক্‌, খোলা সমুদ্রে জাহাজের দুলুনি আরম্ভ হ'য়েছে। পাঞ্জাবী বীরেরা চক্কর খেয়েছেন, সকলেই করুণ, হাস্যোদ্দীপক মুখ ক'রে শুয়ে প'ড়ে আছেন, মাঝে মাঝে উঠে ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে বা ব'সে পা ঘ'ষে ঘ'ষে ডেকের রেলিঙের ধারে গিয়ে বমি ক'রে আস্‌ছেন। আমার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে চক্কর লাগার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম, তাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম। এখন এই উপরের ডেকে গিয়ে দেখি, ফৌজী পাঞ্জাবী এক কম্বল পেতে শুয়ে আছে, তার সাজা তামাক বেকার হ'য়ে

গড়গড়ায় পুড়ে যাচ্ছে—তার স্ত্রী মশারির পর্দ্দার মধ্যে খাটিয়ায় ব'সে আছে,—আশেপাশে চীনে, পাঞ্জাবী। একটী চীনে লোক শুয়েছিল জাহাজের একটা উঁচু জায়গায়। তার ভালো ক'রে পা ছড়িয়ে শোবার সুবিধা হ'চ্ছিল না, কারণ সেই উঁচু জায়গাটীতে অন্য কার একটী টিনের কানেস্তারা ছিল। হঠাৎ চীনেটী সেই কানেস্তারায় একটা লাথি মেরে সেটীকে নীচে ফেলে দিলে, তারপর বেপরোয়া হ'য়ে দিব্যি পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে শোবার চেস্টা ক'রলে। কানেস্তারাটী ছিল ফৌজী পাঞ্জাবীর; সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বল্‌লে—"এই, ইয়ে মেরী চীজ হ্যায়, তুম্‌নে কোঁ্যা ইসে নীচে গিরায়া।" ব'লে উঠে জিনিসটী তুলে, যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার এসে শুলো। চীনেম্যান চুপ ক'রে দেখলে, পাও সরিয়ে নিলে, কিন্তু যেই পাঞ্জাবী শুয়েছে, অমনি আবার লাথি মেরে কানেস্তারাটা ফেলে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা হিন্দুস্থানীতে অশ্রাব্য ভাষায় পাঞ্জাবীকে গালাগালি দিলে। তাতে পাঞ্জাবীও হিন্দুস্থানীতে তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে, টল্‌তে টল্‌তে উঠে, জোর ক'রে জিনিসটা রাখলে। তারপর চীনেটীকে একবার বেশ ক'রে দেখে নিয়ে, গড়গড় ক'রে চীনে ভাষায় তার সঙ্গে তক্‌রার করতে লাগল। দেখলুম দুজনের খুব ঝগড়া বাধ্‌ল চীনে ভাষায়। আশেপাশে, ঝোলা বিছানা থেকে, ডেক থেকে, বেঞ্চি থেকে চীনেরা মাথা তুলে দেখতে লাগল। খোলা হাওয়া, রোদ্দুর, চারদিকে অনন্ত দিক্‌চক্রবাল,—এর মধ্যে দুল্‌তে দুল্‌তে জাহাজ চলেছে—আর সেই জাহাজের মধ্যে এই দুটী প্রাচীন জাতের প্রতি-নিধি এইরকম ঝগড়া লাগালে। মিনিট দুই ঝগড়ার পর হঠাৎ চীনেম্যানটী একটী বাঁশের টুল তুলে পাঞ্জাবীকে মারবার জন্য

ওঠালে। পাঞ্জাবী সেটাকে ধ'রে ফেল্‌তেই চীনেম্যান একেবারে "বেঙ্-তড়্‌কা" লাফে লাফিয়ে উঠে, দু'হাত দিয়ে পাঞ্জাবীর টুঁটী চেপে ধরলে, পাঞ্জাবী পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য কাবু হ'য়ে রইল। এই সব ব্যাপার যেন চক্ষের নিমেষের মধ্যে ঘট্‌ল। আমি অবাক্ হ'য়ে এই লম্বা চওড়া ছ' ফুট ঢ্যাঙা পাঞ্জাবী জোয়ানের সঙ্গে পাঁচ ফুট খর্ব্বাকৃতি চীনেম্যানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগলুম। আশপাশ থেকে চীনেরা তাদের জাত-ভাইকে উৎসাহিত ক'রতে লাগ্‌ল। পাঞ্জাবীর স্ত্রী তার মশারির পর্দ্দার ভিতর থেকে খুব তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—ভয়ে নয়। অন্য পাঞ্জাবী সকলে চক্কর লাগার দরুণ কাতর, তারা যাকে ইংরিজিতে বলে languid interest, সেই ক্ষীণভাবের গরজে-পড়া দরদ দেখিয়ে তাকাতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবী দুই ধাক্কা দিয়ে চীনেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে,—চীনে তখন হাতের কাছে ছোটো একটা লাঠী কি যা কিছু একটা পেয়েছে সেইটে নিয়ে আক্রমণ করবার জন্য আবার তেড়ে আস্‌ছে। পাঞ্জাবীটা তার জাতভাইদের দিকে চেয়ে—"লাক্‌ড়ী লাও, লাক্‌ড়ী লাও"—অর্থাৎ "লাঠী দাও, লাঠী দাও" ক'র্‌তে কর্‌তে এগিয়ে গিয়ে চীনের ঘাড়টা বাঁ হাতে ধ'রে তার পিঠে কাঁধে দুম্-দাম্ ক'রে বজ্রমুষ্টি লাগাতে আরম্ভ করলে। দুজনে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি, চেঁচামেচি; চীনেরা দু-চার জনে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ এগোতে সাহস ক'রলে না। ইতি-মধ্যে গোলমালে জাহাজের এক ইংরেজ অফিসার এসে প'ড়ল। সে আস্‌তেই সব চুপ। চীনেম্যান এর মধ্যে বেশ মারটাই খেয়েছে, সে আর বেশী ঘাঁটাতে চাইলে না, সাহেবকে আস্‌তে দেখে নিজে আস্তে আস্তে স'রে গেল সেই ডেক থেকে। ইংরেজ আস্‌তেই আমাদের

পাঞ্জাবী খাড়া দাঁড়িয়ে ফৌজী কায়দায় তাকে সেলাম ক'রলে, আর ভাঙা ইংরিজিতে ব'ল্‌লে—"সার্, দিস্ চায়্‌নামায়ন্, ওয়েরী বায়্‌ড্ মায়্‌ন্, মায় থিঙ্গ্ সাটে হিয়ার, হি কিক্ মায়্ থিঙ্গ, হি এবিউজ্ মি, আয়্ আয়্‌ম্ হাওইল্‌দার হাঙ্‌কাঙ্ মিলিটারী পোলিস্"। তাকে থামিয়ে দিয়ে সাহেব হুকুম দিলে, "তুম ইয়ে তুম্‌হারা ক্যানিষ্টার হটাও।" সেলাম বাজিয়ে সে তখনি তার জিনিষ সরিয়ে নিলে। ইংরেজ অফিসারের পিছন পিছন চীনে কেরাণী এসেছিল, তাকে আস্তে আস্তে কি ব'ল্‌লে, তাতে সে "অল্ লাইট্, অল্ লাইট্" ব'লে চ'লে গেল। ব্যাপারটা এইখানেই সাঙ্গ হ'ল।

ডাক্তারবাবুর কাছে শুন্‌লুম, এই চীনেরা মার মারি করতে খুবই পটু, আর রাগ হ'লে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে মেরে বসে। প্রত্যেক জাহাজে এইরকম ছোটোখাটো মারামারি এরা অন্য জাতের লোকের সঙ্গে তো করেই—পাঞ্জাবীদের হাতে মাঝে মাঝে মার খায়ও বেশ—কিন্তু দমে না; আর আপোষে জুয়ো খেল্‌তে খেল্‌তেও মারামারি করে। মালয় অঞ্চলে দক্ষিণ চীন, হঙ্-কঙ্ আময় প্রভৃতি বন্দর থেকে বিস্তর চীনে কুলি প্রতি বৎসর যাওয়া-আসা করে, তখন জাহাজের অফিসারদের খুব সতর্ক থাক্‌তে হয়। দাঙ্গাফাসাদের জন্য ৩০।৪০ জনকে কখনো কখনো হাতকড়া লাগিয়ে বেঁধে রাখ্‌তে হয়। সময় সময় নাকি পিস্তলও দেখাতে হয়। এদের রকমসকম দেখে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয় না। জাহাজযাত্রী চীনে আর জাহাজযাত্রী ভারতীয় ডেক-প্যাসেঞ্জারদের আমার ক'লকাতা-পেনাঙ যাওয়া-আসার আট দিন আট দিন ষোলো দিন যা দেখেছি, তাতে পূর্ব্ব-এসিয়ার কতকগুলি জটিল সমস্যার একটি দিক

আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠেছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা ক'রবো।

আগেই ব'লেছি যে চীনেরা creature comforts বেশ বোঝে। এরা জাহাজে সফর করে, গরীব শ্রেণীর লোক, ডেক যাত্রী,—গোঁড়া হিঁদুর মত চাল চিঁড়ে ছাতু বেঁধে নিয়ে নয়, বা মুসলমানের মতো হাত পুড়িয়ে রেঁধে নয়। এরা ডেকের যাত্রী হ'লেও খাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে বেরোয়, টিকিটের দামের সঙ্গে খাবার খরচও ধ'রে দেয়। জাহাজে তাই বাবুর্চ্চীখানা আছে, তা'থেকে এদের সকালে বিকেলে দু'বার খাবার দেওয়া হয়। দেখ্‌তুম, চীনে যাত্রী সারাক্ষণ তার কম্বলের ভিতর বা ঝোলা বিছানার ভিতর বা বেতের চেয়ারের মধ্যে শুয়ে ব'সেই কাটাচ্ছে—বেশী বেড়াতে চেড়াতে এদের দেখতুম না—পরস্পর কথবার্ত্তা ব'ল্‌ছে, গল্পগুজব চালাচ্ছে, বই প'ড়ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, কখনো কখনো সারেঙ্গীর মতো যন্ত্র একটা ক্যাঁ-কো' ক'রছে। কিন্তু সকাল দশটায় আর বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যেই বাবুর্চ্চীখানা থেকে বাল্‌তি ক'রে ভাত আর চীনে মাটির বাসন ক'রে নানা চীনে তরকারীব্যঞ্জন নিয়ে বাবুর্চ্চীরা উপরের. ডেকের "চীনে-পাড়ায়" উপস্থিত হ'ত, অম্‌নি একটা সাড়া প'ড়ে যেত, চারদিকে যত চীনেম্যান সব জেগে উঠ্‌ত—গা ঝেড়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌ত সবাই—একটা টেবিলের চারদিকে বাঁশের টুল চেয়ার সব টেনে এনে ব'সে যেত। চীনেদের খাওয়ার রীতি আমি দেখতুম—কেমন ক'রে ভাতের বাটীটা বাঁ হাতে ধ'রে মুখের কাছে এনে, ডান হাতে দুটো বড়ো কাঠী ধরে' ভাত সরিয়ে সরিয়ে মুখের ভিতর পুরে দেয়, তারপর লঘু হাতে কাঠি দুটির সাহায্যে সামনের বড়ো বড়ো রেকাবী আর ছোট

চীনেমাটীর গামলার মতন পাত্র থেকে তরকারী মাছ মাংস সব তুলে তুলে নিয়ে মুখে পোরে; তরকারীর মধ্যে দেখতুম অনেক সময়ে আলু পেঁয় জকলি প্রভৃতির মধ্যে মস্ত এক মাছ আস্ত বিরাজ ক'রছে। একটা সাদা পাতলা জিনিষ এরা খুব খেত। সমস্ত খাদ্যের নানা গন্ধ ছড়িয়ে যে মিশ্র গন্ধটা বার হ'ত, তার মধ্যে পচা বা শুঁটকি মাছের চাম্‌সে সৌরভের রেশটাই সব চেয়ে মোটা সুরে দূর থেকে আমার নাকে বাজ্‌ত।

চীনে যাত্রীরা অধিকাংশই দক্ষিণ চীনের লোক। দুজন চীনে কিন্তু ছিল, তারা হ'চ্ছে মধ্যচীনের, শাঙ্‌হাই অঞ্চলের। এরা ছিল বাজী-কর,—এক বুড়ো, আর তার ছোকরা চেলা। বাজীকরের কাজে ভারতবর্ষে এরা কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি ব'লে মনে হ'ল। মাঝে মাঝে বোধহয় এইরূপ চীনে বাজীকর ছিট্‌কে ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছয়, আর তারা ভারতের মধ্যে দূর দূর জায়গায় ঘুরে ফিরে বাজী দেখিয়ে—বাঁশবাজী ধরণের কসরৎ, যাদু সব জড়িয়ে কিছু রোজগার ক'রে থাকে। বছর কয় পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদে দেশী মহাল্লায় একবার এইরকম চীনে বাজীকরদের, কাঁসরের আওয়াজে দর্শকদের কান ঝালাফালা ক'রে বাজী দেখাতে দেখেছিলুম। এই দুই চীনে যাচ্ছিল অতি গরীবের মতো; অল্পস্বল্প তল্পিতল্পা নিয়ে ডেকে গুণ চটের বিছানা পেতে প'ড়ে থাক্‌ত। ছোকরা তার গুরুর খুবই সেবা ক'র্‌ত দেখতুম। কোথা থেকে একটা ভারতবর্ষীয় পিতলের লোটা এরা সংগ্রহ ক'রেছিল—চীনেম্যানের ব্যবহারে আমাদের দেশের ঘটী একটু বিশেষ ক'রেই চোখে লেগেছিল। এইটেই এদের তৈজস ছিল, আর তা একাধারে পানপাত্র আর পিকদানি উভয় কাজেই লেগে-

ছিল। খুব গরীব ব'লে বোধহয় অন্য চীনেদের সঙ্গে এরা বড়ো মিশত না, আলাদাই থাক্‌ত, আর এদের জন্য ভাততরকারী আলাদা ক'রেই দিয়ে যেত। খুব সম্ভব ভাষাসঙ্কট না মেশার আর একটা কারণ। এরা মধ্যচীনের লোক, দক্ষিণ চীনের ভাষা এরা বুঝত না, আর এদের ভাষাও দক্ষিণ চীনের লোকেরা বুঝ্‌ত না। আমি এই দু' অঞ্চলের ভাষা এক বর্ণ না বুঝেও কানে শুনেছি—ধ্বনি আর উচ্চারণ হিসাবে তখন দুটো একেবারে আলাদা আলাদা লেগেছিল। উত্তরের ভাষাটি বেশ শ্রুতিমধুর—তালব্য 'চ'কার 'শ'কার বহুল; আর দক্ষিণের ভাষা অতি কর্কশ—'খ' 'হ' এই সব ধ্বনি বড্ড বেশী কানে লাগ্‌ত। এর মত কর্কশ ভাষা খুব কম শুনেছি। চীন দেশের লোকসংখ্যা নাকি চল্লিশ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় গোটা আঠারো ভাষা আছে। অক্ষর বা চিত্রলিপি সমস্ত চীনময় এক, কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ পার্থক্য এসে গিয়েছে। তাতে ক'রে এই দাঁড়িয়েছে যে, চীনা ভাষায় কিছু লিখে দিলে সমগ্র চীনদেশের পড়িয়ে চীনেরা সকলেই সেটা বুঝ্‌তে পার্‌বে, কিন্তু সেই লেখাটা এক প্রদেশের মতন উচ্চারণ ক'রে প'ড়লে অন্য প্রদেশের লোকেরা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। এটা ত গেল চীনা সাহিত্যের ভাষা, সাধু ভাষার কথা। প্রাদেশিক কথিত ভাষার বাক্যরীতিতে আবার নানা পার্থক্য দাঁড়িয়েছে। চীনদেশে পেকিঙ্ অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা আর সেখানকার উচ্চারণ শিষ্ট ব'লে গণিত; শিক্ষিত লোকেরা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা পেকিঙের ধরণে চীনা ভাষা ব'লতে শেখেন। চীনে গণতন্ত্রের শাসকেরা এই "ক্বান হ্বা" বা উত্তর চীনের ভাষাকে এখন সমস্ত রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা ক'রতে চান। কিন্তু এতে নানা অসুবিধা আসছে।

আমাদের দেশে এই অবস্থা কল্পনা করা একটু মুস্কিল। অবস্থাটা কতকটা এইরূপঃ—লেখবার সময় লিখলুম যথাসম্ভব খাঁটি সংস্কৃত, কিন্তু বাঙালী পড়বার সময় তাকে প'ড়বেন বাঙলা প্রতিশব্দ দিয়ে, মারহাট্টী পড়বেন মারহাট্টী প্রতিশব্দ দিয়ে, হিন্দুস্থানী প'ড়বেন হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে। শেষটা চেষ্টা হ'ল খালি হিন্দী প্রতিশব্দ দিয়ে পড়া সংস্কৃত হবে দেশভাষা; আর বাঙলায়, মারহাট্টা দেশে স্থানীয় ভাষা অনুসারে না প'ড়ে এই হিন্দী অনুসারে তাকে প'ড়তে হবে। এত ঝঞ্ঝাটে সাধারণ লোকের চলা অসম্ভব—এক প্রাচীন ভাষাকে খাড়া ক'রে তার দ্বারা কতকগুলি পৃথক্ পৃথক ভাষাকে গেঁথে রাখা এখন আর সম্ভব হ'চ্ছে না—সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে এই ভাষাগত পার্থক্য র'য়েই যাচ্ছে। দূর দূর প্রদেশের অধিবাসী চীনে বাধ্য হ'য়ে এই পার্থক্যকে মেনে নিচ্ছে, আর তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তার দরকার হ'লে, দু'পক্ষেরই "কান হ্বা" জানা না থাক্‌লে অন্য যে-কোনো বিদেশী ভাষা জানা থাকে তাই ব্যবহার করে—যেমন ইংরাজী, মালায়, হিন্দুস্থানী। দক্ষিণ চীনের এক রসায়ণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক এই ভাষা-সঙ্কটে প'ড়ে উত্তর চীনের এক চীনা কলেজে ইংরাজিতে পড়াতে বাধ্য হ'য়েছিলেন শুনেছিলুম। এ হ'চ্ছে বাঙালী আর মারহাট্টীয় ইংরিজীতে আলাপের মতন। এই যাত্রায় আমাকে একবার দুই চীনের মধ্যে দো-ভাষীর কাজ ক'রতে হ'য়েছিল। জাহাজ যখন পেনাঙে পৌঁছল, তখন ডেকযাত্রীদের বোটে ক'রে কোয়ারাণ্টীনে নিয়ে গেল। ক'লকাতায় প্লেগ হয়, পাছে ক'লকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ডেকযাত্রী প্লেগের বীজাণু নিয়ে পেনাঙে নেমে অসুখটা ছড়িয়ে দেয়, সেই ভয়ে যাত্রীদের তিন দিন ধ'রে একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে আটকে রেখে দেয়। যদি

এই তিন দিনের মধ্যে কারু অসুখবিসুখ জ্বরজাড়ী না হয়, তাহ'লে সকলকে ছেড়ে দেয়; অন্যথা প্লেগের আশঙ্কায় আরও লম্বা সময় আটক ক'রে রাখে। এখন পেনাঙে যখন জাহাজ দাঁড়াল, বন্দরের ডাক্তার এসে সব ডেকযাত্রীকে সার দিয়ে দাঁড় করালে, তারপর এক এক ক'রে নাড়ী টিপে, জিভ দেখে, নিজের সামনে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল। তারপর তারা নিজের নিজের গাঁঠ্‌রী মালপত্র নিয়ে তৈরী হ'তে লাগল, কোয়ারাণ্টীনের নৌকায় চ'ড়বে ব'লে। সবাই নিজের মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত। শাঙ্‌হাইয়ের দুজন চীনে তখন কি ক'রবে সে বিষয়ে ঠিক ক'রতে না পেরে, হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য চীনেরা নিজের জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত, আর সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকলেও ভাষার অভাবে এরা কিছু ক'রতে পারলে না। এদের ভাষা কেউ জানে না, কেউ এদের দেখলেও না। কদিন জাহাজে ডেকপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি অনেকের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়েছিলুম—প্রায় সকলের সঙ্গে মুখচেনা আলাপ হ'য়েছিল,—বুড়ো চীনে তার টোল-খাওয়া গাল, রেখাঙ্কিত কপালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চোখ, আর বেশ লম্বা (যদিও সংখ্যায় অল্প ক'গাছি) দাড়িগোঁফওয়ালা সহাস্য মুখে ঘাড় নেড়ে আমায় নীরব সম্ভাষণ ক'র্‌ত। এমন কি তার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তার সঙ্গে আমি কথাও দু' একটা ক'য়েছি, তাতে তার বৃত্তান্ত সামান্য কিছু জানতেও পেরেছি; আর আমার ভাষাতত্ত্বের কেতাবে পড়া দু' একটা চীনে বাক্যও তার উপর প্রয়োগ ক'রেছি—যেমন "নী-ম্যন্ য়ুঙ্ শাঙ্-হাই লাই—তোমরা শাঙহাই থেকে আসৃছ?" আর "থিয়েন হাই হাও—আকাশ আর সমুদ্র পরিষ্কার"।—এই গোলমালে সে আমার দিকে তাকালে। ব্যাপারটা কি হ'চ্ছে, জাহাজ বন্দরে লাগ্‌লে

যে আবার কোয়ারাণ্টীনের হাঙ্গামা হয়, সে সব আমার জানা ছিল না। এমন সময় জাহাজের এক চীনে কেরাণী সেখানে এল। সে আবার দক্ষিণ চীনের লোক, উভয়ের ভাষা জানে না। আমি ইংরাজিতে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—এরা কি ক'রবে? যা যা ক'রতে হবে সে আমায় ব'লে দিলে, আমি তখন অতি কষ্টে হিন্দী ভাষার দ্বারা এদের বুঝিয়ে দিলুম।

জাহাজে অন্য লোক যাদের দেখেছিলুম, এই চীনেদের বাদে—তারা নানা জাতের ছিল। খালাসীরা বাঙালী মুসলমান প্রায় সবাই—দু চারটী অবাঙালী, খুব সম্ভব বিহারী ছিল। পাঞ্জাবী ছিল অনেক—শিখ আর মুসলমান; কতক ফৌজী লোক, কতক পুলিসে কাজ করে সিঙাপুরে, হঙ্‌কঙে, শাঙহাইয়ে,—বাকী সব দরওয়ানের কাজ করে ইন্দোচীনে। সিঙাপুরে তখন ব্রাহ্মণ সিপাহীর পল্টন ছিল, সেই পল্টনের জনকতক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সিপাহীও ছিল। ভোজপুরী আর হিন্দুস্থানী আর কতকগুলি ছিল, এরা মালয় শ্যাম, ইন্দোচীন অঞ্চলে দরোয়ানের কাজ করে। সিন্ধী ব্যবসায়ী চার পাঁচ জন ছিল, এরা যবদ্বীপ আর সুমাত্রার যাত্রী—ঐ সব দেশে ছোটো বড় অনেক ব্যবসায় এরা হাতে নিয়েছে—চাল দাল আটার ব্যবসা অনেকে করে। জনকতক পাঠান, জন দুই আরব, জন দুই মালাইও ছিল। এদের সকলের কথা বারান্তরে ব'লবো।

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কথা ও কাজ।

—:০:—

মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার ধারাবাহিকতা ব্যাপারটা এতই মৌলিক এবং সনাতন যে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতের ব্যাকরণসমূহেও ভাষার সংজ্ঞার কোন অভিনব সংস্করণের প্রয়োজন হয় নি। মানুষের মুখের কথা এবং হাতের কাজের ভিতরে কিন্তু এমনধারা কোনো সহজ পারম্পর্য্য সহসা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন যা কাজ, তার সম্পাদনে কথার আবশ্যকতা হয়ত খুব বেশী নেই। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের জটিলতা মানুষের যতই বেড়েছে, কাজের আগে কথার ভূমিকার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে ততই অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। ডাল ভাত উদরস্থ করা যে এমন একটা অত্যন্ত সোজা কাজ, সেটি করবার আগেও শাস্ত্রমতে 'নিবেদন' অবশ্যকর্ত্তব্য। আর বিবাহাদির মত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হবার পূর্ব্বে যে উভয়পক্ষে লক্ষ কথার বিনিময়ের ব্যবস্থা—সে ত' আমাদের সকলেরই জানা কথা।

যেখানে কাজের আগে কথাবার্ত্তা কিছুই হয় না, সেখানে কাজটা হয়ে পড়ে নিতান্তই দৈবাৎ। মানুষে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নিজ নিজ অবিবেচনা আর অপরিণামদর্শিতা দেবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে। ফলে দৈবের সদর মফঃস্বল দু'পিঠই সমান অন্ধকার। দেবদ্বিজে ভক্তি যতই থাক্, সংসারী মানুষ দৈবাতের পরে

ভবিষ্যতের বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে না। এটা একটা অত্যন্ত আটপৌরে সত্য কথা। যুগে যুগে অনেক শাস্ত্রের বিধি এবং ধর্ম্মের অনুশাসনের ধোপ এর উপর দিয়ে গিয়েছে; কিন্তু এর পাকা রং দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়েই উঠ্‌ছে। মানুষের মনের সহজ অহমিকা তাকে দেবতার সমকক্ষ না হওয়া অবধি কিছুতেই দৈবের পরে একান্ত নির্ভরপরায়ণ হবার-নতি স্বীকার করতে দেয় না। এটা হচ্ছে বিধির বিধি—মানুষের স্বভাব। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ বা বেদাধ্যয়নে এর পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এই কারণেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অনুষ্ঠানের উপক্রমণিকা মন্ত্র না হয়ে, হয়েছে মন্ত্রণা।

কিন্তু মন্ত্রণা ব্যাপারটি যে বিশেষ করে একটা অসমাপিকাক্রিয়া, তা ওর আকারেই প্রকাশ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রে এর এই অসমাপিকা আকার এমন অসাধারণ দ্রুত বেড়ে চলেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে ভরসা হয় অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সকল সমস্যার তাপ এই বিরাট মন্ত্রণার চন্দ্রাতপতলে চিরনির্ব্বাণ লাভ করবে। মুমূর্ষু দেহটাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ঘটোৎকচ যদি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স-শরীরে স্বর্গে চলে' যেত, তাহলে ব্যাপারটা বাস্তবিক যা ঘটেছিল তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আজগুবি নিশ্চয়ই হত না; কিন্তু তাতে কুরুপাণ্ডব কোনো পক্ষেরই কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। তার বিরাট দেহের আকস্মিক পাতনেই শত্রু অক্ষৌহিনীর ধ্বংস সম্ভব হয়েছিল। মন্ত্রণাও যদি শুধু কথার জাল ক্রমাগত বুনে গিয়ে পরিশেষে আপনাতেই আপনি পরিসমাপ্তি লাভ করে, তাহলে যতই সুদীর্ঘ, সর্ব্ববাদিসম্মত এবং বিস্ময়কর হোক না কেন, তা নিতান্তই কথার কথায় পরিণত হতে বাধ্য। উদ্দেশ্যকে সকল

দিক থেকে চাপ দিয়ে শৃঙ্খলিত করে' সাধ্যের গণ্ডীর ভিতরে আনাতেই মন্ত্রণার সার্থকতা। এ কথাটা যেন আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। সমবেতভাবে কোনো কাজের আশু প্রয়োজন হলেই, আমরা চারিদিক থেকে অজস্র মন্ত্রণার জাল বিস্তার করে' অচিরেই সেটীকে লোক-চক্ষুর অগোচর করে' ফেলি। তারপরে জাল গুটানোর সময় হ'লে সবাই অকুতোভয়ে নিজ নিজ কোলের দিকে টানি; এবং জাল নিংড়ে যা পাই, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ কথাসরিৎসাগর।

(২)

ন্যায়শাস্ত্রকারগণের মতে ধোঁয়া নাকি আগুনের অস্তিত্বই জ্ঞাপন করে। কিন্তু রান্নাঘরের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা সবাই জানেন যে, অনেক সময়ে ধোঁয়া বিশেষ করে আগুনের অভাবই জানিয়ে দেয়। যে মন্ত্রণার পিছনে ঐকান্তিক কর্ম্মপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ নেই, তা শুধু আমাদের কর্ম্ম-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে মাত্র। এমনধারা নিরর্থক কথার মাত্রা যতই কমবে, আমাদের সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধন ততই সহজ-সাধ্য হবে। কাজের প্রতি যতক্ষণ না প্রাণের টান আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কথা কাজের কথা হবে না; আর কাজের দায়িত্ব দ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত না হলে, কাজটাকে উপলক্ষ্য করে' কল্পনার আকাশে রঙবেরঙের ঘুড়ি ওড়ানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। অনেক অসাধ্য তখন আমরা সাধন কর্‌ব। কথার তোড়ে নিচুগাছকে ছদ্মবেশী আমগাছ, আর আমগাছকেই প্রকৃতপক্ষে নিচুগাছ প্রমাণ করে দিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না। দরকার হলে দিনকে রাত, রাতকে দিন আমরা মুখের জোরে তখন

করব। এত করেও কিন্তু জমাখরচ খতিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

আত্মারাম সরকারের হাড় ছুঁইয়ে বাজীকর ধুলোমুঠি নিয়ে টাকা বানিয়ে দেয়, একটা থেকে টেনে অনায়াসে দশটা বের করে—কিন্তু পরণের শতগ্রন্থি লুঙ্গি আর গায়ের শতছিদ্র জামা আর তার ঘোচে না। হাতের বদলে ক্রমাগত হাত-সাফাই দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে আমরা ঘরের অশান্তি আর বাইরের অশ্রদ্ধাই দিন দিন বাড়িয়ে তুল্‌ছি। এতদিনে অন্ততঃ এটা আমাদের বোধগম্য হওয়া উচিত যে—যে বিদ্যায় রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া সম্ভব, কর্ম্ম-জগতে তার স্থান নেই। এখানে তেল মাখবার আগেই কড়ি ফেলা চাই—আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সে কড়ির সংস্থান করতে হয়। লক্ষ্মীলাভের আশায় এ ক্ষেত্রে কোন পঞ্চম উপায়ের প্রয়োগ শুধু যে শাস্ত্রবহির্ভূতই হবে তা নয়, জাতীয় প্রকৃতির উপরে তার প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী।

মামুদ ঘোরীর সিন্ধু পার হবার বহু পূর্ব্বেকার সেই সুদূর অতীত যুগের সমাজ, যার নিষ্ঠা এবং আদর্শের গৌরব এবং গর্ব্ব আমরা আমাদের পুরুষ-পরম্পরাগত সহজ উত্তরাধিকারহিসাবে অঙ্গীকৃত করে' সময়ে অসময়ে পরম পুলক প্রকাশ করে' থাকি—সে সমাজে পুরুষকারই ছিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। এবং এই কারণেই বোধহয় তখনকার মানুষের হাতের অস্ত্রের মত তাঁদের মুখের কথারও প্রত্যাহার ছিল না। কথার জন্য তখন রাজ্যত্যাগ, পুত্রত্যাগ, সংসার ত্যাগ সম্ভব হত। আর এখন আমাদের আদর্শ হয়েছে—শতং বদ একং মা লিখ। আইন আদালতের ভয় না থাকলে আমরা মনে মনে যে আদর্শটিকে মেনে চলি, তাকে শাস্ত্রীয় আকার দিলে—শত শতং

বদ শতং লিখ, একং মা কুরু—এইরকমই হয়ত দাঁড়ায়। এই 'মা কুরু'র বীজমন্ত্রেই আমাদের সমস্ত কথাকে সত্যমিথ্যানির্ব্বিচারে নিরর্থক করে দিয়েছে। অর্জ্জুনের রথের সাম্‌নে বসে' অশ্বরশ্মি মাত্র হাতে, কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঝড়ঝাপ্‌টা বুক পেতে না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার যথারীতি আবৃত্তিতে অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করে' রেখে, দারুককে ডেকে নিজের রথ আনিয়ে শিঙা ফুঁকে দ্বারকায় চলে যেতেন, তাহলে তাঁর সেই সারগর্ভ বক্তৃতাও অর্থহীন প্রলাপেই পর্য্যবসিত হত। দ্বৈপায়ণ ঋষি কষ্ট করে সে গীতাভিনয় সঙ্কলিত এবং লিপিবদ্ধ করলেও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নামে তাকে নিশ্চয়ই অভিহিত কর্‌তেন না।

আমরাও কর্ম্ম-জগতে বহুদিন ধরে গীতাভিনয়েরই চর্চ্চা করে' আস্‌ছি। যুদ্ধে বাক্‌পটুতা এবং সভায় বিক্রম প্রকাশ, এ সবও ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। কথার মাত্রা হিসাবে মাঝে মাঝে আমাদের যে-সব অঙ্গসঞ্চালন, তাতে শুধু আমাদের কর্ম্মশক্তির নগ্ন দারিদ্র্যই ফুটে উঠ্‌ছে। রবাহূত হয়ে কাজ যতবারই আমাদের দুয়োরে এসেছে—অতৃপ্ত ফিরে গিয়েছে। অভিনয়ের আবেগে বহু আড়ম্বরে সর্ব্বস্ব পণ করে' দেবার বেলায় দিয়েছি আমরা শুধু তাকে আমাদের মাথার'পরের কর্ম্মবৈমুখ্যের বোঝাটিকে ঘুরিয়ে বসানোর ভার। সদাসতর্ক মন আমাদের কালের ইঙ্গিতে অনিশ্চিত কল্যাণের দিকে পা না বাড়িয়ে, সমধিক আগ্রহে সুপ্রতিষ্ঠিত জড়তাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে আছে প্রাণপণে। এই জাগ্রত আবিষ্টতার ফলে জাতীয় বা সামাজিক যত কিছু আমাদের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সবই হয়েছে মৃত-জাত বা জীবন্মৃত।

(৩)

কর্ম্মপরিচয়ে আমাদের এই যে অচল অধম দশা, এটাকে ঘর এবং পরের কাছ থেকে সর্ব্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন রাখ্‌বার জন্যেই আমরা যখন-তখন মুখে মুখে মোহমুদ্গর পরিচালনা করে থাকি। কিন্তু এতে ক'রে আমাদের মুখ ব্যথা হওয়া ছাড়া আর কোনই ফল হয় না। জাতিকে তার নিজস্ব প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে কর্ম্মপ্রেরণা, সমাজকে আমাদের আদর্শের দিকে উন্মুখ করে তুল্‌তে যে আন্তরিকতা নইলে নয়—তার সন্ধান যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের ভিতরে না পাব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সব কথা এবং কাজই মিথ্যা বৃথা ছলনা মাত্র হবে। রূপহীন যে, সে মুখে চুণ ঘস্‌লেও লোকে হাস্‌বে, কালি মাখ্‌লেও কেউ মুগ্ধ হবে না। ও উভয়বিধ অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সেই ত্যাগই হবে আমাদের মুক্তিপথের প্রথম সোপান।

শুদ্ধমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানবশেই আমরা মনে করি আমরা আমাদের সমাজকে এবং জাতিকে চিনি ও জানি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞান-লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, যেখানে সামাজিক বাঁধন অত্যন্ত শিথিল বলে' আমাদের অনেকের ধারণা—সেখানে সামাজিক হিত-সাধনের জন্য অসংখ্য কর্ম্মীসংঘ নানা দিকে নানা কাজে সদাই ব্যস্ত। এম্নি করে' কাজের ভিতর দিয়েই সে-সব দেশে সমাজের সর্ব্বস্তরের ভিতরে জানাশোনা, সহানুভূতি এবং প্রাণের পরিচয় ঘটে। আর আমাদের দেশে?

অতীত যুগে যখন অন্নসমস্যার প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয়ুপরিমাণও দিন দিন ক্ষীণ এবং ক্ষীণতর হতে সুরু হল, খুব সম্ভব

তখনই আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রাকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে বাধ্য হয়ে অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত অর্দ্ধেক হচ্ছে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ঐ দুই আশ্রমের কাজই ছিল স্বতঃ পরতঃ সমাজের হিতসাধন—নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের সামাজিক জীবনে তখন ভাঁটা পড়ে এসেছে। যাকে কালোপযোগী আকার দিয়ে, গার্হস্থ্য সংস্করণে পরিণত করে', সমাজের অঙ্গীভূত করে' ধরে রাখা উচিত ছিল, আমরা তাকে নির্ব্বিবাদে বিদায় দিয়েছি। সেই থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বিধিব্যবস্থা আমাদের সমাজ শাস্ত্রেত নেই-ই, বরং পরের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়ানোর প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে ঢুকেছে।

আমাদের মনের অভিধানে 'সমাজ' 'জাতি' এ সব শব্দের অর্থের ঠিক সেইধরণের আকৃতি এবং বিকৃতি ঘটেছে, যে ধরণের বিকৃতির ফলে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় পরিবার মানে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী। সামাজিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার একান্ত অভাবের ফলেই আমাদের ভিতরে এ সব সঙ্কীর্ণতা এসেছে। কথার ফুৎকারে এ অপসারিত হবার নয়। 'সমাজ' এবং 'জাতি'র বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ এবং জাতি রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের শুধু কর্ম্মের ভিতর দিয়েই হওয়া সম্ভব। আর সে পরিচয় সংসাধিত হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে কথার প্রয়োজনীয়তাও অনেকাংশে অন্তর্হিত হবে। কারণ সমাজের পিঠে গুরুগিরি ফলানোর প্রবৃত্তি, অথবা সমাজের পক্ষে ওকালতি করবার উৎসাহ, এ দুইই তখন নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে পড়বে। তখন সমাজ হবে সজীব—আমাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সেও স্বরূপে ফুটে উঠবে

স্বতঃই। তখন আমাদের সমাজ হবে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ভালোমন্দের সম্মিলিত নিদর্শন।

এখন আমরা সমাজের ভিতরে থেকেও সমাজছাড়া; জাতি হয়েও জাতিহীন। সমাজের সঙ্গে সহজ সরল সহানুভূতি এবং নিত্য অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করবার মত কর্ম্মপ্রবণতা সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব মধ্যে বিরল। এর ফলে যখনই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবন-যাত্রার বিরোধ ঘটে, তখনই হয় আমরা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানাপ্রকার প্রলাপের প্রলেপ দিয়ে বিরোধের ব্যথা চেপে রাখি, নয় ত বিদ্রোহ করি—সমাজকে হাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে আমরাও গিয়ে হোটেলে ঢুকি।

নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের একটা সহজ অধিকারের আনন্দ বা দায়িত্ববোধ—একটা মমতা থাকেই। কিন্তু এ মনোভাবের সম্যক বিকাশ নিশ্চয়ই চর্চ্চাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজের প্রতি যে আমাদের মমতাবোধ, সেটাও খুব সম্ভব চর্চ্চার অভাবে আমাদের মনোবৃত্তির ভিতরে সম্যক্ পরিণতি লাভের সুযোগ পায় না। এই কারণেই সমাজের ভালোমন্দের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ না হ'লেও অনেকটা উদাসীন। সামাজিক কোনো অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত আমাদের গা-ঘেঁসে না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অত্যন্তই নির্লিপ্তধরণের হয়ে থাকে। তাতে আমাদের সৎবুদ্ধির পরিচয় যতই থাক্, সমবেদনার ছাপ প্রায়ই থাকে না।

কিছুদিন আগে স্নেহলতার আত্মাহুতিতে আমরা অত্যন্ত বিচলিত

হয়ে পড়েছিলাম। গদ্যে পদ্যে অনেক লেখালিখি হয়েছিল, সভাসমিতিও হয়েছিল বিস্তর। এবং তাতে দেখা গিয়েছিল পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকেই আমরা শতমুখ এবং সবাই আমরা একমত। কিন্তু একমত হয়ে আমরা করেছি কি? নূতনত্ব চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে ও-সব ব্যাপারকে একটী নতুনতর দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের দলভুক্ত করে' দিয়ে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেছি। এম্নি ধারা কর্ম্ম-বিমুখতার দরুণ আমরা ক্রমশঃ নিজেদের কাছেই নিজেরা ঝুঁটা বনে' গিয়েছি। আমাদের তথাকথিত ভাবপ্রবণতা, বাক্-প্রবণতার ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্রমে হুজুগ্‌প্রিয়তায় পরিণত হয়েছে।

(৪)

আমাদের কথার সঙ্গে কাজের অসহযোগ এবং বৈসাদৃশ্য যে কত বেশী, তা আমাদের কথা-সাহিত্যের সঙ্গে কর্ম্ম-সংহিতার তুলনা করলেই ফুটে উঠবে। মুখে মুখে আমরা ললিতা সুচরিতা দত্তা পরিণীতার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করি, আর কাজের বেলায় নিজের ঘরের খুকী দশ বছরে পা দিতে না দিতেই আমাদের আহার কমে যায়, নিদ্রা ঘুচে যায়—আমরা তাকে পাত্রস্থ করবার চেষ্টায় প্রাণপণ করি। যে পরিমাণ চেষ্টা আমরা বাধ্য হয়ে 'কন্যাদায়' হ'তে মুক্তি পাবার প্রয়াসে ব্যক্তিগত ভাবে করে থাকি, তার সিকির সিকিও যদি আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমবেত ভাবে 'বরপণে'র উৎপীড়ন থেকে সমাজকে মুক্ত করবার চেষ্টায় ব্যয় করতাম, তাহলে সমাজের অনেক সমস্যার উপরেই হয়ত মীমাংসার আলো এসে পড়ত। কিন্তু তা'ত হবার নয়। ললিতা সুচরিতা ওঁরা কথা-সাহিত্যের পটেই আঁকা থাক্‌বেন—কাজের বেলায় 'গৌরীদান'ই হবে আমাদের লক্ষ্য।

সব বিষয়েই ঐ এক কথা। আমাদের জীবনের, সমাজের যে সব সম্ভাবনাকে সাহিত্যপ্রতিভা আকার দিয়েছে, আমরা সেগুলোকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে কল্পলোকে অন্তরিত করে' সেখানেই তাদের যথারীতি পূজার ব্যবস্থা করেছি। কথাসাহিত্য আমাদের কাছে উপকথায় রূপান্তরিত হয়ে শুদ্ধ অবসরবিনোদনের উপাদানেই পরিণত হয়েছে। তার ইঙ্গিত এবং প্রেরণা আমাদের মৌতাতের খোরাক যোগায় মাত্র—কর্ম্মের উদ্দীপনা ভুলেও জাগায় না। "ম্যাট্‌সীনি-লীলা" চিরদিনই আমাদের কাছে "সরেস" থেকে যায়।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শোনা যায়, আমাদের কথা-সাহিত্য নাকি ক্রমশঃই অ-জাতীয় হয়ে উঠছে। এ অভিযোগের মূলে অনেকখানি সত্য আছে। যে সমাজে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, গোত্র, গোষ্ঠি, আরো কত কি, এবং সর্ব্বশেষে কোষ্ঠির মিলামিল যোগাযোগ না হ'লে স্ত্রী-পুরুষের মিলন অসম্ভব বা অবিধি, সেখানে জাতীয় ধারায় কথা-সাহিত্যের প্রসার যে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, সে কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু যথাবিধি ঘটকের মুখে নায়িকার রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি এবং ঘরবাড়ী সব জেনেশুনে সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা উপন্যাসের নায়ক হিসাবে কি যে করতে পারি, তা'ত কবি-গুণাকর সবিস্তারেই লিখেছেন। ও-দিকে আমাদের সামাজিক জীবন এমন বৈচিত্র্যহীন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমাদের সাহিত্য অন্য কোনো দোষাশ্রিত না হলেও পুনঃপুনঃ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবেই।

আসল কথা, আমাদের জাতীয়-জীবন খুব সম্ভব এখনও সৃষ্টির অপেক্ষা করে' রয়েছে। যা আছে সেটা হচ্ছে জাতীয় জড়তা;

অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত জাতীয়তার দোহাই ব্যাপারটা আমাদের কৃতিগত জড়তার ওজর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহিত্যের রস-সংগ্রহে আমরা আরব, পারস্য থেকে সুরু করে' সুদূর নরওয়ে, সুইডেন্ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজ দেহে সাহিত্যের রসায়ণের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা সদাই সন্ত্রস্ত। অনুপানে আমাদের বিশেষ আপত্তি নেই, বরং যথেষ্ট আগ্রহই আছে; কিন্তু ওষুধ আমাদের ধাতে কিছুতেই সইবে না। এ আমরা আগে থেকেই জেনে বসে' রয়েছি। এ সর্ব্বজ্ঞতার মূলে কিন্তু বিন্দুমাত্রও কৃতকর্ম্মের অভিজ্ঞতা নাই—আছে শুধু আমাদের বহু যুগের জেরটানা জড়তা।

এমনধারা সর্ব্বজ্ঞতার সতর্কতা কর্ম্মজগতে আমাদের সর্ব্বতোমুখী জড়তারই অন্যতর উপসর্গ। প্রকৃতির রাজ্য যে এমন অচঞ্চল নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধা—সেখানেও ত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অমন কত শতই হচ্ছে। সে-সব যদি প্রাকৃতিক মহানিয়মের ব্যতিক্রম না হয়ে অন্তর্ভূক্ত এবং অনুবর্ত্তীই হয়, তবে কর্ম্মের পথে আমাদের যে সব ভুল-ভ্রান্তি, স্খলন-পতন, ত্রুটী-বিচ্যুতি, সে সবও আমাদের সাথের সাথী বলেই মেনে নিতে হবে। ভগীরথের যে এত স্তবস্তুতি, এত সাধ্য-সাধনা, এত পুণ্যের জোর,—তবুও ত স্বর্গমন্দাকিনী সগর-বংশের ভস্মাবশেষের উপর সরাসরি এসে নামেন নি; অনেক চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে, অসংখ্য বাঁক ঘুরিয়ে, বহু ফাঁড়া কাটিয়েই তাঁকে আনতে হয়েছিল।

আমাদেরও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বোঝাপড়া করতে করতেই জাতীয় ভবিতব্যতায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত বাক্‌প্রবণতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসবে

সন্দেহ নেই; কিন্তু তখনই আমরা আমাদের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতার সন্ধান পাব। আজ যে-কথা আমাদের ভালো লাগে, তখন তা আমাদের ভালো করবে। আন্তরিকতার আলোতে কথার হাওয়া থেকে তখনই আমরা গঠনের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারব। শুদ্ধ তখনই আমাদের মন, আমাদের আশা, আমাদের কাজ, আমাদের ভাষা, ভগবানের বরে সত্য হয়ে উঠবে।

শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত।

বাঙ্গালীর কবিত্ব।

——ঃঃ*ঃঃ——

কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ইউরোপের জনৈক মনীষী বলিতেছেন যে, কবিতা চিত্তাবেগের রাগে রঞ্জিত চিন্তা। অবশ্য কবিতার এই ব্যাখ্যাটি যে খুব সূক্ষ্ম বা গভীর, তাহা আমি মনে করি না। তবে আপাততঃ এটি গ্রহণ করিতেছি এবং এই কথা দিয়াই আমার আলোচনা সুরু করিতেছি এই জন্য যে, তাহাতে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। কারণ আমি বলিতে চাই, বাংলার কাব্যে চিন্তাসম্পদের বড় মহিমা নাই, সেখানে যাহা আছে তাহা চিত্তাবেগের প্রাচুর্য্য—বাংলার নিজের এক কবির কথায়, "প্রাণেরই প্রচুর স্পন্দন রে"। ফলতঃ, যদি বলা যায় বাংলা কবিতা মূর্ত্ত ভাবমত্ততা বা ভাবোন্মত্ততা, তবে বিশেষ অন্যায় হইবে না—কথাটা কেবল দোষের হিসাবে আমি বলিতেছি না, গুণের হিসাবেও বলিতেছি। বাংলার কাব্যসৃষ্টির আসল গোড়াপত্তন হইয়াছে ভক্তদের—প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ভক্তদের হাতে। পদাবলীর সুরই বাংলার কবিতার প্রধান সুর। বাঙ্গালীর আদি কবি চণ্ডীদাস যে তান দিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূর্চ্ছনা আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর কাব্যজগতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাংলার কীর্ত্তন, বাংলার বাউল যে বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব সম্পদ, তাহাও বাঙ্গালীর রসানুভবের ও রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটিকেই ধরিয়া দেখাইতেছে। সে বৈশিষ্ট্য কি? না

প্রাণের উদ্বেগ উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের তীব্র ভাবালুতা, সুকুমার মর্ম্মের কেমন অন্ধ একাগ্র তন্ময়তা।

এমন জিনিষটি পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। আমার চোখে ত পড়ে না, নির্জ্জলা ভাবাবেগ দিয়া কোথায় এমন একটা কাব্যজগতই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে মেনান্দের (Menander) ও লাতিন সাহিত্যে কাতুল্ল (Catullus) ছিলেন; ফরাসীর রঁসার (Ronsard), জর্ম্মনীর হায়েন (Heine) ও ইংরাজের বর্ণ্‌স্‌ (Burns) বা কিয়ৎপরিমাণে শেলীর (Shelley) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই খুব তীব্র একটা ভাবোল্লাস বা lyric enthusiasm ছিল, সন্দেহ নাই। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেকানেক কবির মধ্যে যে এই জিনিষটি অল্পবিস্তর পাওয়া যায় না, এমনও নয়; কিন্তু মোটের উপরে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখি এই ভাবোল্লাসকে শৃঙ্খলিত সুসংহত সুষীম করিয়া রাখিয়াছে আর একটা বৃত্তি, একটা চিন্তাশীলতার সবল রেখা—সে চিন্তা অবশ্য শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত তর্কবুদ্ধিজাত নাও হইতে পারে, তাহা হয়ত হৃদয়াবেগের স্পর্শে জাগরিত আন্দোলিত আর এক ধরণের জ্ঞানভূমি; তবুও তাহাতে পাই একটা সজাগ সমর্থ বুদ্ধিরই আভাস, মনে হয় হৃদয়াবেগ সেখানে মস্তিষ্কেরই একটা ঊর্দ্ধতর প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ রূপান্তরিত হইয়া সুঠাম অর্থপূর্ণ স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রেরণা যেন হৃদয়ের প্রাণের স্তরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, এই স্তরে আবদ্ধ থাকিয়া শুধু এই স্তরেরই গভীরতর অন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; মস্তিষ্কের অপেক্ষা ও অন্বয় তাহাতে কিছু

নাই, তাহাতে আছে একান্ত চিত্তাবেগেরই অন্বীক্ষা ও অন্বয়। তাই বাঙ্গালীর কবিত্ব যেন স্রোতের মত কোমল, তরল, নিত্যগতিময়; কোন মুহূর্ত্তে কোনরকম কাঠিন্য বা স্থৈর্য্য সে লাভ করে নাই।

শেক্সপীয়রের এই গীতিকবিতাটি আমাদের সকলেরই হয়ত জানা আছে—

Take, Oh! take those lips away,
That so sweetly were forsworn,
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn:
But my kisses bring again,
Bring again—
Seals of love, but seal'd in vain,
Seal'd in vain!

ইংরাজী সাহিত্যে এটি sheeer lyricism-এর পরাকাষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এখানেও ভাবমত্ততার সাথে সাথে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া নাই কি, মস্তিষ্কের মধ্যে পৃথক একটা চিন্তারও আন্দোলন, এলিজাবেথীয় যুগের নিজস্ব একটা কারুকল্পনার লাস্য? অথবা শেলীর এই মর্ম্মোচ্ছ্বাস—

I fear thy kisses, gentle maiden,
Thou needest not fear mine!
My spirit is too deeply laden
Ever to burthen thine.

এখানে অনুভব হয় যেন সকল চিন্তাবৃত্তি মস্তিষ্কের গতি এক প্রকার স্তব্ধই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও, শুনুন এবার একটু আমাদের বৈষ্ণব কবিদের বাণী—

বঁধুয়া! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥

অথবা,

সখিরে! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥

এখানে আমরা একেবারে হৃদয়ের রসের কূপে ডুবিয়া গিয়াছি, এখানে যে আবেগে আচ্ছন্ন আমরা, তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির কোন রশ্মির এতটুকু প্রবেশপথ নাই, মর্ম্মের কোন নিগূঢ় একতারায় এখানে ঝঙ্কার দিতেছে মর্ম্মেরই আদিম সুরটি, এখানে শুনি শুধু হৃদ্‌পিণ্ডেরই তালে তালে মন্দ্রিত এক অনাহত নাদব্রহ্ম।

ইহাই বাঙ্গালীর কবিত্বের বনিয়াদ, আর ইহাই যেন চির-কালের জন্য বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছে বাঙ্গালীর কবিত্বের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম। আধুনিক বাংলার কবি-চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্রনাথও মূলতঃ এই বৈষ্ণবভক্তদিগেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব—এবং হয়ত অনেকখানি তাঁহারই কল্যাণে আধুনিক বাংলারও বিশেষত্ব এইখানে যে, পূর্ব্ববতন কবিদের স্বভাবসিদ্ধ একমুখী চিত্তাবেগ এখন বহুবিধ চিন্তার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বিচিত্র ও প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তবুও একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সত্ত্বেও, আধুনিক কালধর্ম্মের প্রভাব সত্ত্বেও, বাংলার চিন্তা ও চিত্ত

মিলিয়া মিশিয়া এখনও সে নিবিড় রসায়ন তৈয়ার করিতে পারে নাই, যাহা কাব্যের কবিত্ব; এখনও যেন মনে হয় ঐ দুইটি বস্তু তেল ও জলের মত বাঙ্গালীর কাব্যে পাশাপাশি থাকিয়াও আলাদাই রহিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই। বঙ্গীয় কবির চিত্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে হয়ত চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না; প্রাণকে জ্ঞানের মধ্যে উঠাইয়া কি প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া ধরিতে হয়, সে রহস্যের সন্ধান বাংলার কবিপ্রতিভা এখনও পায় নাই। আর দ্বিতীয় পথ যে, চিন্তাকে চিত্তের স্তরে নামাইয়া আনা, চিত্তের খোরাকরূপে ধরিয়া দেওয়া—তাহা কথঞ্চিৎ বাঙ্গালীর স্বভাব ও স্বধর্ম্মের অনুকূল হইলেও, সেখানেও সম্যক সিদ্ধিলাভ সে করে নাই। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বাঙ্গালী কবি যাহা করিতেছে তাহা প্রধানত চিন্তাকে আবেগের রঙে একটু রঙীণ করিয়া ধরা, মস্তিষ্ককে একটা প্রাণের বাহ্য আবরণ পরাইয়া দেওয়া, অথবা আবেগস্রোতের মধ্যে বিসদৃশ চিন্তারাজি ছড়াইয়া দেওয়া।

বাঙ্গালীর কাব্যে তাই দেখি দুই দিক হইতে দুইরকমের অকবিত্বের ছায়া বা রসভঙ্গের দোষ স্পর্শ করিয়াছে। এক, যখন একান্ত ভাবাবেগে সে চলিয়াছে বটে কিন্তু ভাবস্থির হইতে পারে নাই, তখন গভীরে যাইতে না পারিয়া উপরের ভাসা ভাসা চাঞ্চল্যে সে উদ্বেগ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কাব্য হইয়া পড়িয়াছে কেবল বাগাড়ম্বর (Rhetorical); আর যখন সে তাহার সৃষ্টিতে চিন্তাবস্তু কিছু দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতিশাস্ত্র (Didactic)। বাঙ্গালীর কবিত্ব বেশীর ভাগ—বিশেষতঃ আধুনিক যুগে—দেখি এই দুই প্রান্তের দুই অতিমাত্রার মধ্যে দোল খাইয়া

চলিয়াছে। তবে এই উভয় ভঙ্গীরই মূলে রহিয়াছে বোধহয় এক জিনিষ—চিন্তাকে কাব্যরসে ভিজাইবার, পরিপাক করিবার অসামর্থ্য। এই অসামর্থ্যকেই পূরণ করিয়া লইবার ব্যস্ততায় পড়িয়া বাঙ্গালী কবি হয় একদিকে চিন্তাকে ঠেলিয়া রাখিয়া কপট অন্তঃসারশূণ্য আবেগে কেবল শব্দজাল তৈয়ার করিয়াছে, নতুবা অন্যদিকে মস্তিষ্ককে অত্যধিক খাটাইয়া চিন্তাকে ফলাইতে গিয়া শুধু তত্ত্ব-কথা শুনাইয়াছে।

বাঙ্গালীর কবিত্ব সার্থক হইয়াছে তখনই, যখন চিন্তার বা মস্তিষ্কের কথা তাহার আদৌ মনে পড়ে নাই, সেদিকে কোন লুব্ধ-দৃষ্টি দেয় নাই বা কষ্টপ্রয়াস করে নাই; পরন্তু সহজ অনুভবের একান্ত আবেগে চলিয়া যখন সে সৃষ্টি করিয়াছে ভাবময়, ভাববিগলিত চিন্তা (vital thoughts)—বৈদিক ঋষির ভাষায় যাহার নাম মরুৎ-বাহিনী—যতক্ষণ তাহার চিন্তা চিত্তাবেগেরই শ্রবণ এবং উৎসেচন। এই ভাবুকতা যতক্ষণ আপন গণ্ডী পার হইয়া যায় নাই, চলিয়াছে একটা সঙ্কীর্ণ খাতে, একটা বিশেষ অনুভবের ধারায়—তদবধি সেই সঙ্কীর্ণতার তীব্র তন্ময়তার জোরেই তাহা পাইয়াছে একটা নিবিড় গভীরতা, একটা প্রগাঢ় উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে এই যে উচ্ছ্বাস—

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞিও সে অবলা নাম—

এই অন্ধ ভাবমুগ্ধতা চিন্তাবৃত্তির কাছেকিনারায় দিয়াও যায় নাই, তর্কবুদ্ধির সকল ব্যাকরণ একটা দুর্ব্বার আবেগে হেলায় ভাসাইয়া দিয়াছে; অথচ কি এক একাগ্র তীব্রতার তীক্ষ্ণতার ফলে দেখি সে

অনুভব কেমন প্রায় চক্ষুষ্মান জ্ঞানভাস্বরই হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের আছে একটা উপলব্ধি। জ্ঞানের আছে সাক্ষাৎ দৃষ্টি, আর ভাবের আছে সাক্ষাৎ স্পার্শ—উভয়ই অপরোক্ষ উপলব্ধি। বঙ্গীয় কবির মধ্যে ঋষির উজ্জ্বল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি তেমন নাই, আছে ভাবুকের ও মরমীর অপরোক্ষ স্পার্শালুতা।

কবিত্বের এই যে দুইটি উৎস, ইহাদিগকে ধরিয়া দুই প্রকারের কবিতা সৃষ্ট হইয়াছে। কবিতায় আমরা যাহাকে বলিলাম এক জ্ঞানের ধারা আর এক ভাবের ধারা, ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজ্ (Coleridge) তাহারই নাম দিয়াছিলেন masculine ও feminine poetry—পুরুষালী ও মেয়েলী কবিতা। আধুনিক যুগে প্রায় সর্ব্বত্রই দ্বিতীয় রীতিটিরই প্রাদুর্ভাব দেখি বেশী। যাহাকে আজকাল আমরা বলি মিস্‌টিক্ কবিতা তাহা ইহারই রকম ফের। যাহা হউক, নিছক প্রথম ধারার যে কবিতা—অর্থাৎ যে কবিতার রস ভাবলাস্যে নয় কিন্তু চিন্তাসামর্থ্যে, মাধুর্য্যে ততখানি নয়, যতখানি শক্তির ব্যঞ্জনায়,—তাহার সহিত তুলনা করিলে বঙ্গীয় কবিতার বিশেষত্বটি আরও স্পষ্ট হইবে। পাশ্চাত্যের গোটে বা সোফোক্লিস্ কিম্বা প্রাচ্যের মহাভারতকার বেদব্যাসের সৃষ্টিতে (বা তামিলখণ্ডের তিরুবল্লুবরের মধ্যে) পাই যে অর্থগৌরব, যে তপঃপ্রভা, যে একটা কাঠিন্য, তাহা বাংলার নরম মাটিতে ভিজা হাওয়ায় বিকশিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনে যে একটা সংহত প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম, অথবা বিবেকানন্দের দুই চারিটি কবিতায় যে সবল মস্তিষ্কের কিছু আভাস পাইয়াছিলাম, তাহা বাঙ্গালীর কাব্যপ্রতিভায় আপনার বস্তু হইয়া উঠিল কই? বাঙ্গালীর যতটুকু ছাঁকা কবিত্ব, তাহা ফুটিয়াছে

কেবল বৈষ্ণব কবিতায় ও বৈষ্ণব-ভাবের কবিতায়। * বাঙ্গালী কবি তাহার এই সঙ্কীর্ণ রসাল-চিত্তকে যখনই উদার ও বহুমুখী করিয়া ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছে, অথবা তাহাতে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছে চিন্তা-জগতের বৈচিত্র্য, তখনই তাহার কাব্য দেখি বেশীর ভাগ হইয়া পড়িয়াছে পদ্য—তরল বা উচ্ছল বিবৃতি, নাই যাহাতে ইন্দ্রজাল, নাই যাহাতে কবি কীট্‌সের সেই "magic casements"-এর কোন আভাস।

বাঙ্গালীর কাব্যে এই যে বৈষ্ণব-সুরের কথা আমরা বলিলাম, একটু বৃহত্তর অর্থে তাহাই গীতিকাব্যের সুর। ফলতঃ, বাঙ্গালীর চারুসাহিত্য বিশেষভাবে গীতিকাব্যেরই সাহিত্য, এরূপ বলা অত্যুক্তি নয়। বৃহৎ বিচিত্র আয়তন লইয়া একটা সৃষ্টি, স্থাপত্যের বিশাল জটিল সৌন্দর্য্য বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, তাহারও কারণ ঠিক এইখানে। আমাদের দেশে নাটকের যে একান্ত অভাব, তাহা আজকাল সকলেই একরকম স্বীকার করিতে প্রস্তুত। উপন্যাসেরও অভাব বড় কম নয়। আমি অবশ্য বলিতেছি নাটকের মত নাটক, উপন্যাসের মত উপন্যাসের কথা, শেক্স্‌পীয়র ও বাল্‌জাকের সৃষ্টির মত সৃষ্টি। বাঙ্গালীর নাটক যাহা আছে, উপন্যাস যাহা আছে, তাহা তখনই এবং ততটুকুই সত্য ও সুন্দর হইয়াছে, যখন ও যতটুকু তাহা গীতিকাব্যের প্রেরণায় চলিয়াছে। বাঙ্গালীর বৃহত্তর কাব্য সম্বন্ধেও

---

* বৈষ্ণব-ধারা ব্যতীত বাঙ্গালীর কাব্যে আছে অবশ্য শাক্ত-ধারা—কিন্তু এই পার্থক্য প্রধানতঃ বিষয়গত, উভয়ের ভঙ্গী বা মূলসুর একই। শাক্তের ভক্তি ও বৈষ্ণবের প্রেম, দুইয়েরই উৎস অভিন্ন—তাহা বৈষ্ণবী ভাব বলিলে অন্যায় হয় না।

এই কথা খাটে। ইদানীন্তন কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, ইঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা কতদূর প্রযোজ্য, তাহাও দেখিবার বিষয়।

বাঙ্গালী বিশেষভাবে ভক্তিমার্গের সাধক, জ্ঞানপন্থী সে সহজে হইতে চাহে না বা পারে না। ভক্তি-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভাকে সঙ্কীর্ণ ও তীব্র করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশাল ও বিচিত্র করিতে পারে নাই। বিশালতা ও বৈচিত্র্য জ্ঞানের দান। ভাবাবেগ বা অনুভবের ধর্ম্ম এই যে, একসঙ্গে সে বহুদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—পতঞ্জলির কথায়, এক সময়ে চোভয়ানবধারণম্, এক সময়ে তাহার দুইটি জিনিষের উপর অভিনিবেশ হয় না। এ কাজটি জ্ঞানের কাজ, বুদ্ধির কাজ। মস্তিষ্কই সেই কেন্দ্র, যাহা একসূত্রে বহুল বিচিত্র অনুভবকে সংগ্রথিত করিয়া রাখে। বুদ্ধিশক্তি, চিন্তাশীলতা সহজেই আনিয়া দেয় একটা শান্ত উদাসীনতা, উদার অপক্ষপাতিতা, একটা দ্রষ্টার ভাব,—যাহার কল্যাণে পুরুষ একাধিক এবং পরস্পরবিরোধী বস্তুরাজির উপর একসঙ্গে সমান মনঃসংযোগ করিতে পারে। ঠিক এই বৃত্তিটির উপর বাঙ্গালী কবির তেমন অধিকার নাই বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে বৃহত্তর কাব্য, নাটক, উপন্যাস গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সকল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বহুতর ও বিবিধ দেশ কাল ও পাত্রের সহিত সমান পরিচয় ও সহানুভূতি, নানাবিধ ভাবধারাকে, তাহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া,—শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নয়, সুস্পষ্ট ফুটাইয়া তুলিয়া,—একটা বৃহৎ দৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা আছে সচল মস্তিষ্কের,—বাঙ্গালীর স্বাভাবিক একরোখা ভাব-বিহ্বলতা সে ক্ষমতার অন্তরায়।

সচল মস্তিষ্কের রাসায়নিক প্রতিভা কি বাঙ্গালী কবি অর্জ্জন করিতে পারিবে না? এই প্রতিভা কি তাহার প্রকৃতির মধ্যে, অন্ততঃ সুপ্ত চেতনায় কোথাও নাই? বাঙ্গালী ভক্তিমার্গী, জ্ঞানমার্গী নয়, তাহা আমি বলিয়াছি। বাঙ্গলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যেরই আবির্ভাব হইয়াছে, শঙ্করের আবির্ভাব হয় নাই। সত্য কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ? ধর্ম্ম-সাধনায় এই যুগলপ্রতিভা যে অভিনব সুর বাঙ্গালীর চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কাব্য-সাধনাতেও তাহারই অনুরূপ সুর একটা প্রকট হইয়া বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

---

* প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা ধারণা হইতে পারে যে, আমি বুঝি বলিতেছি বাঙ্গালীর চিন্তা বা বুদ্ধি-স্থানে একেবারে শূন্য। তাই এই কথাটি এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার বক্তব্য বিশেষভাবে কেবল কাব্য-সৃষ্টি লইয়া। তা ছাড়া, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক বা চিন্তাবৃত্তি যে কোথায় খেলিয়াছে, তাহা কি ধরণের ও কি দরের, সে কথা বারান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিব।

গাছ।

গাছের বুদ্ধি।— গাছের যে প্রাণ আছে তা আগেই বলেছি —কিন্তু বুদ্ধি আছে কিনা? বুদ্ধি টের পাওয়া যায় কাজে। গাছে যে সব কাজ করে, তা বুদ্ধির কাজ কি না?

চুম্বক লোহাকে টানে, কিন্তু তাতে চুম্বকের কোনই লাভ নেই— কাজেই লোহাকে টানা চুম্বকের বুদ্ধির কাজ নয়; চুম্বকের বুদ্ধি নেই। কিন্তু পিঁপড়ে যে ভাত টেনে নিয়ে যায়, তা'তে পিঁপড়ের লাভ আছে। ভাত টেনে নিয়ে যাওয়া পিঁপড়ের বুদ্ধির কাজ; পিঁপড়ের বুদ্ধি আছে।

গাছ যে সব কাজ করে, তা কিসের মত? চুম্বকের লোহা টানবার মত, না পিঁপড়ের ভাত টেনে নিয়ে যাবার মত?

এর উত্তর তোমরাই দিতে পারবে, যদি গাছের মোটা মোটা দু' চারটে কাজ নজর করে দেখ। কেবল এইটুকু জানা দরকার যে, কিসে গাছের ভালো হয়—কি কি মতলব তার থাকতে পারে।

গাছের যদি কোন মতলব থাকে ত তার আসল মতলব দুটো— বেঁচে থাকা আর বংশ বাড়ানো। এ দুটো মতলব আমাদেরও আছে। কিন্তু এ মতলব দুটো হাসিল করবার জন্যে তার যে হাজার হাজার ছোটোখাটো মতলব থাকতে পারে—যেমন মাটীর রস টানা, পাতাখেকো জন্তুদের তাড়ানো—তার সঙ্গে আমাদের কোন মতলব মেলেনা।

গাছের বুদ্ধি যে আমাদের মতই টন্‌টনে, সে যে আমাদের মতই ভেবেচিন্তে মতলব খাটিয়ে কাজ করে—এই হচ্চে একদল পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন গাছ কেবলই নিজেকে তার চারপাশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কি হচ্ছে তা বুঝে নিয়ে সে ত কাজ করেই—কি হতে পারে তা এঁচে নিয়েও কাজ করে। সেই দলের পণ্ডিতের কথাই সত্য বলে' মেনে নিয়ে আমরা পর পর দেখিয়ে যাব গাছের সমস্ত শরীরের কাজ—আর কি কি মতলবে সেই সেই কাজ হচ্ছে।

গাছের বীচি।— যে কোন গাছের যে-কোন বীচি নিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, তার উপরে শক্ত খোলা, আর ভিতরে নরম শাঁস। এই নরম শাঁসটাই হচ্চে বীচির আসল জিনিষ—এই থেকেই নতুন গাছ হয়। যে-সব বীচির ভিতরটা পোকায় ফোঁপ্‌রা করে' ফেলে, সেই ভুয়ো বীচি থেকে, কিম্বা যে সব বীচির ভিতরকার শাঁস গজায়নি, সেই চিটে বীচি থেকে গাছ হয় না। কিন্তু এও হয়ত তোমরা দেখে থাক্‌বে যে, উপরকার খোলাটা না থাকলে, কেবল শাঁসটুকু থেকেও গাছ হয় না। একটা গিলের খোলাকে হাতুড়ী দিয়ে ভেঙে ফেলে, একটা নারকোলের মালাকে দা দিয়ে চটিয়ে তুলে ফেলে, কিম্বা একটা লিচুর বীচির খোলাকে ছুরী দিয়ে চেঁচে তুলে ফেলে মাটীর মধ্যে হতে দাও; দেখবে তা থেকে কখনোই গাছ হবে না। কেন?

গাছ ইচ্ছা করে' তার বীচির শাঁসকে শক্ত খোলা দিয়ে মুড়ে দেয় এই জন্যে যে, তাহলে তা সহজে নষ্ট হবেনা। বীচির শাঁস আল্‌গা থাক্‌লে তা'থেকে নতুন গাছ হবার আগেই তাকে পোকায় খেয়ে

ফেল্‌বে—কি যদি পোকাতে নাও খায়, তাহলেও বেশী ঠাণ্ডা কি বেশী তাত লেগে মরে' যাবে। তাত জল না পেলে যে বীচি ফলায় না তা সত্যি, কিন্তু বেশী তাত জল পেলে হয় বীচি যায় শুকিয়ে, নাহয় ত যায় পচে। এনামেলের মত শক্ত খোলায় আঁটসাঁট করে' মোড়ক-করা বীচির সে ভয় নেই। জানা গেছে, যে ঠাণ্ডায় পারা জমে শক্ত হয়ে যায়, বাষ্প গলে' জল হয়ে যায়, সে ঠাণ্ডাও বীচির খোলা ঠেকাতে পারে।

একটা বীচিকে যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল ক'রে নজর করে দেখ, তাহলে দেখ্‌বে তার খোলার গায়ে একটী ছোট্ট জায়গা আছে, যা সব চেয়ে নরম—যেন একটী ছোট্ট ছ্যাঁদাকে কেউ পাতলা পরদা দিয়ে বুজিয়ে রেখেছে। এর মানে কি?—এর মানে এই যে, বীচি যখন ফলায়, তখন ঐ নরম জায়গাতেই ফাট ধরে আগে—আর সেই ফাটল দিয়েই কচি শিকড়টী মুখ বের করে। অবশ্য মাটীর রসে ভিজে শাঁসটাও ফোলে, খোলাটাও নরম হয়ে যায়, আর ভিতর থেকে বাড়বার চাড় ত আছেই; কাজেই রোগা লোক হঠাৎ মোটা হয়ে গেলে তার জামাটা যেমন চড়াৎ করে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, খোলাটারও ঠিক তেমনি দশা হয়। পাছে মিছিমিছি বেশীদিন খোলার মধ্যে আট্‌কা পড়ে থাকে, আর বেরবার জন্যে আঁকুবাঁকু করে, তাই গাছ তার বীচির গায়ে ঐ নরম জায়গাটী ক'রে রেখেছে। একটা নারকোলকে ছুলে তার মাথাটা টিপে দেখো, দেখবে সেখানে একটা জায়গা আছে, যা আঁতুড়ে ছেলের মাথার চাঁদির মত তল্‌তলে; ঐখান দিয়েই নারকোলের চারার শিকড়গুঁড়ি বেরোয়। নারকোলের খোলের গায়ে আর যে দুটো চোখের মত গর্ত্ত দেখতে

পা'ও, সে দুটোও অমনি নরম জায়গা; তা ফুঁড়েও শিকড়গুঁড়ি বেরতে পারত—কেননা একটা নারকোল থেকে তিনটে নারকোল গাছ হবারই কথা। কিন্তু তা বেরোয় না—একটা নারকোল থেকে একটা নারকোল গাছই হয়। একটা ছোলাকে আতসী কাঁচের তলায় ধ'রে দেখলেও দেখতে পাবে, তার তলপেটে নাইয়ের মত একটী গর্ত্ত আছে।

গাছের শিকড়।—বীচি থেকে বেরিয়েই শিকড় খাড়া নীচের দিকে মুখ করে মাটির মধ্যে ঢোকে। বীচিকে কাৎ করেই পোঁত, চিৎ করেই পোঁত, আর উপুড় করেই পোঁত—শিকড় নীচের দিকে যাবেই।

শিকড় নীচের দিকে যায় জলের খোঁজে। সে জানে মাটির নীচেই জল আছে—আর সে মাটি তার সেই দিকেই, যেদিকে পৃথিবী সব জিনিষকে টান্‌ছে।

কিন্তু খানিকটা নীচের দিকে নেবেই যদি সে বুঝতে পারে সেদিকে জল নেই, তাহলে সে আর পৃথিবীর টান মানবে না; যেদিকে জল আছে, সেইদিকেই যাবে। একটা চালুনীর উপর গোটা দুই তিন মটর রেখে তাদের কলাতে দাও। মটরগুলোর শিকড় চালুনীর ছ্যাঁদা দিয়ে নীচের দিকে নামবে। চালুনীর নীচে যদি এক গামলা জল রেখে দাও, তাহলে যতই জোলো হাওয়া তাদের গায়ে লাগবে, ততই তারা নীচের দিকে নাম্‌বে। কিন্তু যদি জলের গামলাটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় গরম বালি বিছিয়ে দাও, আর চালুনীর উপরটায় গোটাকয়েক ভিজে সেওলা ঢেলে দাও, তাহলে সেই শিকড়গুলো বুঝতে পারবে যে তাদের নীচে শুক্‌নো হাওয়া আর উপরে জোলো হাওয়া; অমনি

তারা মুখ ঘুরিয়ে উপর দিকে উঠতে থাকবে—কেননা তারা জানে যেদিকে জোলো হাওয়া, সেদিকে জল আছেই।

আগেই বলেছি শিকড়ের রোখ্ নীচের দিকে—অর্থাৎ নীচের দিকে সে যাবেই, যদি না সেদিকে জলের কম্‌তি হয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে, তার সাম্‌নে বাধলো শুক্‌নো বেলে মাটি, তাহলে সে কি করবে? তাহলেও সে ঐ বেলেমাটি ফুঁড়ে নীচের দিকে নামবে, যদি ঐ বেলে-মাটির তলায় জোলোমাটি থাকে। যদি বেলেমাটির বদলে একটা পাথর সাম্‌নে বাধে, তাহলেও সে ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে না—মুখ ঘুরিয়ে পাথরটার গা বেয়ে তাকে ঘুরে যাবে—আর ঘুরে গিয়েই যেমন নীচে নামছিল, তেমনি নীচে নামবে। তবে যদি ঐ পাথর কি বেলে-মাটীর তলায় জল না থাকে, তাহলে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঠিক করে নেবে কোন্‌দিকে জল আছে—তারপর সেইদিকেই যাবে।

একটী কাঠিকে আমরা যে ভাবে চেপে মাটিতে পুঁতি, শিকড় ঠিক সে ভাবে মাটির মধ্যে ঢোকে না; সে ঢোকে অনেকটা স্ক্রুপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, যাতে জোর লাগে কম।* পাছে তা'তেও তার নরম কচি ডগাটী মাটীর ঘসড়া লেগে জখম হয়ে যায়, তাই ডগাটী একটী টুপি দিয়ে ঢাকা—যেমন টুপি লোকে সেলাই করবার সময় আঙুলের মাথায় পরে। বট, কেয়া আর পানার শিকড়ে এই শিকড়ের টুপি খুব ভালরকম দেখা যায়।

---

* শিকড় যে স্ক্রুপের মত ঘুরে ঘুরে মাটিতে ঢোকে, তার আর একটা মানেও আছে। সোজাসুজি সূচের মত ঢুকলে সে তত খাবার জিনিষ দেখতে পেতো না, যত ঐ ভাবে ঢুকে পায়।

গুঁড়ির যেমন ডালপালা হয়, শিকড়েরও তেমনি ডালপালা হয়, তা সে মোচা-শিকড়ই হোক্, আর ঝুপো-শিকড়ই হোক্। কুচো শিকড়-গুলো আসল শিকড়ের গা থেকে আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়—আবার কুচো শিকড়ের গা থেকে তার চেয়ে কুচো শিকড় আড়াআড়ি ভাবে বেরোয়। কুচো শিকড়ের রোখ্ আসল শিকড়ের মত নীচের দিকে নয়—কেননা তারাও যদি নীচের দিকেই নামবে, তাহলে চারপাশের জল খুঁজবে কে? তাদের রোখ্ গোড়াগুড়ি থেকেই জলের দিকে, তা কে জানে উপরে, কে জানে নীচে, কে জানে আশপাশে।

কিন্তু মাটির রস আসল শিকড়ও টানে না, কুচো শিকড়ও নয়। সে টানে এক লোম-শিকড়। এ শিকড় চুলের মত সরু—আর আসল শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়, কুচো শিকড়ের গা থেকেও বেরোয়। রস টানতে হয় বলেই গাছের সব শিকড়ের চেয়ে লোম শিকড় বেশী। লোম-শিকড় মাটির ফাঁকফোকর দিয়ে মাথা গলায়, যাতে না এক ফোঁটা রসও ফস্কে যায়। একটা বড় গাছের গোড়া কুপিয়ে এমন এক ডেলা মাটি তুলতে পারবে না, যার ভিতর দিয়ে একটা লোম-শিকড়ও না মাথা চালিয়েছে। লোম-শিকড়গুলোই দলে দলে বেরিয়ে এমন জোরে মাটী কামড়ে থাকে যে, একটা গাছকে উপড়ে তুলে ফেললে দেখবে তার শিকড় থেকে ডেলা ডেলা মাটি ঝুলছে। বরং লোম-শিকড় ছিঁড়বে, তবু সব মাটি ছাড়বে না—ঝাড়লেও না, ধুলেও না।

লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, অন্য শিকড় টানে না, তা এই থেকেই বুঝতে পারবে। একটা চারাগাছকে চড়চড়িয়ে টেনে তুলে আবার ভাল করে মাটির মধ্যে পুঁতে দাও, পরদিনই দেখবে তার পাতাগুলো মুস্ড়ে গেছে। তার মোটা শিকড় একটাও ছেঁড়ে নি—

ছিঁড়েছিল কেবল লোম-শিকড়, তাই সে আর মাটির রস টানতে পারছে না। লোম-শিকড়ই যে মাটির রস টানে, তা আর এক দিক দিয়েও বোঝানো যায়। পানা পাটারি, পানিফলের মত যে সব গাছ জলে হয়, তাদের ত আর জল জল করে হাতড়ে বেড়াতে হয় না, কাজেই তাদের লোম-শিকড় নেই বল্লেই হয়। ক্ষুদে পানার ত মোটেই লোমশিকড় নেই। তার যা একটা কি দুটো আসল শিকড় থাকে, তাই লোম-শিকড়ের কাজ করে।

গাছ যতই বড় হতে থাকে, তার শিকড়ও ততই বাড়তে থাকে,—কি লম্বায়, কি মোটায়, কি ডালপালায়। কেননা গাছ বড় হতে থাক্‌লেই তার বেশী খাবারের দরকার। তা ছাড়া ঝড়ঝাপ্‌টার সময় চারাগাছের শিকড়ে তত টান পড়ে না, যত বড় গাছের। গাছের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিকড়ও না বাড়ত, তাহলে একটু ঝড় উঠলেই, কি কোন রকমে গুঁড়িটা একটু হেলে পড়লেই, গোটা গাছটা উপ্‌ড়ে যেত। শিকড় গাছটাকে নোঙরের মত পোক্ত করে মাটীর সঙ্গে গেঁথে রাখে। ডালপালা নেই বলে' ঝড়ের সময় তাল নারকোলের গায়ে ধাক্কা লাগে কম; তবু যে আম কাঁঠালের চেয়ে তারাই বেশী ওপ্‌ড়ায়, তার মানে আম কাঁঠাল যত মোটা মোটা শিকড় দিয়ে যতখানি মাটি আঁকড়ে থাকে, তাল নারকোল তা পারে না। ঝড়ের আগেই যে কলাগাছ পড়ে, সেও এই জন্যে।

গুঁড়ির তলাতেই শিকড় থাকবে, এই হচ্ছে গাছের নিয়ম; কিন্তু কখনো কখনো গুঁড়ির গা থেকেও শিকড় বেরোয়। বটগাছের ডাল-পালা থেকে যে ঝুরি (বোয়া) নাবে, তা তোমরা দেখেইছ। ওগুলো নাবে কেন?—ওগুলো নাবে এই জন্যে যে, বটগাছের ডাল যেমন ভারি

তেমনি লম্বা; ওগুলো যদি থামের মত ডালের ভার না বয়, কি খুঁটির মত ডালগুলোকে চাড়া দিয়ে না রাখে, তাহলে সেগুলো মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া ওগুলো মাটির রস টেনেও গাছকে খাওয়ায় —যেন গাছের বুড়োবয়সের ছেলে! ওগুলোকে গাছের বেজায়গার শিকড় বলে। আর যে শিকড় গোড়াগুড়ি থেকে গাছকে খাইয়ে বড় করে তোলে, সেই হচ্ছে গাছের আসল জায়গার শিকড়। কেয়া, নারকোল, সুঁদরীর গোড়ারদিককার গুঁড়ি থেকে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তা বেরোয় এই জন্যে যে, এ সব গাছের আসল জায়গার শিকড় তেমন লম্বাও নয় শক্তও নয় যে, কেবল তার ভরসাতেই গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। চৈ, গাছপান, গজ্-পিপুলের গুঁড়ির গাঁট থেকে যে থোপা থোপা শিকড় বেরোয়—তা বেরবার মানে এই যে, ও সব গাছ কোন একটা খাড়া গাছকে বেয়ে ওঠে; সে গাছটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যেই ঐ সব শিকড়ের দরকার। পাথরকুচির পাতাকে মাটিতে ফেলে রাখলে, পাতার কিনার দিয়ে যে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তার মানে ঐ শিকড়ের উপরেই নতুন গাছ হবে।

বটগাছের বেজায়গার শিকড়ের মত আরো অনেক গাছের শিকড় আছে, যা দেখতে মোটেই শিকড়ের মত নয়। বট গাছের ঝুরি দেখ্‌লে ঠিক মনে হবে সেগুলো শিকড় নয়, গুঁড়ি—যদিও আসল গুঁড়ির চেয়ে সরু। কিন্তু সেগুলো যে গুঁড়ি নয়, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, গুঁড়ির মত তাদের গায়ে গাঁট নেই—তাদের গা থেকে পাতাসুদ্ধ ডালপালা বেরোয় না। কিন্তু এই সব শিকড় দেখতে অনেকটা গুঁড়ির মত বলে, এদের নাম হচ্ছে রূপচোরা শিকড়।

সমুদ্রের ধারে যে গরাণ গাছ হয়, তাদের তলার দিককার গুঁড়ি থেকে বেজায়গার শিকড় বেরোয়—তাও রূপচোরা শিকড়, তাও দেখতে গুঁড়ির মত। ভাঁটার সময় যখন শিকড় সব জেগে ওঠে, তখন ঠিক মনে হয় গাছের গোড়ার দিককার গুঁড়িটা অনেকগুলো ফ্যাক্‌ড়ায় চিরে গেছে। এরকম শিকড় বেরবার মানে এই যে, গরাণ গাছ যে মাটিতে জন্মায়, সে হচ্ছে পেঁকো বেলে মাটি, তা'তে শিকড় তেমন এঁটে বসতে পারেনা, যেমন এঁটেল মাটীতে বসে; তার উপর জলের স্রোত তাকে কেবলই গোড়া ধ'রে ঝাঁকাচ্ছে, কাজেই এরকম কায়দা ছাড়া সে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার বেজায়গার শিকড়গুলোর ফাঁক দিয়ে হু হু করে জল বয়ে যায়—তখন ঠিক মনে হয় একটা মাকড়সা তার লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলোকে হাঁটু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগেই বলেছি শিকড় মাটির রস টানে, কিন্তু সে রস মানে শুধুই জল নয়—জলে গোলা শক্ত খাবার। * যে সব খাবার জলে গোলেনা, তাদের গলিয়ে নেবার জন্যে শিকড় নিজের গায়ের ভিতর থেকে একরকম টক রস (অ্যাসিড) বের করে। ঐ টক রসে গলানো খাবারকে সে জলের মতই টেনে নেয়।

---

* গাছের শক্ত খাবার হচ্ছে এই ক'টা—লোহা, গন্ধক, বালি, ক্যাল্‌সিয়ম, ম্যাগ্‌নিসিয়ম, পটাসিয়ম, ফস্ফরস্। লোহা যেমন একটা ধাতু, ক্যাল্‌সিয়ম, ম্যাগ্নিসিয়ম, পটাসিয়মও তেম্‌নি এক একটা ধাতু। ফস্ফরস্ কোন ধাতু নয়—গন্ধকের মতই একটা জিনিষ। ফস্ফরস্ অন্ধকারে দপ্ দপ্ করে জ্বলে, কিন্তু আগুনের মত হাত পুড়িয়ে দেয় না।

অর্কিডের মত যে-সব নিরীহ পরগাছা অন্য গাছের উপর পাখীর মত ভর দিয়ে থাকে মাত্র, তাদের শিকড় ত লুটে-যাওয়া শিকড় নয় যে, যে গাছের উপর গজিয়েছে সেই গাছেরই রস চুষে খাবে; আর সে শিকড় মাটি পর্য্যন্তও নাবেনা যে, মাটি থেকে রস টানবে। কাজেই সে শিকড় অন্য ফন্দীতে খাবার জোগাড় করে। তার ত দরকার মাটি আর জল। এ দুইই সে পায় বাতাস থেকে। তোমরা জান হাজার হাজার ধূলোর গুঁড়ো দিনরাত বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে—আর এও জান যে, অনেক জল বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে। এখন, ধূলোর গুঁড়োদের এইটুকুই মজা যে, তারা খালি গায়ে থাকতে চায় না; হাওয়ার বাষ্পকে গলিয়ে জল করে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেদের মুড়ে রাখে। এই সব জলেমোড়া ধূলোর গুঁড়ো হতে নিরীহ পরগাছার শিকড় খাবার বের করে নেয়। তাছাড়া যে গাছের উপর ঐ সব পরগাছা জন্মায়, তার ছালের ফাটলের মধ্যেও শিশির বৃষ্টিতে ভেজা ধূলো থাকে। পরগাছার শিকড় ঐ ফাটলের মধ্যে ঢুকে ঠিক যেন মাটির রস চুষে খায়। টোকা পানার মত যে সব গাছের শিকড় জলে থাকে, তাদের জলচরা শিকড়, আর অর্কিডের মত নিরীহ পরগাছাদের বাতাসচরা শিকড় খুবই নরম; কিন্তু যে সব গাছ মাটী থেকে রস টানে তাদের মাটীচরা শিকড়, আর রাক্ষুসে পরগাছাদের শিকড় বেশ শক্ত—কেননা শক্ত জিনিসের মধ্যে তাদের ঘুরতে হয়।

গাছের গুঁড়ি।—বীচি থেকে বেরিয়েই ক'ল সোজা উপর দিকে ওঠে। যদি বীচি বেশী মাটির নীচে পোঁতা থাকে, তাহলে কলের মাথাটি কেন্নোর মত কুঁকড়ে মাটি খুঁড়ে ওঠে, পাছে মাটির

ঘষড়ায় জখম হয়ে যায়; আর মাটির উপরে উঠেই পাক খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ক'ল যখন বড় হয়ে পাতা বের করে, তখন তাকে গুঁড়ি বলে।

গুঁড়ি উপরে ওঠে আলোর খোঁজে। যদি সোজা উপর থেকে আলো না আসে, তাহলে যেদিক থেকে আলো আসে সেইদিকেই গুঁড়ি বেঁকে যায়। একটা অন্ধকার ঘরের জানলার কাছে টবে করে একটা চারাগাছ রেখে দাও—দু'চারদিন পরেই দেখবে ডালপাতাসুদ্ধ গুঁড়িটা বাইরের আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

পাতায় যে গাছের খাবার রান্না হয়, তা আগেই বলেছি। কিন্তু যখন ক'ল বা কচি গুঁড়ির গায়ে পাতা বেরোয়নি, অথচ শিকড় রস টানছে, তখন খাবার রাঁধে কে?—খাবার রাঁধে বীচিপাতা। ক'ল বুঝেসুঝেই অনেক সময় বীচিপাতাকে কাঁধে করে' মাটির উপরে ঠেলে ওঠে। একটা তেঁতুলের কচি চারার দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে এ কথা ঠিক কিনা। গুঁড়ির গায়ে দু'চারটে পাতা বেরলেই বীচিপাতা খসে' পড়ে' যায়।

গুঁড়ির গা নলের মত সমান নয়; তার গায়ে গাঁট আছে। সব গুঁড়ির গাঁট তেমন চোখে মালুম হয় না—যেমন আখ বাঁশ সুপুরীর হয়।

দুই গাঁটের মাঝামাঝি জায়গাকে পাব বলে। তোমরা সকলেই জান যে, পাবের চেয়ে গাঁট বেশী শক্ত আর নীরেট। মাঝে মাঝে গাঁট আছে বলেই গাছের গুঁড়ি অত মজবুত—ঝড়ঝাপটায় টপ্ করে' ভেঙ্গে পড়ে না। হাড়জোড়া গাছের পাবের চেয়ে গাঁটগুলোই সরু সরু—সেইজন্য তার গুঁড়িটা দেখতে শিকলের মত। কিন্তু গাঁটগুলো যে পাবের চেয়ে শক্ত, তাতে ভুল নেই।

যে সব গাছের গুঁড়ি খুব সরু আর লগ্‌বগে, ঝড়ের সময় তাদের তলার গুঁড়িতেই টান পড়ে বেশী। এই জন্যে তাদের আগার গুঁড়ির চেয়ে তলার গুঁড়ির গাঁটগুলো কাছাকাছি।

যে সব গাছের গুঁড়ি মোটা আর শক্ত, তারাও এমন জিনিষ দিয়ে আগাগোড়া তৈরী যে, নোয়ালেও ভাঙতে চায় না। বেতকে যে কি রকম বেঁকানো যায়, তা তোমরা জান; কিন্তু অতটা না বেঁক্‌লেও সব গাছই যে কিছু না কিছু বেঁকে, তা ঝড়ের সময় যে-কোন গাছের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে। সুপুরী গাছ ত মাটীর উপর শুয়ে পড়ে আর উঠে দাঁড়ায়—দেখলে মনে হয় যেন রাগের চোটেই মাথা কুট্‌ছে!

গুঁড়ি গাঁট থেকেই পাতা বের করে। কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে একটী করে পাতা বেরোয়—যেমন লাউ, বাঁশ, পেঁপে, জবার; কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে দুটো করে' পাতা বেরোয়—যেমন গন্ধরাজ, তুলসী, ঘলঘাসের; আবার কোন গুঁড়ির গাঁট থেকে অনেকগুলো করে' পাতা বেরোয়—যেমন ছাতিম, ডালিমের।

প্রতি পাতার উপর-কোলে একটী ক'রে ছোট কুঁড়ি থাকে। ঐ কোলকুঁড়িই পাতাসুদ্ধ ডাল হয়ে ফুটে বেরোয়। পাতা খসে' গেলেও, কোলকুঁড়ি প্রায় খসে না।

গুঁড়ির মাথাতেও একটী কুঁড়ি থাকে, যাকে মাথার কুঁড়ি বলে। মাথার কুঁড়ি বাড়লেই গুঁড়ি লম্বাতে বাড়ে। ডাল হচ্ছে গুঁড়ির ফ্যাক্‌ড়া, সরু গুঁড়ি বল্লেও চলে: তাই ডালের মাথাতেও মাথার কুঁড়ি আছে।

সব কোলকুঁড়িই যে ডালপালা হয়ে ফুটে বেরোয় তা নয়; তা যদি বেরতো, তাহলে এক একটা গাছ আশেপাশে বেড়ে এক একটা

পাহাড়ের মত হয়ে পড়ত—গুঁড়িটা ডালপালার ভার বইতে পারত না, শিকড়গুলো গাছের খাবার জোগাতে পারত না, আর পাতা-গুলোকে কাজ না করে' চুপ করে' বসে থাকতে হত; কেননা অত পাতা গাছের দরকার নেই। তাই বেশীর ভাগ কোলকুঁড়িই হয়ে অবধি ঘুমিয়ে থাকে।

ঘুমন্ত কুঁড়িরা যে একেবারেই জাগে না, তা নয়—দরকার হলে জাগে। অনেক সময় দেখা যায় একটা ঘুনধরা সজনে গাছ ঘাড়মোড় ভেঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে' গেল, কি একটা তেঁতুল গাছের ডালপালা সব বাজ পড়ে জ্বলে' গেল। গাছটার নেড়া গুঁড়ি অনেক দিন ধরে' মড়ার মত পড়ে' রইল, তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই মরা গুঁড়ির গা থেকেই কচি কচি ডালপালা তড়বড়িয়ে ফুটে বেরচ্ছে—যেন সেকালের কোন মুনিঋষি এসে একটুখানি জলের ছিটে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এ আর কিছুই নয়, যে ঘুমন্ত কুঁড়িগুলো এতকাল ধরে' পড়ে' পড়ে' ঘুমচ্ছিল,—গাছটা মরে' যায় দেখে, তারা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

মাথার কুঁড়ির মধ্যে গুঁড়ির একেবারে কচি ডগাটি পাতায় পাতায় মোড়া থাকে। মাথার কুঁড়িটা যতই ফুটতে থাকে, ততই গুঁড়ির ডগাটি পাতা ছড়াতে ছড়াতে বেড়ে যায়। ডগার পাবটি যখন বাড়চে, তখন তলার পাবগুলো যেমন তেমনিই থাকে; থাকেনা কেবল ধান, বাঁশ, আখের মত দু-একটা গাছের। তাদের ডগার পাবটিও যেমন বাড়ে, অমনি তলার পাবগুলোকেও কে যেন টেনে টেনে লম্বা করে' দেয়। সেই জন্যেই ঐ সব গাছ দেখতে দেখতে উঁচু হয়ে ওঠে। একটা বাঁশগাছ একদিনেই দু'হাত বাড়ে। ধানগাছের বাড় আরো বেশী।

আজ বানের জলে ধানগাছের মাথার উপর তিনহাত জল দাঁড়িয়ে গেল, কাল কি পরশু দেখবে, সে জলের উপর মাথা জাগিয়েছে।

তাল, নারকোল, খেজুর, সুপুরীর মত প্রায় সব এক-বীচিপাত গাছের মাথার কুঁড়িটাই বাড়ে, কোলকুঁড়িগুলো ঘুমিয়েই থাকে। একেই ত ও সব গাছের শিকড়-গুঁড়ির জোর কম, তা'তে আবার যদি রাশি রাশি ডালপালা বেরোয়, তাহলে টেঁকাই দায়।

গুঁড়ির মাথার কুঁড়ি বেড়েই যায়, তবে কোন কোন গাছে এও দেখা যায় যে, মাথার কুঁড়িটা খানিক দূর বেড়েই ঘুমন্ত কোলকুঁড়ির মত ঘুমিয়ে পড়ল, কি ফুল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, কি একেবারেই মরে' গেল। তখন কি হয়? গুঁড়ির বাড় কি বন্ধ হয়ে থাকে?—তা থাকে না। ঐ মাথার কুঁড়ির ঠিক নীচেই যে কোলকুঁড়িটা ঘুমিয়েছিল, সেইটেই মাথার কুঁড়ির মত হয়ে যায়—সেইটে থেকেই গুঁড়ির মত মোটা ডাল বেরিয়ে উপরদিকে ওঠে।

আসল গুঁড়ির মাথার কুঁড়িটা ঘুমিয়ে পড়লে কি মরে' গেলে কখনো কখনো তার তলার দিককার দুটো কুঁড়িই দুদিক থেকে ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে বেরোয়; আবার সেই ডাল দুটোর মাথার কুঁড়ি যখন ঘুমিয়ে পড়ে কি মরে' যায়, তখন তাদের প্রত্যেকের তলা থেকে আবার দুটো করে কোলকুঁড়ি ত্যারচা ডাল হয়ে ফুটে ওঠে।

এক একটা গাছের আবার মাথার কুঁড়িটা মরে' গেলে, তার তলার দিককার দশ বিশটা কোলকুঁড়ি হয়ত একসঙ্গে ফুটে ওঠে—যেন আসল গুঁড়িটা হঠাৎ দশ বিশটা ফ্যাকড়া-গুঁড়িতে চিরে গেল। ভবানীপুর বকুলবাগানের মোড়ে যে ২৭-মাথা খেজুর গাছটা আছে, তার এই রকম খামখেয়ালী বাড়। তার মাথার কুঁড়ির বাড় থেমে যেতেই

তলার ২৭টা কুঁড়ি একসঙ্গে ফুটে উঠে তার ঘাড়ে ২৭টা মাথা চাপিয়ে দিয়েছে।

আসল গুঁড়িটাকে ডালপালা আর পাতার বোঝা বইতে হয় বলে' গাছও যত বাড়তে থাকে, সেও তত মোটা হতে থাকে। কেবল তাল, নারকোলের মত গোটাকয়েক গাছ মাথায় বাড়লেও গায়ে বাড়ে না। তবে তাদের তা'তে বিশেষ লোকসান নেই, কেননা তাদের ডালপালা হয় না যে বইতে হবে।

থামের যেমন তলার দিকটা উপর দিকের চেয়ে মোটা, গাছেরও ঠিক তাই। এতে এই সুবিধা হয় যে, গাছ বেশী ভার বইতে পারে।

গুঁড়ির গা সব গাছের সমান নয়; কোন গাছের তেলা,—যেমন বাঁশ, পেয়ারা, ইউক্যালিপ্‌টসের; কোন গাছের খস্‌খসে—যেমন আম, নিম, কুলের; কোন গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা—যেমন লাউ, তুলসী, সূর্য্যমুখীর; কোন গাছের গুঁড়ি কাঁটায় ভরা—যেমন গোলাপ, পদ্ম, কণ্টিকারী, কাঁটানটে, কুলেখাড়ার; কোন গাছের গুঁড়ি আগাগোড়া কুঁড়ো-মাখানো—যেমন আকন্দের; কোন গাছের গুঁড়ি চট্‌চটে—যেমন তামাক, লাল ভেরাণ্ডার; কোন গাছের গুঁড়িতে খোঁচা দিলে দুধের মত কস্‌ বেরোয়—যেমন পেঁপে, রাংচিতে, করবীর; কোন গাছের গুঁড়ি চিরলেই ঝরঝর করে আঠা পড়ে—যেমন জিউলী, সজনে, রবারের।

আঠাই বল, কসই বল, শোঁয়াই বল, কুঁড়োই বল, কাঁটাই বল,—এ সব গাছের খা[illegible]য়াল নয়, এর মা[illegible] আছে। এই দিয়েই গাছ পোকামাকড়, জন্তুজানো[illegible]রের হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। এক রকম গুব্‌রে পোকা আছে যারা গাছের গা ফুঁড়ে তার মধ্যে ডিম

পাড়তে যায়। রবার গাছের গা ফুঁড়লেই তারা ঝাঁঝালো আঠায় জড়িয়ে মারা যায়।

গুঁড়ি হয় কেন? গুঁড়ির আসল কাজটা কি?—তোমরা হয়ত বলবে গাছকে খাড়া করে' ধরে' রাখা। গাছকে সে খাড়া করে' ধরে' রাখে ঠিক—কিন্তু সব গুঁড়িই ত আর খাড়া গুঁড়ি নয়; লতানে গুঁড়িও ত আছে। গাছকে খাড়া করে' রাখবার জন্যই যদি গুঁড়ির দরকার হবে, তাহলে লতানে গাছের গুঁড়ি হতই না। এবার হয়ত তোমরা বলবে গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতা ফুল ফলের ভার বওয়া। তাই যদি হবে, তাহলে আনারস কচু ঘৃতকুমারী মুরগার মত যে সব গাছের সব গুঁড়িটাই চোরা গুঁড়ি, অর্থাৎ মাটীর মধ্যে পোঁতা—সে সব গাছের গুঁড়ি হয় কেন?—তোমরা হয়ত এবার খাবার জমানো, খাবার চালাচালির কথা পাড়বে, কিন্তু ও সব কাজ ত গাছের পাতাও করতে পারে, শিকড়ও করতে পারে - অনেক গাছে করে'ও থাকে। চাপ্ড়া ঘাসের যে চোরা গুঁড়িও নেই, দেখা গুঁড়িও নেই— সে বেঁচে আছে কি করে'? তার যে শিকড়ের উপরেই পাতা। পাতাগুলো এলানো চুলের মত মাটির উপর গা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে, অর্থাৎ মাটীই তাদের ভার বয়।

ঠিক্। কিন্তু চাপ্ড়াঘাসের একটা কি মস্ত অসুবিধে জানো? বেশী আওতায় জন্মালে সে বাঁচেনা। দুর্ব্বা ঘাসের কিন্তু সে অসুবিধে নেই। সে যতই আওতায় জন্মাক, তার লতানে গুঁড়িটাই তাকে আওতা থেকে বের করে আলোয় নিয়ে যায়। গুঁড়ির আসল কাজ হচ্ছে পাতাগুলোকে আলোর মুখ দেখানো।

যদি বল সব গুঁড়িই তাহলে লতানে হয় না কেন? তাহলে বলব

যে উপর দিকে উঠলে যে গাছ বেশী আলো পাবে, ফাঁকা আলো পাবে। ধর—একটা মস্ত বন, কেবল ঘেঁসাঘেঁসি ঝোপগাছ। সেখানে দূর্ব্বা ঘাসের লতানে গুঁড়ি আর মাটি বেয়ে কত দূর দৌড়বে? তা ছাড়া পাতাখেকো জন্তুরা যাতে না পাতা পর্য্যন্ত নাগাল পায়, সে জন্যও গাছ উঁচুতে ওঠে। তা ছাড়া এক একটা গাছ বেয়াড়া লম্বা হয় অন্য গাছের সঙ্গে টক্কোর দিয়ে কেননা সকলেই চায় আমার মাথায় পুরো ফাঁকা আলোটা লাগুক্।

লতানে গাছ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না কাজেই কি করে? গড়িয়ে গড়িয়েই যতটা পারে আলোর মুখ দেখবার চেষ্টা করে: পুঁই, তরমুজ, পটল, শুষ্‌নি, রাঙা-আলু, থুলকুড়ি, আমরুল—এই সব গাছের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে চলে। এদের মধ্যে আবার শুষ্‌নি, থুলকুড়ি, রাঙাআলু, আমরুল একটু করে' যায় আর একটা গাঁট থেকে শিকড় বের করে—যেন হাঁপিয়ে ওঠে আর শিকড় বের করে' জিরোয়। দূর্ব্বা, আলু, হলুদের গুঁড়ি মাটির উপর দিয়ে যায় না, মাটির ভিতর দিয়ে দৌড়য়। তারা যেন একরকম মাটির ডুবুরি! পানকৌড়ির মত এক নিঃশ্বাসে খানিক দূর গিয়ে ভুস্ করে ভেসে ওঠে, আর যেখানেই ভেসে ওঠে সেইখানেই উপর দিকে একটা সরু ডাল বের করে' আবার ডুব দেয়।

অনেক লতানে গাছ কিন্তু মাটিতে লতিয়ে খুসী হয় না—তারা খাড়া গাছের মত উঁচুতে উঠবে। কি করে উঠবে?—পাশেই যদি কোন খাড়া গাছ কি পাঁচীল থাকে, তাহলে সেই পর্য্যন্ত লতিয়ে গিয়েই তাকে বেয়ে উঠবে। এই বেয়ে ওঠার জন্যে তারা মাথা খেলিয়ে নানান্ ফিকির বের করেছে। কেউ বা খাড়া গাছটাকে

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে,—যেমন সীম, গুলঞ্চ, মাধবীলতা, বরবটী, স্বর্ণলতা, তরুলতা। কেউ বা গুঁড়ি থেকে বেজায়গার শিকড় বের করে' তাই দিয়ে অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে' ওঠে, যেমন চৈ, গাছপান, গজপিপুল, গোলমরিচ। কেউ বা বেজায়গার শিকড়ের বদলে বঁড়শীর মত কাঁটা বের করে' সেইগুলো অন্য গাছের গায়ে বাধিয়ে তাদের মাথায় চড়ে' বসে—যেমন কাঁটালিচাঁপা, কেলেকোঁড়া, গোলাপ, শিয়াকুল, বেত, চীনেলতা, লতানে বাঁশ। কোন কোন লতার গা থেকে আবার লম্বা লম্বা আঁকড়া বের হয়। ঐ আঁকড়াগুলো যেই কোন জিনিষে ঠেকে, অমনি তাকে জড়িয়ে ধরে,—যেমন লাউ, কুমড়ো, শঁশা, তরমুজ, ঝুমকোলতার। আঁকড়াগুলো স্প্রিং-এর মত প্যাঁচ খাওয়া, টান পড়লে অনেকখানি লম্বা হতে পারে, কাজেই টপ্ করে' যে ঝড়বাতাসে ছিঁড়ে যাবে সে জো নেই। বিলাতে ভার্জিনিয়া ক্রীপার বলে একরকম লতা আছে, যা তেলা পাঁচীল বেয়ে উঠতে পারে, পিছ্‌লে পড়ে না। তার আঁকড়ার ডগায় ছোট ছোট বোতামের মত কতকগুলো জিনিষ হয়, যা এমনি চট্‌চটে যে দেয়ালের গায়ে তাই এঁটে এঁটে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়।

গাছ যে আঁকড়া বের করে, সে আঁকড়া সে পায় কোথায়? গাছের কোল-কুঁড়িই বদ্‌লে আঁকড়া হয়ে যায়। ঝুমকোলতার একটা আঁকড়া যদি একটু ভাল করে' দেখ, তাহলেই দেখবে সে বেরিয়েছে পাতার ঠিক উপরকোল থেকে, আর পাতার উপরকোলে যে কোলকুঁড়ি থাকবার কথা, সে কোলকুঁড়ি নেই। হাড়জোড়া আর গোয়ালেলতার মাথার কুঁড়িই বদ্‌লে আঁকড়া হয়ে যায়।

কোলকুঁড়ি যে শুধু আঁকড়া হয়েই বেরোয় তা নয়, দরকার হলে

কাঁটা হয়েও বেরোয়। বেল, বুঁচ, বাগানবিলাসে গাছের কাঁটা হচ্ছে রূপচোরা কোলকুঁড়ি।

খাড়া গুঁড়ির খাড়া উপর দিকে ওঠবার কথা হলেও, অনেক সময় সে তা করতে পারে না। হয়ত তার মাথার উপর অন্য দু' তিনটে বড় গাছ এমনি ঝুঁকে পড়েছে যে, এক কোণের একটু ফাঁক দিয়ে মাথা গলানো ছাড়া তার উপায় নেই,—কাজেই তার গুঁড়িটাকে বেঁকাতে হয়। ফাঁকা মাঠের গাছকে অনেক সময় ঝড়ই ঘাড় ধরে' বেঁকিয়ে দিয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে যেখানে দিনরাত্তিরই জোর বাতাস বইছে, সেখানকার অনেক গাছই এইরকম। ঘাড় তুলে ঘাড় ভাঙবার চেয়ে তারা ঘাড় নুইয়ে থাকাই ভাল বুঝেছে।

আমেরিকায় মেক্সিকো দেশে একরকম অর্কিড পরগাছা আছে, যা নীচের দিকে মাথা করে' ঝোলে। তার মানে, সে দেশে খুব বৃষ্টি হয়। মাথা উপর দিকে থাক্‌লে জলের তোড়ে মাথা ভেঙে যেতে পারে। তা ছাড়া বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলেই যে জোলো হাওয়া ওঠে, তা হেঁটমাথা করেই তার ধরবার সুবিধে হয়।

তোমরা দেখেছ, কচি বেলায় গুঁড়ির রং থাকে সবুজ, বড় হলেই হয়ে যায় কটাসে। এর মানে চারাগাছের পাতা কম, অথচ ক্ষিদে বেশী, কেননা ধাঁ ধাঁ করে বাড়তে হবে; কাজেই তার গুঁড়িও গাছসবুজ দিয়ে পাতার মত খাবার রাঁধে। আর বড় গুঁড়ির রং কটাসে হয় এই জন্যে যে, তাকে খাবার রাঁধতে হয় না, খাবার জমাতে হয়; রাঁধা খাবারে বেশী তাত আলো লাগ্‌লে, তা নষ্ট হয়ে যায়। কটাসে রঙের ভিতর দিয়ে তাত আলো চুঁইয়ে যায় কম।

যে সব গাছের খুব কুচি কুচি পাতা—যেমন বাজবরণ; কি মোটেই পাতা নেই—যেমন ফণীমনসা (নাগফাণী); * সে সব গাছের খাবার রাঁধেও গুঁড়ি, খাবার জমায়ও গুঁড়ি। তাদের গুঁড়ি পাতার মতই সবুজ, অথচ খাবার-পোরা বলে' শাঁসালো।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

* ফণীমনসার গুঁড়ি একে পাতার মত সবুজ, তা'তে পাতার মত চেপ্টা না হলেও খুব চেপ্টা—কাজেই অনেকে পাতা বলে ভুল করে। কিন্তু ও যে পাতা নয়, রূপচোরা গুঁড়ি—তা এই থেকেই বোঝা যায় যে, ওর গায়ে গাঁট আছে। আর ও পাতা হলে ও-র দুপিঠই সমান সবুজ হত না।

রূপচোরা গুঁড়ি অনেক সময় শিকড়ের মতও দেখতে হয়। আলু, হলুদ, কচু, ওলের গেঁড় যে, মূলোশালগমের মত শিকড় নয়— তা হয় গাঁট, না হয় কুঁড়ি, না হয় পাতা, না হয় পাতা খসার দাগ দেখে বুঝবে। আলুর গায়ে যে পাতলা আঁশের মত খোসা দেখ, সেই হচ্ছে পাতা—মাটির নীচে অন্ধকারে থেকে অন্য পাতার মত সবুজ হতে পারে নি; আর যেগুলোকে আলুর চোখ বলে জানো, সেইগুলোই পাতার কোলকুঁড়ি। কচুর কোলকুঁড়িগুলোকে আমরা কচুরমুখি বলে' থাকি।

লোহার ব্যথা।

ও ভাই কর্ম্মকার!
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লিমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলগো যন্ত্র তোল।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই—কাঁদিছে 'নেহাই', আগুন ঢুলিছে ঘুমে;
শ্রান্ত সাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্গোছে 'ছেনি' চুমে।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি,—
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দুপ'রে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে;
ভাঙিলে গড়িলে—সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা করে।
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম;
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ;
ধড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে আপনা চিনিতে নারি;
স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই—পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে, সাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়;
তবু সগর্ব্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়— হোক্‌না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হই, সহি শান পান পোড়,—
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা—দিন রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরি, নেহাই হাতুড়ি, ভাই হয়ে ভাইএ পেটে!

ও ভাই কর্ম্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্ম্মভার;
কহগো বন্ধু, কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি?
কি কহিছ ভাই? আমি হব তুমি, এই প্রেম সহি যদি?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায়, পায় কামারের গদি!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কাগজ।

('আনন্দবাজারে'র জন্য বিশেষভাবে লিখিত)

ইংরাজরা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের জন্মদিনে, many happy returns of the day, এই বাঁধা গৎ আওড়ে থাকেন। এর অর্থ—এদিন যেন বার বার ফিরে আসে; সংক্ষেপে তোমার যেন বছর বছর পুনর্জন্ম হয়।

আমিও আপনাদের কাগজ সম্বন্ধে এই বিলিতি-দস্তুর শুভকামনা করছি।

এ কামনা আমার কেবল মুখের কথা নয়। সংবাদপত্র জিনিষটে কি, এবং কি জন্য সকলে তার উন্নতি কামনা করতে বাধ্য, তা জানলে আমার কামনার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কারও আর সন্দেহ থাকবে না। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলছি।

সভ্যতা জিনিষটি কি?—তার কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা অদ্যাবধি কোনও সভ্য মানব দিতে পারেন নি। সভ্যতার বৃদ্ধি যে মানুষের সুখের বৃদ্ধি অথবা সন্তোষের বৃদ্ধি নয়, তার প্রমাণ সভ্য-মানবের তুল্য অসন্তুষ্ট লোক আর দুনিয়াতে নেই। সভ্যতার পাণ্ডারা সভ্যমানবের অসন্তোষের নাম দিয়েছেন divine discontent—অর্থাৎ দিব্য অসন্তোষ। এ হচ্ছে সুখের লোভে সোয়াস্তির প্রতি অসন্তোষ। পৃথিবীর সব চাইতে সভ্যদেশ ইউরোপে যুদ্ধের পর থেকে শুধু এই কথাই শোনা যাচ্ছে যে—"সুখের লাগিয়া

এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল"। এর থেকেই বোঝা যায় যে, সভ্যযুগে ভবের হাট হচ্ছে নিরানন্দ বাজার।

সভ্যতার আমরা সংজ্ঞা না দিতে পারলেও তাকে চিনিয়ে দিতে পারি। তার একটি লক্ষণ অতি স্পষ্ট। এ কথা কে না জানে যে, কাগজের বাইরে সভ্যতা নেই।

কোন্ জাত কত লিখেছে বা লিখছে, তার হিসেব থেকেই আমরা সকল জাতের সভ্যতা অসভ্যতার তারতম্য নির্ণয় করি। এই দেখুন না কেন, আমরা বৈদিক যুগকে সভ্যতার আদি যুগ মনে করি, আর প্রাক্‌বৈদিক যুগকে অসভ্যতার শেষ যুগ। এ দুই পিঠোপিঠি যুগের আসল প্রভেদটা কি? —এই কি নয় যে, পরযুগের ঋক্‌বেদ বলে একখানি বই আছে, আর পূর্ব্বযুগের প্রাক্‌বেদ বলে কোনো বই নেই?

সংবাদপত্রের প্রসাদে যত লেখা হয়, তত আর কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। সুতরাং এ সত্য স্পষ্ট যে, সভ্যতার চরম যুগ হচ্ছে কাগজের যুগ। সংবাদপত্রই হচ্ছে সভ্যতার একাধারে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যে সাধনা করে এসেছে, এখন বোঝা যাচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেই সকল মনোবৃত্তির চর্চ্চা করা, যার ফলে সভ্যতার চরম অবস্থায় সে কাগজ লিখতে পারবে ও পড়তে পারবে। মানবসমাজ তার উন্নতির শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে। এর পরেই তার স্বর্গারোহণ—বক্‌তে বক্‌তে।

(২)

আমাদের দেশে সংবাদপত্র তাঁরাই এনেছেন, যাঁরা এদেশে সভ্যতা এনেছেন। কিন্তু পরের আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত বলে, সংবাদপত্র যে এ দেশে টিঁকবে না—এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

গোল আলুও পরের দ্বারা আনীত ও বিদেশ থেকে আনীত, তাই বলে আলুর ফসল কি এদেশে কচুর চাইতে জোর ফলছে না? বরং এই কথাই কি সত্য নয় যে, এ যুগে আলুই হচ্ছে আমাদের সর্ব্বপ্রধান আহার? সংবাদপত্রও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ আমাদের মনের প্রধান খোরাক। দেহের বলবীর্য্য আমরা যেমন আলুর কাছ থেকে সংগ্রহ করি, মনের বলবীর্য্যও আমরা তেমনি সংবাদপত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করব,—যেমন সভ্য ইউরোপের লোক এখন করছে।

কাগজের আর একটি গুণ আছে—ও হচ্ছে মনের কাপড়। ম্যাঞ্চেষ্টারের ধুতি যেমন আমাদের দেহের নগ্নতা ঢেকে রাখে, খবরের কাগজও তেমনি আমাদের মনের নগ্নতা ঢেকে রাখে। আমরা যখন সভ্য হয়েছি, তখন ও আবরণ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ভবিষ্যতে বড় জোর আমরা কাগজের খদ্দর বানাতে পারব। কিন্তু তারও টানা হবে বিলেতি ভাব, আর পোড়েন হবে দেশী ভাষা। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না; কেননা ভারতবর্ষের সভ্যতা চিরকালই দোসূতী।

সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা দেখতে পারেন না, এমন লোক এখনও পৃথিবীতে বিরল নয়। এঁরা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত—(১) সাহিত্যিক দল, (২) শাসনকর্ত্তার দল।

সাহিত্যিক দলের ভয় যে, সংবাদপত্রের চাপে সাহিত্য মারা যাবে; যেমন কলের চাপে তাঁত মারা গিয়েছে। এই ব্যাপারকেই বাঙ্গলায় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সাহিত্য যে মারা গিয়েছে, এ জ্ঞান কি সাহিত্যিকদের আজও হয় নি?—সে যাই হোক, আর দু'দিন যেতে দিন, দেখতে পাবেন যে, এই সাহিত্যিক শত্রুর দল সব সংবাদপত্রের

দলে ভর্ত্তি হয়েছে। সাহিত্যে ফেল করলে লোকে যে সংবাদপত্রে প্রমোশন পায়, তার উদাহরণ আমি।

শাসনকর্ত্তারা যে সংবাদপত্র ভালবাসেন না, তার কারণ পৃথিবীতে কাজের লোক কথা ভালবাসে না, বিশেষতঃ সে কথা যদি তাঁদের স্বেচ্ছামত কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। নূতন শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম কাজ হচ্ছে কাগজের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। ইটালীতে মুসোলীনি ও রুষিয়ায় লেনিন, উভয়েই নিজের মুখপত্র ছাড়া অপর সকল কাগজ বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের সুমুখে মস্ত একটা ফাঁড়া আছে। যেদিন স্বরাজ হবে, সেদিন অনেক কাগজ চাপা পড়বে। কিন্তু সংবাদপত্র এ ফাঁড়াও কাটিয়ে উঠবে। যিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের গত একশ বৎসরের আইনকানুনের ইতিহাস জানেন, তিনি অবশ্যই জানেন যে, Press Act press-কে চাপতে পারে নি। যার পিছনে স্বয়ং প্রকৃতির ঠেলা আছে, কার সাধ্য রোধে তার গতি! প্রকৃতি অন্ধ বটে, কিন্তু বেজায় জোয়ান। আর যখন গতি মানেই উন্নতি, তখন সংবাদপত্রের উন্নতি অনিবার্য্য।

সুতরাং বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় যতই কেন ছটফট করুন না—সংবাদপত্রের প্রসার ও প্রচার দিন দিন বেড়েই যাবে। সংক্ষেপে ও-বস্তু অচিরে কচুরিপানার মত বাঙলাদেশকে ছেয়ে ফেল্‌বে।

(৩)

আমি যে অন্তরের সঙ্গে আপনাদের কাগজের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা কর্‌ছি, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। এক বিষয়ে আমি ও "আনন্দবাজার" সমবস্থ ;—"আনন্দবাজার"ও কোন পার্টির মুখপত্র

নয়, আমিও কোন পার্টির মুখপাত্র নই। "আনন্দবাজার" No-changer, আর আমি Independent। No-changer যে No-party, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ সত্যকার পার্টি হচ্ছে all-changer।

এখন Independent নামক জীবটির পরিচয় দিই। সমাজে লোকে যেমন জাত হারালে বোষ্টম হয়,—পলিটিক্সে লোকে তেমনি জাত হারালে Independent হয়। আমরা জনকতক যে পলিটিকাল জাত হারিয়েছি, তার কারণ আমরা জাত রক্ষা করতে চেয়েছিলুম সনাতন পদ্ধতি অনুসারে—নতুন জিনিষ থেকে আলগা হয়ে।

এখন যে আবার কোনও জাতে ঢুকতে পারছি নে, তার কারণ সব দলই বলেন যে, ভলাণ্টিয়ার হয়ে আমাদের দলে যোগ দাও—অর্থাৎ "ঘরের খেয়ে তুমি আমাদের হয়ে কাউন্সিলের মোষ তাড়াও।" উপরন্তু সকল দলই আমাকে দিয়ে স্বদলের গুণ গাওয়াতে চান, কিন্তু কেউই আমাকে নুন খাওয়াতে চান না। আমি অবশ্য নগদ বিদায়ের প্রার্থী নই। কিন্তু হয় ministerগিরি, নাহয় অন্ততঃ কাউন্সিলের Presidentগিরির লোভটাও ত আমাকে দেখানো উচিত। কিন্তু সে লোভ আমাকে কেউ ভুলেও দেখান না। সখের সাহিত্যিক গুণ্ডাগিরি করবার যদি আমার প্রবৃত্তি থাকে, শক্তি থাকে, আর সেই সঙ্গে থাকে অবসর—তাহলে ভাল করে সে সখ মেটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, দলাদল নির্ব্বিচারে সকলের উপর হাত চালানো।

এ কাজের মহা সুবিধা এই যে, এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সকলের গায়ে হাত চালালে কারও গায়ে তা লাগবে না। কারণ সকল হচ্ছে সকল,—অর্থাৎ কেউ নয়। তা ছাড়া আমার হাত অত্যন্ত নরম, আর

পলিটিসিয়ানদের চামড়া স্বভাবতঃই পুরু। তবে এ দলের ভিতর এমন কেউ যদি থাকেন, যিনি কথার ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান—তাহলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, তাঁর কুস্তির আখড়া রাজপথ নয়, পর্দ্দার ও-পারে।

(৪)

এ যুগে কাগজ চালানো যে একটা ব্যবসা, তা সকলেই জানেন। কাগজের এই ব্যবসার দিকটে কি করে বড় করে তুলতে হয়, সে বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই; কারণ হাতে কলমে ও-ব্যবসা আমি কখনো চালাই নি—কারণ চালাতে পারি নি। তা ছাড়া ও বিদ্যে বাঙালী-লোকে আয়ত্ত করতে পারবে না। মাড়োয়ারী ও-ব্যবসা যতদিন হাতে না নিচ্ছে, ততদিন মুদ্রাযন্ত্র টেঁকশাল হবে না। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, দেশী Northcliffe এখন গোকুলে বাড়ছে; আর বলা বাহুল্য যে, সে গোকুল হচ্ছে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। ইতিমধ্যে বাঙালী যদি মাড়োয়ারী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমরা ইদানিন্তন যেরকম ইকনমিক্স-গত-প্রাণ হয়ে উঠেছি, তাতে ভরসা হয় যে, আমরাও হয়ত একদিন সংবাদপত্রের circulation'ও gold currency-র মত ফুর্ত্তিসে চালিয়ে দিতে পারব। জিনিষটে আসলে খুব সুসাধ্য। রূপোকে সোনা করতে পারলেই কেল্লা ফতে।

তবে একটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। সংবাদ পত্রের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, press পুরোদস্তুর পেশাদার হবার পূর্ব্বেও নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছিল। কি

উপায়ে ?—বলছি। তিল কুড়িয়ে তাল করে। বারোমেসে গ্রাহকের উপর নির্ভর করলে ওর প্রচার দেশময় ছড়িয়ে পড়ে না। গ্রাহকের সংখ্যার চাইতে পাঠকের সংখ্যা যে ঢের বেশি, এ জ্ঞান আমাদের হওয়া চাই। পাঠক রাস্তায় রাস্তায় মেলে—গ্রাহক থাকে দূরে দূরে। কাগজ কাটাবার তাই শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নগদ বিক্রী। কাগজের hawker যে তার লেখকের চাইতে কম লোক নয়—এ জ্ঞানের উপর সংবাদপত্রের প্রাণ নির্ভর করে। লেখকরা পারে সুধু লিখতে, কিন্তু hawker-রা পারে তা পড়াতে। এর পর আমাদের কাগজ লেখবার পদ্ধতিও অনেকটা বদলাতে হবে। সভ্য পাঠক ভেবে পড়ে না, পড়েও ভাবে না। সভ্য-যুগ হচ্ছে নিশ্চিন্ত যুগ; অতএব আমাদেরও না ভেবে এমন লেখা লিখতে হবে, যা পড়ে কেউ যেন না ভাবে।

(৫)

কাগজের প্রচার বৃদ্ধি করতে হলে, তার আগে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। যতদিন দেশের বেশীর ভাগ লোক নিরক্ষর থাকবে, ততদিন কাগজের পাইকিরি ব্যবসা করা অসম্ভব। ইংরাজরা যাকে mass-press বলে—সে জিনিষ mass education-এর প্রশস্ত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। একটা উদাহরণ দিই। বাঙলা দেশে ইংরাজের চাইতে বাঙালীর সংখ্যা যে বেশী, এ কথা সবাই জানেন। আর এ কথাও সবাই জানেন যে, ইংরাজী কাগজ Statesman-এর কাটতি বাঙলা কাগজের কাটতির হাজার গুণ বেশী। এর কারণ ইংরাজসমাজে mass education আছে, বাঙালী সমাজে নেই। অতএব হুঁসিয়ার সংবাদপত্রকে লোকশিক্ষার

জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। বিলেতে লোক-শিক্ষা কাগজ-ওয়ালাদের চেঁচামেচির ফলে compulsory হয়েছে। কারণ মানুষ লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হলে, খবরের কাগজ পড়তে বাধ্য হবে অতএব এ বিষয়ে আপনাদের যে কি কর্ত্তব্য, তা বলবার প্রয়োজন নেই। হিন্দীতে বলে, "আক্কেলীকো ইসারা ব্যস্‌"।

দুঃখের বিষয় বাঙলাদেশের সংবাদপত্র তার স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নইলে যে ডালে সে বসে আছে, সেই ডাল কাটতে সে চেষ্টা করত না, উঠতে বসতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করত না। এ বিষয়ে অনেকে অন্ধ যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার ফলে দলে দলে সুধু সংবাদপত্রের পাঠক সৃষ্ট হয়। আমরা যাকে উচ্চশিক্ষা বলি - তাও নামান্তরে লোকশিক্ষা। নিম্নশিক্ষা আর উচ্চ-শিক্ষার ভিতর প্রভেদ এইমাত্র যে, প্রাইমারিশিক্ষিত লোক সুধু বাঙলা পড়তে পারে, আর উচ্চশিক্ষিত লোক ইংরাজীও পড়তে পারে, কিন্তু তা লিখতে পারে না। এ কথা শুনে চম্‌কে উঠবেন না। এঁরা অবশ্য ইংরাজীতে সংবাদপত্র লেখেন। কিন্তু যে ইংরাজী তাঁরা লেখেন, বিলিতী ইংরাজীর সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ, পালির সঙ্গে সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ। ও ভাষায় সুধু পলিটিকাল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা যায়। সে বস্তু কি ?—না সেই পলিটিকাল ধর্ম্ম, যার আদর্শ হচ্ছে নির্ব্বাণ।

বর্ত্তমানের যুগ-ধর্ম্ম হচ্ছে পলিটিক্স্‌। এ যুগে ভগবান বুদ্ধ কিম্বা যিশুখৃষ্ট ধরাধামে অবতীর্ণ হলে তিনি যে সভ্য-সমাজে কল্কে পাবেন না, তা বলাই বাহুল্য,—যদি না তিনি তাঁর ধর্ম্মের সঙ্গে পোনেরো আনা রাজধর্ম্ম মেশান। আর সেই কেমিকাল ধর্ম্মও আর মুণ্ডজটীলদের

মারফৎ প্রচার করতে পারবেন না। ঈশ্বরের "একজাত পুত্র" যিশু-খৃষ্টকেও কাগজ বার করতে হবে, শাক্যরাজপুত্র বুদ্ধদেবকেও কাগজ বার করতে হবে। আর শাক্যসিংহকে লিখতে হবে মাগধী ইংরাজী। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সংবাদপত্রের একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানবের অন্তর্নিহিত পলিটিক্স্‌কে ফুঁ দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা। সকলেই জানেন যে, পঞ্চপ্রাণ মানে পঞ্চবায়ুঃ। 'আমাদের ভিতর যে পঞ্চপ্রাণ আছে, সে পঞ্চপ্রাণকেই এই ফুঁয়ের কাজে নিয়োজিত করতে হবে; আর সে ফুঁ কাগজের নলের ভিতর দিয়ে চালাতে হবে, নচেৎ তার জোর হবে না, ফুৎকার চীৎকারে পরিণত হবে না। সেকেলে ধর্ম্মের সার কথা ছিল ওম্‌—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু টানা। আর একালের ধর্ম্মের সার কথা হয়েছে হুম্‌—অর্থাৎ নিঃশ্বাস ওরফে প্রাণবায়ু ছাড়া। সুতরাং যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে সংবাদপত্রকে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিতে হবে ওঙ্কারধ্বনিতে নয়—হুঙ্কারধ্বনিতে।

একালের এই যুগধর্ম্ম-পলিটিক্স্‌ই সংবাদপত্রের জন্ম দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, পলিটিসিয়ান না থাক্‌লে সংবাদপত্র বাঁচতে পারে না। সে কারণ পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্বন্ধ যে কি, তাও একটু জানা দরকার।

ইউরোপের গত একশ দেড়শ বছরের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় যে, সংবাদপত্র প্রথম আভির্ভূত হয়—পলিটিসিয়ান-দের লাঙ্গুলস্বরূপে। তাই বহুদিন ধরে সে লাঙ্গুল পলিটিসিয়ানরা যে দিকে যে ভাবে আন্দোলিত ও আস্ফালিত করতেন, সে লাঙ্গুলও সেই দিকে সেই ভাবে সশব্দে আন্দোলিত ও আস্ফালিত হত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কাগজ পড়ে দেখুন, তা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ক্ষুদে

ক্ষুদে অক্ষরে পলিটিসিয়ানদের বক্তৃতার রিপোর্টে ভরা। আর আমরা যাকে আর্টিকেল বলি, তাও ছিল ঐ সব বক্তৃতার টীকা ও ভাষ্য। এই বিরাট ভাষাসাহিত্যকে বিলেতের লোকে আজকাল Old Journalism বলে। আমাদের নূতন journalism আসলে বিলাতের সেই পুরোনো journalism.

কালক্রমে কাগজওয়ালারা যখন আবিস্কার করলে যে, mass educationএর প্রসাদে পলিটিসিয়ানদের অপেক্ষা সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সামাজিক মনের উপর ঢের বেশী, তখনই জন্মাল new journalism.

পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে সংবাদপত্রের আজও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বজায় আছে। বদল হয়েছে এই যে, এখন সংবাদপত্র হয়েছে অঙ্গী, আর পলিটিসিয়ান হয়েছে তার অঙ্গ। সংক্ষেপে আগে the dog used to wag the tail, আর এখন the tail wags the dog.

পলিটিসিয়ানরা পূর্ব্ব যুগে প্রমাণ করেছেন যে, কাজের চাইতে কথা বড়; আর কাগজওয়ালারা বর্ত্তমান যুগে প্রমাণ করছেন যে, কওয়া-কথার চাইতে লেখা-কথার শক্তি বেশী।

আমাদের সংবাদপত্রের উন্নতির পথও ওই। অবশ্য সংবাদপত্র যদি তার স্বত্ব সাব্যস্ত করতে চায়—তাহলে প্রথমে পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তার বিবাদ উপস্থিত হবে। কিন্তু তা'তে ভয় খেলে চলবে না। কারণ সংবাদপত্র আসলে বিসংবাদপত্র।

বীরবল।

দোল-পূর্ণিমায়।

(১)

দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা
হৃদয় আকাশে।
দোলফাগুনের চাঁদের আলোর
সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে,
বচনহারা ধ্যানের পারে,
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
ছিল ঢাকা সে।
দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
গোপন রেণুকা,
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে,
লাগ্‌ল যে রঙ্‌ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের তানে তানে
রইল আঁকা সে॥

(২)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বনবীথি
পাখীর কাকলি-গীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত।
বাণী মম নিলো তুলি'
পলাশের ফুল ধূলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমন্ত॥

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দীপালি সংঘ।

(ঢাকা, নারীসভা।)

আজ অনুভব করচি ঢাকা নগরী তার হৃদয়ের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করেচে, এই সঙ্গীতেই তার উপযুক্ত অভ্যর্থনা। যে অন্তর নিকেতনে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার, সেইখানে সমাদর পাওয়াই কবির শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন।

যাঁরা কর্ম্মী, তাঁদেরই পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় আদর; যাঁরা কোনো বড় প্রয়োজন সাধন করেচেন, পুরুষমণ্ডলীর কাছে তাঁরা বড় পুরস্কার পান। কিন্তু আজ আমি মেয়েদের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, তার মধ্যে কোনো কর্ম্মের প্রাপ্তিস্বীকার নেই। তার মধ্যে তাঁদের যে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে, সে আনন্দের কারণ এই যে, আমি মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে কিছু সুর যোগ করে দিয়েছি —যেটা বেদনাকে গানে বাজিয়ে তোলে, পৃথিবীর শ্যামলতার উপর হৃদয়ের লাবণ্য মাখিয়ে দেয়, সংসারকে তার প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গহ্বর থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে চিরকালের আলোতে বের করে আনে। আজ মেয়েদের আনন্দধ্বনির মধ্যে যা' আমাকে পুরস্কৃত করেছে সে হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে মজুরীশোধের কথা নেই। অন্য যে-কোনো আকারে উপকারের কাজ করি, তার জন্যে মজুরী দাবী করা চলে, তার জন্যে বাইরের দিক থেকে পারিতোষিক প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো কর্ম্মের সহায়তা না করে'

কেবলমাত্র আনন্দের পাত্র ভরে দিয়ে থাকি—সুর দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, রস দিয়ে,—তবে আনন্দই তার পুরস্কার।

সংসারে আনন্দভাণ্ডারের ভার ত মেয়েদেরই উপরে। মাধুর্য্যের অমৃত মেয়েদেরই হৃদয়ে। তাদের স্নিগ্ধস্পর্শে জীবযাত্রার কঠোরতা ক্ষয় হয়, তাদের হাসি আর চোখের জলে দুঃখসন্তাপে শান্তি আনে, তাদের সেবায় ও নিষ্ঠায় গৃহ কল্যাণে সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। এই-জন্যে কবিকে পুরস্কার দেবার ভার ত তাদেরই, যে কবির কাজ হচ্ছে সংসারকে রসবর্ষণে শ্রীদান করা। যতদিন আমি সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত আছি, অন্তরের মধ্যে এই আশ্বাস বারবার অনুভব করেছি যে, দেশের মেয়েদের কাছে আমার কবিতা পৌঁচেছে। পুরুষদের মধ্যে সহজে রসভোগের বাধা তাদের বিদ্যার অভিমান, বুদ্ধির অহঙ্কার; বিদেশী সাহিত্যে নূতন অধিকারের উত্তেজনায় তারা পুঁথিগত তুলনার সাহায্যে রসের যাচাই করতে বসে। কিন্তু যাচনদার মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে আর পারে না। সহজ আনন্দ অনুভব করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই কাব্যের রসটিকে পূরোপূরি আকর্ষণ করে নেয়। শিক্ষার দ্বারা নানা সাহিত্যে প্রশস্ত অধিকারের দ্বারা সেই শক্তির উৎকর্ষ ঘটে, এ কথা সত্য; কিন্তু যেখানে স্বভাবত সেই শক্তির দৈন্য, অথচ বইপড়া শিক্ষার দ্বারা সাহিত্য বিচাররীতির একটা বাহ্য কাঠামো হাতে এসেছে, সেইখানেই দুর্ব্বিপাক, সেইখানেই সাহিত্যরাজ্যে মত্তহস্তী পদ্মবন দলতে আসে। আমাদের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার বিস্তার যথেষ্ট হয় নি বটে, কিন্তু তাদের চিত্তের মধ্যে সহজবোধের ঐশ্বর্য্য আছে। সেই কারণে আমার এই অহঙ্কারটুকু সত্য হতে পেরেছে যে, আমার কাব্য গ্রহণ

করতে আমাদের দেশের মেয়েদের তেমন বাধা ঘটে নি। কখনো কখনো এমনো দেখেছি, আমার রচনা সম্বন্ধে বাইরের ঘরে যেখানে বিরুদ্ধতা, ভিতরের ঘরে সেখানে বেদনার সঙ্গে মেয়েরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সাহিত্য মেয়েদের কাছে এই যে আতিথ্য পায়, এটি বিশেষ মূল্যবান; মেয়েদের আনন্দ পুরুষের শক্তির উদ্বোধন।

মাধুর্য্যই শক্তির প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুর হাতে যে গদা আছে, বিষ্ণুর হাতের পদ্মই তাকে পূর্ণতা দেয়। যে-কোনো বড় দেশেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে, রসের ক্ষেত্রে, কর্ম্মের ক্ষেত্রে পৌরুষের নানাপ্রকার উদ্যম দেখ্‌তে পাই, সেইখানেই এই উদ্যমের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে নারীচিত্তের প্রবর্ত্তনা আছে। সেখানে হাওয়ার মধ্যে একটা উৎসাহ নারীর মন থেকে প্রবাহিত হয়ে পুরুষের সাধনাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে। যে সমাজে নারীমাধুর্য্যের সেই অলক্ষ্য উদ্দীপনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সমাজই শৌর্য্যবীর্য্যে কর্ম্মে সৌন্দর্য্যে বিচিত্রভাবে সফল হয়। গাছ আপন শিকড়ের জোরে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে ফুল ফোটায়, ফল ফলায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার শক্তির প্রধান প্রেরণা আকাশের আলোয়, বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে। প্রাণলক্ষ্মীর এই দিব্য দূতগুলি অলক্ষ্য আকারে অশ্রুত পদসঞ্চারে দিকে দিকে বিহার করে। তারাই অরণ্যে অরণ্যে প্রাণের পাত্রকে তেজে পূর্ণ করে দেয়। মেয়েদের অনুপ্রাণনা পুরুষের শক্তিকে তেজ জোগাবার সেই অলক্ষ্য দূত। এই কারণেই ভারতবর্ষ স্ত্রীপ্রকৃতিতে শক্তির রূপ উপলব্ধি করেছে। এখনকার মনোবিজ্ঞান যেমন বলে যে, মনের গূঢ়চেতন লোকে আমাদের মর্ম্ম উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস; আমাদের দেশ তেমনি করেই বলেছে পুরুষের

উদ্যমের দ্বারা গোচরে যে কাজ হয়, অগোচরে তার শক্তিকে সচেষ্ট করে রাখে নারীপ্রকৃতি।

কালে কালে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে নব নব পরিণতি সাধন করতেই হয়। তখন পুরাতন অভ্যাসের জায়গায় নূতন উৎসাহের দরকার হয়। নূতন যুগের আহ্বান উপস্থিত হলে তবু যারা অপরিচিত পথের দুর্গমতা এড়িয়ে পুরাতন কালের কোটরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক্‌তে চায়, মৃত্যুর চেয়েও তাদের বড় শাস্তি, —তাদের শাস্তি জীবন্মৃত্যু। একদিন আমরা ভারতবর্ষে আত্মীয় সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে নিবিড় নিবদ্ধ একটি সমাজ পারিবারিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলাম। তাই আমাদের সংহিতাকাররা বলেছেন—গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নারীকে সেই আশ্রমের লক্ষ্মীরূপে পূজা করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেদিন ভারতবর্ষের এই গৃহধর্ম্মমূলক সভ্যতা ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পুণ্যে সৌন্দর্য্যে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তখন স্বভাবতই মেয়েদের উপর ছিল আতিথ্যের ভার, পূজার ফুলের সাজি সেদিন তারাই সাজিয়েছে, গৃহকে তারা সুন্দর করেছিল, পূর্ণ করেছিল। কিন্তু যে সুরক্ষিত সীমার মধ্যে এটি সম্ভব হয়েছিল, সেই সীমা আজ ভেঙে গেছে। আজ যুগসঙ্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের ডাক বড় হয়ে উঠেছে। সে ডাকে ঠিক মত সাড়া দিতে না পারলেই অসম্মান। আজ আমাদের আশ্রয় একান্তভাবে গৃহের মধ্যে আর নয়। আজ সমস্ত পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্চে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনতা প্রকাশ হয়ে পড়চে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে নূতন ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার

তার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নূতন উৎসাহে নূতন যুগের সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশ্বে আপন যোগ্য আসন অধিকার করতে হবে, সেই উৎসাহকে নিরন্তর সজীব রাখবে মেয়েরা। এই নূতন দিন আজ এসেছে। এদিন পূর্ব্বে কখনো আসেনি, এমন নয়। ভারত একদিন পৃথিবীর সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। সেদিন যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা দেশে দেশে গিয়েছিলেন অমৃত বিতরণ করতে; যাঁরা সন্ন্যাসিনী, তাঁরাও সর্ব্বমানবের মুক্তিদানব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সেদিনকার ইতিহাসের বহুল ভগ্নাংশ প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধ্য এসিয়ার মরুবালুকার মধ্যে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখছি ভারতীয় মৈত্রীদূতদের পদচিহ্ন, পাচ্ছি বিশ্বত্রাণসাধনার প্রাচীন বার্ত্তা; আজ আমাদের পরম অগৌরবের মধ্যে সেদিনকার মহিমার কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল। প্রথম যেদিন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছি, দেখলাম মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের কাছে বসে জাপানের এক ধীবর, বুদ্ধের শরণ নিলাম বলে প্রণাম করচে। রাত্রে দেখি পূর্ব্বকৃত পাপের অনুশোচনা নিয়ে বোধিদ্রুমের তলায় বসে সেই ভক্ত পাপমোচনের প্রার্থনা করচে। এমন দিন ছিল, যেদিন দূরদেশের মুক্তিকামীরা ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি বলে' ভক্তি করেছে। সেদিনকার বিশ্বযজ্ঞের দানক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ আজ কি আপনার হৃদয়কে একেবারে সঙ্কুচিত করতে পারে? অমৃতের পাত্র কি কখনো নিঃশেষে রিক্ত হয়? গৃহপরিধির বাইরে আজ আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করা চাই। বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ দ্বার উন্মুক্ত, সর্ব্বত্র যাবার পথ অবারিত, আজ সেখানে আমরা কি নিয়ে যাব? যারা বণিক তারা পণ্য নিয়ে যায়, যারা দস্যু তারা লুঠ করবার অস্ত্র নিয়ে

ছোটে, যারা জ্ঞানতাপস তারা আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে। ভারতের লোক কি কেবল এই বলেই যাবে যে, আমরা পরের বুলি সংগ্রহ করতে এসেছি, আমরা অজ্ঞান, আমরা অশক্ত, আমরা অকিঞ্চন? তা নয়, এই বল্‌তে হবে আমাদের গুরুর মুখ থেকে আমরা অমৃতবাণী এনেছি। সেই কথা বলবার শুভ সময়কে তোমরা শ্রদ্ধার দ্বারা পুণ্যময় কর। বাহির পৃথিবী থেকে অতিথি আসবে—তোমরা কল্যাণশঙ্খ বাজাও, তাদের বল, তোমরা শান্ত হও, সান্ত্বনা লাভ কর, তোমাদের ক্ষতবেদনা দূর হোক্।

ভারতবর্ষ আতিথ্যকে বড় ধর্ম্ম বলেছে, কেননা আতিথ্যের দ্বারাই বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্বীকার করা হয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য—সে যে খুব বড়, তাকে অল্পপরিধির মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। খাঁচার মধ্যে যে আকাশটুকু আছে, তাতেই ত পাখীর ডানার সম্পূর্ণ সার্থকতা মেলে না। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে ঘরের হাওয়ার যোগসাধন করলে তবে ঘরের হাওয়ার কলুষ দূর হয়। অতিথি গৃহীকে গৃহকর্ম্মের একান্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে আসেন। এইজন্যে অতিথিকে দেবতা বলা হয়েছে, কেননা দেবতাই বড়র সঙ্গে যোগের দ্বারা ছোটকে উদ্ধার করে।

আজ যেমন বৃহৎভাবে ভারতের গৃহকর্ম্মের প্রয়োজনে আমাদের মন জেগেছে, তার অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতার কথা চিন্তা করচি, এই জাগরণের দিনে আজ তেমনি বড় করেই ভারতের ধর্ম্মসাধনের কথাও যেন ভাবতে পারি। এই দুই চিন্তার পথেই মেয়েদের সেবাশক্তি ও শুভবুদ্ধির আহ্বান আছে। এই উভয় সাধনাতেই তোমাদের প্রবর্ত্তনা, তোমাদের মঙ্গল ইচ্ছা দেশকে শক্তি দেবে। আজ তোমরা

তোমাদের কবিকে অভিনন্দন করচ, তার মধ্যে যদি তোমাদের এই কথাটি থাকে যে, "যাও বাহিরে, বিশ্বকে আহ্বান কর"—তাহলে আমি ধন্য হ'ব। সমুদ্রের পরপারে আমার নিমন্ত্রণ আছে; যদি শরীর নিতান্ত অক্ষম না হয়, তাহলে অল্প কয়েকদিন পরে যাব। সেই যাবার আগে তোমাদের কণ্ঠ থেকে আজ যেন এই কথা শুন্‌তে পাই যে, "যাও, ভারতের বাণীকে সমুদ্রপারে বহন করে নিয়ে যাও।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

—:*:—

মহাভারতের একটি শ্লোকে আছে :—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।"

অন্বার্থ :—প্রতিদিন জীবগণ যমমন্দিরে যাচ্চে, কিন্তু অবশিষ্ট যারা বর্ত্তমান থাকচে তারা ভাবচে তারা অমর; এ অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

কথাগুলি মহাভারতের বনপর্ব্বে পাণ্ডুপুত্র বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। স্বয়ং ধর্ম্মরাজই যখন উত্তরটা যথাযথ বলে মেনে নিয়েছিলেন, তখন কথাগুলি ঠিকই বলতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও যদি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হ'ত, তাহ'লে তিনি মহাভারতের পরবর্ত্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই কথাগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে বলতেন, মানুষ প্রতিদিন মানুষের দুঃখভার দূর করবার নব নব উন্নততর জীবন-যাত্রাপ্রণালী বের কচ্চে, কিন্তু যদিও তার দুঃখভার প্রতিদিন নব নব রূপ ধারণ ক'রে বেড়েই চলেচে, তথাপি অনন্তকাল ধরে' তার এই নবতর পন্থা উদ্ভাবনচেষ্টার বিরাম নেই—এর চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?

সেই স্মরণাতীত আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে' মানুষ কতবার, কতভাবে, কতরকমে চেষ্টা করলে, মানুষকে অন্ধকার হ'তে আলোতে নিয়ে যাবার জন্য, বন্ধন হ'তে মুক্তিতে নিয়ে যাবার জন্য, সঙ্কীর্ণ

বিভিন্নতা হ'তে সাম্য-মৈত্রীর দিকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কে বলতে পারে তার চেষ্টা সত্যিই সার্থক হয়েচে? কে বলতে পারে তার দুঃখ-দৈন্য-বন্ধন-অন্ধ সঙ্কীর্ণতা এক তিল কমেচে? আর তা' যাচাই করবার নিকষ-পাথরই বা কোথায়? একদিকে যদি বা এতটুকু কমেচে মনে হচ্চে, অপরদিকে যে তার দশ গুণ বেড়ে গিয়েচে দেখতে পাচ্ছি; একদিকের বাঁধন যদিবা একটু আল্গা হয়েচে, অন্যদিকে যে তার বিশ গুণ আঁট পড়ে' গিয়েচে। কিন্তু তথাপি মানুষের কি বিরাম আছে, নিত্য নিত্য এই উন্নততর জীবন-যাত্রাপ্রণালী উদ্ভাবন করবার? না অন্ত আছে তার বিশ্বাসের যে, বক্ষ্যমাণ পন্থাই তার শ্রেষ্ঠ পন্থা?—কত অবতার, কত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, কত প্রচারক, কত দার্শনিক, কত যুগপ্রবর্ত্তক আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরের বাণী নিয়ে। তাঁদের আশার বাণী, মুক্তির আহ্বান শুনে এই কোটি মানবসন্তান কতবার আনন্দোল্লাসে মেতে উঠল। ইঙ্গিতমাত্র কত কৃচ্ছ্রসাধনা, কত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কত স্বজনশোণিত পাত যে করলে, তার কি ইয়ত্তা আছে? ইষা, মূষা, বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্‌ফিউসিয়াস্, মহম্মদ, রামমোহন—কত মহাপুরুষ এসেছিলেন এই মানবকে মুক্ত করতে, মানবের চিরন্তন দুঃখভার দূর ক'রে তাকে অসীম আনন্দ দান করতে; কিন্তু কোথায় তাঁরা আজ? সেই এক সনাতন উত্তর—'সে অসীম অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হ'তে তাঁরা এসেছিলেন, সেই অন্ধকারের গহ্বরেই আবার সকলে ফিরে গিয়েছেন।' আর এই হতভাগা মানবসন্তান?—সে যে সুধু যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল, তা' নয়; পরন্তু তাঁদেরই বিধান মাথায় করে' নব উৎসাহে নব উল্লাসে সুরু করলে এই অন্তহীন আত্মহনন, এই নৃশংস স্বজন

পীড়ন। ইতিহাস ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে আজ সেই সব মতবাদ প্রতিষ্ঠাব্যপদেশে মানুষের জিঘাংসাবৃত্তির নিষ্ঠুরলীলার কাহিনী বহন করে'।

সৃষ্টির সেই মহারাজ বিশ্ব-বিধাতা এই চির-অবনত দুর্ভাগা মানব সন্তানের পরিত্রাণের জন্য যে সব মহাত্মাদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের সেই মহাবাণী লক্ষ্য করে' যে কত লক্ষ লক্ষ লোক শোণিত তর্পণ করেছে, তা'ত আমরা ভুলতে পারিনি। হায়রে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা! এই কাঞ্চনমৃগের অনুসন্ধানে কত দারুণ অসাম্য, কত নিদারুণ বৈরতা, কত নিষ্ঠুর বন্ধনই যে সৃষ্ট হয়েচে, বোধকরি স্বয়ং বিধাতাও তা' মনে ক'রে রাখতে পারেন নি। এক একবার এই মহামন্ত্রের ভূমিকম্প পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে চলে গিয়েচে, আর শত শত জাতি, শত শত সাম্রাজ্যসৌধ চূরমার হ'য়ে পড়েচে—ধরিত্রী আপন সন্তানের শোণিতে স্নান করে উঠেচে। যেদিন বাঙ্কার শৈল শিখরে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজনবিষাণ প্রথম বেজে উঠল, সেদিন মানুষ যে কি আশা, কি আকাঙ্ক্ষা, কি আনন্দে নৃত্য করে উঠেছিল, কারোর কাছেই তা অবিদিত নেই; এবং আজ আমরা সকলেই যে কি সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার সুশীতল ছায়াতলে কালযাপন করছি, এ কথাও বোধ করি কাউকে বলতে হবে না। তবুও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটচি আমরা সেই মৃগতৃষ্ণিকার হাতছানি লক্ষ্য করে'।

দশহাজার বছর পূর্ব্বে যখন আমরা ককেসস্ পাহাড়তলী থেকে প্রথম শুভ্র সভ্যতার আদর্শ নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তখনও বলতে ছাড়িনি—আমরা যা এনেছি, তাই মানবজীবনের উন্নতির চরম আদর্শ; এবং মানুষকে লাঠি মেরে বোঝাতেও ছাড়িনি—আমাদের আদর্শই

শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আবার হাজার বৎসর পর সেই আমরাই বলেছি, "না না, ও যা বলেছি ও ঠিক নয়। সুখের পথ, আনন্দের পথ ও নয়।" তখনও কি কম মনীষা, কম শক্তি আমরা ব্যয় করেছি জগৎকে বোঝাতে যে, প্রাচীনের জীর্ণ নিগড় ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে মুক্তির নব আহ্বান, আনন্দের নব আস্বাদ লাভ করাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য? কিন্তু সেই চরম লক্ষ্য লক্ষ্য ক'রে যে নব আদর্শের বাণী আমরা প্রচার করলাম, কৈ দু'দিনও আমরা সে কথা মেনে চলতে পারলাম না। এরি মধ্যে যে আবার বলতে সুরু করেছি :—

"Ye wanderers that were my sires,
* * * * * * * * *
Why did you leave for garth and town
Your life by heath and river's brink,
Why lay your gipsy freedom down,
And doom your child to Pen and Ink" ?

কত যত্নে কত প্রাণপাত ক'রে গড়া ইমারৎ যে সব আবার ভাঙ্গতে বসেচি; আবার যে তারস্বরে প্রচার করতে আরম্ভ করেছি—ফেরো ফেরো ফেরো, সুখের পথ ও নয়, আনন্দের পথ ও নয়।

জীববিশেষের গলায় চামড়ার বন্ধনী বেঁধে দিয়ে যেমন তাকে আভিজাত্যের ছাপ দেওয়া হয়, তেমনি 'সিভিলিজেশনের' (Civilization) ছাপ এঁটে দিয়ে মানুষের মধ্যে আমরা যে একটা উৎকট ব্যবধান সৃষ্টি করেছি, তার মূলেও ত আমাদের সনাতন প্রচেষ্টাই প্রকটিত। এই সিভিলিজেশনের এক একটা বন্যা যখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে, আমরা এমনি অভিভূত হ'য়ে পড়েচি যে, যুগ যুগ ধরে তারই হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি করে' জপেচি, "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,

নান্যপন্থা বিদ্যতেহয়নায়"। কিন্তু অয়নায় পন্থা যে অস্তি, তাও আমাদের বুঝতে বেশী দেরী হয় নি। কারণ যাকে 'সিভিলিজেশন' বলে' শতবর্ষ ধ'রে কীর্ত্তন করে এলাম, দু'দিন পরে তাকে হীন "বার্‌বারিজম্" বলতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করলাম না।

তারপর 'সোস্যালিজম্,' 'ইন্‌ডিভিজুয়্যালিজম্,' 'কমিউনিজম্' প্রভৃতি কত মূর্ত্তিতে যে মানুষের সেই অক্লান্ত প্রচেষ্টার আবির্ভাব ও তিরোধান হয়েছে এবং অদ্যাপি হচ্চে, তা' ভাবলে স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বিস্মিত না হ'য়ে পারেন না। কত নিখিল মঙ্গলবিধায়িনী সম্মিলনী, কত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠামূলক সমিতি, কত আন্তর্জাতিক শান্তিসভার প্রতিষ্ঠান হল, যার প্রত্যেকটার মূলমন্ত্র ছিল নিখিল মানবের সুখশান্তি বিধান করবার নবতর পন্থা উদ্ভাবন। কিন্তু এই সভ্যতার আদর্শ যুগে দাঁড়িয়েও কি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সেই সুখের অদৃশ্য তটভূমির দিকে আমরা এক পাও বেশি এগিয়েছি?

সেই অখণ্ড সুখরাজ্যজয়ের দুর্ব্বার তাড়নায় এই অফুরন্ত মানবের অপ্রমেয় শক্তি নিয়ে আমরা পৃথিবীর বুকে যে অঘটন ঘটিয়েছি, তা' ভাবলে সত্যই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কিন্তু যদিচ সে স্বর্গরাজ্যের সীমারেখা এখনও আমাদের দিগ্‌বলয়ের পরপারেই রয়ে গিয়েছে, এবং যদিচ "It may be we shall touch the Happy Isles" ছাড়া অন্য কথা বলবার আমাদের ন্যায্য অধিকার নেই, তথাপি কি অন্ত আছে, প্রতিদিন এই মুক্তি ও সুখসাধনের নবতর প্রণালী উদ্ভাবন চেষ্টার? তাই ধর্ম্মপুত্রের বাক্যের প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছা হয়—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

"ভূতের কথা"।

আজ যে 'ভূতের' কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, সে অশ্বত্থ কি তাল গাছের ভূত নয়; শ্মশানে মশানে যে 'ভূত' বিচরণ করে, তাহাও নয়। তবে আবার কোন্ ভূতের কথা বলিব? যাহা 'ভূত', যাহা 'অতীত', যাহা কাল-সাগরে লীন, তাহারই কথা। তবে কি মনে করেন যে, আমি রাতারাতি একটা প্রকাণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিক হইয়া পড়িলাম? তাহাও নয়। সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা হইতে এই প্রত্নতাত্ত্বিক রোগে অভিভূত, বা 'ভূতপ্রাপ্ত' রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়—এমন কি "সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায়" 'ভূতের' কথা ছাড়া অন্য কথা প্রায় স্থানই পায় না। পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে ত প্রত্নতত্ত্ব অবশ্য অনুশীলনীয় ও অনুসন্ধেয়। ইতিহাস, পুরাণ, কিম্বদন্তি প্রভৃতির আলোচনায় সুখও আছে, লাভও আছে। নানা উপাদানে, কল্পনার সাহায্যে একটা অতীত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বাস করা কম আনন্দদায়ক নয়। তারপরে, বর্ত্তমানকে যখন অতীতই নিয়মিত করিতেছে, তখন অতীতের আলোচনা লাভজনকই বা হইবে না কেন? কোনো জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির কথা জানিতে হইলে, কি তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কিছু কল্পনা করিতে হইলেই, তাহার অতীত ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনা বা অধ্যয়ন আবশ্যক। অতীত বা 'ভূত'কে সুতরাং কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু অতিরিক্ত

মাত্রায় 'ভূতের' বিষয় আলোচনা করিলে, বা শুধু 'ভূত' লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে যে আমাদিগকে 'ভূতে' পায়, এবং শেষে "রোঝা"র পক্ষেও সে ভূত ছাড়ানো কঠিন হইয়া পড়ে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। 'স্বর্ণযুগ', 'সত্যযুগ', 'বীরযুগ' (Golden Age, Heroic Age, &c.) সমস্তই অতীতে বা 'ভূতে' সংস্থাপিত। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে বা পুরাণে ভবিষ্যতে ঠিক স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ না হোক্—কল্পান্তে 'নবীন জগৎ' 'নবীন ভাব' 'নব রহস্যের' (millennium) উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু 'ভূতে'র প্রতি ঝোঁকটাই যেন বেশী।

যুগ বিভাগ বা কল্প-বিভাগ নেহাৎ কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক নয়। ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিভিন্ন যুগের চিহ্ন দেখিয়া থাকেন; তাহা হইতেই 'প্রস্তর যুগ', 'লৌহ-যুগ' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মানব-সভ্যতার যুগ-বিভাগ করিয়া থাকেন, এবং পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যে সমস্ত জীবজন্তু, উদ্ভিদ্, কি খনিজ পদার্থ ছিল, তাহারও কাল ও যুগ বিভাগ করেন। কিন্তু বিজ্ঞান 'ভূতে' কখনও বিশ্বাসবান্ নহেন। ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্তবাদীরা ভবিষ্যতেই স্বর্ণ-যুগের কল্পনা করেন—তাঁহাদের মতে অতিমানুষ বা দেবতারা ভবিষ্যতেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন; 'ভূতে' তাঁহারা দেখেন শুধু সেই 'মহাভূত' সমাধি,—তাহা পাঁচটিই হোক্ বা চৌষট্টি কি ততোধিকই হোক্।

সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তদ্বিপরীত। বাইবেলে আদি-সৃষ্ট নর-দম্পতি নিষিদ্ধ ফলভক্ষণের পূর্ব্বে ছিলেন 'অপাপ-বিদ্ধ', তৎপরে ক্রমশঃ পাপভারাক্রান্ত হইয়া বংশানুক্রমে পাপপ্রলোভন জগতে সংক্রামিত করিয়াছেন।

অবশ্য পুনরুত্থানের (Resurrection) দিনে ত্রাণকর্ত্তা যিশুর কৃপায় সে পাপভার আবার বিমোচন হইবে, এ প্রকার আশার বাণী তাহাতে পাওয়া যায়; তবে সে আশা কবে যে পূরণ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

আমাদের দেশে ত আমরা ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই কয়েকটি যুগ-বিভাগ করিয়া, কল্পনানেত্রে মানবের অধঃপতনের ইতিহাস ও ছবিই বিলোকন করি। সত্য-যুগে—পুণ্যং পূর্ণং, পাপং নাস্তি, পুষ্করনামতীর্থং, মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ, ইচ্ছামৃত্যুঃ, একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, লক্ষবর্ষ পরমায়ুঃ, স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত ভোজন-পাত্রং। আর সেই সত্যযুগের লক্ষণ হইতেছে—সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং, তীর্থানাঞ্চ সদাশ্রয়াঃ, নন্দন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ, সত্যেসত্যপরানরাঃ। সুতরাং আমাদের Superman বা অতিমানুষ ছিলেন সেই সুদূর অতীতে বা সত্য-যুগে। আর আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রমশঃ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রকায়, অল্পায়ুঃ, পাপরত মনুষ্যাধমে পরিণত হইয়াছি এবং হইতেছি। কলি-কালে—পুণ্যমেকপাদং, পাপং ত্রিপাদং, সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ, বিংশত্যধিক শতবর্ষ পরমায়ুঃ। আর সেই কলিকালের লক্ষণ হইতেছে—ধর্ম্মঃ সংকুচিতস্তপোবিচলিতঃ, সত্যঞ্চ দূরেগতং, ক্ষৌণী মন্দফলা, নৃপাশ্চ কুটিলাঃ, শাস্ত্রেতরা ব্রাহ্মণাঃ, লোকাঃ স্ত্রীবশগাঃ, স্ত্রিয়োপি চপলাঃ, পাপানুরক্তজনাঃ, সাধু সীদতি, দুর্জ্জনঃ প্রভবতি, প্রায়ঃ প্রবৃত্তে কলৌ। সত্যযুগের ছবি ও কলিযুগের ছবি তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, আমরা অতীতে কেন এত শ্রদ্ধাবান্। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও কলিকালের কতকগুলি লক্ষণের উল্লেখ আছে, যথা:—

যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ,
ভবিষ্যন্তি শিবে শান্তে, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।
যদা স্ত্রিয়াঃ অতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহেরতাঃ
গর্হিষ্যন্তি স্বভর্ত্তারং, তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
ইত্যাদি –

বর্ত্তমানে অসন্তোষ মানবচরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এই অসন্তোষই মানবের ক্রমোন্নতির একটি প্রধান কারণ, এবং ইহাই আবার কোন কোন জাতির পক্ষে অধোগতিরও কারণ বটে। আমরা 'কলির জীব', সুতরাং আমাদের অধোগতি অনিবার্য্য। আবার প্রলয়ান্তে যখন সত্যযুগোৎপত্তি হইবে, তখন হয়ত আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যের রশ্মি-পাতে এই ভারত-ভূমি আলোকিত হইবে, কিন্তু প্রলয়কালপর্য্যন্ত আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। কোন জাতির পক্ষে 'ভূতে' বা অতীতে অতিশ্রদ্ধা বা অস্বাভাবিক প্রীতি, জাতীয় জীবনগঠনের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহাই বিশেষভাবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাসলেখক মহামতি বাকল ভারতের অতীতে বা ভূতে অতিশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।--

Of all the various ways in which the imagination has distorted truth, there is none that has worked so much harm as an exaggerated respect for past ages. This reverence for antiquity is repugnant to every maxim of reason, and is merely the indulgence of a poetic sentiment, in favour of the remote and unknown.

কল্পনা সত্যকে যতপ্রকার উপায়ে বিকৃতি করিতে পারে, তন্মধ্যে অতীত যুগের প্রতি অতিশ্রদ্ধা যে পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছে, তেমনটি আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। আর এই প্রাচীনকালের প্রতি ভক্তি, বিজ্ঞানের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার বিরোধী এবং সুধু "সুদূর ও অজ্ঞাতের" প্রতি কবিকল্পনার আসক্তি বই আর কিছুই নয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহার বঙ্গানুবাদ এই প্রকার হইতে পারে:—

"ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেও কল্পনার অপ্রতিহত প্রভুত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সর্ব্ব প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, গদ্যরচনার প্রতি বিশেষ অভি-নিবেশ ছিল না। উৎকৃষ্ট লেখকগণ প্রায় সকলেই, জাতীয় চিন্তা প্রণালীর অনুকূল বলিয়া, পদ্যরচনায় অবহিত ছিলেন। ব্যাকরণ, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, ভূগোল, দর্শন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ গ্রন্থই পদ্যে লিখিত এবং নিয়মিত ছন্দে গ্রথিত।

ভারতীয় সাহিত্যের এই বিশেষত্ব যে কেবল বাহ্য আকারেই প্রকটিত তাহা নয়—তাহার মূল প্রকৃতিতেও সেই বিশেষত্ব পরিস্ফুট। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরে রাখাই যেন সে সাহিত্যের প্রকৃতি, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কল্পনার বাহুল্য ব্যাধতে পরিণত, এবং প্রত্যেক বিষয়েই তাহার তাণ্ডব-লীলা।

ইহা হইতেই কবিদিগের প্রাচীন 'সুবর্ণযুগের' কল্পনা! সে যুগে মহাশান্তি বিরাজমান, নীচ প্রবৃত্তি প্রশমিত এবং পাপ দূরে গত। ইহা হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মনুষ্যজাতির আদিম সরলতায় ও পুণ্যে এবং পরে সেই উচ্চাবস্থা হইতে অধোগতিতে বিশ্বাস। ইহা হইতেই,

প্রাচীনকালে মানব সুধু ধার্ম্মিক ও সুখী ছিল তাহা নয়, তাহার শারীরিক গঠনও শ্রেষ্ঠ ছিল, সে দীর্ঘবপু ও দীর্ঘায়ু ছিল--আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও অধঃপতিত মানবের সেই আয়ু এবং দৈহিক দৈর্ঘ্যলাভ অসম্ভব—এইপ্রকার বিশ্বাসের উৎপত্তি।" আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যুগ-বিভাগ মহামতি বাকলের উক্তি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছে।

আজকাল আমরা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সমস্ত কারণ নির্ণীত না হইলে, তাহা পরিহার করিতে বা তাহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হইব না। আমরা আবার জগতে একটি শ্রেষ্ঠ ও গণ্যমান্য জাতিতে পরিণত হইব—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তৎপ্রতিকারের বিষয় চিন্তা করিতেই হইবে। এক দিকে যেমন আমাদের প্রাচীন গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল আনয়ন করিব, অপরদিকে যাহাতে ভবিষ্যৎ আশার অরুণালোকে আমাদের হৃদয় উৎভাসিত হইয়া উঠে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। একটি বালককে অহর্নিশি 'মন্দ' বলিলে সে 'মন্দ' হইয়াই উঠিবে; আর যদি তাহার ত্রুটি দেখাইয়াও দুইটা আশার বাণী শুনানো যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই একদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। "প্রাচীনকালে যাহা ছিল তাহাই ভাল—বর্ত্তমান সুধুই সেই প্রাচীন কালের আবর্জ্জনা"--ইহা যে জাতি ভাবে, তাহার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই তমসাচ্ছন্ন। দিবাবসানে রাত্রি হয়, কিন্তু রাত্রির অবসানের অপেক্ষা করিতে পারিলেই আবার সেই ঊষার অরুণালোক এবং ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন তপনের তীব্র দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানবাদী ও প্রাচীন শাস্ত্রবাদীদিগের বিরোধ, সনাতন শাস্ত্র-

বাদীদিগের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, ও বিজ্ঞানবাদীদিগের ভবিষ্যতে আশা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ডারুইন্ ও ওয়ালেছের ক্রম-বিকাশ বা বিবর্ত্ত-বাদ যখন য়ুরোপে প্রচারিত হইল, তখনই সমস্ত ধর্ম্মযাজকেরা উদ্যত-দণ্ড হইলেন। কোথায় সেই ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত, সারল্যে ও সাধুতায় বিমণ্ডিত মানবদম্পতি হইতে লোক সমূহের উৎপত্তি, আর কোথায় মনুষ্যাকৃতি মর্কট (anthropoid ape) হইতে বর্ত্তমান সুসভ্য জাতি সমূহের ক্রম-বিবর্ত্তন! মর্কট ত দূরের কথা, অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে মানবের বর্ত্তমান সভ্যতা বিবর্ত্তিত, ইহা স্বীকার করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত। কিন্তু উন্নতিশীল য়ুরোপে সহজেই বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং সেই মত অবলম্বন করিয়া আবার কেহ কেহ ভবিষ্যৎ অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

মনুষ্যজাতির ইতিহাসে যে অধঃপতনের দৃষ্টান্ত নাই, তাহা নয়। জড়জগতেও সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক উদ্ভিদ্ ও জীব জন্তুর কিছুকাল উন্নতি হইয়া পরে অধোগতি হইতে থাকে, বা উন্নতির বেগ প্রতিহত হয়। নৈসর্গিক কারণসমবায়েই এ অবস্থা ঘটে। কিন্তু উন্নতি-কামী মানবের সে অবস্থা ঘটিলে চলিবে কেন?

প্রাচীন অনেক সভ্যজাতির অধোগতি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, এবং ইতিহাসও তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, যে জাতি আবার 'নবজীবন' লাভ করিতে চায়, তাহার পক্ষে নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নবীন উদ্যমের আবশ্যক। 'ভূতে' শ্রদ্ধাবান্ হইতে হয়—হও, কিন্তু ভবিষ্যতে আশা স্থাপন কর; নচেৎ শোকে ও নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া, কুল পাওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে

দূরীভূত হইবে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধায় যদি ভবিষ্যতের আশার বীজ উপ্ত করিতে পারা যায়, তবেই না উন্নতির সম্ভাবনা। যে জাতির ইতিহাস নাই, যে জাতির অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি একেবারেই নাই, তাহার উন্নতির সম্ভাবনাও যেমন সুদূরপরাহত; আবার যে জাতি কেবল অতিশ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া ভবিষ্যৎ আশা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে জাতির পক্ষেও উন্নতির আশা তদ্রূপ সুদূর-পরাহত।

মহামতি বাকলের কথা লইয়া ইত্যাকার আলোচনা করিতে করিতে, ভারত-গৌরব, ঋষি-কল্প, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ স্যর্ জগদীশচন্দ্র সেদিন তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তিনি বলিতেছেন ঃ—

"যে মুমূর্ষু, সেইত মৃত-বস্তু লইয়া আগ্‌লাইয়া থাকে; যে জীবিত, তাহার জীবনের উচ্ছ্বাস চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, এই বর্ত্তমান যুগে সমস্ত ভারতের জীবন প্লাবিত করিয়া একটা উচ্ছ্বাস ছুটিয়াছে, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে। আমাদের সাহিত্য কেবল পুরাতন গ্রন্থপ্রকাশ লইয়া থাকিবে না, বর্ত্তমান যুগের নব নব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতিকে একত্র করিয়া একটি 'জীবন্ত সাহিত্য' গঠিত করিয়া তুলিবে।"

এই আশার বাণী লইয়া বৈজ্ঞানিক অক্লান্তদেহে গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। আশা ভবিষ্যতে, কার্য্য বর্ত্তমানে, শ্রদ্ধা অতীতে।

সেই শ্রদ্ধা অতি-শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া যদি বর্ত্তমানের কার্য্যকারিণী শক্তিকে পরাভব করে, এবং ভবিষ্যতের আশালোককে ক্ষীণ বা পরিম্লান করে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে,—

"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥"

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত।

সোনার তরী।

—[ঃঃ*ঃঃ]—

সোনার তরী কবির ত্রিশ হইতে বত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা। ইহার অনেকগুলি কবিতাতেই প্রত্যক্ষভাবে নদীর প্রভাব আছে। ইহার পদ্মা বর্ষার পদ্মা। প্রথম বর্ষাসমাগমে নদী ছাপাইয়া উদ্বেল আনন্দে আপনাকে লইয়া আপনি মত্ত হইয়া ওঠে, তাহার তীরের বন্ধন যে আছে বারে বারে তাহা ভুলিয়া যায়, আপনার প্রাচুর্য্যের গণ্ডিতে আপনি সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে;—এই বইখানিতে কবির প্রতিভারও সেই অবস্থা। অকস্মাৎ শক্তির পূর্ণতা অনুভব করিতে পারিয়া কবি দুঃসহ আনন্দ বেগে পূর্ণ পালের মত ফুলিয়া উঠিয়াছেন। বর্ষার পদ্মার মত কবি ইহাতে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। এক কথায় সোনার তরীর পদ্মায় তীর হইতে নীরের প্রাধান্য; লোকালয় হইতে জলাশয়ের আতিশয্য। ভূতত্ত্বে বলে পৃথিবী প্রথমে জলময় ছিল— কালক্রমে তাহাতে ডাঙ্গা জাগিয়াছে; কবির পৃথিবী এই পুস্তকে জলময়—স্থলের রেখা তাহাতে কদাচিত দেখা যায়। বর্ষার উন্মত্ততার অবসানে যেমন ধীরে ধীরে ডাঙা স্পষ্ট হইতে থাকে, তেমনি দেখিব কবির পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থে জলাশয়ের বিস্তৃতি কমিয়া লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়িতেছে, কবি নিজেকে লইয়া আর মুগ্ধ না থাকিয়া বিচিত্র পৃথিবীর সহিত পরিচয় সাধনে ব্যস্ত। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। বিশ্বের বৈচিত্র্যকে বিশেষ শক্তি দ্বারা নিজের অন্তরে আনন্দময় রূপ দিয়া

আবার তাহা বিশ্ববাসীকে ফিরাইয়া দেওয়া কবি ও শিল্পীর কাজ, এবং ইহাতেই আর্টের চরম সার্থকতা। মেঘদূতের মূল সূত্রটি লইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব মেঘদূত কেন চিরন্তন—কালিদাস কেন অপূর্ব্ব। কালিদাসের মেঘ বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ছিল, শিপ্রা-তীরের কবি স্বয়ং এই উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। পদ্মাতীরের কবি সোনার তরীতে অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ অর্দ্ধেক মাত্র—কেবল নিজেকে লইয়াই সম্মুগ্ধ—পৃথিবীর সহিত তাঁহার প্রেম ও জ্ঞানের পরিচয় স্থাপিত হয় নাই। কয়েকটি কবিতার আলোচনা করিলে আমার কথা উদাহরণের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মানস-সুন্দরী কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র এই কবিতাটি লিখিলেই অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন। কবিতাটির নামেই প্রতীয়মান, কবি নিজের কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রীকে সম্বোধন করিতেছেন। কল্পনার সহিত বাস্তবলোকের সংমিশ্রণ হইয়াছে নিঃসন্দেহ। তবু এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, বিশেষ ভাবে নারীর মানসমূর্ত্তিকে, অর্থাৎ নারী যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার এবং অন্তঃপুরবাসিনী—তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা লিখিত। ইহার সহিত পরবর্ত্তী পুস্তক চিত্রার উর্ব্বশীর কত প্রভেদ। সম্পূর্ণ এক বস্তুকে সম্পূর্ণ দুই স্থান হইতে দেখা হইয়াছে। উর্ব্বশী হইতেছে নারীর বিশ্বগত মূর্ত্তিটি—ব্যক্তিগত নহে; মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে। মানস-সুন্দরীতে কবির নজর ছিল নিজের দিকে, এখানে তাহা পৃথিবীর দিকে।

দেউল কবিতাটিতে কবি যে বিশ্ববিহীন নিস্তব্ধতা ও নিভৃত ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা নিজের অন্তরের। বজ্র পড়িয়া হঠাৎ দেউল

ভাঙিয়া "সংসারের অশেষ সুর ভিতরে এল ছুটি।" ইহা কবির আকাঙ্ক্ষার বিষয়—কিন্তু এখনও উপলব্ধ সত্য নহে। বসুন্ধরা কবিতায় তিনি খুলিয়া বলিয়াছেন, "এখনো মেটেনি আশা, এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি।" কবি জীবধাত্রী ধরিত্রীকে ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে রাজী নন; শিশু যেমন মাতাকে আঁকড়িয়া থাকে, কবি তেমনিভাবে অন্তর্জগৎকে, নিভৃতবাসিনীকে কল্পনার বাহুবেষ্টনে ঘিরিয়া আছেন। সোনার তরীতে বাহির বিশ্বের কথা অল্পই, ইহাতে নিজের হৃদয়কে নিঃশেষে ভোগ করিবার ও জানিবার আকাঙ্ক্ষা একমাত্র লক্ষ্য। বস্তুত নিজের সহিত যোগ স্থাপিত না হইলে, প্রেমের বন্ধন গ্রন্থিযুক্ত না হইলে, পৃথিবীতে বাহির হইয়া কোনো লাভ নাই, কারণ অপরকে জানা যায় নিজেকে জানিবার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই—যেমন বর্ষায় একবার নদী আনন্দে ও জলে উদ্বেল না হইয়া উঠিলে তারপরে ফসল ফলিবে জমির কোন্ রসের অভিজ্ঞতায়? কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—গদ্যপদ্য সংব্যাপ্ত যে কবির জীবন, তাহার সমস্ত সার্থকতা কেবলমাত্র পদ্যে খুঁজিলে মিলিবার নয়। পৃথিবী যেমন বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকাকে লইয়া সম্পূর্ণ, কবির জীবনও তাঁহার কল্পলোক ও বাস্তবের সমাবেশেই গঠিত। বায়ুমণ্ডলে যে সব কাণ্ড ঘটে, তাহার সহিত পৃথিবীর ধূলি রাজ্যের বিশেষ যোগ নাই; তাহার মেঘবিলাস, তাহার বর্ণচ্ছটা, তাহার বিদ্যুৎবিকাশ, তাহার ইন্দ্রধনুর মণিমাণিক্যের কলাপবিস্তার সমস্তই খানিকটা অপার্থিব; কিন্তু সেই মেঘ যখন বৃষ্টিরূপে, সেই বিদ্যুৎ যখন বজ্ররবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। কাব্যটা আমাদের মনের সেই ঊর্দ্ধলোক—সেখানে

এমন সব অলৌকিক ব্যাপার হয়, যাহার সব তথ্য উদ্ঘাটন কবির দ্বারাও সম্ভব নয়। গদ্যের এই ভূমিরাজ্যের কোনো কোনো খবর আমরা বলিতে পারি বটে। সোনার তরীর কবিতাগুলিতে যে সমস্ত আশা, আশঙ্কা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াও অতৃপ্তির যে একটা আভাস, নিজের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলিত হইবার যে প্রবৃত্তি,—কবির গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে তাহা দেখা যায়, অশরীরী রূপ কাটাইয়া অনেকটা মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। সোনার তরীর পূর্ব্বে লিখিত অনেকগুলি গল্পে আমরা দেখিতে পাইব, কবি স্বরচিত কল্পলোক ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসীদের জীবন-যাত্রার সহিত কিরূপ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত গল্পগুলিও লিরিক-গল্প। এগুলি পাথরে খোদিত মূর্ত্তির মত নিরেট নহে—বুদ্বুদের মত ভঙ্গুর। এক একটি চরিত্রের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া এক একটি আকাশকুসুম ফোটানো। উর্ণনাভ যেমন সামান্য যে-কোনো একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া নিজের শরীরের রস দিয়া জাল বুনিতে থাকে, এও অনেকটা তেমনি তুচ্ছ একটা বিষয়কে আশ্রয় করিয়া আপনাকে লোক এবং লোকালয়ের মধ্যে, অন্তরকে বাহিরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার একটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র। খোকাবাবু, সম্পত্তি সমর্পন, দালিয়া, মুক্তির উপায়, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া প্রভৃতি গল্প ইহার প্রমাণ। তাঁহার অঙ্কিত এই সব চরিত্রের আভাস, কে বলিতে পারে কতদিন কবি তাঁহার পরিচিত অপরিচিত কত লোকের মুখে কতদিন দেখিয়াছেন। তাঁহার রাইচরণ, অর্থলিপ্সু যজ্ঞেশ্বর, বুড়ো জেলে, সন্ন্যাসগ্রস্ত মাখন, সুরবালা, কাদম্বিনী, কাবুলিওয়ালা,

ফটিক চক্রবর্ত্তী, বোবা মেয়ে সুভা, পলায়নপরা মহামায়া, বঙ্গ-সাহিত্যের ধ্রুবলোকে স্থান পাইবার পূর্ব্বে শিলাইদহের নগণ্য পল্লীর অধিবাসী ছিল। কবি ইহাদিগের আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম্যজীবনের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া নিজের কল্পলোক হইতে বাহিরে আসিবার ইচ্ছাকে কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী রচনাসমূহে আমরা দেখিব কবির জীবন গদ্য ও পদ্যের দুই পক্ষের সাহায্যে কিরূপে সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতার অভিমুখে বহু বঙ্কিম গতিতে অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের পত্র।

[আজ দিন চার পাঁচ হল, আমার পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে, ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পদ্যে লেখা একখানি পত্রের সাক্ষাৎ পেলুম। আমার "পদচারণ" উপহার পেয়ে তিনি আধ-মজা করে ঐ পত্রখানি আমাকে লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাত থেকে যখন যা বেরিয়েছে, তারই আমার বিশ্বাস ছাপার অক্ষরে ওঠবার অধিকার আছে। এই বিশ্বাসবশতই সে পত্রখানি আমি সবুজ-পত্রে প্রকাশ করছি। আশা করি কেউ মনে করবেন না যে, ওখানি আমি আমার সার্টি-ফিকেট হিসেবে পাঠকের দরবারে পেশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।]

পদচারণের কবি—

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়

সমীপে—

রসের যে সিধা পেনু ঢোলে চাঁটি পড়ার শবদে,—
পাঠাই রসীদ তার, ঢাকে কাঠি থামিবার পরে;
জানেন্ তো কুঁড়ে গরু চিরদিন ভিন্ন গোঠে চরে,
কুঁড়েমি কায়েমি যার, ত্রুটি তার ঘটে পদে পদে।

মরম বোঝে না কেউ, মনে ভাবে মেতে আছে মদে,
কেউ কয় 'চালিয়ান্!' 'কি অসভ্য!' কেউ মনে করে।
আমি শুধু তুলি হাই,—চিঠির কাগজ নাই ঘরে,—
দোয়াতে মসীর পঙ্ক,—এক ফোঁটা জল নাই গঁদে!

লেফাফা দূরস্থ অতি, পোষ্টাপিসে বিকিকিনি তার,
লেফাফাদুরস্ত হওয়া তাই আর হ'ল না আমার।

হু হু করে বে-পরোয়া চ'লে যেতে চায় দিনগুলো,
হাঁ হাঁ ক'রে পদে পদে ওদের কি রাখা যায় ধ'রে?
বিশেষে গরম দেশে,—হাঁফ্ ধরে, নাকে ঢোকে ধুলো;
ঢাকে ঢোলে চিঠি তাই লিখি আমি দু'বার বছরে।

গোড়াতে জানিয়ে হাল, ক্ষমা চাই বিনয়-বচনে,
ওগো ছন্দ- * ! পদচারণের কবিবর!
পায়চারি করে চিত্ত তব গুঞ্জ-গীতিকুঞ্জবনে,
তারিফে ফুটিয়ে তারা, পদে পদে, নিত্য নিরন্তর!

ইতি—
ভবদীয়
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

---

* অস্পষ্ট।

সামান্য কারণে।

(য়াখিন্তো বেনাভেন্তের স্পানিশ হইতে)

একাঙ্ক নাটিকা।

পাত্র পাত্রী।

এমিলিয়া।
মানুয়েল।
গণ্‌থালেথ্‌।
হার্‌নান্‌দেথ্‌।
একজন ভৃত্য।

প্রথম দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

গণ্‌থালেথ্‌, মানুয়েল ও ভৃত্য।

ভৃত্য—আর পেড়াপিড়ি করবেন না; আপনাকে বল্‌ছি সেঞোর* বাড়ী নেই, আজ মোটেই ফির্‌বেন না।

গণ—যখন আমি এসেছি, তিনি নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছেন; আমি ভিতরের খবর বিলক্ষণ জানি।

ভৃত্য—আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌তে চান আপনি—

---

* সেঞোর—ভদ্রলোক; সেঞোরা—ভদ্রমহিলা।

গণ—মোটেই না…এই কার্ডখানা তাঁকে দাওগে।

ভৃত্য—কিন্তু, মশাই…

গণ—কিংবা তাঁর স্ত্রীকে, একই কথা…যেমন করে'ই হোক্ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কর্‌তেই হবে।

ভৃত্য—দেখুন…

গণ—আর কোন কথা না, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তেই হবে।

ভৃত্য—মশাই,…আপনার যা খুশী কর্‌তে পারেন; কিন্তু আমি বলে' রাখছি আপনাকে…

গণ—কিছু বলে' রাখবার দরকার নেই তোমার। তোমাকে তিনি হয়ত এরকম হুকুম দিয়েছেন…হুঁ;…সবই জানি আমি,…এ রকম অবস্থায় কি ঘটে;…আর কি করতে হয় সাধারণতঃ, সেটাও জানি; এখনই তুমি দেখতে পাবে—

ভৃত্য—আপনার যেমন অভিরুচি।

(মানুয়েলের প্রবেশ)

গণ—দেখলে ?

ভৃত্য—সেঞোরের হুকুম আমি তামিল করেছি—কিন্তু সেঞোর…

মানু—আচ্ছা…

(ভৃত্যের প্রস্থান)

গণ—বুঝেছেনত আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার নেহাৎ দরকার কেন ?

মানু—আপনিও বুঝেছেন কারো সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে চাইনে কেন—বিশেষতঃ আপনার মত বন্ধুদের সঙ্গেত নয়ই। আমি

জানি কি বল্‌তে এসেছেন আমাকে···অনাবশ্যক, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; আমার সঙ্কল্প অটল···ঘটনাটা কি তা' প্রেসিডেন্ট আপনাকে ব'লেছেন, খবরের কাগজেও পড়েছেন;···আপনাকে আর বেশী কিছু বল্‌বার নেই।

গণ—কিন্তু···

মানু—অনর্থক, সম্পূর্ণ অনর্থক···কেউ বল্‌তে পারবে না এ গোলযোগ আমি ডেকে এনেছি। আপনি জানেন মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করা অবধি আমাকে কত ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে; মন্ত্রীসভায় থাকা মানে আমার পক্ষে ত্যাগস্বীকারের পরম্পরা মাত্র; যতক্ষণ কেবল আমার ব্যক্তিগত মত, এমন কি আমার মনোভাব সম্বন্ধে কথা ছিল, আমি মন্ত্রীর দপ্তর চালিয়েছি,—কিন্তু এখন, আর না; এখন কথা হচ্ছে জনসাধা-রণের প্রতি, দেশের প্রতি আমার কর্ত্তব্য নিয়ে; এই নূতন ত্যাগের দাবী মেনে নেওয়া আর আমার সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবন অস্বীকার করা একই কথা; তার অর্থ আমাদের দলে আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করা; আমার ব্যক্তিত্ব, আমার বিবেকবুদ্ধি অস্বীকার করা; ততদূর যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য—কারণ, সেটা আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করার সমান হবে।

গণ—কিন্তু ভাই! অবস্থাটা কি, একবার ভেবে দেখ। ঐ গোলযোগ···

মানু—সে দোষ আমার নয়···আমার সৎপরামর্শ কেউ কানে তুল্লে না, আমি যা' ছেড়ে দিতে রাজি সেটা অগ্রাহ্য করলে—দল আমার সর্ব্বস্ব নয়;···আমি আইডিয়াকে মানুষের চেয়ে বড় বলে' মানি।

গণ—সেই জন্যই মানুষের সঙ্গে রফা করা দরকার, যাতে করে নির্ব্বিবাদে আইডিয়ার অনুসরণ করতে পারেন।

মানু—মিছে বাক্যব্যয় করছেন। আমার সঙ্কল্প অটল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ব্বানুরূপ ও হার্‌নান্‌দেথ্‌।

হার—ঠিক! আমি জানতেম বাড়ীতেই আছেন আপনি...... চাকরটা ত আমাকে ঢুকতে দিতেই চায় না। ওহে গণ্‌থালেথ্‌···

গণ—কি ভাই হার্‌নান্‌দেথ্‌! তুমিও কি আমার মত এসেছ···আমাদের বহুমান্য বন্ধুকে সম্মত করাতে?

হার—আমাদের প্রিয় বন্ধুকে···কিন্তু আপনিই রাজি করিয়েছেন নিশ্চয়···সেটা হতেই পারে না···বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্কট ডেকে আনা—আর সঙ্কট কিনা···তুচ্ছ বিষয়ের জন্য! আপনার ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণ থাক্‌লেও বা বুঝতেম;—বিশেষতঃ আপনি জানেন, গবরমেণ্টে ও মেয়র-আফিসে যথার্থ বন্ধু যাঁরা, তাঁরা আপনার হাতে রয়েছেন।

মানু—কিন্তু আমি যে-সকল গুরুতর বিষয়ের অনুমোদন করেছি, উক্ত বন্ধুগণ যে সে-সকল বিষয়ে আমার মতে সায় দেন না।

হার—কিন্তু কারণটাই ত যথেষ্ট নয়; ব্যক্তিগত ভাবে ত কেউ আপনাকে কিছু দিতে অস্বীকার করবেন না।

মানু—জনসাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে দিতে যে অস্বীকার করছেন।

গণ—কিন্তু জনসাধারণ আপনি বলছেন কা'কে! সংবাদপত্রগুলোকে? ওগুলো পড়া যদি আপনি ত্যাগ করতেন!

মানু—আমার বাবা দুর্ব্বলতাবশতঃ আমাকে কলেজে দেন এবং আমিও দুর্ব্বলতাবশতঃ লেখাপড়াটা শিখে ফেলি···হ্যাঁ, গোড়ায় পড়্‌বার বদ-অভ্যাসটা ঐরকম করেই হয়। বিপদ এলে চোখ মেলে দেখ্‌তে চায় না বলে' অষ্ট্রিচ ডানার নীচে মাথা গোঁজবার যে অভ্যাস করেছে, যে ব্যক্তি শাসনভার নিতে যায় তার পক্ষে সেটা মোটেই সদভ্যাস নয়।

গণ—কিন্তু, প্রিয় বন্ধু, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশী চরিত্রবল আছে বলে' আমার বিশ্বাস ছিল।

মানু—আজকাল আপনারা চরিত্রবল বলেন কোনরূপ চরিত্র না থাকাকে, কোনরকম কাজ কর্‌তে বাধাবোধ না করাকে। ও কথা এ স্থলে খাটে না ভাই।

হার—সব-কিছুর উপরে ওঠা, সেটা ঠিক জিনিষ নয়,···সকল বিষয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা···

মানু—কেন মিছে আপনারা ক্লান্ত হচ্ছেন! আমার সঙ্কল্প অটল।

গণ—কিন্তু প্রিয় বন্ধু···ভেবে দেখুন···আপনি ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুতর করে তুল্‌ছেন, বিরুদ্ধপক্ষের হাতে অস্ত্র যুগিয়ে দিচ্ছেন···

মানু—ঠিক তার উল্টো! আমি আমার সহকারীদের মিটমাট করবার পন্থা সহজ করে দিচ্ছি।

হার—আপনি ত জানেন যে, আপনার পদে নূতন লোক এখন নিযুক্ত

হলে তাতে দলের ভিতরকার অনৈক্য বাইরে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

মানু—আমি তাই চাই! সব দলকে আলাদা আলাদা করে' দিতে হবে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে হবে, প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘুচিয়ে দিতে হবে।

গণ—কিন্তু প্রচ্ছন্ন গোলযোগ ঘোচাবার বিপদ আপনি ত জানেন। বিশেষতঃ সে চেষ্টার ফলে যখন আপনার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

মানু—আমি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে' থাকতে রাজি আছি।

হার—একবার দেখুন না যতখানি ছাড়া আপনার পক্ষে সম্ভব, তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আসতে পারেন কি না।

মানু—তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি অনেক আগেই এসেছি।

হার—তবু যদি একটা কোন উপায় খুঁজে পান, যা অবলম্বন করা সম্ভব।

মানু—আমি সেরূপ একটি উপায়ের প্রস্তাব ত করেছি।

গণ—সেটা সম্ভবপর নয়।

মানু—তবে দ্বিতীয় উপায় আর নেই।

হার—একটু সময় দিন আমাদের; সকলে মিলে একটা উপায় আমরা নিশ্চয়ই বের করতে পারব।

মানু—না।

গণ—একটা দিন।

মানু—না।

গণ—একটি ঘণ্টা মাত্র,—বিরুদ্ধপক্ষের দলপতির সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখব, আর তাঁর উত্তর নিয়ে তখনি ফির্‌ব—কিন্তু আরো একটুখানি ছাড়বেন আপনি।

মানু—কখ্‌খনো না। যা ছাড়তে পারি তার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমি পৌঁচেছি।

হার—আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আর একবার কথা না বলে' আপনার সঙ্কল্পের কথা কাউকে জানাবেন না,—এই প্রতিশ্রুতিটুকু আমাদের দেবেন ত ?

মানু—আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। উপায় সম্বন্ধে আমার শেষ প্রস্তাব সর্ব্বাংশে গ্রহণ করা না হ'লে আপনাদের প্রত্যাবর্ত্তন অনর্থক।

গণ—সর্ব্বাংশে ? আর এক ধাপ এগিয়ে আসুন, বন্ধুবর!

মানু—সামনে এগিয়ে চলা ভিন্ন অন্য কোনরূপ চলা আমার জানা নেই। আর এক ধাপ এগনোর মানে আরো কিছু কম ছাড়া।

হার—আপোষের দিকে এগিয়ে আসুন—আর সকলেও ঐ মুখে এগিয়ে আস্‌বে, তখন সব মিটে যাবে—ইতিমধ্যে……, এক ঘণ্টা সবুর……, এক ঘণ্টা……, আপনি ভেবে দেখুন; ইতিমধ্যে… ..., আমরা চেষ্টা করে'……

মানু—আমার বিশ্বাস আপনারা কিছুই করতে পারবেন না—আমি যতটা আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি, তা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন; সেটুকুও ছেড়েছি আপনাদের সদ্ভাবের জন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ।

গণ—আপনি ত জানেন, আমরা আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল।

হার—যতক্ষণ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ততক্ষণ আমরা আপনার অনুগত থাকব। শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

গণ—প্রিয় বন্ধু·········

(উভয়ের প্রস্থান)

মানু—কারো সঙ্গে আর দেখা করব না—কোন অজুহাতেই কাউকেও আর আস্‌তে দেবে না—বলবে আমি মোটরে করে বেরিয়ে গেছি—একেবারে সহর ছেড়ে মফঃস্বলে গেছি—কোথায় আছি জাননা—কাউকেও না, যাই হোক্ না কেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

মানুয়েল এবং এমিলিয়া।

এমিলিয়া—মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহ করে' দেখা দেবেন কি ?

মানুয়েল -- এস, এস !

এমি—এখনও খবরের কাগজ পড় নি ?

মানু—কেন ?

এমি – কারণ, রোজই তা' পড়ে' পড়ে' তোমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়। যদি আমার মত হ'তে—আমি ও-জিনিষ কখনো পড়িনে।

মানু – তোমাকে মন্ত্রীসভার সভাপতিত্বে বরণ করা উচিত।

এমি—অবশ্য সমাজের ও নাটকের খবর ছাড়া—আর বিজ্ঞাপন।

মানু—ঠিক বলেছ; বিজ্ঞাপনগুলি একবার দেখা যেতে পারে।

এমি – কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য তোমার মুখ দেখাই যথেষ্ট—আজকের দিনটা ভাল।

মানু—সে কথা সত্য; আজ কোন খবর নেই।

এমি—অত্যন্ত আনন্দের বিষয়! আর বাস্তবিক, কি খবরই বা থাকবে...দিনের পর দিন এমন একঘেয়েভাবে চলা আর কখনো দেখেছ? বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে—এক্‌স্‌চেঞ্জ পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে।

মানু—আমার চেয়ে দেখছি তুমি বেশী খবর রাখ—তবু বল যে খবরের কাগজ পড়িনে।

এমি—বাস্তবিক পড়িনে; আমার দরজীর কাছে শুনেছি—পারী থেকে তারা একটা ফরমাসী মাল পাঠিয়েছে, তার টাকা দেবার সময় হয়েছে, টাকা দিয়েও দিয়েছি আমি-- কি বল্‌ছ? দেখ, ব'লো না যেন যে আমি বেশি টাকার দাবী কর্‌ছি—আমি, আমি·····হাঁ সেএ্যার! সাধারণ মাসিক খরচ থেকে...

মানু—আমি ত কোন আপত্তি করছি নে।

এমি—ওঃ, আমি ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত মস্ত বড় একজন মন্ত্রিণী হয়েছি! দেখ, আমি কোনরকম বায়না করি নে—উপ্‌রি খরচের তহবিলে হাত না দিয়ে আমার পোষাকের ব্যয় নির্ব্বাহ!. .... তোমার ধারণাই নেই তা'তে কিরকম খরচ লাগে—সমস্ত কাগজগুলো বলে আমার বেশভূষায় সুরুচি ও বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। মন্ত্রীপক্ষের কাগজেও বলে, বিরুদ্ধপক্ষের কাগজও এই কথা বলে।

মানু—সামাজিক সংবাদদাতারা চিরদিনই মন্ত্রীপক্ষীয় হয়ে থাকে। স্ত্রীশাসন চিরকালই অত্যন্ত অত্যাচারী এবং তিলমাত্র বিরুদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

এমি—বরং অত্যন্ত উদার, তাই তার বিরুদ্ধাচরণ হতেই পারে না···
কি শিষ্টতার অভাব তোমার !

মানু—পারী থেকে এমন কি আশ্চর্য্য জিনিষ এল, আমরা শুনতে পাই কি ?

এমি—ওঃ ! শীঘ্রই দেখতে পাবে···সে একটা কবিতা,···একটা স্বপ্ন···একটা আদর্শ পোষাক ! সে আর্টের একটি সৃষ্টি ! পুরুষেরা সে সব সূক্ষ্মতত্ত্বরসাস্বাদনের অধিকারী নয়···তবে সমষ্টি হিসেবে বটে ;—কিন্তু ব্যষ্টি হিসেবে···

মানু—কিন্তু সেই ব্যষ্টির একটা অংশ সম্ভবতঃ জিনিষটার দাম।

এমি—দামের কথা বলছ ? এরকমের পোষাক বরাবরই সস্তা হয়, আর আমার কাছে তাদের দর আলাদা। ঠিক এই জিনিষ অন্যের কাছে তিন হাজারের কমে ছাড়বে না, কিন্তু আমার কাছে নিয়েছে দু'হাজার নয় শ পঁয়তাল্লিশ···, সবসুদ্ধ··· কাষ্টম্ শুল্ক, ডাক খরচা···

মানু—হুঁ ! সস্তা বটে।

এমি—সে একটা প্রকৃত সৃষ্টি..., আর আশ্চর্য্য এই যে, দেখ্‌তে কিছুই নয়..., সেই ত সত্যিকার ফ্যাশন, একেবারে সাদামাঠা... হাতে নিয়ে হয়ত বল্‌বে, এর আবার দাম কি,...যে সে ত এমন জিনিষ বানাতে পারে। কিন্তু যেই সেটা কারো গায়ে ওঠে···তখন...দেখ্‌বে...দেখ্‌বে...

মানু—সে সৌভাগ্য কবে হচ্ছে ?···

এমি—কি যে জিজ্ঞাসা কর ! পরশু সকালে, প্রাসাদে, যখন তুরস্ক যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ ভোজ হবে।

মান্নু—পারস্যদেশের—

এমি—তবেই হ'ল...এবার আর বুককাটা পোষাক নিয়ে বক্তৃতা দেবার সুবিধা পাচ্ছ না...

মান্নু—না, আমি আর কিছু বল্‌ছি নে..., ভাল কথা...সে ভোজটা যখন...

এমি—কি! বন্ধ হয়ে গিয়েছে? যুবরাজ আস্‌বেন না?

মান্নু—তিনি আসবেন, হাঁ সে-এরারা,—আর তিনি না এলে আর কেউ আস্‌বে,...কিন্তু সেদিন আর আমি মন্ত্রী থাক্‌ব না।

এমি—কিরকম! কেন, কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে? তাই বা কি করে' হবে? আমার চুল-বাঁধুনী ত আমাকে কিছুই বলেনি!..

মান্নু—সে এখনও এ খবর জানে না...

এমি—সে ত গণ্‌থালেগ্‌ আর হারনাদেখের বাড়ীতেও কাজ করে!...

মান্নু—সঙ্কটটা আংশিক মাত্র—আমি একাই ইস্তফা দিচ্ছি...

এমি—তুমি একা? এমন কি করেছ তুমি, যে তোমাকে একা ইস্তফা দিতে হচ্ছে?

মান্নু—এখন তোমাকে সে কথা বল্‌তে পার্‌ছিনে—কিন্তু যথেষ্ট কারণ আছে...

এমি—আঃ, তাহ'লে তোমার আপন ইচ্ছায়—

মান্নু—তা' নয়ত কি? তুমি কি ভাবছ তারা আমাকে ত্যাগ করেছে?

এমি—তা ছাড়া ত আমি বুঝ্‌তে পারছিনে। ব্যাপারখানা কি—

মান্নু—আমার মতের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মতের মিল হচ্ছে না...; সকলের উপরে আমার মত...

এমি—আমার বিশ্বাস ছিল তোমার মতই গবরমেণ্টের মত...

মানু—কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমারও তাই বিশ্বাস ছিল।

এমি—ওঃ, তাহলে মোটে কাল সন্ধ্যায় এই ব্যাপার ঘটেছে!...আর আমাকে তুমি কোন কথাই বলনি!...

মানু—রাত্রে একবার সব ভেবে দেখ্‌বো মনে করেছিলেম।

এমি—ও, তাই সারারাত ছট্‌ফট্‌ করছিলে!...ইস্তফাপত্র তারা গ্রহণ করেছে?

মানু—করুক্‌ বা না করুক্‌···

এমি—ওঃ! তাহলে এখনও সেটা পাঠাওনি?

মানু—হাঁ, একরকমে···চিঠিতে দস্তুরমতভাবে এখনও পাঠাইনি।··· তারা আশা করছে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে...তারই চেষ্টা চল্‌ছে···

এমি—নিরস্ত করতে পেরেছে?···

মানু—কোনমতেই নয়···আমার সঙ্কল্প অটল। যতখানি ছাড়া যায় আমি ছেড়েছি···

এমি—তুমি যে ধার চেয়েছিলে, তা দিতে চায় না তারা?

মানু—হাঁ, তা দেবে···; আমাকে তুষ্ট করবার জন্য তারা উঠে পড়ে' লেগেছে।

এমি—তবে···?

মানু—তা'তে কিছু এসে যায় না···ধার নিয়েত কথা নয়···এ হচ্ছে জনসাধারণের নিকট, দেশের নিকট আমার দায়িত্বের কথা... তোমাকে আর কি বোঝাব?—তবে এটুকু জেনে রাখ যে যথেষ্ট কারণ আছে···

এমি—কি জানি...; কিন্তু তোমার একা ইস্তফা দেওয়া...এটা অত্যন্ত বিসদৃশ...লোকে বল্‌বে তোমার কোন কারণই নেই...

মানু—তা'ত বল্‌বেই...

এমি—আরো এক কথা...,সবাই নিজ নিজ পদে বাহাল থাকবে...কি বিশ্রী যে দেখাবে...আর তোমার শত্রুরা আনন্দ করবে...

মানু—আমার শত্রুরা স্বীকার করবে যে আমার আন্তরিকতা আছে।

এমি—অর্থাৎ তুমি বল্‌তে চাও যে; মিত্রের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার চেয়ে শত্রুর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা তোমার বেশী পছন্দসই !

মানু—দেখ এমিলিয়া ! তোমাকে রাজনৈতিক বন্ধুরূপে কোনদিন দেখ্‌তে ইচ্ছা করিনি, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ত দূরের কথা।

এমি—আমিও তা মনে করিনে...,কিন্তু চিরকাল দেখেছ আমি কেমন সৎপরামর্শদাত্রী গৃহিণী..., সেইরূপেই সর্ব্বদা আমাকে দেখো। এ কথা বল্‌তে পারবে না যে আমি কখন তোমার কাজে হাত দিতে গিয়েছি। তোমাকে সুপারিশ-পত্র দেওয়ার জন্যও কখন বিরক্ত করিনি..., তুমিত জান কত লোকে সেজন্য আমাকে ধরেছে...তোমাকে কোনরকমে বিরক্ত করব না বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অসদ্ভাব পর্য্যন্ত হয়েছে। তুমি মন্ত্রী হবার পরে, কি চেয়েছি তোমার কাছে ? কেবল আমার দাসীর বাগদত্ত বরের জন্য একটা পুলিসের চাকরীর একটু সুপারিশ; আর আমার চুলবাঁধুনীর বোনের যাতে আইনপরিষদের এক সভ্যের কিনেমেটোগ্রাফে চাক্‌রী হয়, তার জন্য একটুখানি সুপারিশ। আমার পদমর্য্যাদার কখন অপব্যবহার করেছি,

সে কথা বল্‌তে পারবে না। আমার জায়গায় আর কেউ হলে একবার দেখতে কি করত। তোমার সহযোগী রুইথ গোমেথের ঘরে ত একজন আছে, সে তার স্বামীকে না ব্রেক-ফাষ্ট, না ডিনার, কোনটাই শান্তিতে খেতে দেয় না...এবং স্বামী যদি তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন ত সে এ মন্ত্রীর কাছে সে মন্ত্রীর কাছে চেয়ে চেয়ে বেড়াবে।

মানু—এ মন্ত্রী সে মন্ত্রী যদি না থাক্‌ত!

এমি—যার তার কাছে চাইত। তার স্বামী ত তবু মহা খুসী আছে।

মানু—মোটেই না;—কাউন্সিলে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হয়···

এমি—তাই বলে' পদত্যাগ করবার আবশ্যক হয় না! শুন্‌ছ?—ঘণ্টা বাজ্‌ছে। বন্ধুবান্ধবেরা কেউ হয়ত আস্‌ছেন তোমাকে বোঝাবার জন্য; কোন অপরিচিত লোক হয়ত খবর নিতে আস্‌ছে···

মানু—আমি কারো সঙ্গে দেখা কর্‌ব না বলে' দিয়েছি···

এমি—তোমার পদত্যাগের কারণ তাহ'লে বাস্তবিক গুরুতর?

মানু—অত্যন্ত গুরুতর।

এমি—অন্ততপক্ষে সবুর করাও চলবে না?

মানু—কি উদ্দেশ্যে? যা হবার তা হবে···আর তুমিও ত সর্ব্বদা বল যে তোমার ইচ্ছা আমি এ সব কাজের চাপ থেকে মুক্ত হই,···এ সব খেজালতের···

এমি—হাঁ সেঞোর,···হাঁ,···তা বলি বটে; তবে কথা হচ্ছে···

মানু—কথা হচ্ছে?

এমি—একবার আমার মন্ত্রীর-স্ত্রী হবার সাধ মিট্‌লে!···

মান্‌নু—যদি তুমি এত জাঁকজমক ভক্ত না হতে ! তোমার কথায় মনে হয় যেন আমার মন্ত্রীপদ রাখ্‌তে হয় কেবল লোক দেখাবার জন্য,...কেবল...ওহো, এই দেখ ! সেই পারীর পোষাক,... পরশু ঐটে পরে' বাহার দেখাবার সখ...

এমি—কি বল্‌ছ ? আমি বড় ভুল করে ফেলেছি !

মান্‌নু—আর কোন সুযোগ যেন তুমি পাবে না ! কোন বল্‌...

এমি--সেটা বল্‌-নাচের পোষাক নয়...ডিনারের ;—সেটা এমন ধাঁচের যে ডিনার ছাড়া, এবং রাজবাড়ীর ডিনার ছাড়া, আর কোন সময়ে কাজে লাগ্‌বে না।

মান্‌নু—সেই সঙ্গে বল যে পার্সী যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার ডিনার ছাড়া... সেটাও নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত ! জানিনে এমন কি বিশেষত্ব আছে সে পোষাকে, যে একটা বিশেষ সময় ছাড়া কাজে লাগ্‌বে না !

এমি—কি যে বল্‌ছ তার ঠিক নেই ;—সেটা ঠিক অমনি ধরণের,... আর আমারও সখ ঠিক সেই সময়ে বাহার দেখান। অন্য গবরমেণ্ট ছেড়ে এই গবরমেণ্টে মন্ত্রী হ'তে তোমার এত ইচ্ছা কেন ?...সেইটে বল...

মান্‌নু—বেশ, এইত আমি নিজের ইচ্ছায় ছাড়্‌ছি...

এমি—হার্‌নান্‌দেথ্‌কে ক্ষেপাবার জন্য,...তুমিই আমাকে এ কথা বলেছ...তাহ'লে বুঝ্‌তে পার আর কাউকে ক্ষেপাবার জন্য. আমার এত আগ্রহ কেন,...আমি জানি সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে ;...তোমার সহকারী মন্ত্রীদের কা'র স্ত্রী...

মান্‌নু —কে বল্‌লে ?

এমি—হাঁ হাঁ, আমি শুনেছি;...আমাকে বলেছে; বলেছে যে আমার অত্যন্ত বদ্‌রুচি...মন্ত্রীদলের মধ্যে কেবল আমার অল্প বয়েস ব'লে!...

মানু—আরো বল্‌তে পার, সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে...

এমি—ওটা অবশ্য তোমার কথা,...শুনে খুব খুসী হলেম...কিন্তু সে ত যে-কেউ হতে পারে;...কিন্তু মার্জ্জিতরুচি হওয়া—সেটা ঢের বেশি শক্ত কথা।

মানু—তোমার মার্জ্জিত রুচিও বটে,...যেমনটি হওয়া উচিত...

এমি—তা হোক্,—কিন্তু এবার দেখ্‌বে! এক এক সময়ে আমার বেশভূষা ঠিক হয় নি তা' বুঝতে পেরেছি, বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে...কিন্তু এবারকারের পোষাক একদম সেরা ছাঁদের; এ নিয়ে কুড়িদিন ধরে দরজীর সঙ্গে রোজ আমার লেখালেখি হয়েছে,...নমুনা, নক্সা, বর্ণনাপত্র কেবল যাওয়া আসা করেছে, ...কিছুতে ঠিক করতে পারছিলুম না কি ক'রে যে মনের কল্পনাগুলোকে রূপ দিতে পারি। "আপনি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন" —পোষাকওয়ালা আমাকে এক চিঠিতে লিখ্‌লে...

মানু—তাই নাকি!

এমি—"সর্ব্বদা আমার কথা মনে রাখবেন,"—প্রত্যেক চিঠিতে আমি তাকে লিখ্‌তেম...

মানু—তাহ'লে জেন যে ঐ চিঠিপত্র যার হাতে পড়বে...

এমি—সেই পোষাক তোমার জন্য পরতে যাচ্ছি, বুঝ্‌লে? তোমার জন্য! আমি চাই আর কেউ দেখবার আগে তুমি সেটা দেখবে, তুমি তার প্রশংসা করবে।

মানু—না, না..., সে সুযোগ ত হচ্ছেই...

এমি—পরশু...

মানু—হাঁ, রিয়াল থিয়েটারে সেদিন একটা অভিনয় আছে, সেদিন যদি পর...

এমি—রিয়াল-থিয়েটারের পক্ষে সেটা বড্ড বেশী জমকালো হবে; লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে...

মানু—যেন সেইটেই তোমার অভিপ্রায় নয়!

এমি—লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা? মোটেই না! সত্যিকার ষ্টাইল ত সেইখানেই...কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, অথচ সকলের চোখেই পড়বে...

মানু—সেটা কিরকম দাঁড়ায় আমার কাছে পরিষ্কার হল না। যাই হোক্, পোষাকেরও গুপ্তরহস্য আছে বটে...

এমি—ঠিক রাজনীতির মত...আজই তার একটার পরিচয় পাওয়া যাবে...

মানু—একটার? কোন্‌টির?

এমি—তোমার পদত্যাগ বন্ধ করবার।

মানু—একটা পোষাকের জন্য? উপভোগ্য প্রস্তাব বটে!

এমি—পোষাকের জন্য না, আমার জন্য! তুমি কি মনে কর তোমার এই ত্যাগের মূল্য আমি বুঝিনে? যদিও সেটাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না,...কিন্তু তুমিও ত তোমার বন্ধুদের মত সকলের আগে আনন্দ প্রকাশ করবে?

মানু—আমার বন্ধুরা করবেন নিশ্চয়..., আর আমাকে লক্ষ্য করে কি হাসিটাই হাস্‌বেন!

এমি—যেন তাঁরা তুচ্ছতর কারণে গুরুতর কোন কাজ কোনকালে করেন নি!

মানু—পোষাক পরে' বাহার দেবার খেয়ালের চেয়েও বেশী তুচ্ছ কারণে?

এমি—একগাছা ফিতে গায়ে লাগাবার বা মুখস্থকরা বক্তৃতা শুনিয়ে দেবার খেয়ালও হতে পারে। সবই অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি···; কিন্তু তোমাদের পুরুষদের ধারণা যে তোমাদের অহঙ্কার অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের জিনিষ...আর বাস্তবিক ধরতে গেলে পদত্যাগ করবার জন্য তোমার এত জিদের কারণ কি?—না অহঙ্কার।

মানু—আত্মসম্মান!

এমি—অহঙ্কার! একটা কথা যখন বলে ফেলেছ, সেটা আর না করা চলে না···; তোমার দৃঢ়তার খ্যাতি বজায় রাখ্‌বার অহঙ্কার। আর সেজন্য তুমি বন্ধুবান্ধবদের মুস্কিলে ফেলতে প্রস্তুত, গবরমেণ্টকে একটা দুস্তর সঙ্কটের মুখে এগিয়ে দিতে প্রস্তুত..., কোন লাভই হবে না···; সকলের ধারণা তুমি দাম্ভিক, একগুঁয়ে, কোন অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে' নিতে পার না··· এ দোষ তোমার চিরকালই আছে ..; কাগজগুলো প্রত্যেক দিন তোমার সম্বন্ধে এই কথাইত বলে···

মানু—তবু সেগুলো পড়তে হবে?

এমি—কখনো কখনো...হাতে এসে পড়লে···, রোজ সেগুলো তোমার সম্বন্ধে লিখ্‌বে..."মন্ত্রীর একগুঁয়েমি···, তাঁর একবগ্‌গা স্বভাব...তিনি একগুঁয়েমিকে দৃঢ়তা বলিয়া ভুল

করেন"...সে কথা কিছু মিথ্যাও নয়; ঐ জন্যই ত বাড়ীতে কেউ দেখা করতে আসে না...

মানু—এমিলিয়া! তুমি অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা বলতে ভালবাস।

এমি—সত্য কথা চিরদিনই অপ্রীতিকর...তুমি আমাকে আর শুনিও না যে মন্ত্রীসভার আর সকলের কথা কিছু নয়, তুমি যা বল্‌ছ তাই একেবারে বেদবাক্য...আর তা হ'লই বা...; শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের মত মেনে চলেন...তাঁরাও আরেক সময়ে তোমার কথা অনুসারে চল্‌বেন...তুমি লোক হাসাতে যাচ্ছ... তোমার পরামর্শদাতা হয়েছেন তোমার "পরমবন্ধু" পেপে..., তাই তোমার এমন দুর্দ্দশা। বেশী করে দৃঢ়তা দেখাতে গিয়ে এখনই একটা কাণ্ড বাধিয়ে ব'স, তখন যা'তে তোমার অনিষ্ট হয় সেইরূপ পরামর্শ দেবার সুযোগ হবে...পেপের মতলব তুমি মন্ত্রীপদ ছাড়; সে তোমাকে ভয়ানক হিংসে করে।

মানু—কিন্তু পেপে কতখানি দেখেছে, আর কি-ই বা পরামর্শ দেবে আমাকে?...

এমি—কি বল তুমি...সে সব দেখেছে, সব জানে...যখন থেকে তোমার আফিসঘরে সে পা দিয়েছে...আমি হলেম ঐ যা' বলেছি...কুরুচিসম্পন্না...ভাল-ফেশান খাবার ঘর হচ্ছে পাড়া-গেঁয়ে কফিশালার মত দেখ্‌তে, আর তোমার আফিস দেখ্‌তে মুদ্দফরাসের ঘরের মত...মুদ্দফরাসের মত দেখাবার জন্য তুমি এমন দরজীর কাছেই যাও, যে পোষাক পর্য্যন্ত ঠিক করে তৈরী করতে জানে না। সেদিন রাত্রে বল্‌-নাচের নিমন্ত্রণে দূতাবাসে গেলেন; আজকাল হর্ত্তনের মত বুককাটা

জামা কেউ পরে না, সাটিনের চুড়িদার হাতা কেউ পরে না... তোমাকে দিল ঐরকম সাজিয়ে ••, তুমি যে ঐ-সব সৌখীন জামা পর, ওগুলো হাস্যকর—দেখ্‌বে কাগজগুলো ঐ নিয়ে তোমার কেমন ব্যঙ্গচিত্র বের করে•••

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া! আমার সমস্ত স্নায়ু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, তাই কোন উত্তর দিলেম না।

এমি—তোমার রাজনৈতিক উৎপাত আমার উপর যতখানি, তার প্রতিশোধ নিতে পার্‌লে তবে ঠিক হ'ত। তোমার রাজনীতি চর্চ্চার দরুণ—আমার লাভের মধ্যে যত ক্ষতি ও অসুবিধা হয়েছে...তোমার জন্য আমার পরম বন্ধুদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ হয়েছে,...আর এমন বিস্তর লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়েছে যাদের দু'চক্ষে দেখতে পারি নে,...যারা কোনরকমে সম্মানের যোগ্য নয়, যারা আলাপের অযোগ্য। প্রত্যেক বিষয়েই এইরকম,...আগাগোড়া ত্যাগস্বীকার...গেল গরমের সময় তুমি মাদ্রিদে একা পড়ে থাক্‌বে বলে হাওয়া বদ্‌লানো হ'ল না, কারণ তোমার পরম সোহাগের কর্ত্তেস্* ছেড়ে যাবার উপায় ছিল না,...এবার বড়দিনের সময় তোমার নানা প্রিয় প্ল্যানের পাল্লায় পড়ে মাকে দেখতে যাওয়া হল না। আর একবার একজনের যাতে একটু সন্তোষ হয়, একটা খেয়াল একজনের হয়েছে ব'লে,...সেটা যেন একটা অপরাধ,...তার জন্য কিনা সে হল কুটচক্রিনী, সে ভয়ানক কি একটা দাবী

* কর্ত্তেস্—Sp. Cortes = আইন সভা।

কর্‌ছে, একজনের রাষ্ট্রীয় জীবন, একজনের আত্মসম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে, ..আরো কত শুনব! তোমার কেবল বলা বাকী রইল যে, রুইথ্‌ গোমেথ তার স্বামীকে যেমন করেছে, আমিও তেমনি তোমাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছি;...সেটুকু বাকী থাকে কেন...বল, আমাকে ও কথাও বল...বলে ফেল...

মানু—এমিলিয়া! এমিলিয়া!...

এমি—না, এবার আমিই বলব যে তুমি ইস্তফা দাও...আজই এই মুহূর্ত্তে! কিন্তু ফের আমার কাছে রাজনীতি বা মন্ত্রীর দপ্তরের কথা তুলতে পাবে না...এখান থেকে উঠে ছোট এমন কোন পল্লীতে গিয়ে আমরা বাস করব, যেখানে অন্ততঃ শান্তি মিল্‌বে ...ঐ জিনিষটাই আমি চিরকাল চেয়েছি,...ছোট্ট বাড়ীটি হবে, দু' চারটে মুরগী পায়রা থাক্‌বে,...আর, আর...এইরকমের নরক নয়, এ সব দলাদলি নয়...তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌বার চাইতে...তোমার আর সকলের উপরে বিরক্তির শোধ আমার উপর দিয়ে তোলবার আগে...

মানু—এ যে বিরুদ্ধপক্ষের কুড়িটা বক্তৃতার চেয়েও সাংঘাতিক... আমি এই চল্‌লেম কংগ্রেসে,...সেনেটে,...এ ছাড়া আর সবই সহ্য করতে পারব...আমার ওভারকোট, টুপি...

এমি—তাহলে ইস্তফা দেবে না?

মানু—না, ইস্তফা দেব না...মন্ত্রীসভায় না থাক্‌লে আর কোন্ ছুতায় অত সময় বাইরে থাক্‌ব...কে আর এক বছরের মধ্যে তোমাকে ঘাঁটাতে যায়! ভোজে যেও, পোষাকের বাহার

দেখিও। এ ধরণের সমস্যার মীমাংসা পেটিকোটের দ্বারা হওয়া এই প্রথম নয়···খুশী হয়েছ ?

এমি—হয়েছি, কিন্তু রাগ ক'রো না...যখন পোষাকটা দেখ্‌বে, সব বুঝবে তখন !

মানু—তা বুঝব, কিন্তু কাল থেকে তোমার সমাজসমাচার ছাড়া আর কিছু পড়া চল্‌বে না, কারণ খবরের কাগজগুলো আমার সম্বন্ধে যা বল্‌তে সুরু করবে !

এমি—বিরুদ্ধ দলের কাগজ। তুমি ইস্তফা দিলে মন্ত্রীপক্ষের কাগজও সেইরকম বল্‌ত···ওগুলো ত ঐ বলার উপরেই আছে !

মানু—এর পরেও মেয়েরা আবার চায় যে তাদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হোক্, যেন তারা সমস্ত দুনিয়াই শাসন করে না !

এমি—আমি ছাড়া ! আমি ও সব চাই না···এ বিষয়ে প্রস্তাব উঠ্‌লে তুমি তার বিপক্ষে ভোট দিতে পার।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

সাধুমা'র কথা।

——০*০——

[সৌভাগ্যক্রমে এবং ঘটনাচক্রে একটি আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে, যার লেখিকা অতীতে ছিলেন বিশিষ্ট বংশের কন্যা ও বধূ, এবং বর্ত্তমানে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিনী। আধুনিক অর্থে শিক্ষিতা মহিলা না হলেও, নারীসুলভ সরল লেখাপাতে ও গল্পচ্ছলে নিজের জীবনীসঙ্গ সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ঘরের এমন উজ্জ্বল চিত্র তিনি এঁকেছেন যে, আমাদের পক্ষে তা' যেমন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, অপর পাঠকের পক্ষেও তাই হবে মনে করে', যথাসম্ভব সংকোচনপূর্ব্বক এই বিস্তৃত আত্মকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সবুজপত্রে প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করেছি। স, স]

আমার মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন, তাঁর ধৈর্য্য ও দয়ার বিষয় লেখা আমার ন্যায় অক্ষমা কন্যার অসাধ্য। তবে নারায়ণের কৃপায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব। আমার মা'র প্রথমে একটি কন্যা হয়। সেটি জন্মগ্রহণ করে' মাত্র ১৩ দিন জীবিত ছিল। পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম হয়, তাঁর জন্ম হবার পর আমার পিতামহী বড় বেশীরকম আনন্দিত হন। তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে এক মাস নহবৎ বসে, আর দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান করা হয়। পরে ঐ পৌত্রটীর জন্য একটী ধাত্রী নিযুক্ত করেন। ত্রিতলের উপর সদা সর্ব্বদা রেখে তাঁকে পালন করা হয়। এমন কি, আমার মায়েরও কোলে করবার পর্য্যন্ত সাধ্য ছিল না। অবশ্য পাঠকপাঠিকারা বলতে পারেন যে, সে বিষয় আমি কিরূপে জানলুম? আমার মা'র মুখে

সকলই গল্প শুনেছি, সেজন্য লিখছি। যতটুকু সুখ পেলে মানুষ মনে করে অপরিসীম, তা তিনি পেয়েছিলেন। আবার দুঃখও যাকে বলে অপর্য্যাপ্ত, তাও শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। এ দুটীর কোনটীতেই মাতাঠাকুরাণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। তাঁর সুখের কথার কিছু গল্প শুনেছি। তাঁর পিতা সেকালের হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তাঁর পসার বিলক্ষণ ছিল। উপার্জ্জনও বিস্তর করেন; কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না। সমস্তই পরিবারবর্গের ও নিজের ভোজন ও সুখবিলাসে ব্যয় করেন। আমার মাকে অতি সুখে ও যত্নে লালনপালন করেন। মাতাঠাকুরাণীর সাত বছর বয়সে বিবাহের সম্বন্ধ হয়। পানপত্রও খুব সমারোহের সহিত হয়। আর সেইদিন অবধি নিত্যই দুই পক্ষ হতে নানারকম বস্ত্র, অলঙ্কার, বিলাসের বস্তু আর নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রীর আদানপ্রদান চলে। পরে দশ বছর বয়সে সমারোহের সহিত বিবাহউৎসব সম্পন্ন হয়। নববধূও খুব আদরের সহিত দিন যাপন করেন। কিন্তু এ সুখ অতি অল্পদিনই রইল। পরে বারো বছর বয়সেই তাঁর প্রথমা কন্যা হল, পরে আবার তেরো বছর বয়সে একটী পুত্র হয়। পুত্রটী হবার পর হতেই তাঁর মনোকষ্ট আরম্ভ হয়, কারণ আমার পিতামহীর মেজাজ নতুন ধরণের ছিল। তিনি ঐ ছেলেটীকে মা'র কোলে আদবে দিতেন না। এর কারণ আর কিছু নয়, সুধু কর্ম্মফল,—সুখের সংসারে দুঃখ—হরিষে বিষাদ। পিতামহীর মনে এই ভাব যে, এ ছেলে দাই রেখে আমি পালন করব; ও মা'র কাছে গেলে আমার প্রতি বেশী ভালবাসা হবে না; এ ছেলে আমাকে মা বলে ডাকবে। ফলে হ'লও তাই, কিন্তু মার প্রাণ সর্ব্বদাই একবার কোলে

নেবার জন্য উৎসুক হ'ত। আমার ঠাকুরমা যেদিন বড় বোনের বাড়ী বেড়াতে যেতেন, মা যেন সেদিন একটু আনন্দ পেতেন। ঘরে বস্ত্র অলঙ্কার খাদ্যাখাদ্যের, কোন বিলাসের দ্রব্যের কিছুই অভাব ছিল না। তবে সর্ব্বদা ঘরে রুদ্ধ অবস্থায় থাকাই তাঁর ব্যবস্থা ছিল। আর তার উপর প্রথম কন্যাটী হয়ে মরে' যাওয়ার পরে ছেলেটি হ'ল, তাকে নিয়ে যে একটু আনন্দ করবেন, কি একটু কোলে নেবেন, তাঁর অদৃষ্টে সেটিও ঘটেনি। ঠাকুরমার অনুপস্থিত হওয়া শুনেই মা অমনি আমার দাদাকে একবার ডেকে কোলে নিতেন। একদিন এইরকমে তাঁর স্তনপান করাবার সাধ হয়। সেদিন একেবারে তুমুল কাণ্ড হয়। পুরানো ঝি মা'র কাছে চুপি চুপি মন রক্ষা করে' ডেকে এনে "খোকাকে নাও বৌঠাকরুণ" বলে দেয়। আবার ঠাকুরমা সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আস্‌তেই পুরানো ঝি সংবাদ দাখিল করেছেন— মা, আজ বৌঠাকরুণ খোকাকে দুধ খাইয়েছেন। আমার পিতামহী স্বর্গগতা দেবী। আমার তাঁর নিন্দা করা যদিও অন্যায় হয়, এটি যদিও মনে আছে, কিন্তু লিখতে গেলে সত্যই লেখা উচিত। তিনি কিছু খোসামোদপ্রিয় লোক ছিলেন, লাগানো কথাটা খুব শুনতেন। তিনি যদিও বিদ্যাবতী ও গুণবতী ছিলেন। এমন কি, আমার পিতামহ যখন বায়ুরোগে পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি নিজে জমিদারী সংক্রান্ত কাজ পর্য্যন্ত দেখতেন। কিন্তু ঐদিন ঐ কারণে আমার মা'র বিস্তর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ছেলে কোলে নেওয়া সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ঝি'র প্রতি কড়া হুকুম জারি হয়—খবরদার আর কখনও খোকা দোতলায় না যায়, ও ছেলেকে মেরে ফেল্‌বে। এখনকার বৌঝিরা কেমন গানবাজনা করে, স্বচ্ছন্দে সুখে বেড়ায়;

কিন্তু আমার মা ঘরের বারাণ্ডায় বেরতে পারেন নি, মনের কষ্টেই দিন গত হয়েছে। যদি কোনদিন ঠাকুরমা কোথায়ও বেড়াতে যেতেন, তবে একবার উঠান দেখবার সাধ হত, বেরিয়ে দেখতেন, ও মনে কত আনন্দ হত। তবু রাস্তা কি গাড়ীঘোড়া দেখবার সম্পর্কও ছিল না। এ উঠানে কি আছে? আছে একটী বোজানো পাতকুয়া, আর একটী জলযুক্ত কুয়া। বৃহৎ উঠান, তিনদিকে রোয়াক, আর একদিকে চৌতলা-সমান প্রাচীর। এই দৃশ্য দেখতে মা'র বাসনা হত। আমার এ গল্প শুনে বড় আক্ষেপ হয়। পরে আরও শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, একদিন ঠাকুরমা তাঁর মাসীর বাড়ী গেলেন, মা অমনি উঠান দেখতে বেরিয়েছেন। একটী দাসীর মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন; একটু পরে উঠে আবার কুয়া ও উঠান দেখছেন। এমন সময় আমার ঠাকুরমা এসে পড়েছেন। তখন যদি দাঁড়িয়ে ঘরে যান, তাহলে নীচে থেকে দেখা যায়। অগত্যা কি করেন, ঝুপ্ করে বসে পড়ে, অমনি শুয়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঘরে যান। এইরূপ নানাপ্রকার মানসিক কষ্টে কাল যাপন করেন। পরে আমার জন্ম হয়, ও খুব আনন্দোৎসব হয়। ঠাকুরমা খুব ভালও বাসতেন, তবে দাদার মত নয়। সেজন্য আমার পালনভার মায়ের উপরেই ছিল। আমার কাছে একটী চাকর ও একটী ঝি ছিল, আর ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার দৃষ্টি অষ্টপ্রহর ছিল।

আমার পিতামহী ত্রিতলের উপর শুতেন। যখন আমার পিতামহের খাওয়া হয়ে যেত, পরে তিনিও আহার করে উপরে যেতেন। দোতলার ঘরে ঝি চাবি বন্ধ করে, আমার পিতামাতার সংবাদ এনে দিত। পরে ঠাকুরের প্রসাদী বেলফুলের গড়ে, মিঠা পানের দোনা,

রূপার জপের মালা, গামছা, জলের রূপার ঘটি, আর একজন লণ্ঠন নিত। এই সকল অনুষ্ঠান সমাপন করে, পরে তেতলায় উঠ্‌তেন। আমরা ঠাকুরমাকে দিদিমা বলে ডাক্‌তুম, ঠাকুরদাদাকে কর্ত্তামণি বলে ডাক্‌তুম, এখন হতে সেই নামেই অভিহিত করব।

ভোরবেলা আমি ভূমিষ্ঠ হই। খুব আনন্দ হতে লাগ্‌ল। বাজনায় বাড়ী ভরে উঠ্‌ল। ছেলের কোলে মেয়ে হলুম কিনা। আর লোকে বলে যে, আমার নাকি একটু রূপলাবণ্যও হয়েছিল। আমাদের এক কবিরাজ মহাশয় ছিলেন। তিনি রোজ প্রাতঃকালে ও বৈকালে দুইবার সব বাড়ী একবার একবার ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন, কে কেমন আছে। বাবুরা ও মায়েরা সুধু প্রণাম নিয়েই ক্ষান্ত হতেন, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলি ও দাসদাসী সকলেই—কেউ কবিরাজদাদা ও ছেলে বলে আবদার করত আর হাত দেখাত। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন ছ'বছরের, আমি কবিরাজ ছেলেকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির করে' তুলতুম। আর মিছে করে বলতুম—ছেলে, আজ আমার বড় গায়ে ব্যথা। মাথা ধরেছে বল্‌লেই বলতেন--হাত দেখি, হুঁ, নাড়ি চঞ্চল, আজ আর ভাত নয়। আমরা তখন হাস্‌তে লাগলুম। আমি ও আমার দাদা দুজনেই কবিরাজ ছেলেকে নিয়ে এইরূপ আনন্দ করতুম। কিন্তু ছেলে এত ভালমানুষ ছিলেন যে, এতে কোনদিন তাঁর একটু রাগ বা বিরক্তির ভাব দেখতে পাইনি। তিনি থাক্‌তেন আর খেতেন আমাদের বাড়ীর আর এক অংশে, আমার পিতার ছোটকাকিমার কাছে, আমার ছোটদিদিমার বাড়ীতে। বাড়ীটি প্রকাণ্ড সাতমহল ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিবার হলেই ক্রমে ক্রমে খুঁটিনাটি

সামান্য কারণে পৃথক হয়ে পড়ে। এঁরাও এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হন। আমার পিতামহরা তিন ভাই ছিলেন। আমার কর্ত্তামণি মেজ ছিলেন। এঁরা দুজনে সম্মুখের অংশ আধা আধি পান। পশ্চাৎ ভাগটা ছোটদাদামহাশয়ের ভাগে পড়ে। কিছু লম্বা অধিক ছিল। ঐখানে ঢোলের মহল নামে একটা মহল—তাতে ঐ কবিরাজ মহাশয়ের বাসা ছিল। কবিরাজ মহাশয় সব বাড়ী ঘুরে শেষে বাসায় যেয়ে ছোটমার সঙ্গে দেখা করে, একটু তত্ত্বাবধান করে, পরে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর খবরাখবর দিতেন ও গল্পগুজব কর্‌তেন। ছোটদিদিমার কথা যখন পেড়েছি, তখন যতটুকু সংক্ষেপে পারা যায় তাঁর দোষগুণ কিছু বলা চাই। তিনি বড়ই চতুরা ছিলেন, এবং একটু বেশীরকম স্পষ্টবক্তা ছিলেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে প্রায় সকল লোকের বনিবনাও হত না। আমার দিদিমার কাছে যা শুনেছি তাই লিখছি। এতে গুরুজনের নিন্দাজনিত পাপ আপনারা মাপ করবেন। তাঁর জন্যেই বিবাদবিসম্বাদ বাধে, ও বাড়ীটিতে রাতারাতি বিস্তর রাজ লেগে প্রাচীর উঠে যায়। এমন কঠিন পণ যে রাত্রি প্রভাত হলে কেউ আর কারোর মুখদর্শন করব না। এই সকল ভাব বহুদিন স্থায়ী হয়। তবে প্রথম প্রথম ঝি পাঠানো ও খবর নেওয়াটা ছিল। সেজন্য আমার জন্মাবার পরেই ছোটদিদিমা তাঁর একটী পুরানো ঝিকে পাঠান। সে দেখে গিয়ে কি বলে, ভগবান জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যেমন কবিরাজ ছেলে বলেছেন—ছোটমা, আজ মেজমার ওখানে বাবুর একটী চমৎকার খুকি হয়েছে, যেমন রং তেমনি একমাথা কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল আর বাটাপানা মুখ, ঠিক চাঁদের মত মেয়েটী। এ সকল অসহ্য কথা ছোটদিদিমার সহ্য করা

সুকঠিন হয়। তিনি একটু আওয়াজটা উচ্চে চড়িয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, এই যে স্বর্ণ দেখে এসে বল্‌লে যে সর্পমাথা কোটরচোখী পেঁচামুখীর মত এক কন্যা হয়েছে, শুনেছি বাছা শুনেছি! এখন পাঠক পাঠিকারা শুনুন, এটা অসামান্য রূপের বর্ণনা বটে। দুটোর মধ্যে যেটা হয় বিশ্বাস করুন, তবে যদি আমার উপর বিচারের ভার পড়ে, তাহলে তা'তে দর্পণের আবশ্যক। তাতে আমি দেখেছি আমি কিছুই নয়,—সুরূপা নয় আর কুরূপা নয়, একটা মানবী মূর্ত্তি এই পর্য্যন্ত।

তবে শুনুন। আমার মা আমায় পেয়ে বড়ই খুসি হন। একেত প্রথম কন্যাটি মারা যায়, আবার ছেলেটীকে নিয়েও আনন্দ করতে পান নি। সেজন্য আমার দিনের মধ্যে চারপ্রকার সাজ বদল হত। আর দিদিমাও খুব ভালবাস্‌তেন। তিনি আপন হাতে রোজ রূপটান্ মাখাতেন, এটি একটা আগেকার প্রথা ছিল। তাঁরা বল্‌তেন যে এতে শরীর পোষ্টাই আর সুশ্রী হয়। এর অনেক তদ্বির ছিল, ও অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করা হত। বাদাম, পেস্তা, পোস্ত, জাফরাণ, মোমদিস্তা, দুধ, সর, কুসমফুল—এই সকল জিনিষ মোলায়েম করে বেঁটে, দুধ ও ময়দা দিয়ে গোলা হ'ত। তাই মাখানো হত, তার উপর বেসন, তারপর উত্তম সাবান মাখানো হত। এতে আমার শরীরটী খুব ভাল ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে অতিশয় স্থূল হল, তা'তে তখনকার দিনে নিন্দনীয় ছিল না, বরং আনন্দই ছিল। তার উপর আবার রংটি সাদার উপর গোলাপী ছিল, সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। আবার নাকটা টিকলো ছিল, চোখ দুটি মাঝামাঝি ছিল। ভুরু জোড়াটিত আমার দর্পণে অতি কদর্য্য ঠেকে, কিন্তু সে সামলে আমার

জন্ম হয়, তখন এর বড় বেশী সুখ্যাতি ছিল। ঠোঁট দুটো অবশ্য পাত্‌লাই ছিল, এজন্য আর মুখটা বড় খারাপ দেখায় নি। কিন্তু আমার যখন জ্ঞান হল সুরূপ ও কুরূপ বিচার করবার, তখন দেখতুম যে আমি একটী মানুষ—এই পর্য্যন্ত। তবে আমার একটা শোভা ছিল কিনা বটে—চাঁচর কেশ। আমাদের মেয়েমহলে বলে কেশেই বেশ। এটা আমার প্রচুর পরিমাণে ছিল। যাই হোক, এর বর্ণনা কিছু বিস্তর হয়ে পড়ল। মোটের উপর পাঠিকাগণ এই বুঝবেন যে, সে আমলে আমার রূপের খুব নাম ছিল। আমার কর্ত্তামণিও এই রূপে ভুলেছিলেন। তিন মাস বয়স থেকেই ছবি তোলা আরম্ভ হয়। আমাকে তিন মাস থেকেই ইডেন পার্কের হাওয়া খাওয়া অভ্যাস করানো হয়। আমাদের একটী দাদা ছিলেন, তিনি আমাদের খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি আমাদের বড় ভালবাসতেন। আর আমরাও তাঁকে খুব ভালবাসতুম ও আদর করতুম। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে বস্‌তেন। আর গরম জলে বসানো থাকৃত দুধের বোতল, সঙ্গে সুজ্‌নী ও অয়েলক্লথ্‌ থাকৃত। এত হাঙ্গামা করেও আমায় হাওয়া খাওয়ানো চাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকে। আমার যেটুকু লেখা সাঙ্গ হয়ে গেল, এটুকু এই রূপেই আমার শোনা কথা। এইবার আমার পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এখন থেকে যতটুকু মনে পড়ে সেটুকু লিখব।

আমার কর্ত্তামণির তিনটি ঘোড়া ও দুখানি গাড়ী ছিল। সকাল ৪টায় আমার বাবা ও আমি গাড়ী চড়ে মাঠে যেতুম। মা নিজে স্পিরিট ল্যাম্পে চা তৈরী করে দিতেন। আমি ও বাবা দুজনে চা পান করে, গরম কাপড় প'রে, জুতো মোজা ও টুপি এঁটে বেড়াতে

বেরতুম। তখন আকাশে তারা থাকত। যখন মাঠে পৌঁছতুম, তখন বেশ ফরসা হয়ে যেত। ছুটাছুটী ও খেলা খুব হত। দু' চার জন ইংরেজ বালিকার সঙ্গেও ভাব হয়েছিল। এইরূপ বেলা আটটা পর্য্যন্ত খেলা করে কোনদিন একেবারে বাড়ী আসা হত, আবার কোনদিন উইলসেন হোটেলে গিয়ে চা, বিস্কুট, কেক্ খাওয়া হত, আর মনের মতন খেলনাও কেনা হ'ত। পরে বাড়ী এসে কাপড় ছেড়ে একটু দৌড়াদৌড়ি হত। দাদাকে গল্প বলা হত, তাঁকে খেল্‌না দেখানো হত। তা ছাড়া বল্‌তুম—আমি ভাই এই দেখলুম, ঐ দেখলুম; এটা কিনেছি, কেক্ কিনেছি। হয়ত কোনদিন দাদার জন্যে লুকিয়ে রুমালে কেক্ বেঁধে এনেছি। দাদাকে দিতুম। লজেঞ্চুস্ ও চকোলেট্ প্রায়ই আন্‌তুম। কেক্ রোজ আনতুম না, কারণ আমার দাদা পেটরোগা ছিলেন। তাঁর আহারাদির একটু বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল, কেক্ খাওয়া দিদিমা শুন্‌লে বক্‌বেন। কিন্তু আমার ঠিক তার উল্টো। বল্‌লে আপনাদের অবিশ্বাস হবে যে, এত করে খাওয়া বোধহয় এত অল্প বয়সে কেউ খায় না। তা ছাড়া এ বয়সে আমি চঞ্চলাও খুব বেশী ছিলাম; কেউ কোন বিষয় নিষেধও করত না—এইটী আশ্চর্য্যের বিষয়। বেড়িয়ে এসেই কাপড়গুলি গয়ারাম চাকর ছাড়িয়ে দিলে। ঝিকে আমি বড়ই ভালবাসতুম, কারণ সে ছেলেবেলা থেকেই আমার লালনপালনের ভার নিয়েছিল। সে আমার ইজারটী বদ্‌লে সাদা ইজার ও গাউন পরিয়ে দিলে। তখন আর আমায় পায় কে?—আমি কাপড় ছেড়েই, দাদার সঙ্গে একটু দুষ্টামি করে, ছুটলুম অমনি পাশের বাড়ী। সেখানে আমার জ্যেঠামহাশয়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। আমার দুই জ্যেঠাইমা ছিলেন—বড়মা ও মেজমা।

এঁরা আমায় ঠিক মাতৃস্নেহ দিতেন। আমার বড়মা খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল ঠিক কাঁচা সোনার বর্ণ, আর সৌন্দর্য্যে ঠিক দেবীপ্রতিমার মত ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তিনি পূজা অর্চ্চনা নিয়েই বহু সময় অতিবাহিত করতেন। এঁর কাছে আমরা আব্দার বা খেলা কর্‌বার বড় ফুরসুত পেতাম না। বৈকালে একটু বস্‌বার ঘরে বসতেন। কিন্তু আমার রোজ বেড়াতে যাওয়া ছিল ব'লে তাঁর কাছে বসা বা খেলা হয়ে উঠ্‌ত না। তবে কোনদিন যদি বেশী বাদল হ'ত, তাহলে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হত। সেদিন বড়মার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প শুনতুম। হয়ত তাসখেলা দেখতুম, নাহয় রামায়ণ শুনতুম। আর একটু একটু মুখস্থ করতুম—যোগসিদ্ধ মহা-তেজা, জনক নামেতে রাজা, আমি সীতা তাহার নন্দিনী। দশরথসুত রাম, নবদুর্ব্বাদল শ্যাম, বিবাহ করেন পণে জিনি। শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর, কতমত করিলাম সুখ, শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ী-গণের তত, নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক। হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড। কুব্জি দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, মোরে বিধি কৈল লণ্ডভণ্ড। আমি কন্যা পৃথিবীর, স্বামী মোর রঘুবীর, মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস বিরচিত, সুললিত গীত মনোহর॥ এটুকু আমার প্রথম মুখস্থ বিদ্যার নমুনা।

আমার মেজমা ঠিক তাঁর দু'টী মেয়েকে যেমন ভালবাসতেন ও আদর করতেন—আমাকে তেমনি করতেন; বরং আমি তাঁর কাছে বেশী আব্দার করতুম। দুষ্টামীর জন্য মা'র কাছে ধমক খেতুম কখনো কখনো। সেজন্য তত আব্দার জানাতে সাহস হত না। মেজমার কৈ

মাছে বড় ডিম বেরলে, আমি যদি তখন ও-বাড়ীতে থাক্‌তুম তাহলে সেটা আমার মুখে না দিয়ে তিনি কখনো বড়দিদি কি ছোটদিদিকে দেন নি। আমসত্ত্ব দিয়ে কলা ক্ষীর ভাত কি পরমান্ন মাখ্‌লে আমরা বসে খেতুম। আমরা সবাই মিলে খুব দৌড়াদৌড়ি ও লুকোচুরি খেল্‌তুম। এমন কি, এক এক দিন আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছে হত না। জোর ক'রে চাকর এসে ধরে নিয়ে যেত।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল থেকে নেপাল)

(১)

কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন।

[অনেকের বোধহয় মনে আছে যে, বছর পাঁচেক আগে বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ এবং পুরাতত্ত্ববিৎ আচার্য্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক বাঙ্গলা দেশে এসেছিলেন, এবং নেপালে গিয়েছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অমায়িক ব্যবহারে বাঙ্গালী বন্ধুগণ যেমন আকৃষ্ট, তাঁর পত্নীর সৌজন্য ও সহৃদয়তায় মেয়েরাও তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমাদের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আপনার লোক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সুদূর স্বদেশে ফিরে গিয়েও যে এই "ক্ষণিকের অতিথি" আমাদের ভোলেন নি, তার প্রমাণ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত উল্লিখিত পুস্তকপ্রেরণে ও পুস্তকান্তর্গত বর্ণনেও পাওয়া যায়। সেই অনাড়ম্বর স্বল্পভাষী প্রৌঢ়া রমণীর মধ্যে যে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লুকানো ছিল, তা' এই পুস্তকপাঠ ভিন্ন আমাদের জানবার উপায় ছিল না। হাল্কা হাতের দু'চার টানে তিনি এই নব নব দৃশ্যঘটনা-বহুল বিদেশভ্রমণের যে জীবন্ত ছবি এঁকেছেন, তা' অনুবাদের মলিন দর্পণে প্রতিফলিত খণ্ডিতাকারেও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হবে বলে' আমাদের বিশ্বাস। যাঁরা এ দেশের নিছক প্রশংসা শোনবার আশা করবেন, তাঁরা হতাশ হবেন তা আগেই ব'লে রাখছি। কিন্তু পরের চোখে নিজেদের কেমন দেখায় জানবার জন্য যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁরা এই বিদেশিনীর দৈনিক লিপি থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন এই ভরসায়, লেখিকার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমি তাঁর ভ্রমণকাহিনীর কিয়দংশ অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলেম। শুনতে পাই তিনি বাড়ীতে যে চিঠি লিখতেন, এই বইখানি তারই সংগ্রহ।

শ্রী ইন্দিরা দেবী।]

সিংহল।—বন্দরে লাগবার হৈচৈয়ের মধ্যে, মঙ্গলবার ১লা নবেম্বর ১৯২১, ১১টার সময় আমরা জাহাজ থেকে নাবলুম। সিংহলী সুন্দরীর প্রথম নমুনা;—দু'টি মেয়ের পরণে একইরকম ছোট সাদা কুর্ত্তা, গায়ে বেশ চোস্ত বসা, কোমরে বেশ কসে' আঁটা, কুনুই পর্য্যন্ত আস্তিন, লম্বা সায়া; একটু নড়লে চড়লেই বেশের দুই অংশের মধ্যে শরীর দেখা যায়। পুরুষেরা সামাজিক অবস্থা অনুসারে কমবেশী কাপড় পরে; রিক্‌শ বা পুস্‌পুস্‌টানা কুলিদের পরণে এক জাঙ্গিয়া মাত্র, কিন্তু প্রায় সকলেরই একটি করে' ছাতা আছে। আমাদের সভ্যতা যা' কিছু বিস্তার করেছে, এমন কি তামাক এবং মদের চেয়েও, এই জিনিষটিরই আদর বেশি হয়েছে বলে' বোধ হয়। এটি সবরকম কায়দায়, এমন কি পিঠে ঝুলিয়েও লোকে নিয়ে বেড়ায়।

রাস্তায় ছোট ছেলেদের চোখের বাহারে বড় সুন্দর দেখায়; তাদের খালি গা, কখনো কখনো কোমরে একটা ছোট ঘুন্‌সি বাঁধা; কখনো কখনো এই ঘুন্‌সিতে ঝোলানো একটি হর্ত্তনাকার রূপালী পদক আমাদের আদিম পিতার আঙুরপাতার স্থান অধিকার করে।

* * * * *

আমরা এখানকার একটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক—র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি কেঁচে স্বদেশী পোষাক ধরেছেন, আগাগোড়া সাদারঙের নরম কাশীরেশমের কাপড়, খালি পায়ে চাপ্‌লি জুতা। তাঁর স্ত্রী এলেন, সাদার উপর গোলাপীরঙের এক ইংরাজ রমণী, পরণে ফল্‌সাইরঙের সুন্দর সাড়ী; অবশ্য ইংরাজসমাজ এঁদের প্রতি বিমুখ।

এঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় এসে আমার যেন চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল, আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম; ফলের মত রাঙা রাস্তা, নানাপ্রকার সুগন্ধী গাছ, মাটিতে ঝরে'-পড়া ফুলের আস্তর, যেন মশলা-দেওয়া এই সকল তীব্র সৌরভ,—বোধহয় কল্পনার চোখে অমরাবতী দেখতে গেলে এইরকমই দেখে থাকি। সূর্য্য যে আকাশে অস্ত যাচ্ছে, সে আকাশ যেন নাটকের রঙ্গমঞ্চ, সেখানে ভয়াবহ মেঘ দ্রুতবেগে চলাফেরা করছে, তাদের রঙে চোখ ঝল্‌সে যায়,—এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়া নাম্‌ল। মস্ত মস্ত কাকের ঝাঁক এক এক জায়গায় জড় হচ্ছে, বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে, আকাশ অন্ধকার করে' ফেল্‌ছে।

বুধবার, ২রা—আজ সকালে আমরা কলম্বো থেকে ক্যাণ্ডি যাবার প্রচলিত পথে যাত্রা করলাম। এ রাস্তা বিখ্যাত ও বহুবার বর্ণিত :—গ্রাম, থরকাটা ধানের ক্ষেত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের বন, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সেই ফুলের সৌন্দর্য্য যা'তে মনকে কিছু অভিভূত করে' ফেলে। এক জায়গায় করাতের কারখানায় একটা হাতী কাঠের বোঝা তুলছে; আর কিছুদূরে এক নালায় একটি ছোট্ট কুমীর অঙ্গভঙ্গী করছেন।

*　*　*　*

বৃহস্পতিবার, ৩রা— শ্রীযুক্ত ক—দের সঙ্গে শেষ বিদায় নিয়ে, ও কিছু সওদা করে' আমরা ভারতবর্ষে যাবার গাড়িতে উঠলুম। কারণ সিংহল ভারতবর্ষ নয়,—এ কথা আমার সঙ্গী অবজ্ঞাভরে আমাকে বল্লেন।

আর সে কথাটাও ঠিক। কেননা জলপ্রণালীটুকু পার হয়েই চোখে পড়ল—লম্বাচওড়া কোঁচানো কাপড়, হাতের কব্জায়, উপর হাতে, পায়ের গোছে ও নাকে গয়না, অলঙ্কাররাশি ধারণের জন্য কানের উপর নীচে চারিদিকে বিঁধনো। আমাদের ফ্যাকাসে রঙে যে সোনার জেল্লা খোলে না, এই সব শ্যামলা রঙের উপর সেই সোনা তার স্বাভাবিক তেজ ধারণ করে ও নিজ ভাস্বর দীপ্তিতে পূর্ণমাত্রায় শোভা পায়। ছোট মেয়েরা স্বভাবের সরল বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথায় ফুল গোঁজা, ছোট্ট খোঁপার চারদিকে ফুলের মালা জড়ানো। এ দেশ সুন্দর চোখের দেশ, এত বেশি বড় চোখ যেন সমস্ত মুখটাকে গিলে খায়। এ দেশের পেটগুলিও বিলক্ষণ বড়: হতভাগা ছোঁড়াগুল কি খায় তা' মহাদেবই জানেন!

আমরা ঠিক করেছিলুম দক্ষিণের মন্দিরগুলি দেখে যাব, তা' যতই সময় লাগুক্; কিন্তু আমার সঙ্গী কাজ আরম্ভ করবার জন্য ব্যস্ত, তাই মাদুরা ছাড়া কিছু দেখা হবে না। সে এক প্রকাণ্ড সহর, সেখানে হোটেল নেই, কেবল যাত্রীদের জন্য ষ্টেশনেই কতকগুলি ঘর ঠিক করা আছে; এখানকার বাসিন্দারাই এখানে একলা রাজত্ব করে।

এক বুড়ো ব্রাহ্মণ সম্ভাবিত যাত্রীর আশায় ষ্টেশনের রোয়াকে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের মত সহজ শিকার পেয়েই চেপে ধরলে, আমরাও তৎক্ষণাৎ মন্দিরে চল্লুম্। তার বর্ণনা কে করবে? মন্দির কি একটা?—না, মন্দিরের সার চলেছে, "গোপুরম্"গুলির উপর উচ্চ চূড়া, বোধকরি আটটি হবে; তার ভিত্তির গায়ে এমন এক আঙুলপরিমাণ জায়গা নেই যা হাজার রকমে খোদিত, চিত্রিত, ভূষিত নয়; শত শত সহস্র দেবতার মূর্ত্তি। কিন্তু এগুলি ত কোন্ ছার; সেই

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য থামওয়ালা দালান দেখতে হয়। একটার মধ্যেই বোধহয় অমন হাজার থাম; দেবদেবী ও অবতারের মূর্ত্তি, দেয়ালের মাথায় হাতী, বাঁদর সাপ, মাছ ও বিশ্বের জন্তুজানোয়ারের লম্বা টানা পাড়, রূপকের ছবি প্রভৃতি অনবরত চলেছে, রাশিকৃত হয়েছে, মূর্ত্তি ও গঠনের এমন ভিড় জমিয়ে তুলেছে যে মাথা ঘুরে যায়। মাইলের পর মাইল ধরে' এইরকম জিনিষ—বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক, মুগ্ধকর। এই বন্যার মুখে আমাদের গরীববেচারি পাশ্চাত্য কল্পনা-শক্তি থ বনে যায়! * * * * * এও কি সম্ভব যে, এই পাগলের মত দু'হাতে করে' বিলিয়ে-দেওয়া কল্পনার ঐশ্বর্য্য আমাদের পশ্চিমের শিল্পী, আমাদের ভাস্কর, আমাদের কারিগরদের পক্ষে একেবারে গুপ্তরহস্য? আমাদের ওখানে কি এর কোন নক্সা বা নকল বা ছবি নেই? Angkor-এর পরিচয় আমরা সবেমাত্র পেতে আরম্ভ করেছি; কিন্তু কৃষ্ণ-ভারতবর্ষের মন্দির ত ভগ্নাবশেষ নয়, সেই জন্যই তার এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ; তার অলি-গলিতে, দরদালানে সর্ব্বদাই আনা-গোনার ভিড়, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে কিলবিল করছে। একটি দেউড়ির মধ্যে এক ছোটখাটো বাজার বসে গেছে; দোকানদারেরা ভক্তদের কাছে ফুল বিক্রী করছে, যে মালা দিয়ে তারা দেবমূর্ত্তি সাজাবে, যে ভস্ম, সিঁদূর, মাখন ও তেল তাদের দেবতাকে মাখাবে, সেই সব সরবরাহ করছে। সবরকম জাতের, সবরকম শ্রেণীর পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়ে যাচ্ছে আসছে, স্নান করছে, শুয়ে রয়েছে, বেড়াচ্ছে, পূজো করছে, গল্প করছে, খেলছে; গরু ও কুকুর যেমন রাস্তায় তেমনি এখানেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কড়িকাঠে ঝোলানো খাঁচায় টিয়েপাখী চেঁচামেচি করছে; হাজার হাজার পাখী বাসার দিকে

উড়ে চলেছে, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এল। এই সব আলো, এই সব ফুল, এই সব অনাবৃত শরীর থেকে কি এক গুরুভার ঘনমধুর গন্ধ উঠে যেন গলা চেপে ধরছে।

আমাদের ব্রাহ্মণটি সবার কাছেই জাঁক করে' বলে' বেড়িয়েছেন যে এই ফরাসী ভদ্রলোকটি মস্ত বড় সংস্কৃত পণ্ডিত, তাই সর্ব্বত্রই আমরা লোকের আনুকূল্য পেয়েছি। একটা ছোট মন্দিরে—অবশ্য সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ—একটি শৈব পুরোহিত আমাদের মালা দিলেন (পঞ্চমুদ্রা, এবং ভাঙ্গানো টাকা অতি যাচ্ছেতাই!)।

* * * * * * * * * *

রবিবার ৬ই মাদ্রাজে কাটিয়ে, আমরা ৮ই সকালে কলকাতা পৌঁছতেই ঠাকুরমশায়ের ছেলে র—র সঙ্গে দেখা হল, এবং তার সঙ্গে তাঁদের সহরের মধ্যস্থিত পুরাণো বাড়ী অথবা পুরাণো প্রাসাদে গেলুম। এইবার আমরা হিন্দু জীবনস্রোতে মগ্ন হলুম।

পাশের একটি প্রাসাদে কবির দুই ভাইপো বাস করেন, অ—এবং গ—; দুজনেই বনেদী ঘরের মস্ত বড় চিত্রকর। তাঁরা এখনো সেকেলে নিয়মানুসারে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ একত্র থেকে একই সম্পত্তির আয় ভোগ করেন। মেয়েরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। দশ বারোটি সুন্দর ছেলে এক সঙ্গে খেলা করছে। আমি দেখলুম মা, মেয়ে, বউ, বছর সতেরোর একটি অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী, এক ঝাঁক চাকরদাসী, জন পঞ্চাশেক লোক হবে,—সে এক ছোটখাটো রাজ্যবিশেষ।

তার পরদিন আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছলুম।

(ক্রমশঃ)

নবম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রদ্ধায় স্মরণ।

(নোয়াখালি টাউনহলে ৺আশুতোষ চৌধুরী ও ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতি-সভায় পঠিত)

'Sweetness and Light'—জ্ঞান-জ্যোতি ও স্নিগ্ধতাই ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে বৈদগ্ধ্যের গোড়াকার কথা। ম্যাথু আর্ণল্ডের সুরুচি-সম্পন্ন মন ও পরম পরিচ্ছন্ন প্রাণের কাছে জ্যোতিঃ এবং স্নিগ্ধতাই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া ঠেকিয়াছিল। এ দুটি ছাড়া জীবনে ও সমাজে আরো কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু ম্যাথু আর্ণল্ডের finely-attuned মনের উপর তৎকালীন ইংলণ্ডের মজ্জাগত Hebraism একটা দুরন্ত আঘাতের মত বাজিয়াছিল; তাই অসম, ছন্দহীন জাতীয় জীবনের তথা ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের শান্ত ও সুসমাহিত বাণীটি জাগাইয়া তুলিবার জন্য Oxford-এর সুকুমার শিক্ষার অগ্রদূত আর্ণল্ড Hellenism-কে বরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশেও ঠিক এইকালে এই সভ্যতা-সংঘাতের পরমুহূর্ত্তে, তেমনি একটি ক্ষণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যখন অনতিপূর্ব্বের পশ্চিমী মোহ ও পরমুখাপেক্ষিতা মার খাইয়া হঠাৎ ঘরে ফিরিবার নামে একেবারে মারমুখো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দেশের আকাশ ও বাতাস যে এত ধূলি ও এত ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি কারণ আমাদের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ঢুকিয়াছে একটা Hebraic অসহিষ্ণুতা ও একটা Pharisaical fanaticism,

কিন্তু, এই ধূলি ও ধোঁয়ার মধ্যে একটি অম্লান সুপ্রভকান্তি দাঁড়াইয়াছিলেন—তিনি পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরী। যৌবনারম্ভে যিনি 'প্রভাত-সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' শ্রবণে বাঙ্গালার কবি-প্রতিভাকে বরণ করিয়াছিলেন; যাঁহার বিদ্যাবত্তা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্যায়তনগুলির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিবে; যাঁহার শাণিত বুদ্ধি একদিন ধর্ম্মাধিকরণকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল; আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ-রাত্রে যিনি প্রদীপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; যাঁহার উচ্চারিত একটি বাণী—A subject race has no politics—অন্তত আমাদের সমস্ত নৈরাশ্যকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে; বাঙালা ভাষার ইতিহাসে যাঁহার নিজের কীর্ত্তি রহিল কিনা জানিনা, কিন্তু বাঙালা ভাষার নীরব সেবক মণ্ডলীর মধ্যে যিনি প্রথম এবং প্রধান হইয়া থাকিবেন; যিনি আর্য্য-সঙ্গীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া মুহ্যমান কলা-সরস্বতীর রুদ্ধ কণ্ঠে আজ আনন্দকাকলী জাগাইয়া তুলিয়াছেন;—বাঙালী আজ স্মরণ করিতে গেলে অনেক দিক দিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম-তালিকার পিছনে যে অমলকান্তি মনটি বসিয়াছিল, তাহার খোঁজ নিলে বাঙালী তাঁহাকে চিনিবে-ও বেশী, উপকৃত-ও হইবে বেশী। পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরীর মনটি ছিল একটি পরম স্নিগ্ধতায় স্নাত, একটি বিমল জ্যোতিতে আলোকিত। সে জ্যোতিতে জ্বালা ছিল না, সে স্নিগ্ধতায় দৌর্ব্বল্য ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা এই বাঙালী জাতি যে যে গুণ ও বিশেষত্ব লইয়া জন্মাই বলিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য যে-কোনো জাতির সহিত একই ভূমিতে দাঁড়াইতে পারি না, অন্যান্য জাতির মত কর্কশ কঠিন

নিদারুণ ঊষরতার মধ্যে জীবনের স্রোতকে ডুবাইয়া দিই না, বাঙ্গালী জাতির মজ্জাগত সেই কারুণ্য ও কোমলতা, বুদ্ধি এবং সুরুচি, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জীবনে যেমন বিকাশলাভ করিয়াছিল, তেমনি করিয়া আর কোনো বাঙালীর জীবনে করিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার জীবনে এবং চরিত্রে বৈদেশিক প্রভাব কতটা দাবী বসাইয়াছিল জানিনা, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় আশুতোষ চৌধুরী বাঙালার কাল্‌চারের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ,—তাঁহার সৌজন্যে, তাঁহার করুণালোকিত চরিত্রে, তাঁহার সুপ্রভ জ্ঞানদীপ্তিতে, তাঁহার অমলিন শুভ্র জীবনে, বাঙালার বাণী প্রকাশিত হইয়াছে; ঠিক যেমনি করিয়া Oxford-এর বাণী আর্ণল্ডের urbanity-তে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথাটি মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, বিগত কয় বৎসরের তাণ্ডবতার মধ্যে আমরা কেন তাঁহার দেশ-হিতগত প্রাণের ততটা সাক্ষাৎকার লাভ করি নাই; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝব যে, কেন এই কয় বৎসরে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালা পুরোবর্ত্তী না হইয়া পুরোবর্ত্তী হইল গুজ্‌রাট ও অন্ধ্র। বাঙালা পুরোবর্ত্তী হয় নাই—তাই বাঙালার পৌরহিত্যের প্রয়োজন বাড়িয়াছে। আজকার দিনে এই দেশের ধূলি ও ধোঁয়াসমাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডলের অপরিচ্ছন্নতা যদি দূর করিতে হয়, তবে স্বর্গগত এই বিদগ্ধজনের সহজাত sweetness and light-এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন আর কোনো কিছুরই নাই।

বাঙালার শ্যাম অঙ্গে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা নিত্য চলিয়াছে, এখানে উগ্রতা ও রৌদ্ররসের দাব-দাহে মানুষের বুক শুষ্ক হইয়া উঠে না, মানুষের মাথাও উষ্ণ হইয়া উঠে না। আমাদের হিন্দুস্থানের

অপরাপর প্রান্তবাসীদের চোখে বাঙালী তাই তাঁহার স্বাভাবিক করুণ কোমলতার জন্য একটু কৃপার পাত্র। কিন্তু, সুজলা বাঙালার বুকের উপরে সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার ধ্বংসমন্ত্র নিশিদিন উচ্চারিত হয়, বাঙালার মাথার উপরে চৈত্রের খর-রৌদ্রতাপের শেষে কালবৈশাখীর মেঘ সম্ভারে ধ্বংসদেবতার ডম্বরুধ্বনি গুরুগম্ভীরে বাজিয়া উঠে। প্রলয়ের বাঁশীও বাঙালী বাজাইতে জানে, তাণ্ডবনৃত্যের নিমন্ত্রণেও বাঙালী যোগ দিতে উৎসাহী। বাঙালীর সে যজ্ঞে থাকে না নিরর্থক তিক্ততা। তিক্ততা শক্তিমানের ধর্ম্মও নয়।

এমনি শক্তির স্ফুরণ দেখিয়াছি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে ও চরিত্রে।

যাহা কিছু বিভূতিমান, গীতায় ভগবান তাহারই ভিতরে নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়া বলিয়াছেন। নীট্‌শের ভবিষ্যৎকালের স্বপ্ন অতি-মানব (Superman) যদি নিতান্তই স্বপ্ন না হয়, তবে এই বিভূতি-মানবদের মধ্যেই বোধহয় আমরা তাহার ইঙ্গিত দেখিতেছি। বর্ত্তমানকালে স্বদেশে অথবা বিদেশে যদি কেহ এই দেব-দুর্লভ পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইবার মত ক্ষমতা ও পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকেন, তবে তিনি স্বর্গগত এই মহাত্মা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী। এই সন্ধ্যায় তাঁহার গুণাবলীর হিসাব লইতে গেলে ব্যর্থ হইতে হইবে নিঃসন্দেহ। সেই দিব্যোজ্জ্বল মনীষা, যাহার রশ্মিপাতে আলোকিত হয় নাই এমন গুপ্ত কোণটি কোথাও আর পড়িয়া নাই; সেই অলৌকিক পাণ্ডিত্য, যাহা পৃথিবীর সুধীসমাজে একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল; সেই পরম প্রখর বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণধী, যাহা আইনের কূটজালকে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া বাহির হইয়াছে; সেই ব্রাহ্মণবৎ

জ্ঞান-পিপাসা ও অকার্পণ্যে জ্ঞানদান, যাহা দরিদ্র দেশের কাছে আজ বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সেই ব্রাহ্মণ-সুলভ অকপট ক্ষমা ও তিতিক্ষা, স্নেহ ও করুণা, আবার সেই ব্রাহ্মণোচিত দৃঢ়তা ও দর্প, গৌরব ও গর্ব্ব;—এইরূপ শত গুণের তালিকা লওয়া অসম্ভব।

দেহমানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'বাঙালী' ছিলেন, এবং এরূপ 'বাঙালী' আর কেহই নাই,—বাঙালীর পক্ষে এ একটা পরম গৌরবের কথা। তথাপি সেই মোটা ধুতি ও মোটা জামার নীচে যে প্রাণটি ছিল, তাহাকে শুধু বাঙালীর বলিয়া দাবী করিলে একটু বিপদ হইতে পারে। লক্ষ্মণসেন ও সিরাজদ্দৌলার আমল হইতে আমরা বাঙালী জাতি বীরত্বের ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়াছি, স্বর্গগত এই মহামানবের জীবনের শিক্ষাটা ঠিক তাহাকে সমর্থন করিয়া চলে কিনা জানি না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে হয়ত লিটন-মুখুয্যে পত্রবিনিময়টা স্থান পাইবে, কিন্তু সে একটা নূতন অধ্যায় হবে নিঃসন্দেহ। তাহার সহিত এক সূতায় গাঁথিতে হইলে আমাদের হয় যাইতে হইবে রাজস্থানের ইতিবৃত্তের সন্ধানে, অথবা আরো দূরে বহু নিন্দিত শ্বেত-দ্বীপে; প্রতাপ সিংহকে লিখিত পৃথ্বীরাজের পত্র অথবা লর্ড চেষ্টারফীল্ড্‌-কে লিখিত ডাক্তার জনসনের পত্রই তাহার একমাত্র তুলনা। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মেরুদণ্ডের একটা অখ্যাতি আছে—চর্ম্মের উৎকর্ষতা দেখিলে তাহা আপনা আপনি নুইয়া পড়ে,—কিন্তু কোনো বাঙালীই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নামে এই বাঙালীর একান্ত বিশেষত্বটি আরোপ করিতে পারিবেন না। এ কথাও অবিসংবাদিত যে, আমাদের স্বদেশিকতা যখন পর্য্যন্ত খদ্দরে

সূটের 'সর্ট-কাটুটির' সন্ধান পায় নাই এবং বিলাতী-বিরোধের নামে নিত্যনূতনরকমের স্বদেশী জামার ভঙ্গীও উদ্ভাবন করিতে শিখে নাই, তখন হইতেই সেই সরকারের বেতনভুক্ মানুষটি একটি বিশেষ পরিচ্ছদকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন তাহা ত্যাগ করেন নাই। এই সকল গোঁড়ামি আর যাঁহারই হোক, বাঙালীর পক্ষে ততটা সুলভ নয়।

সেই বিরাট মানবকে বাঙালী নামের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা বাতুলতা। Superman যে, সে কালের ও দেশের বহু অংশেই নিরপেক্ষ। বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর জীবন ও চরিত্রের উপর সেই প্রকাণ্ড পুরুষকারের ছাপ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু বাঙালী সেই superman-কে একান্ত বলিয়া দাবী করিতে পারে না।

আসল কথা, শক্তি যেখানে আপনার পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত লইয়া স্ফুরিত হইয়া উঠে, সেখানে সে এমনি জ্বলিয়া উঠে, শতদিক ছাইয়া শত খাণ্ডবদাহনের তেজ লইয়া। বিশ্বনিয়মের উপরে যিনি অলঙ্ঘ্য বিধান লইয়া শত সৌরমণ্ডলের গতিপ্রবাহ নিয়মিত করিতেছেন, যে জাতি তাঁহাকে 'শক্তি'রূপে কল্পনা করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে সেই পরম সত্যটি বুঝা অসম্ভব হবে না, আশা করা যায়। "Force! force! everywhere force! and we are ourselves a force in the midst of it!"—এই না তাপস কার্লাইলের কথা? আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত Hero-দের জীবনের উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি আপনার শ্রদ্ধার কুসুমে Hero-worship করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। শক্তির স্ফুলিঙ্গ যেখানে জ্বলিয়া উঠিবে

সেখানে মানব সাধিয়া পায়ে পড়িবে, লুটাইয়া বলিবে "নমো নমো নমঃ॥" আশুতোষের প্রদীপ্ত আকাশের নীচে যে-কোনো গ্রহ একবার ভাসিয়া আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সে প্রবলতর শক্তির টানকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া।

বর্ত্তমান সময়ে আর একজন মাত্র এমনি বিরাট মানবাত্মা আসিয়াছিলেন—তিনি রুশদেশের লেনিন্। লেনিনের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্মভূমি যত নিপীড়িতাই হোক্, ভারতবর্ষের মত এতটা অপরিষ্কার ছিল না। তাই তাঁর প্রতিভা সর্ব্বাংশে বিকশিত হইয়াছিল M. Clemenceau—যিনি ফরাসী ভূমিতে Le tigre—শক্তির আধার ছিলেন বটে, কিন্তু আজ বার্দ্ধক্যে ফরাসীর সেই ব্যাঘ্র 'গলিত-নখ দন্ত নয়নঃ'। ইংলণ্ডের আকাশে একদিন লয়েড্ জর্জ্জও এমনি দীপ্তি লইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা জানি যে Welsh Wizard-এর কণ্ঠের দীপক রাগিণী আজ থামিয়া গিয়াছে, তাঁহার যাদুদণ্ড ভগ্ন বাঙালার আর আর সন্তানের কথা ভাবিলে যাঁহার নাম মনে পড়ে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর,—যাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, মাতৃভাষার সেবা প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা ভুলিয়া গেলেও আজ ভুলিতে পারি না সেই পাণ্ডিত্যাভিমান, যাহা একদিকে চটি ও চাদর মাত্র লইয়া একদিন বিদেশীয় সভ্যতার উদ্ধত বিদ্রূপকে উদ্ধত নীরবতায় মূক করিয়া দিয়াছিল, আর একদিকে নিখিল বঙ্গীয় তর্কফলার আস্ফালন এবং স্মৃতি ও শ্রুতির বুলি কপ্‌চানি ও শাস্ত্রিক ভণ্ডামির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া অটল দৃঢ়তায় অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত হিন্দু বিধবার দুঃখের কপালে শান্তি-বারি বর্ষণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগের সেই পুরুষকার এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর একবার দেখিয়াছি,—দেখিয়াছি শক্তির জয়-যাত্রা, বিদেশীয়কে বিস্মিত করিয়া, স্বদেশীয়কে সরাইয়া দিয়া! স্বদেশ-প্রেমিক, পরম হিন্দু, রক্ষণশীল স্যার আশুতোষ বাঙালীর বিধবাদের সম্পর্কে আচরণের যে উত্তরটি দিয়াছেন, বাঙালী সেটি মনে রাখিবে না, কেননা সেটি ভুলিয়া গেলেই তবে তাহার নির্জীব জীবনগতি সহজে চলিতে পারে। বাঙালার বাহিরে যে শক্তি-উপাসক সাধকের পবিত্র নাম আমাদের আজ মনে আসিতেছে, তিনি শিবাজীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ লোকমান্য তিলক। যে বিভূতি আশুতোষের মধ্যে দেখা গিয়াছে,—তাহারই কতকটা প্রকাশিত হইয়াছিল লোকমান্যের জীবনে—আজ যাঁহার নামেরই ছত্রতলে সমস্ত মহারাষ্ট্র সম্মিলিত হয়।

আজিকার দিনে মুদ্রা-যন্ত্রের searchlight এবং flashlight-এর প্রসাদে আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম কোণটুকুও আর লুপ্ত রহিল না।—এবং তাহার উপর পড়িতেছে দীপ্ত আলোকের বিকৃত দীর্ঘছায়া—কাজেই এ যুগ যেদিন অতীত হইয়া যাইবে, আজকার মহামানবরা হয়ত সেদিনও আর hero-র উচ্চমঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ, hero-র জীবনের যা মূল,—একটি অনন্যসাধারণ শক্তি,—তাহা আমরা এই যুগের এই বিরাট পুরুষাকারের মধ্যেই ব্যক্ত দেখিলাম।

এই শোক-নিবিড় সন্ধ্যায় বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমরা প্রণাম করি স্বর্গগত সেই মহাপুরুষদ্বয়কে, যাঁহাদের একজন এই ছন্নছাড়া fanatical দেশে Hellenism-এর বাণী লইয়া আসিয়াছিলেন, যিনি

বাঙালীর অমলিন শুভ্র দীপটিকে বাড়াইয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন,—তিনি নমস্য কেননা তিনি কমনীয়;—আর প্রণাম করি তাঁহাকে, যিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-তাপসের বিদ্যার স্বচ্ছ দীপটি লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন অজ্ঞান যাত্রীর জ্ঞান-বর্ত্তিকাটি জ্বালাইতে সাহায্য করিবার জন্য, যিনি বিমাতৃ-মন্দিরে জননী বঙ্গভাষার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রণম্য তিনি, কেননা তিনি শক্তিমান, বিভূতিসম্পন্ন ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র হালদার।

গাছ।

——:•:——

গাছের পাতা।—পাতার ভিতর গাছসবুজ আছে বলেই যে তা সবুজ দেখায়, তা তোমরা জান; কিন্তু পাতা চ্যাপ্টা হওয়াতে যে গাছের কতখানি সুবিধা হয়েচে, তা বোধহয় জাননা। পাতা যদি চ্যাপ্টা না হয়ে একটা নীরেট তাল হত, তাহলে সে যতখানি জায়গা জুড়ে সূর্য্যের আলো ধরত, চ্যাপ্টা পাতাও ততখানি জায়গা জুড়ে সূর্য্যের আলো ধরে—অথচ সেই নীরেট তাল গড়তে গাছের যতখানি মালমসলা লাগ্‌ত, পাঁচশো চ্যাপ্টা পাতা গড়তেও ততখানি লাগেনা। একই খরচে এক গুণ খাবার রাঁধার চেয়ে গাছ পাঁচশো গুণ খাবার রাঁধে।

পাতার উপর-পিঠকে বলে সোজা পিঠ, আর তলার পিঠকে উল্টো পিঠ। সোজা পিঠের রং যে উল্টো পিঠের চেয়ে বেশী সবুজ, তার মানে আর কিছুই নয়,—সোজা পিঠে আলো পড়ে বেশী, কাজেই সেই পিঠেই বেশীর ভাগ গাছ সবুজ আলো ধরবার জন্য গিয়ে জড় হয়।

পদ্মপাতার কিন্তু সোজা পিঠের চেয়ে উল্টো পিঠের রংই বেশী ঘোরালো। সোজা পিঠের রং সবুজ, উল্টো পিঠের রং বেগুণী মেশানো ঘোর সবুজ। এরকম হবার মানে কি?—মানে এই যে, পদ্মপাতা দিনরাতই ঠাণ্ডা জলে ভাসে। পাছে তার গায়ের সব তাতটুকু জলের মধ্যে চলে যায়, তাই তার উল্টো পিঠের রংকে সে

যতদূর পেরেচে ঘোরালো করেছে। তোমরা সকলেই জান, সাদা কোটের চেয়ে কালো কোট বেশী গরম—কেননা ফিকে রঙের ভিতর দিয়ে যত শীগ্‌গির তাত বেরিয়ে যায়, ঘোরালো রঙের ভিতর দিয়ে তত শীগ্‌গির যায় না। পদ্মগাছ না পড়েশুনেও মানুষের মতন পণ্ডিত। তা ছাড়া সবুজের সঙ্গে ঘোর বেগুণী রঙের মিশ খাইয়ে সে আর একটা বুদ্ধির নমুনা দিয়েছে। বেগুণী রঙের একটা গুণ এই যে, সে আলোকে ভেঙ্গে তাত করে নিতে পারে। পদ্মপাতার উপর-পিঠে যতখানি আলো পড়ে, তার খানিকটা তলার পিঠে গিয়ে ঠেকতেই তাত হয়ে যায়।

একটা অশথপাতাকে যদি সূর্য্যের দিকে তুলে ধর, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার সারা গা-টাই যেন সরু সূতোর জালে ভরা। ঐ সূতোগুলোই হচ্ছে পাতার শির :—মাঝখানকার মোটা শিরটা বোঁটা থেকে ডগা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে, আর তার গা দিয়ে বেরিয়েছে রাশি রাশি কুচো শির। ছিটে বেড়ার দেওয়ালের কঞ্চিগুলো যেমন মাটিগুলোকে ধরে রাখে, শিরগুলোও তেমনি পাতার অন্য জিনিষ-গুলোকে ধরে রেখেছে। তা যদি না ধরে রাখত, তাহলে একটু হাওয়াতেই পাতাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে তস্‌নস্‌ হয়ে যেত। তা'ছাড়া গাছের শিকড় দিয়ে টানা রস, যা গুঁড়ির ভিতর দিয়ে পাতায় এসে পোঁছয়, তা ঐ শিরগুলো দিয়েই পাতাটাময় চারিয়ে যায়।

পাতার চেহারা হাজার রকমের হয়, কিন্তু বেশীরভাগ পাতারই মুখ ছুঁচলো—-তার মানে ছুঁচলো পাতার মুখ দিয়ে শীগ্‌গির জল ঝরে পড়ে। পাতার উ।র জল দাঁড়িয়ে থাকলে পাতার অনেক ক্ষতি—কি ক্ষতি, তা পরে বুঝবে।

পাতার ছুঁচলো মুখ আবার অনেক সময় কাঁটার মত শক্ত হয়—যেমন খেজুরের। তাতে হয় এই যে পাতাখেকো জন্তুরা মুখ দিতে সাহস করে না। আবার অনেক পাতার কিনার করাতের দাঁতের মত কিরকাটা—যেমন আনারসের। এ সব পাতাও গরুছাগলদের ভয়ের জিনিষ।

রঙ্গন, জিনিয়া, গন্ধরাজের মত গোটাকয়েক গাছ ছাড়া সব গাছেরই পাতায় বোঁটা আছে। কিন্তু বোঁটা থাকবার দরকার কি?—বোঁটা থাকবার দরকার এই যে, ঝড়ঝাপটার সময় বোঁটা নুইয়েই পাতারা এপাশ ওপাশ করে। এ ছাড়া আলোর দিকে মুখ ঘোরানো, কি ঝাঁজালো রোদের সময় খাড়া নীচের দিকে ঝুলে পড়া—এ সব কাজ পাতা সহজে করতে পারত না, যদি না তার লগ্‌বগে বোঁটাটিকে এপাশ-ওপাশ কি উপরনীচে ঘোরাতে পারত। অনেক সময় এও দেখা গেছে যে, একটা আওতায়-গজানো পাতা বোঁটাকে দুমড়ে নিয়ে উল্টো দিকে গিয়ে ফলাটাকে আলোতে মেলে ধরেচে। আঁব কি অশোকের কচি পাতা বেশী রোদ সহ্য করতে পারে না বলে খাড়া নীচের দিকে ঝুলে থাকে—তখন তাদের বোঁটাগুলোও ধনুকের মত বেঁকে থাকে; কিন্তু যেই পাতাগুলো পুরুষ্ট হয়ে ওঠে, অম্‌নি তাদের বোঁটাগুলো সোজা হয়ে উঠে ফলাগুলোকে আলোর নীচে চিৎ করে ধরে।

অনেক পাতার বোঁটাই পাতার ফলাটাকে গুঁড়ির সঙ্গে আট্‌কে রাখে, কিন্তু ঘাস, বাঁশ, তাল, নারকোলের মত গোটাকয়েক গাছ আছে, যাদের বোঁটার শেষে একটা চওড়া চামড়ার মত পেটো আছে—আর সেই পেটোই পাতাকে গুঁড়ির সঙ্গে আটকে রাখে। সুপুরী গাছের পাতার সঙ্গে তার পেটোটা খসে পড়ে—যার উপর চড়ে ছেলেরা

গাড়ী গাড়ী খেলে। কিন্তু তালগাছের পাতার পেটো গুঁড়ির গা
এমন জড়িয়ে থাকে যে খসেনা। খেজুরগাছের গুঁড়ি অত মজবু
হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না, আর তাকে অত মোটাও দেখা
না, যদি না তার পাতার পেটোগুলো তার চারদিকে ঘাঘরার ম
লেগে থাকত। দুর্ব্বাঘাসের নরম খড়কে-গুঁড়িটিত পেটো
থাক্‌লে কোন্ কালে রোদে শুকিয়ে যেত। কলাগাছের পা
পেটো দিয়ে গাছের সঙ্গে আটকানো থাকে বলেই সে তবু কি
জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মোটা খোলা বা বাস্‌নাগুলো
হচ্ছে পেটো, আর ভিতরকার থোড়ই হচ্ছে গুঁড়ি।

অনেক পাতার গোড়ায় দুটী করে ছোট্ট পাতা দেখা যায়, যাদে
সখিপাতা বলে। যে সব পাতার পেটোটা বিশেষ কাজে লাগে
তাদেরই পেটোটা বদলে সখিপাতা হয়ে যায়। ঐ সখিপাতা কখ
পাতাটি বড় না হতেই খসে পড়ে, কখনো বরাবর থেকে যায়।

সব পাতার সখিপাতা সমান বড় হয় না। বট, অশথের সখিপা
এত বড় যে, হঠাৎ দেখলে সখিপাতাকেই আসল পাতা বলে ম
হয়। সখিপাতা পাতারই জুড়ীদার হয়ে গাছের খাবার রাঁধে
তাছাড়া কোলকুঁড়িকে ঢাকনী-খোসার মত ঢেকে রাখে।

তেঁতুল, নিম, গোলাপ, বাব্‌লা, বক, কৃষ্ণচূড়া, আমল
লজ্জাবতী, নারকোল, খেজুর, শিমুল, বেল, সজনে, ছাতিম, ঘোড়াযুগ-
এই সব গাছের কুচো কুচো পাতা দেখতে এক একটা আলাদা পাত
মত হলেও, আসলে তা নয়। এক এক গোছা কুচো পাতা মি
এক একটা গোটা পাতা। এই জন্য এরকম গোটা পাতাকে গে
পাতা বলে। গোছা পাতার কুচো কুচো পাতাগুলো যে সরু ডা

থেকে বেরিয়েছে বলে মনে হয়, সেটিও আসলে ডাল নয়, গোছা পাতার বোঁটা।

তোমরা ভাবতে পার যে, কোন্‌টা গোছা পাতা আর কোন্‌টা অনেকগুলো একানে পাতা, তা চিনব কি করে। তোমরা যদি একটু ভেবে দেখ, তাহলে নিজেরাই ঠিক করতে পারবে। ধর আতা-পাতা আর গোলাপ-পাতা। এর মধ্যে কোন্‌টা গোছা পাতা আর কোন্‌টা নয়? তোমরা জান যে, গাছের ডাল দিন দিন বাড়ে, আর তার গা থেকে নতুন নতুন পাতা বেরোয়। এখন দেখ আতা-পাতা গুস্তিতে বাড়ে, কি গোলাপ-পাতা। আতা-পাতাই বাড়ে। গোলাপের যে পাঁচটী কি সাতটী কুচো পাতা একসঙ্গে ছিল, তা আর গুস্তিতে বাড়ল না। তাহলেই বুঝলে আতা-পাতার কুচো পাতাগুলো একানে পাতা, আর গোলাপের কুচো পাতাগুলো গোছা পাতা। এ ছাড়া পাতা যখন ঝরে পড়ে, তখন গোলাপের গোছাসুদ্ধ পাতাই ঝরে পড়ে, আর আতার এক একটা পাতা আলাদা আলাদা ঝরে পড়ে। ফি পাতার কোলে একটী করে কোলকুঁড়ি থাকে তা' তোমরা জান। আতা-পাতার ফি পাতাটীর গোড়ায় কোলকুঁড়ি দেখতে পাবে, গোলাপ পাতায় তা পাবে না। তারপর গোলাপের গোছাপাতাকে টেনে ছিঁড়লে তার বোঁটার সঙ্গে একটু ছালই উঠে আসবে, কিন্তু একগোছা আতার পাতাকে টেনে ছিঁড়লে তার বোঁটার মত ডালের সঙ্গে খানিকটা কাঠ পর্য্যন্ত উঠে আসরে—কেননা ডাল গুঁড়ির সঙ্গে যেমন ভাবে লেগে থাকে, বোঁটা তেমনভাবে থাকে না। কিন্তু গোছাপাতা হয় কেন? একটা পাতাই একগোছা কুচো পাতা না হয়ে একটা মস্ত বড় একানে পাতা হলে দোষ ছিল কি?

একটা কলাপাতা যখন গাছ থেকে বেরোয়, তখন একটা গোটা পাতা হয়েই বেরোয়, কিন্তু গাছের গায়ে যখন হাওয়ার ঝট্‌কা এসে লাগ্‌তে সুরু হয়, তখন গোটা পাতাটি ফালি ফালি হয়ে বোঁটাশিরের দু'পাশ থেকে ঝালরের মত ঝুলতে থাকে। এতে লাভ হয় এই যে, ঝড়ের পূরো ধাক্কাটা গাছের গায়ে লাগতে পারে না, পাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। গোছা পাতার আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে পাতা উপরকার সমস্ত আলোটুকু আট্‌কে রেখে নীচের পাতাগুলোকে আওতায় ফেলে না। উপরের কুচো কুচো পাতার ফাঁক দিয়ে নীচের পাতাগুলোতে বেশ আলো লাগে।

উপরের পাতা যাতে নীচের পাতাকে না একেবারে আওতা করে, সেজন্য গাছের আর এক ফন্দীও আছে। অনেক গাছের পাতায় বড় বড় ফোকর দেখ্‌তে পাবে। ঐ ফোকরের ফাঁক দিয়ে গলে আলো নীচের পাতায় পড়ে। আমেরিকায় গরম দেশে একরকম কচুজাতের গাছ জন্মায়, যাকে সে দেশের লোকেরা বলে' 'সুখাদ্য রাক্ষস', কিন্তু আমরা বলব ফোকর-পাতা কচু—কেননা তার পাতার সারা গায়েই ফুটো।

একটা গাছের দিকে চাইলে মনে হয় তার পাতাগুলো এলো-মেলো ভাবে সাজানো—কিন্তু তা নয়। ফি পাতাটি এম্‌নি ভাবে সাজানো যাতে সে নিজে সব চেয়ে বেশী আলো পায়, অথচ অন্য পাতাকে সব চেয়ে কম আওতা করে। বট, অশথ, ছাতিমের মত কতকগুলো গাছ এমন ভাবে পাতা মেলিয়ে রাখে যে, তাদের তলায় দাঁড়ালে এক ফোঁটা রোদের মুখ দেখা যায় না—পাতাগুলো এতটুকু জায়গা নষ্ট না করে এমন গায়ে গায়ে ঘেঁসে থাকে যে, দূর থেকে

দেখ্‌লে মনে হয় গাছটি তার ডালপালার উপর সবুজ রংয়ের তাঁবু খাটিয়ে রেখেছে।

উপরের পাতা যাতে নীচের পাতাকে না আওতা করতে পারে, সেইজন্য যে কত গাছের পাতা কতরকম কায়দায় সাজানো থাকে তার ঠিকানাই নেই। দু একটা নমুনা দিচ্চি। যে সব গাছের ফি গাঁট থেকে একটি করে পাতা বেরোয়, তাদের নীচের গাঁটের পাতাটি যদি ডানদিকে থাকে ত উপরের গাঁটের পাতাটি বাঁ দিকে থাকে— তার উপরের গাঁটের পাতাটি আবার ডানদিকে থাকবে। জবা, কাঁটাল, পেঁপের মত কতকগুলো গাছ আছে, যাদের পাতা ঘোরানো সিঁড়ির মত ঘুরে ঘুরে ওঠে। গন্ধরাজ গাছের ফি গাঁট থেকে দুটি করে পাতা বেরোয়। পাতা দুটি পাশাপাশি হলেও উল্টো দিকে মুখ করে থাকে। তুলসী, রক্তদ্রোণ, ঘলঘস গাছেরও ফি গাঁট থেকে দুটি করে পাতা বেরোয়, কিন্তু তাদের নীচের গাঁটের পাতা দুটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে থাক্‌বে। ডালিম, ছাতিমের ফি গাঁট থেকে অনেকগুলো করে পাতা বেরোয়, তাই সেগুলো ঘাগরার মত গোল হয়ে গুঁড়ির গায়ে সাজানো থাকে।

পাইন, সাইপ্রেস, জুনিপারের মত যত দেওদার জাতের গাছ আছে, তাদের নীচের পাতাগুলো হয় বড় বড় আর লম্বা বোঁটাওয়ালা; উপর পাতাগুলোর বোঁটাও ছোট, ফলাও ছোট। তাছাড়া ও সব গাছ ঠিক জাহাজের মাস্তুলের মত খাড়া উপর দিকে ওঠে, আর গুঁড়ির দুপাশ দিয়ে এক এক জোড়া করে আড়াআড়ি ডাল এক এক জোড়া ছড়ানো হাতের মত বেরোয়। কিন্তু ডালগুলোর মজা এই যে, নীচের ডালগুলোর চেয়ে উপরের ডালগুলো লম্বায় ছোট—কাজেই উপরের

ডালের পাতা নীচের ডালের পাতাকে আওতা করতে পারে না। রোদের সময় দূর হতে একটা পাইন গাছের দিকে চাইলে মনে হয় একটা ঝক্‌ঝকে সবুজ গির্জ্জে মাটি থেকে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে।

পুঁই, আমরুল, কল্মীশাকের গাছ যদি সোজা সামনের দিকে বেড়ে যেত, তাহলে হয়ত সামনের পাতার ছায়া পিছনের পাতার গায়ে, পিছনের পাতার ছায়া সামনের পাতার গায়ে পড়তে পারত—তাই ঐ সব গাছ প্রায়ই সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে।

গাছ যে শুধু আলো ধরবার জন্যই তার পাতাগুলোকে কায়দা করে সাজায়, তা নয়; তার অন্য মানেও আছে। আমরা সকলে দেখেছি যে, ঝেঁকে বৃষ্টি এলেও বড় গাছতলায় দাঁড়ালে অনেকটা মাথা বাঁচানো যায়। তার মানে তার পাতাগুলো খোলার চালের খোলার মত এমন এ ওর গায়ে চাপানো যে, সব জল গড়িয়ে কিনারের পাতা দিয়ে ঝরে পড়ে। এতে করে হয় এই যে, গাছের ঠিক গোড়ায় ততটা জল পড়ে না, যত পড়ে একটু তফাতে। এই গোড়া থেকে একটু তফাতে জল পড়াই গাছের দরকার—কেননা সেই জায়গার নীচেই গাছের শিকড়ের ডগাগুলো জলের জন্য হাঁ করে বসে আছে। এই জন্যই গাছের গোড়ায় জল দিতে হলে, ঠিক গোড়ায় জল না ঢেলে একটু তফাতে ছিটিয়ে দিলেই বেশী কাজ হয়।

গাছের পাতা যে ছাতির মত গোল করে সাজানো থাকে, তার আর এক মানেও আছে। গ্রীষ্মকালের রোদে মাঠের জমি কেমন শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয় তা তোমরা দেখেছ—ঐরকম ফেটে গেলে

কি তাতে আর একটুও রস থাকে? গাছ নিজের পাতার ছায়া দিয়ে নিজের গোড়ার মাটিকে ঠাণ্ডা ও ভিজে রাখে।

আঁকড়া আর কাঁটা যে গাছের কত দরকারী জিনিষ তা তোমরা জেনেছ, কিন্তু কেবল কোলকুঁড়ি বদ্‌লেই যে আঁকড়া কাঁটা হয় তা নয়, পাতা বদ্‌লেও হয়। ফণীমনসার গুঁড়ির গায়ে যে কাঁটা দেখেছ, সে তার রূপচোরা পাতা। লাউ, কুমড়ো, শঁশার আঁকড়াগুলোও যে এক একটা পাতা, তা তাদের কোলকুঁড়ি থেকেই বোঝা যায়। পাতার মত পাতার এক একটা ভাগও অনেক সময় কাঁটা কি আঁকড়া হয়ে যায়। শিয়ালকাঁটা পাতার কুচো শিরগুলোই ফলার কিনার দিয়ে কাঁটা হয়ে বেরোয়। চীনে (রেঙ্গুন) লতার পাতা ঝরে গেলে তার বোঁটাটাই কাঁটা হয়ে পড়ে, যেমন ঈশের মূলের ঐটেই হয়ে যায় আঁকড়া। কুল, বাবলা, মনসার সখিপাতা দুটো গোড়াগুড়ি থেকেই কাঁটা হয়ে থাকে, যেমন কুমারিকার সখিপাতা দুটো গোড়াগুড়ি থেকেই আঁকড়া হয়ে বেরোয়। উল্ট-চণ্ডাল পাতার মুখটা লম্বা হয়ে আঁকড়া হয়ে যায়—আর মটরের গোছা পাতার ডগায় যে আঁকড়া দেখতে পাও, তাও পাতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রূপচোরা পাতা যে শুধু আঁকড়া আর পাতার চেহারাই ধরে, তা নয়। দরকারমত আরো নানান্ রকমের চেহারা ধরে। পাড়াগাঁয়ের জলা বিলে যে ঝাঁঝি দেখা যায়, তাদের মধ্যে একরকমের ঝাঁঝি আছে, যার কতকগুলো পাতা জলে ডুবে চুলের মত সরু হয়ে যায়—দেখলে ঝুপো শিকড় বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ সরু সরু পাতা হবার মানে আছে। গাছ যে বিষ-গ্যাস বাতাস থেকে টানে, তা বাতাসে তেমন বেশীমাত্রায় নেই। কাজেই অনেক মেহনৎ করে

জোগাড় করে নিতে হয়। কিন্তু জলেও বাতাসের খানিকটা বিষ-গ্যাস মিশে আছে। এখন ওই ঝাঁঝি দেখলে যে তার তলার দিকটা যখন জলেই ডুবে থাকে, তখন জলের বিষ-গ্যাসই বা সে ছেড়ে দেবে কেন ? তাহলে ত হাওয়ার পাতার মেহনৎ অনেকটা কমে যায়। কাজেই সে তার দু চারটে পাতাকে জলের তলায় চালান করে দিলে, আর যাতে একটা পাতাই অনেকখানি জল হাতড়াতে পারে, তাই তাকে দু'একশো সরু সরু চুল-পাতায় চিরে দিলে।

কলমী গাছের দু একটা পাতা যে ঢাকনীশুদ্ধ কলসীর মত হয়ে যায়, তা তোমাদের আগেই বলেছি। আলুপেঁয়াজের উপরকার খস্‌খসে খোসা যে পাতা ছাড়া কিছুই নয়, তাও তোমরা জেনেছ। পাতা বদ্‌লে যে আর দুরকমের জিনিষ হয়, তার কথা এখন বলব। গাছের ফুলও পাতা বদ্‌লে হয়। ফুলের পাপড়ীর গড়ন ও পাতার গড়ন আলাদা হয় বলে, আবার সবুজ রঙের বদলে পাপড়ীতে অন্য রং দেখা দেয় বলে ভেবোনা যে পাতা আর পাপড়ী আলাদা জিনিষ। পাতা যে কেন রঙীন পাপড়ীতে বদলায়, তা একটু পরেই বুঝবে। পাতা আর ফুল যে একই জিনিষ, তা বেশ বোঝা যায় লালপাতা আর বাগানবিলাস গাছের দিকে চাইলে। লাল পাতার কুচি কুচি ডাঁটির মত ফুলের ঠিক তলাতেই যে দুচারটে পাতা আছে, তাদের গড়ন ঠিক পাতার মতই; দেখলেই বুঝবে ফুলের পাপড়ী নয়—কিন্তু রং হয়ে গেছে সিঁদুরের মত টক্‌টকে—ঠিক ফুলের পাপড়ীর যেমন হয়। বাগানবিলাসের ম্যাজেণ্টা রঙের পাতাগুলোও ফুলের পাপড়ী নয়—পাতাই। এই সব পাতা, পাতা আর পাপড়ীর মাঝামাঝি; এরাও

পাতা বদ্‌লে হয়। ফুলের রঙীন পাপড়ীরও যে কাজ, এদের কাজও অনেকটা তাই।

তোমরা জান মোচাই কলাগাছের ফুল, কিন্তু সমস্ত মোচাটা নয়। যা আমরা কুটে রেঁধে খাই, তাই হচ্চে কলার ফুল; আর যা মোচার খোলা বলে ফেলে দিই, তাই হচ্চে বাগানবিলাসের রঙের পাতার মত পাতা। মোচার খোলার কাজ হচ্চে কলাফুলের নরম পাপড়ীকে আগলে ঢেকে রাখা। সুপুরী নারকোলের মুচি (ফুলের ছড়া) যে কোসার মত ঠোঙায় ঢাকা থাকে, সেও রূপচোরা পাতা; তারও কাজ মোচার খোলার মত ফুলকে আগলানো। এই সব পাতা—যা না পাতা, না পাপড়ী—তাদের নাম হচ্চে ফুল-বন্ধু পাতা, বা এককথায় ফুলপাতা।

পাতা বদ্‌লে ফুল হয় বলে তোমরা যেন মনে ভেবনা যে, গুঁড়ি বদ্‌লে পাতা হয়। অনেকে কিন্তু তা ভাবে। তারা ভাবে এক তাল সোনাকে যেমন পিটে পিটে পাত তৈরী করা যায়, গাছও তেম্‌নি ডালকে চেপ্টা করে করে তৈরী করে। এটা কিন্তু একেবারেই ভুল। শিকড়, গুঁড়ি, পাতা, তিনই আলাদা আলাদা জিনিষ। শিকড় বদ্‌লে যেমন গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি বদলেও তেম্‌নি পাতা হয় না। একটী বীচিকে চিরে অনুবীণ দিয়ে দেখ্‌লে দেখতে পাবে, তার মধ্যে শিকড়, গুঁড়ি, পাতা তিনটী ভাগই আছে।

গুঁড়িই যে ডালপাতার ভার বয়, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু এমন গাছও আছে, যার পাতাই সমস্ত গাছটার ভার বয়। হরিণ-শিঙে নকসাপাতার গাছ এইরকম। তার একটা পাতা ব্রাকেটের মত হয়ে সমস্ত গাছটাকে মাথায় করে রাখে। গুঁড়ির চেয়ে পাতা জোরাল হলে, কেন পাতা গুঁড়ির কাজ করবে না?

পাতার আর একটা মজার কথা বলচি। ঘনঘন গাছ আওতায় গজালে তার পাতাগুলো হয় জ্বল্‌জ্বলে সবুজ আর লম্বা লম্বা, কিন্তু ফাঁকায় গজালে পাতাগুলো হয় ম্যাড়মেড়ে সবুজ আর ছোট ছোট। এর মানে কি ?—এর মানে এই যে, আওতার পাতা আলো পায় কম, কাজেই যা পায় তার একটুও যাতে না ফস্‌কে যায়, তার জন্য নিজেকে যতদূর লম্বা চওড়া করতে পারে করে, আর যতখানি গাছসবুজ ফলার উপর এনে জড় করতে পারে, তাতে ক্রুটী করে না। আলোর পাতা এম্‌নিই যথেষ্ট আলো পায়, কাজেই তা ছোট হলেও তেমন লোক-সান নেই, তাতে গাছসবুজ কম থাকলেও লোকসান নেই। তা ছাড়া পাতার গাছসবুজের দানাগুলো খুব আলোতে নিজেদের যে কায়দায় সাজায়, অল্প আলোতে সে কায়দায় সাজায় না। সাজাবার গুণে কখনো পাতাকে বেশী সবুজ দেখায়, কখনো কম সবুজ দেখায়।

গাছের ফুল।—একটা কেয়াফুলকে নিয়ে যদি নীচমুখ করে ঝাড়া দাও, তাহলে দেখ্‌বে তার ভিতর থেকে হল্‌দে হল্‌দে গুঁড়ো পড়চে। এই গুলোই হচ্চে কেশরের রেণু। আবার একটা রজনীগন্ধা ফুলের পাপড়ীগুলো আর সূতোর মত কেশরগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌লেই দেখতে পাবে, তার বোঁটার চাকের উপর একটা ছোট্ট কুঁজোর মত সবুজ জিনিষ। ঐ সবুজ জিনিষের পেটটা নখ দিয়ে একটু টিপলেই মাছের ডিমের মত যে ছোট ছোট দানা বেরিয়ে আসে, সেই হচ্চে গর্ভের রেণু বা গর্ভ-দানা।

এখন এই কেশরের রেণু আর গর্ভদানা, এই হচ্চে ফুলের আসল জিনিষ—কেননা এই দিয়েই গাছ বংশ বাড়ায়। কাজেই কেশর আর গর্ভ হচ্চে ফুলের আসল দরকারী ভাগ। দু চারটে পাপড়ী বদ্‌লেই

যে কেশর আর গর্ভ হয় তাতে ভুল নেই, কিন্তু পাপড়ীগুলো না লাগে গাছের নিজের কাজে—না বাড়ায় গাছের বংশ। তবে পাপড়ীগুলো হয় কেন?—হয় কেন, তা একটু পরেই বুঝবে। তবে তাদের একটা কাজ যে ফুলের গর্ভ আর কেশরকে আগলানো, তা এখানেই বলে রাখতে পারি।

ফুলের ভিতর-পাপড়ীর বাইরে গোটা তিন চার সবুজ পাপড়ী দেখা যায়, যাদের বলে বার-পাপড়ী। এই বার-পাপড়ী কুঁড়িবেলায় ফুলকে মুড়ে রাখে, যাতে ঠাণ্ডা, গরম, পোকামাকড় কিছু না ভিতরে ঢুকতে পারে। ফুল ফুটলেও বার-পাপড়ীর কাজ শেষ হয় না। বার-পাপড়ীই ফুলের ভিতর-পাপড়ীগুলোকে একসঙ্গে গেঁথে রাখে। পদ্ম কি শালুকের মত বড় ফুলের সবুজ বার-পাপড়ী বেশ স্পষ্টই দেখতে পাবে।

ফুলের তাহলে সবশুদ্ধ চারটে ভাগ দেখতে পেলে:—গর্ভ, কেশর, ভিতর-পাপড়ী, বার-পাপড়ী। এই চারটে থাকই যে সব ফুলে আছে, তা নয়। এমন ঢের ফুল আছে, যাদের একটা, কি দুটো, কি তিনটে থাকই নেই। গোলাপ ফুলে অবশ্য চারটে থাকই আছে, কিন্তু চাঁপা, শিউলি, কৃষ্ণকলি, হংসরাজ এই সব ফুলের বার-পাপড়ী নেই। পুঁই, বিটপালম, বেতোশাকের ফুলে ভিতর-পাপড়ী নেই। লাউ, শশা, কুমড়ো, তাল, নারকোল এই সব গাছের কোন ফুলটায় কেশর নেই, আর তিনটে থাকই আছে—কোন ফুলটায় গর্ভ নেই, আর তিনটে থাকই আছে। আপাং; ভেরাণ্ডা, কাঁটানটে, ঘোলমউলী, গুলমখমল, খয়েদয়ে, লাল বিছুটী, মোরগফুল প্রভৃতি গাছের ফুলে কেবল দুটো থাক আছে—কোনটাতে বার-পাপড়ী আর কেশর,

কোনটাতে বার-পাপড়ী আর গর্ভ। চুপড়ী আলু, খাম আলু, সকরকন্দ আলু আর পাটা-সেওলার ফুলেও কেবল দুটো থাক আছে,—হয় ভিতর-পাপড়ী আর কেশর, নাহয় ভিতর-পাপড়ী আর গর্ভ। ধানফুলে গর্ভ কেশর দুই-ই আছে, কিন্তু বার-পাপড়ীও নেই ভিতর-পাপড়ীও নেই। মনসা, লাল পাতা, পিপুল, পান, চৈ, রাংচিতে, নোড়, পিঠুলি, জলবিছুটি, মুক্তোঝুরি, টোকাপানা, সরল, চীর বিলাতী ঝাউ, এই সব গাছের ফুলে তিনটে থাকই নেই—কোন ফুলটায় শুধুই কেশর, কোন ফুলটায় শুধুই গর্ভ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমি দিদিমা কি কর্ত্তামশির কাছে কখনো ধমক পর্য্যন্ত শুনিনি। বাবা বড় দুষ্টামি করলে ধম্‌কাতেন। মার কাছে ৯ বছরের মধ্যে তিন চারবার মার হয়েছিল বেশ মনে আছে। আমার স্বল্প আহারের কথাটা লেখা উচিত। এটা পেটে রেখে গেলে আমার জীবনের ঘটনা লেখা অপূর্ণ থেকে যায়। এমন আশ্চর্য্য খাওয়া আমি যে কেমন করে হজম করতুম জানিনে। আমার যখন ছেলেমেয়ে হ'ল ও তাদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিলুম, তখন আমার খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করে দেখলুম, তাদের তিন ভাগ কম। আমায় যে কেন এত খাওয়াতেন, তা এখনো আমি স্থির করতে পারিনি। তবে ভোর থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত আহারের তালিকা পাঠকপাঠিকাগণ শুনুন।

আমার মা ভোরবেলায় আমাকে ও বাবাকে চা করে দিতেন, সে চা মনে করবেন না যে চায়ে দু' চামচ দুধ, আর বাকি চা। মা'র মনে হ'ত, সে চা খেলে আমার গরম হবে। সেজন্য এক পোয়া দুধে এক ছটাক চায়ের জল, আর তার সঙ্গে এক ছটাক মিছরির গুঁড়া, ৪ খানা বিস্কুট—এই খেয়ে মর্ণিংওয়াক করতে যাওয়া হ'ত। পরে সেখানে ছুটছুটী করে উইল্‌সেন হোটেলে বাবা প্রায় রোজ যেতেন, আমিও যেতুম। বাবা কি খেতেন না খেতেন, আমার চঞ্চল মন সেদিকে বড় যেত না। আমার কেক্, লজেঞ্জ এই সব চল্‌ত।

গরমিকাল হলে আইস্‌ক্রিম খেতুম। আবার বাবা কোনদিন ধর্ম্মতলার বাজার থেকে বাজার করে যেতেন, ভাল ছাগমাংস, কপি, কলাইশুঁটি, কমলালেবু, আপেল আঙুর ইত্যাদি। বাড়ী গিয়ে কাপড় ছেড়েই আবার বস্কা দুধ মিছরি দিয়ে জ্বাল দেওয়া প্রায় দেড় পোয়া। তখন বেলা ৯-৩০ হবে। পরে ঠাকুরের বাল্যভোগের মাখন, মিছরি, বাসি লুচি ৪ খানা, ক্ষীরের লাড়ু ও সুপারির-পরিমাণ ৪টি; কিন্তু আমার রসনার এতেও বিশ্রাম নেই। মা'দের বাজারের গরম গরম কচুরি জিলাপি এলে, তা থেকেও দুখানা খাওয়া হয়ে গেল। পরে দিদিমার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—একবার বস্‌চি, একবার শুয়ে পড়্‌চি। দিদিমার আমের ঝোড়া এল। তিনি একটা হাতে দিলেন। আমার স্বভাব ছিল দুধে আম পেলেই তাতে একটী ফুটো ক'রে টিপে টিপে খেয়ে বেড়ানো। আবার বাইরে গেলুম, সেখানে খাজাঞ্চি দাদা মদ্‌না আমওয়ালার কাছে খাবার আম দর করছেন। আমি যাবামাত্রই আমওয়ালা বল্‌লে—এই আমটা চেখে দেখতো মা—বলে' ধুয়ে বানিয়ে দিলে, অমনি চেখে দেখা হ'ল। আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম, তখন স্নানের জন্য রূপটান গোলা, স্নানের সরঞ্জাম গোছানো হচ্ছে, ঝি ধরে নিলে, বিনুনি খোলা আরম্ভ করে দিলে। একরূপ জোরজবরদস্তি করে স্নানকার্য্যটা সম্পন্ন হ'ল। তখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ হয়েছে। একটু বই নিয়ে বস্‌বার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। মা ডাক্‌তে লাগলেন—এস মাথায় তেল দিয়ে দিই। আমার কর্ত্তামণির হুকুম, নাবার পর ম্যাকেসার অয়েল মাখতে হবে। মাথা মুছে, তারপর তেল দিয়ে চুল আঁচড়ানো হল। ভাত এসে পড়ল, বাবার ও আমার। দাদা খেয়ে স্কুল

চলে গেছেন। আমি বাবার সঙ্গেই খেতুম। ভাতের সঙ্গে আমার প্রণয় খুব কম। দুটি চারটি নাড়াচাড়া করে উঠতুম। কৈ মাছের ডিমটা, কি ইলিসমাছের ভাজাটা, কিম্বা গল্‌দার মুড়াটি। আমাদের বাড়ী মাংসটা রাত্রেই হ'ত। দিনে মাছের কালিয়া, ঝোল, মাছভাজা, ঘণ্ট, এই পর্য্যন্ত; কারণ আমার দিদিমা রোজ কালীঘাটে পূজা দিতেন ও প্রসাদী কচি মাংস আনাতেন। এইজন্য রাত্রেই রান্না হত। কিন্তু এখন যেমন পিঁয়াজ না দিলে মাংস রাঁধা হয় না, আমাদের বাড়ীতে সেটি হবার জো ছিল না। পেঁয়াজ কি হাঁসের ডিম আমার বাল্যজীবনে কখনো খাওয়া হয় নি।

পরে আমাদের খাওয়া হয়ে গেল। একটু বই শ্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। মনোযোগ দিয়ে যদি পড়্‌তুম তাহলে যে কিছু শিখতে পারতুম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা যে গান কি যে শ্লোকটি শুনতুম, অমনি কণ্ঠস্থ করে ফেলতুম। কিন্তু মা সরস্বতীর দয়া বড়ই কম। সেজন্য পড়ায় মন মোটেই বসত না। খাওয়ার পর বাবা, মা, আমি ও আমার ছোট ছোট ভাইবোনগুলি সকলেই শুয়ে পড়তাম, বেহারা পাখা টান্‌তে লাগল। দরজা বন্ধ ক'রে টানা পাখার দড়িটা দরজার গায়ে একটা ছেঁদা ক'রে বার ক'রে দিয়েছে। বেহারা বাহিরে বারান্দায় বসে টান্‌ছে। মা ও বাবার যেমন একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি অমনি উঠেছি। আমার দিনে ঘুম কখনো আসেনা। আর একটা মতলব কি মাথায় এসে জুটল, অমনি উঠ্‌লুম দৌড়ে চৌতলার ছাতে। মস্ত উঁচু কাঠের সিঁড়ি চড়বার সময় নড়ে, কিন্তু আমার ভয় ছিল না, বেশ উঠে যেতুম। আবার তেতালার ছাতে এসে, একরকম বুনো

ঘাসে হলদে হলদে ফুল হত, তাই তুলে আমার পিতলের রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন তাঁকে আর অন্যান্য পুতুলদের মালা গেঁথে পরাতুম। আমার ফুল নিয়ে খেলাটা বড় ভাল লাগ্‌ত। দিদিমার পূজার প্রচুর প্রসাদী ফুল সিঁড়ির একটা কোণে ঢালা থাক্‌ত।

আমি এইরকমে দুপুরবেলা ঘুরতুম। পরে দুটো বাজলে গুরুমহাশয় আমাকে পড়াতে আস্‌তেন। গুরুমহাশয়রা চার ভাই ছিলেন, আমাদের যত বাড়ী সব ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। আমার গুরুমহাশয়ের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান। তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন।

কিছুদিন পরে আমার বিবাহের কথা আরম্ভ হ'ল। তখন আমার দিদিমা একদিন আমাকে বলেন যে—তুমি কেবল দুষ্টামি ও খেলা করে বেড়াও, পড়ায় মন দেওনা, পড়া না ক'রলে বর আসবে না, বল্‌বে দুষ্টু মুর্খ মেয়ে, আমরা কেউ বিয়ে ক'রবনা। সেইদিন থেকে আমার মনটা কেমন একটু পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল, মনে হ'ল আমার মা'রা সবাই পড়্‌তে জানেন, আমারও পড়া শেখা উচিত—শিখ্‌তেই হবে। আমায় যেদিন দিদিমা এই শিক্ষাটি দিয়েছেন, সেদিন আমার মনে হতে লাগ্‌ল কতক্ষণে গুরুমহাশয় আস্‌বেন? আমার এমন উৎকণ্ঠা হ'তে লাগল যেন সেইদিনই সব দ্বিতীয় ভাগটা শেষ করি। আমি বাইরে আমার পড়্‌বার আয়োজন ক'রে নিচ্ছি। মাদুর পাত্‌লুম। বই, শ্লেট, পেন্সিল, জলের বাটি, স্পঞ্জ সব ঠিক করে বসে লিখ্‌ছি, নইলে কোথায় চাকরদের বল্‌বেন, তখন চাকর খোঁজ করে ধরে আন্‌বে, মাদুর পাত্‌বে, বই শ্লেট সব দেবে, তবুও দুষ্টুমি হ'ত। আবার যেদিন ও-বাড়ীতে বড়দি ছোড়দির কাছে দুপুরবেলা যেয়ে খেলায় মেতে যেতুম, সেদিন কিছুতেই আর আস্‌বার মন হ'ত না।

কিন্তু কি জানি দিদিমা কিরকম ক'রে মানুষকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বল্‌তেন, সবাই তাঁর কথা শুন্‌তে ভালবাস্‌ত। আমার ৯ বছরে বিবাহ হয়। দিদিমা সন্ধ্যাবেলায় বেড়িয়ে আস্‌বার পর, কি তিনি খাবার পর যখন দুপুরবেলায় বিশ্রাম করতেন, তখন আমাকে ডেকে উপদেশ দিতেন। গুরুমহাশয় সেদিন আমার পড়া দেখে খুব খুসী। বল্‌লেন বাঃ! আজতো বেশ, এরকম রোজ কর না কেন, তাহলে খুব শীগ্‌গির শীগ্‌গির বই শেষ হয়।

তখনি একবাটি গরম দুধ ও তার সঙ্গে একটা মিহিদানা এসে পড়ল, একটু খুঁৎমুৎ করে সেগুলি উদরসাৎ করা হ'ল। আমার ২—৪টা পর্য্যন্ত দু'ঘণ্টার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল। সেদিনকার মত ছুটি। পরে আমার কর্ত্তামণি ঠিক ৪টার সময় ফল ও বড়বাজারের জলপান, ছানা, মাখন, বেদানা প্রভৃতি খেতেন। সেগুলি সাজান হ'ত, কিন্তু তিনি অতি অল্পাহারী ছিলেন। আমার উদরেই বেশী যেত। আমার দাদা যেদিন স্কুল থেকে সকাল সকাল আসতেন, সেদিন দুই জনে মিলে খাওয়া যেত। দিদিমা রোজ কর্ত্তামণির ভাত খাবার ও বিকেলে জলখাবার সময় বস্‌তেন।

আমার যে কি আনন্দময় প্রাণ, সে কথা আমার লিখে জানাবার ক্ষমতা নেই, মনে প্রাণে বেশ অনুভব করতে পারি, আর লোকের কাজগুলিও দৃষ্টি করি। দয়াময় আমার উপর বড়ই দয়া প্রকাশ করেছেন। এজন্য এ কথা লিখ্‌লাম। আমার এখন ৪৪ বছর বয়স, কিন্তু এখনও মন সদাই আনন্দে ভাস্‌ছে। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর আমরা মা'র সঙ্গে তাঁর পিতার বাগানবাড়ীতে গিয়ে ছ'মাস থাকি। আমরা কলকাতা থেকে যেদিন যাই, বাড়ীর গাড়ীতে

গেলুম আমরা তিন বোন, বাবা, আর কোচবাক্সে রামুদাদা, বাবার পুরাণো খানসামা। আর আমার মা গেলেন একটি ঘেরাটোপ-দেওয়া পাল্কিতে। ঝি তিনজন ও দ্বারোয়ান বোটে গেল। আমরা গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করে, কর্ত্তামণি ও দিদিমার চরণধূলি নিয়ে সিঁড়িতে নাম্‌তে যাব, অমনি কর্ত্তামণি ডাক্‌লেন, ডেকে আমায় আদর করে বুকে চেপে চক্ষের জলে স্নান করালেন। তাঁর প্রাণ এত কোমল ছিল যে, কোন কোন সামান্য কারণে চক্ষু জলে পূর্ণ হয়ে যেত, আর ছোট ছেলের মত ঠোঁট ফ্‌লিয়ে ফুলিয়ে কাঁদ্‌তেন। আর এখন আমি যাচ্ছি, তাতে তাঁর কাঁদ্‌বারই কথা। আমাকে আর দাদাকে প্রাণের মত দেখতেন। আমিও কেঁদে ফেল্‌লুম। এদিকে কর্ত্তামণিকে ছাড়তেও ইচ্ছা হয় না, আবার বাগানে যাবারও খুব ইচ্ছা। কি করি, তখন যাবার সব ঠিক। মা'র পাল্কি পর্য্যন্ত চলেছে। তখন নেমে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। কর্ত্তামণি সামনের বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তখনও আমায় ডেকে বল্‌ছেন—দেখ, বেশী দেরী ক'র না; ওরা না আসে, তুমি চলে এস। আমিও কর্ত্তামণিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাস্তাটা পার হয়ে গেলুম। পরে বোটে গিয়ে সেই মা গঙ্গার শোভা, পানসি নৌকা ডিঙ্গী দেখে মন ভুলে গেল। মনের কথা যদি ঠিক লিখ্‌তে হয়, তবে মন পূর্ণানন্দ পাচ্ছে না। কারণ আজ দাদা, কর্ত্তামণি ও খাজাঞ্চি দাদার সঙ্গ ছেড়ে আস্‌তে হ'ল। ও-বাড়ীর দিদিদের জন্যেও মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

কিছুক্ষণ এইরকম হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু নতুন নতুন প্রকৃতির দৃশ্য পেতে লাগলুম; তখনি মন আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌ল। আর মনের যে মলিন ভাব ছিল, সেটি দূর হয়ে গেল। প্রথম দিন আমরা

বরানগরে গিয়ে পৌঁছলুম, অল্প বেলা ছিল বলে মাঝিরা নোঙর ফেলে দিলে। রামুদাদা ও একজন মাঝি নেবে গিয়ে দুধ নিয়ে এল। এর ভেতর লুচি ভাজা ও ছোকা হল, খেতে বেশ লাগল। আবার রাত্রে দুধ ও সন্দেশ খাওয়া হ'ল। তবে সন্ধ্যার খবর আমি কিছুই জানি নে। বিশেষ সেদিন শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন আবার ভোরে ঘুম ভাঙতেই কলের বাঁশী শুনছি। পরে মুখ ধুয়ে বসে বসে রাঁধাবাড়া, মাছ কেনা ইত্যাদি দেখ্‌ছি। পরদিন কোন্নগরে পৌঁছলাম। আমার মাতামহ দেখতে ঠিক মহাদেবের মত ছিলেন, আর স্বভাবও ঠিক শিবের অনুরূপ ছিল। মাতামহী কিন্তু তার ঠিক বিপরীত—দেখতেও বটে, স্বভাবেও বটে। তা যাই হোক্, মাতামহী লোককে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। খাওয়ার উদ্যোগেই তিনি ব্যস্ত থাক্‌তেন, আর খাওয়ার তদ্বিরটাও ভাল-বাস্‌তেন। কিন্তু মেজাজ বড় কড়া ছিল। সত্য কথা বলতে কি, আমার সঙ্গে তাঁর বাল্যকালে বড় বনিবনাও ছিল না। অবশ্য সেদিন আমি প্রথম গিয়েছি, আমায় আদর করলেন। তাঁর যখন আমাকে আদর করবার ইচ্ছে হ'ত, তখন বলতেন আয়—নইলে কথা কইতেন না। স্থধু যে তাঁর দোষ, তা নয়। আমারও বিবেচনাশক্তি ছিল না। অবশ্য এটা এতদিনে বুঝেছি। তিনি আমায় ভাল ক'রে চুল বেঁধে দিতেন; আমি ভারী চঞ্চলা মেয়ে, সব নষ্ট করে ফেলতুম। আমায় বলতেন—আমার কাছে বসে ফুলের মালা গাঁথ্। আমার যেদিন ইচ্ছে হ'ত গিয়ে বস্‌তুম; নাহয়ত কেবল একবার বৈঠকখানা, একবার অন্দর—এই কচ্ছি। আমার মাতামহীর কথাটি আগে এসে পড়েছে। বাগান, বাড়ী, পুকুর কি

বৈঠকখানা সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি। বাগানটী বেশ বড়। তার ভেতর তিনটে পুকুর ছিল, অন্দরে দুটো। একটা বিঘে দুই জমি নিয়ে, সেটির নাম ছিল ছোট পুকুর। সেটায় বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মালিদের গাছে জল দেওয়া, এই সব হত। আর বকুল বলে যে পুকুরটি ছিল, সেটি বড় সুন্দর। সেটি প্রায় ৪ বিঘে জমির উপর ছিল। তার জল ছিল খুব পরিষ্কার। দু পাশে দুটি বাঁধা ঘাট, ও চারপাশে মেদির ছাঁটা বেড়া ছিল। তার পাড়গুলি ঘন জমাটবাঁধা ঘাসে ভরা, ও ঘাটের দুপাশে মস্ত মস্ত দুটো বকুল গাছ ছিল। গাছে খুব ফুল হত। ফুলগুলি খুব বড় বড় আর সাদা হত। ঘাটের সাম্‌নে বস্‌বার জন্য মস্ত চবুতারা ছিল। তার চারদিকে আবার বেঞ্চের মত গাঁথা ছিল, আর মধ্যে মধ্যে থাম। থামেতে সব বড় বড় পুতুল ছিল—কেউ কাপড় নিংড়ে ফেলছে, কেউ প্রার্থনা করছে, কেউবা আবার ছেলে কোলে ক'রে আদর করছে। এদের মাঝখানে আলো দেবার এক থাম্বা ছিল। তা ছাড়া অনেক ফুলের গাছও ছিল। তবে গোলাপ যুঁই বকুল চামেলি চাঁপা,—এই সুগন্ধী ফুলের গাছ বেশির ভাগ ছিল।

এখনকার ছেলেদের পছন্দ অন্যপ্রকার। তাদের একটা গাছঘর চাইই। নানারকম পাতার গাছ কি জানি আমার মনে তত ভাল লাগে না। ফুলটায় প্রাণে বড় দেবভাব আসে। আর পরতেও বড় ভালবাসতুম। দিদিমা খুব সৌখীন লোক ছিলেন। তিনি খাওয়ার পর দু এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে, অমনি বাগানে চবুতারায় গিয়ে বস্‌তেন। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক যেত। তাঁর মেজ ননদ ছিল, তাঁকেও আমরা মেজদিদিমা বল্‌তুম্। তাঁর একটী ছেলে ছিল, তিনি

খুব দেবভক্ত ছিলেন। মার্কণ্ড চণ্ডি অনুবাদ করেছেন, পূজাপাঠ খুব জান্‌তেন। আবার সুন্দর দুর্গামূর্ত্তি গড়েছিলেন। নিজের হাতে গড়ে দুর্গোৎসব করেন। এই মামার একটি বোন ছিলেন। তাঁর কাছে সন্ধ্যাবেলায় নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম।

আমি এক কথা লিখ্‌তে লিখ্‌তে আর এক পথে এসেছি। দিদিমা ফুলের মালা গাঁথবার জন্য গিয়ে বস্‌লেন। মালী মস্ত সাজি ভরে যূঁই, বেল, বকুল এনে দিলে, দিদিমা নানারকম বাহারী করে গাঁথতে লাগলেন। দাদামহাশয়ের জন্যে ফুলনল, আমার জন্য মাথার জাল, মালা বিস্তর গাঁথ্‌তেন। আবার ঐখানে কথা শোনা হ'ত, রামায়ণ কি প্রভাসখণ্ড। কোনদিন বা কেউ গানওয়ালী এসে পড়ত, তার গান শোনা হত। তারপর দিদিমা খুব আমুদে ছিলেন, তাসখেলা চল্‌তে লাগল। দিদিমার অভ্যাস ছিল দু'বেলা সাঁতার দেওয়া। আমরা সকলে ঘাটে বসে দেখতাম। তিনি খুব মোটা ছিলেন, কিন্তু এত জোরে যেতেন যে সকলে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। আমার মামারাও বাইরের মস্ত পুকুরে সাঁতার দিতেন। আমার কিন্তু জলে নাব্‌তে বড় ভয় কর'ত। যত লাফাতুম ঘাটের উপর। আমার নিয়ম ছিল ভোরে উঠে বাগানে ফুল কুড়ানো। তারপর ছাতে উঠে উঠানের বেলগাছ থেকে বেল পাড়া হত। বেলগুলি চমৎকার ছিল; যেমন মিষ্টি তেমনি আবার বীচিও নেই। আকারেও বেশ বড় ছিল। আমি সেখানে যাবার পর থেকে আর কেউ বেল কুড়োতে পেত না, আমি কুড়িয়ে এনে মা কিম্বা দিদিমাকে দিতুম। তারপর দুধ খেয়ে বৈঠকখানায় বেড়াতে

যেতুম। বৈঠকখানায় যেতে হ'লে খানিকটা রাস্তা হেঁটে তবে উঠতে হত। পথে কত গরীব লোকের বাস ছিল। তারা আমাদের দেখে খুব প্রশংসা করত। আমরা তিনটী বোনেই যেতুম। আমার চেয়ে তারা আরও সুশ্রী ছিল। তাদের গঠন আমার মত এত স্থূল ছিল না; তারা আমার মত এত চঞ্চলাও ছিল না।

ভগবানের রাজ্যের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এখানে যখন যা চাই তাই পাই। জল, বায়ু, ফল, ফুল, অন্ন, বস্ত্র, আনন্দ, গীত, বাদ্য, আদর ও স্নেহ—সকলই পাই। তবে অভাব ও কষ্ট যে কি, সেটি পরম পিতা আমায় এ পর্য্যন্ত জান্‌তে দেন নি। তবে লোকের কেন দেখি সব জিনিষেরই অপ্রতুল। কত লোকের অন্নবস্ত্রের কিছুরই অভাব নেই, অথচ একদণ্ডও মনে শান্তি বা সুখ নেই। এই বুঝি কর্ম্মফল। আমারও ঠিক এই ধারণা।

দিল্লী সহরে ফাল্গুনী।

[সম্প্রতি দিল্লী সহরে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" অভিনীত হয়েছে। দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীরা এ নাটিকাখানির অভিনয় করেন। দিল্লী থেকে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক আমাকে এই ব্যাপারের একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে সেটি সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন। আমি আনন্দসহকারে সে অনুরোধ রক্ষা করছি। প্রবাসী বাঙালী-সমাজেও বাঙলা-সাহিত্যের আদর কতদূর বেড়ে গিয়েছে, এই 'রিপোর্ট' তার প্রমাণ।

দিল্লীতেও অ-নবীনের দল এ অভিনয়ের পরিপন্থী হয়েছিলেন, কিন্তু নবীন দলেরই সেখানে জয় হয়েছে। "ফাল্গুনীর" বিরুদ্ধে প্রাচীনদের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, ওর মানে বোঝা যায় না। বোধহয় সেই কারণে প্রোগ্রামে শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার ফাল্গুনীর মানে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের ব্যাখ্যাগুলিও এই সঙ্গে প্রকাশ করছি। পাঠকরা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, এঁদের ভিতর কেউই আমাদের মত পেশাদার সাহিত্যিক নন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার ডাক্তার। অপরটির পরিচয় আমি জানিনে বলে দিতে পারলুম না।

আমি যখন বিলেতে ছিলুম, তখন একদিন লক্ষ্ণৌএর মুসলমান যুবকদের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান যুবকদের মহা তর্ক বাধে এই নিয়ে যে, কোন্ সহরের উর্দ্দু ভাল। সে তর্কের আমি শ্রোতা মাত্র ছিলুম। সে ক্ষেত্রে একটি কথা শুনি যা আমার আজও মনে আছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কোন অভিজাতবংশীয় মুসলমান যুবক বলেন যে, দিল্লীর উর্দ্দুর প্রধান গুণ এই যে, সে ভাষা "সাফ আওর চুস্ত।"

দিল্লীপ্রবাসী বাঙালীদের লেখা পড়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, দিল্লীর বাঙলাও "সাফ আওর চুস্ত্।"

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'Les Nouvelles Litteraires'-এর ৩রা এপ্রিলের সংখ্যায় ফাল্গুনীর একটি সমালোচনা বেরিয়েছে। সেটির বঙ্গানুবাদ আমি এই সঙ্গে প্রকাশ করছি। পাঠকরা দেখে খুসী হবেন যে, এ কাব্য সম্বন্ধে দিল্লীর সঙ্গে প্যারিসের বড় বেশি মতভেদ নেই।

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী।]

ফাল্গুনের সংক্রান্তির দিন দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের নাট্যকলা বিভাগের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" নাট্য-কাব্য অভিনীত হয়েছে।

বাংলার বাহিরে, এমন কি বাংলাদেশেও, ফাল্গুনী কোথায়ও অভিনীত হয়েছে বলে জানা নেই। এক রবীন্দ্রনাথ নিজেই ফাল্গুনী বোলপুরে এবং কলকাতায় অভিনয় করেছিলেন। একে ত রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন লেখার যে অভিনয় হতে পারে, এ কথা সাধারণে বলে না; তার উপর ফাল্গুনী আবার সবার সেরা—রূপকের চরম। সুতরাং এঁদের এ নির্ব্বাচনে যে সাধারণে খুসী হবেন না, এবং একে সুবুদ্ধির কাজ মনে করবেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করতে হবে। রুচিরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির স্তর আছে। আমাদের দেশে এমন সময় ছিল, যখন যাত্রার দলে গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোকের পাঠ অভিনয় করে লোকে বাহবা নিত। ক্রমশঃ থিয়েটারের যুগে রুচির আর একটু উন্নতি হ'ল। তখন লোকে চোখের ও কানের খোরাক ছাড়া মনের খোরাকেরও

খোঁজ করতে লাগ্‌ল। বর্ত্তমান রবীন্দ্র-সাহিত্যে আবার আত্মার খোরাকের কাজ চল্‌ছে। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন লোকের এই আত্মা প্রভৃতি বড় বড় কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ নেই। লঘু সাহিত্য এখানে বেশী আদরণীয়। আজও আমাদের দেশ তলোয়ারের আস্ফালন এবং বীররসের মোহ কাটাতে পারে নি। সূক্ষ্মের চেয়ে স্থূলের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশি। তাই আমার মনে হয় দিল্লীর বর্ত্তমান নাট্য-কলাবিভাগের নেতৃবৃন্দ ফাল্গুনীর মত বই নির্ব্বাচন করে' যে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, তা' সর্ব্বজনপ্রিয় না হলেও অনন্যসাধারণ। বাঙলার বাইরে যে বাঙ্গালীরা প্রবাসজীবন যাপন করেন, তাঁরা যে শুধু ডাক্তারী, ওকালতী, ব্যবসা ছাড়াও অন্য বিষয় চিন্তা করে থাকেন, এটা আশারই কথা বল্‌তে হবে।

কি প্রাণপাত পরিশ্রম করে যে এঁদের এটিকে সার্থক করে তুল্‌তে হয়েছিল, তার সামান্য ইতিহাস আমি জানি। দিল্লী থেকে মন্মথ বাবুকে পাঠান হ'ল বোলপুরে, গানের সুরগুলি আদায় করে আন্‌তে। রবীন্দ্রনাথের চরণোপান্তে উপস্থিত হলে তিনি সব শুনে বল্লেন, "তুই দু' দিনের মধ্যে ফাল্গুনীকে দিল্লীতে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাস?"

তিনি যে প্রবাসী বাঙালীদের কাছ থেকে এতদিন কোন সাড়াই পান নি, এটি বোধ হয় তারই আভাস। তারপর দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুরগুলি আদায় করে তিনি ফিরে এলেন। মাঝির কুটীরের দৃশ্যে সারদা বাবু বল্লেন, কুটীরের উপর দিয়ে একটু বাঁকা ছোট একখানি ডাল থাক্‌বে। ইঞ্জিনীয়ার নৃত্যগোপাল বাবু তিন দিন মাঠে মাঠে ঘুরে ঠিক সেইরকম একটি ডাল আহরণ কল্লেন।

আর ফুল ঝোপঝাড় গাছপাতা ত সমস্ত দিল্লী সহর ঝেঁটিয়ে, এমন কি আম্বালা থেকেও আনা হয়েছিল। যেখানে যেটুকু হলে ideal-এর কাছাকাছি পৌঁছানো যায় বলে এঁদের মনে হয়েছে, তার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি এঁরা করেন নি। বাইরে থেকে এইটুকু জেনেই এঁদের প্রেরণার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

অভিনয় সম্বন্ধে বলার কথা এই যে, অ্যামেচার নাট্যের যে সব সাধারণ খুঁত হয়, তা' এঁদেরও হয়েছিল। প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে প্রচ্ছদপট উঠতে বড় বিলম্ব হচ্ছিল, এবং সে জন্য দর্শকবৃন্দ অধীরও হচ্ছিলেন। কিন্তু ভিতরের লোকদের তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টার অন্ত ছিল না। প্রত্যেক দৃশ্যে সীন আগাগোড়া বদল করতে হয়েছে। সেজন্য কতকটা বিলম্ব অপরিহার্য্য। আর এগুলি details-এর খুঁত, principle-এর নয়। এঁদের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের কচি কচি হাত দু'খানি নেড়ে নেড়ে গেয়েছিল, "দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।" যদি সেদিন কারোর প্রাণ এই দোলায় দুলে থাকে, যদি তিনি অনুভব করে থাকেন যে বাঙলার বাইরে পাঞ্জাবের এই প্রান্তেও আজ বসন্ত নেমে এসেছে, তবে ফাল্গুনী সার্থক হয়েছে। কেবলমাত্র এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতেই কবির প্রাণপণ চেষ্টা। তাই এদেরও ফুল লতাপাতা, পদ্ধতির পাতাগুলি পর্য্যন্ত বসন্তের রঙে মুড়ে বেরিয়েছিল। প্রথম দৃশ্যে বসন্তের আবির্ভাব খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল। শীতের পোষাকে নিখুঁত শিল্পের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল —এটি চিত্রশিল্পী সারদাচরণ উকীলের কৃতিত্ব।

আজ বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক যুগে সহজের স্থান নেই,

আনন্দের স্থান নেই। লোকে হাতে নেড়ে, পায়ে থেঁত্‌লে অনুভব করতে চায় যে, তারা কিছু এমন পেল যা তারা সকলের সাম্‌নে প্রমাণ করতে পারে। বস্তুর অতীত অ-বস্তুর দেশে যাঁদের দৃষ্টি চলে, যাঁরা সেই সুদূরের গান গাহেন, তাঁদের গান এখনও ভবিষ্যতের আহ্বান। তাই শান্তিনিকেতনের আম্রকাননের মধ্যে ঋষির বীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে, তার আহ্বানবাণী দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে—সমস্ত জগত সেই বাণীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। সেই বাণীকে যাঁরা কায়মনো-বাক্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য।

দিল্লী,
১১ এপ্রিল, ১৯২৬।

শ্রীঅবনীনাথ রায়।

ফাল্গুনী।

(১)

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা হচ্চে—চলা-সৃষ্টির কোন্ এক আদিযুগ হতে মানুষ চল্‌তে সুরু করেছে; চল্‌তে চল্‌তে সে জন্মাল, নাচ্‌তে নাচ্‌তে সে জীবন বয়ে চলেছে; আবার চল্‌তে চল্‌তে সে জীবনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। এই চলার বিরাম হলেই বেসুর, অসঙ্গতি, মৃত্যু।

রাজার দরবারে অনেকরকম লোকের ভিড়—কেউ রাজাকে ঠকিয়ে নিতে চায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, বৈরাগ্য-বারিধির শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজেদের অভীষ্টপূরণের অনুকূল করে। কবি এসে রাজাকে এই অবস্থাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন। কবির সুর রাজার বুকে গিয়ে বাজে, যদিও তার অর্থ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন,—কবি, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ, এমন একটা কিছু কর যাতে মনটা বৈরাগ্য-বারিধির দিকে আর না ঝোঁকে। কবি বল্লেন,—হাঁ, আমার হাতে এমন রচনা আছে। এই রচনাটি হচ্চে ফাল্গুনী।

ফাল্গুনীর ভিতরের কথাটুকু প্রাণের কথা—জগতে নিছক বর্ত্তমান থাকার যে আনন্দ, সেইটুকুই হচ্চে এর মূল সুর। এর মধ্যে তত্ত্ব কথা কিছু নেই—কাজেই কেজো লোকদের এ কোন কাজে আসবে না।

বিষয়টা হচ্চে শীতের বস্ত্রহরণ বা বসন্ত-উৎসব। যেমন শীত এসে তার কুয়াসা দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির নীলিমাকে ঢেকে ফেলে, তেমনি আমাদের জীবনেও বার্দ্ধক্য এসে যৌবনকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতিতে শীতের পর আবার বসন্ত আসে—কুয়াসা কেটে যায়, বনস্থলী সবুজ হয়ে ওঠে, ফুল ফোটে, পাখী গান গায়। প্রকৃতির শীত ও বসন্ত আলাদা নয়—শীতই বসন্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে; শীতের ভিতর দিয়ে যিনি অভিব্যক্ত, বসন্তের ভিতর দিয়েও তিনিই অভিব্যক্ত। জীবনেও সেইরূপ মানুষ যদি এই অখণ্ড মূল সুর না হারায়, তবে তার জরা ও বার্দ্ধক্য শূন্যত্ব ও স্থবিরত্বে পরিণত হয় না। সে মানুষ চুলে পাক ধরলেও ছেলেমানুষ থাকে। আর সেই মানুষই বল্‌তে পারে, 'যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জান্‌চি যে বাঁচবই'। এরাই 'নিজের খেয়ালে এমনি হু হু করে চলেছে যে, তাদের বয়সটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁস নেই'। প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেমন কোন ভেদ নেই,—গ্রীষ্মই বর্ষার ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্চে, শরৎই হেমন্তে পরিণত হচ্চে,—তেমনি মানুষের বেলাও জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নেই; জীবনের আগটা এবং জীবনের পরটা—সবটাই একটা বিরাট চলা দিয়ে গ্রথিত।

ফাল্গুনীর অভিযান হ'ল বুড়োকে খুঁজে বের করা। এই বুড়ো আমাদের জীবনে-মরণে কাজে-কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বলেই তাকে খুঁজে পাইনে। পেছন দিক দিয়ে যখন দেখি, তখন মনে হয় সে ভয়ঙ্কর, অন্ধকারের মত তার বুকে চোখ, সে পেছনে হেঁটে চলে। এই ভয়ঙ্করের আবরণ দিয়েই সে ঢাকা। এই আবরণ যার কাছে খুলে যায় সে দেখ্‌তে পায়, সে বুড়োও নয়, ভয়ঙ্করও নয়—সে

বালক—'সে বারে বারেই প্রথম, সে ফিরে ফিরেই প্রথম'। সর্দ্দার এই ছেলে-মানুষের দলের মধ্যে সব সময়েই আছে বলে তাকে এরা দেখ্‌তে পায়নি। তার পরামর্শমত বুড়োকে যখন খুঁজে বের করলে তখন দেখ্‌লে, সে আর কেউ নয়, সে তাদেরই সর্দ্দার। তাদের এই নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা, শূন্য মাঠ, মাঝি কোটালের কাছে অনুসন্ধান, মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ ও সন্দেহ, কবি তাঁর অমর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্ধ বাউল তার ভিতরকার দৃষ্টি দিয়ে পথ ঠিক দেখ্‌তে পায়, সে বুড়োকে চেনে, তাই তার আর ভয় নেই। চন্দ্রহাস প্রেম—সে আমাদের জীবনকে প্রিয় করে রেখেচে; সে বুড়োকে চেনেনা, তবে রহস্যটা তার জানা, তাই সে সন্দেহ করে না, আর অকুতোভয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে। দাদা চৌপদী তৈরী করতেন—কাজের কথাই তাতে লেখা যায়, অ-কাজের কথা তাতে বাজে না। শেষে এদের যৌবনের দলের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন—তাঁর চৌপদীকে এরা বসন্তের আবীরে রাঙিয়ে দিলে।

ফাল্গুনী বিশ্ব-কবির গীতিকাব্য হতে ভাবচুরি—এ প্রকৃতির নাট্য-লীলা থেকে জীবনের নাট্য-লীলায় পটপরিবর্ত্তন। চিরকাল বিশ্বে এই লীলা চল্‌ছে, কিন্তু মানুষের আপাতদৃষ্টিতে এ ধরা পড়ে না। তাই এ শুধু নাটকের কথা নয়, জ্ঞানের কথা নয়—এ আধ্যাত্ম জীবনের গভীর এক অনুভূতির ইতিহাস।

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

এই দেখা যিনি পান, যিনি প্রকৃতই দেখেন পুরাতনটাই নতুন, 'ঋতুর নাট্যে বৎসরে ২. শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়',—তিনিই ফাল্গুনী লিখতে পারেন। তাই বলি ফাল্গুনী শুধু সুন্দর নয়, ফাল্গুনী অনুপম।

শ্রীঅবনীনাথ রায়।

---

(২)

বিশ্বের চিত্তমরুকে শীতল করবার জন্য বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হ'তে যে অমৃতধারা আনন্দে নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে এসেছে, সেই মন্দাকিনী-ধারাই ফাল্গুনী।

যুগযুগান্ত হ'তে মানবহৃদয়ে অবিরত মীমাংসার চেষ্টা হয়ে আসছে—আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাচ্ছি? মৃত্যু কি? সত্য কি? পথই বা কি? অনেকে অনেক মীমাংসা অনেকরকমে ক'রেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সত্য কি. এবং কি উপায়ে সত্যের উপলব্ধি হয়, তা' এই ফাল্গুনীতে প্রকাশ ক'রেছেন। শুধু আজ ফাল্গুনীতে কেন, বহুপূর্ব্ব হ'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমুদ্রে অনেক স্থানে এই জন্মমৃত্যুর মীমাংসা পাওয়া যায়। ফাল্গুনী তার সমষ্টি।

সত্য কি?—"আমরাই চিরকালের", "আমরাই বারেবারে", "আমরাই ফিরে ফিরে", "আমরা আছি", "আমরাই সত্য"। আমরা অনাদি থেকে অনন্তে চলেছি, "চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে"—আমাদের এই চলাটাই সত্য। আমাদের এই চলার পথে কত

গগনতলে জীবনপ্রদীপ জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়; ঋতুর পর ঋতু বরণ-ডালা নিয়ে এগিয়ে আসে, চলে যায়; মৃত্যুর পর মৃত্যুকে চরণ-ঘায়ে মেরে পার হ'য়ে আমরা চলেছি। অনন্তের যাত্রী আমরা—"আমরা ঠেকব না তো কোন শেষে, ফুরয় না পথ কোন দেশে রে", "মোদের মিলবে না কূল গো, মোদের মিলবে না কূল"। এই চলাটাই আমাদের খেলা, এই চলাটাই আনন্দ, আনন্দই সত্য—"খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নেই"। এই খেলা, এই আনন্দের লীলা বিচিত্র হ'য়ে ফুটে উঠছে বিশ্বে—"খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল", আবার "খেলার আগুন যখন লাগে, ভাঙ্গাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই"।

সত্য উপলব্ধির উপায় কি?—"প্রাণের সদররাস্তায় বেরিয়ে পড়্", "থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস্ নে"। প্রাণের রাস্তায়, প্রেমের পথে, আনন্দের পথে, বেরিয়ে পড়্। যেদিন বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি হবে, সেইদিন দেখতে পাবে আমরাই সেই আনন্দময় তিনি—যাকে আমরা যুগযুগান্ত থেকে জানবার জন্য চেষ্টা ক'রে আসছি। "আমরাই বারেবারে, আমরাই ফিরে ফিরে," আমরা অনন্তে চলেছি। সেই অনন্ত চলার লীলাতেই তার ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন অবস্থা ফুটে উঠেছে। এই রহস্যভেদ করবার জন্য কবি প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বসন্তের স্পর্শে শীতবুড়োর ছদ্মবেশ যেমন খসে যায়—দেখি শীতই বসন্ত,—প্রেমের স্পর্শে, আনন্দের আলোয় তেমনি দেখতে পাওয়া যায় আমরাই সেই নিত্য তিনি। আপাততঃ যাকে একদিক থেকে দেখা যায় হারানো, তাকেই অপরদিক থেকে দেখা যায় পাওয়া।

পাওয়ার আরম্ভেই হারানো উপস্থিত হয়, আবার সেই হারানোর শেষেই পাওয়ার পরিপূর্ণতা। পুরাতনকে হারানো, আর নূতনকে পাওয়া, দুইই এক—চলার লীলা। "তোমায় নূতন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণেক্ষণ, দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন"।

সূচনা—যুগে যুগে মানবহৃদয়কে মৃত্যু সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত করেছে। রাজার চুলে পাক ধরেছে, অতএব তাঁর মন খারাপ হ'য়েছে, মৃত্যুর দ্বার সম্মুখে মনে ক'রে তাঁর আর কিছুই ভাল লাগছে না; রাজকর্ম্ম, আমোদ-আহ্লাদ সব "চুপ"। প্রকৃতির উদ্যানে বসন্তের অভাবে যেমন সব চুপ্‌চাপ্, তেমনি রাজার হৃদয় উদ্যানে আনন্দ অভাবে সব চুপ্‌চাপ্। মন্ত্রী আর শত চেষ্টাতেও রাজার মনকে রাজকর্ম্মে টেনে রাখতে পারছেন না। শীতের শুকনো পাতার মত রাজার মনও শুকিয়ে মড়মড়ে হ'য়ে গিয়েছে; ঝরা পাতায় যেমন রং ধরে, তেমনি রাজার মনেও গেরুয়া রং ধরেছে। তিনি এখন চান একমাত্র শ্রুতিভূষণকে, আর তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি। যাজক ব্রাহ্মণ শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজের স্বার্থের থলিটি পূর্ণ ক'রে, শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়ে রাজাকে বৈরাগ্যের পথ দেখিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রুতিভূষণের মন্ত্র—পাবার আশা রেখে ত্যাগ করা; আসক্তিপূর্ণ, নিরাসক্ত নয়। ফাগুনের চঞ্চল হাওয়ার মত সভাকবি কবিশেখর এসে রাজার দুর্ব্বল মনের বৈরাগ্যের ভূষণটি ফাগ মাখিয়ে রঙ্গীন ক'রে দিলেন। শীতে মৃতবৎ গাছপালা ফাগুন হাওয়ায় যেমন নবপল্লবিত হয়, তেমনি শ্রুতিভূষণের বিদায়ের পরই কবিশেখর এসে রাজার মৃতবৎ অন্তঃকরণ নবপল্লবিত ক'রে বল্লেন, "মহারাজ! সাদা চুল, তা ভাবছেন কেন? সাদাই তো সকল

রঙ্গের বাসা, যারা ভোগবতী পার হ'য়ে এসেছে, তারাই আনন্দ-লোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে, তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়; এখনই তো আপনার আনন্দের সময়। ঘরের কোণে বৈরাগ্য আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না, উঠতে হবে, চলতে হবে, আনন্দের সদররাস্তায় নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে পড়ুন"। নদী আনন্দে তার নিরাসক্ত প্রেম বিশ্বে ঢেলে দিতে দিতেই সেই অনন্ত সমুদ্রে মিশে যায়, "তখন তার দেওয়া যেমনি ঘোচে, তার পাওয়াও তেমনি ঘোচে"। কবির অমৃতবাণী রাজার প্রাণে গিয়ে বাজ্‌ল। মানবহৃদয়ে তত্ত্বকথা বা বৈরাগ্যের কথা বড় সহজে বাজে না, কিন্তু প্রেমের কথা, আনন্দের কথা বড় সহজেই প্রাণে বাজে। তখন কবি রাজাকে আবার বল্লেন "আমরা বাঁচবই"। জীবনটাকে যে অমর মৃত্যুর ছদ্মবেশ পরিয়ে বারেবারে নবীন ক'রে নিতে হয়। এই আশ্বাসবাণী পেয়ে নিজের প্রাণের মাঝে ভাবের ঘরে একটু চুরি ক'রে রাজা কবিকে বল্লেন, "যদি বাঁচবই, তবে বাঁচার মত ক'রে বাঁচতে হবে—কি বল"? তখন আবার মন্ত্রীর ডাক পড়ল, রাজকর্ম্মে মন হ'ল, নিরন্নদের অন্নের ব্যবস্থা হ'ল, ইত্যাদি। কবি রাজার ফসলক্ষেত্রে জল দিয়ে সজীব ক'রে তুল্লেন। দুর্ব্বল মনে প্রেমের, আনন্দের আভাষ এলেই সঙ্গে সঙ্গে তর্কযুক্তি এসে বিশ্বাসের মূলে ঘা দেয়। শ্রুতিভূষণ আবার আসছেন, রাজার কাছে খবর এল, রাজা ভীষণ ভাবনায় পড়লেন, তাঁর "দুর্ব্বল মন, তিনি সামলাতে পারবেন না এবং অন্যমনস্ক হ'লেই বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়বেন"; তাই শ্রুতিভূষণ যাতে আর সভায় না আসেন, মন্ত্রীকে মানা ক'রে দিলেন। তিনি কবিকে বল্লেন, "ওহে কবি! তোমার হাতে কোন নাটক, কিম্বা কিছু তৈরি

আছে? শীঘ্র অভিনয় লাগিয়ে দাও, আমার প্রাণটাকে কেবল আনন্দে মাতিয়ে রাখ"। যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানের নিষ্পেষণে পীড়িত মানবহৃদয়ের একটা সকরুণ আহ্বান রবীন্দ্রনাথের কাণে এসে পৌঁছল, "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও"। কবিশেখর বিশ্বপুরাণ থেকে নিয়ে নিত্য আনন্দের মহালীলা নাট্যে দেখালেন, যার ভিতর দিয়ে তিনি সত্য ও সত্যপথ নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন।

গানের কথা—ফাল্গুনী কাব্যনাট্য। এর দুটি অংশ—একটি "গানের" অপরটি "প্রাণের"। প্রথমটিতে আছে প্রকৃতির কথা, দ্বিতীয়টিতে আছে মানুষের।

"গানের কথা" আর "প্রাণের কথা" দুটিই বিশ্ববীণার একতারায় বাঁধা একই সুরে যুগে যুগে বেজে আস্‌ছে, কবি বাউল কাল গুণে ফাল্গুনে শুনতে পেয়েই পাশাপাশি এদের রেখে গূঢ় রহস্য ভেদ করেছেন। সমস্ত লীলাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিতটি যুগ-যুগান্তর ধরে নিত্যনবভাবে ফুটে উঠেছে, সেইটিই হচ্ছে ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা। "গানের কথার" মর্ম্ম হ'চ্ছে "শীতের বস্ত্রহরণ"। ফাগুনের কাননে কবি বেরিয়ে পড়ে দেখলেন, চিরনবীন বসন্ত এসে গাছ, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী সমস্ত জীবের প্রাণকে জাগাচ্ছে। বেণুবনের দখিণ হাওয়ার দোদুল সুরু হ'ল—ব্যাকুলা পারুল, আমের মুকুল, চামেলি, মল্লিকা, করবী, শিমুলের পাতায় পাতায় আনন্দ ফুটে উঠ্‌ল। হারানো বধূটিকে নব সাজে আবার পেয়ে তারাও নবরঙ্গে রঞ্জিত হ'য়ে বরণডালা দিয়ে তাকে বরণ করতে এল। পাখীর নীড়ের দুঃখের আঁধারের ভিতর দিয়ে আনন্দের আলো ভরে উঠ্‌ল, তার প্রাণে শিহরণ সুরু হ'ল, সেও আনন্দে সুরের আবীর বসন্তের

গায়ে ছড়িয়ে দিলে। সমস্ত জলস্থল ভুবনব্যাপী নবানের জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল।

কাব্যকাননের প্রজাপতি রবীন্দ্রনাথ তরুলতার ভাষা, জলস্থলের ভাষা জানেন, তাই বেণুবন থেকে, ফুলন্ত গাছ থেকে, পাখীর নীড় থেকে যে অনাহত বাণার সুরটি বেজে উঠ্‌ছিল, সেটা তিনি বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছেন।

পুরাতনের ভিতর দিয়ে হারিয়ে নূতনকে নূতন করে পেয়ে তাদের মধ্যে আনন্দের লীলা আরম্ভ হ'ল। তারা দেখলে, বসন্তেই শীতের পরিণতি। যে বসন্ত বারে বারে বিদায় নিয়ে যায়, সেই আবার নূতন হ'য়ে ফিরে আসে। বসন্ত চিরকালের, চিরনবীন, চিরনূতন, তার বিদায় হ'চ্ছে তার ছদ্মবেশ। শীতেবসন্তে পরিচয় হবামাত্র পরস্পর দেখতে পায় তারা এক আত্মা। শীত বুড়োটাই হ'ল নবীন বসন্ত। এই "গানের কথাই" "প্রাণের কথার" চাবি।

প্রাণের কথা—এর চারিটি অংশ—প্রথম সূত্রপাত, দ্বিতীয় সন্ধান, তৃতীয় সন্দেহ, চতুর্থ প্রকাশ। এই চারিটি অংশের ভিতর দিয়ে বিশ্বকবি সত্যের প্রকাশ করেছেন।

আমরা নবীন—"আমাদের পাকবে না চুল গো—আমাদের ঝরবে না ফুল গো"। আমরা চিরকাল নবীনই থাক্‌ব, বুড়ো হব না, মৃত্যুও হবে না, আমরা যে অমর। জীবনের পথে মানব-হৃদয়ে কতরকম ভাবের উদয় হয়, তাদের এক এক ভূমিকায় এই "প্রাণের কথার" ভিতর অবতারণা করা হয়েছে। কি কি ভাবের সাহায্যে সত্যের উপলব্ধি করা যায় এবং সত্য কি, তাই দেখানো হয়েছে। নবীনের দল সকল ভাবের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্র, জ্ঞান, দুঃখ,

ভাবনার ভিতর দিয়ে গেল,—কেউই সত্য কি বলতে পারলে না। শেষে বিশ্বাস আর প্রেম নবীনের দলকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল এবং তাদের সত্যের উপলব্ধি হ'ল; তারা দেখলে—জীবনই মৃত্যুর ছদ্মবেশে থাকে, আমাদের আগে আর কেউই নেই, আমরাই অনাদি অনন্ত, আর সব স্বপ্ন; আমরাই বারে বারে প্রথম, আমরাই ফিরে ফিরে প্রথম, আমরাই চিরকালের।

বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বকবির মূলমন্ত্র—"যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে।"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(৩)

ফাল্গুনীর ফল্গুনদী আমাদের চিত্ত-মরুর আনন্দধারা,—অসীম শূন্যের রামধনু।

মান্ধাতার আমল থেকে আমরা চলতে সুরু ক'রেছি। এ চলার বিরাম নেই, তবু চলতে হবে—

"কোন্ ক্ষ্যাপামীর তালে নাচে পাগল সাগর-নীর ?
সেই তালে যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির॥"

জল চলেছে, স্থল চলেছে, পাহাড় চলেছে, চন্দ্র-সূর্য্য, ফল-ফুল সব চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চলেছি। আমাদের রাস্তা সোজা। আমাদের পথের ধারে আলোর মেলা—

"চলি গো, চলি গো, যাইগো চলে'
পথের প্রদীপ জ্বলে গো—গগন-তলে"—

চলতে চলতে চলার বাঁশী শুনতে পাই—

"পথিক ভুবন ভালবাসে পথিক জনেরে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণেরে।"

অন্ধকারে পথ হারিয়ে গেলে অন্ধ বাউল পথ দেখিয়ে দেয়। সে রাত্রে পাখীর ডানার শব্দ শুনে পথ ঠিক করে অন্ধকারের বুকের মধ্যে দেখতে পায় আলো।

চলতে চলতে আমরা সেই মান্ধাতা বুড়োর সেই কালো গুহাটার ভিতর ঢুকে পড়ি—আবার নদীর স্রোতের সঙ্গে ক্ষ্যাপার মত তালে তালে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ি, নবীন উৎসাহে—

"আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!"
"আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে!"

চলার দেশে চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের মহারাজের মনটা হ'য়ে গেল খারাপ, কানের কাছে দুটো পাকা চুল দেখে। গ্রামে গ্রামে সে কথা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল, প্রজারা শুনে বল্লে—

"সর্ব্বনাশ, মহারাজের মন খারাপ! ভাবনার কথা বটে। দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা তিনি—এত বড় মহারাজ, তাঁরও মন খারাপ? এখন উপায়?

মন্ত্রীদাদা বুদ্ধিমান, কাজের কথা ক'য়ে রাজাকে ভোলাতে গেলেন —রাজার কিন্তু মন ভিজ্‌ল না—তিনি স্থির করলেন বৈরাগ্য সাধন করবেন। শ্রুতিভূষণের ডাক পড়ল, আর তাঁর বৈরাগ্য-বারিধি পুঁথি—ত্যাগের অবতার!

শ্রুতিভূষণ ছুটে এসে পায়ের ধূলা দিয়ে রাজমস্তকে বৈরাগ্যের টীকা এঁকে দিলেন, পুঁথির বুলি বুলিয়ে দিয়ে রাজার মনটীকে করলেন স্থির। দক্ষিণা নিলেন সামান্য—কাঞ্চনপুর জনপদ, ব্রাহ্মণীর আভরণ, আর সুদৃঢ় অট্টালিকা—কারণ এগুলোর অভাবে তাঁর বৈরাগ্যসাধনের ব্যাঘাত অনেক।

পুঁথির মন্ত্র কানে দিয়ে শ্রুতিভূষণ রাজার মনকে এমনই স্থির ক'রে দিলেন যে, রাজা আছেন কি না তা রাজা নিজেই বুঝতে পারলেন না। কাজেই দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের সেই নিদারুণ হাহাকার দরবারের বাইরে থেকেই ফিরে গেল।

কবিশেখর—তরলপ্রাণ, ফুলের ডাকেও সাড়া দেয় মেঘের ডাকেও কান পেতে থাকে,—খবর পেয়ে এলেন, রাজাকে বোঝালেন —"সে কি মহারাজ, পাকাচুল দুটোকে আপনি ভাবেন কি? এতো সুসংবাদ, ও তো যমের পত্র নয়। নেপথ্যে আপনার জন্য মিলনের যে আয়োজন চলচে, ও যে সেই মিলনের নিমন্ত্রণ—ওটা যে নব মল্লিকার মালা—আপনার আবার বৈরাগ্য কি মহারাজ? সংসারের পথই আপনার বৈরাগ্যের পথ। সংসারে যে কেবলই সরা আর কেবলই চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে ২ কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই ত কবিবাউলের চেলা"—

কবির বাণী রাজার কানে গেল না—একেবারে প্রাণে গিয়ে বাজ্‌ল। কবিশেখরের কথাগুলো পুঁথির সঙ্গে মেলে না, ব্যাকরণের সঙ্গেও না—কিন্তু সুরের রং ফুটে উঠল রাজার চোখে—ছোপ দিয়ে কবি রং একেবারে ফলিয়ে দিলেন।

মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেছে, ও যে প্রাণের কাছে প্রাণের আবাহন—ওর মাঝখান দিয়ে আপনাকে ছুটতে হবে। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা, কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, তবে অকর্ত্তব্য হ'ল বলে ভাবনা নয়, ভাবনা মরেছি ব'লে।

ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা পেলে, কবি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গাইলেন, ঝঙ্কার দিলেন—

"অকুল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কি রে তোর ক্ষয়ক্ষতিরে ?
যা আছেরে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে !

শ্রীসত্যচরণ সরকার।

ফাল্গুনী *

(ফরাসী হইতে অনুদিত)

ফাল্গুনীর প্রস্তাবনায় কবি রাজাকে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"এটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ, তা ঠিক বলতে পারব না"। বস্তুত ঠাকুরমহাশয়ের উক্ত রচনা একাধারে এ সবই। আমার মনে হয় যে, ফাল্গুনীর মূলে উপনিষৎ বা ভগবদ্গীতা ততটা নেই, যত না আছে A Midsummer Night's Dream।

শেক্ষপীরের কল্পনা যেমন বনে রাণী Titaniaরূপে প্রস্ফুটিত, এ কাব্যেও তেমনি অন্যরূপে প্রকটিত।

কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিলাতের মহা নাট্যকার তাঁর ফুর্‌ফুরে কল্পনার খেলা দেখিয়ে কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর ফাল্গুনীতে আমাদের একটী সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চিরযৌবনের উৎসব সম্পাদনে রত; যে সকল নীতিবাগীশ কথায় যা বলেন কাজে তার উল্টো করেন, এবং যে "দাদা" কাটাছাঁটা চৌপদীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তাদের তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি ভালবাসেন সেই "সর্দ্দার"কে, যিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন; সেই "চন্দ্র"কে

---

* "Le Cycle du Printemps" par Rabindranath Tagore, Les Nouvelles Litteraires, 3 Avril, 1926.

যিনি আমাদের পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখান; এবং সেই অন্ধ "বাউল"কে, যিনি চোখে দেখেন না, কিন্তু সমস্ত শরীর, সমস্ত মন ও সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে দেখেন. তিনি ভালবাসেন তরুণদের, যারা বসন্তের অগ্রদূত, যারা জানে যে শীত হচ্ছে "সেই চিরকেলে বুড়ো—যে ফিরে ফিরে যুবা হয়", যে তার জীর্ণ মলিন কন্থার আড়ালে যৌবনের সকল ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে রাখে।

এই নব-যৌবনের দলের সঙ্গে শীতের খোজে বেরলে তবে অবশেষে আবিষ্কার করা যায় যে, তার মায়াবী রূপের আড়ালে রয়েছে সর্দ্দারের নবীনতর উজ্জ্বলতর রূপ। আমি সুর ধরিয়ে দেবার জন্য শেক্ষপীরের নাম করেছি বটে; কিন্তু ফাল্গুনীর মধ্যে কতটা মৌলিকতা আছে এবং খেলাচ্ছলে কি গভীর রূপকের অবতারণা করা হয়েছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিম্নলিখিত কথাগুলি আমাদের বড় ক্রিটিক Henri Bremond-এর ঠিক মনের মত :—

"মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজ্‌বার জন্যে হয়েচে !"

—"যা রচনা করেচ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব ?"

—"না মহারাজ ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয় !"

—"তবে ?"

—"সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি, আমার এ সব জিনিষ বাঁশির মত, বোঝবার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে।"

—"তবে তোমার ও রচনাটা বলচে কি ?"

—"ও বলচে, আমি আছি! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জল স্থল আকাশ তাকে বলে' উঠচে 'আমি আছি'!—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—'আমি আছি'! আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের স্তুরে প্রাণের সাড়া!"

"কবিত্বের মর্ম্ম" সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে অনুসন্ধান চলছে, আমার বিশ্বাস এই সব কথায় তার অনেক সাহায্য হবে। র নাথ ঠাকুরের এই কল্পনা-লীলা কবিত্বের সারমর্ম্মে ওতঃপ্রোত, তার মধ্যে ফাল্গুনের সুরভিত দখিণ হাওয়া সর্ব্বত্র বহমান।

আমার মনে হয়, ফাল্গুনীর ফরাসী অনুবাদক, ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়ে মূল বাঙলা কাব্যের সকল মাধুর্য্য আস্বাদন করতে পেরেছেন।

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম।

Patriotism ও Nationalism দুটিই মানুষের জীবনে খুবই বড় কথা। অথচ রুষ-রাজ্যের মহামনীষী Tolstoy patriotism-কে বেশ একটু সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। আর বাঙলার মহামনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ Nationalism-এর গলদ বার করায় তাঁকে কতই না নিন্দাবাদ ও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। বাঙলার কোন সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্য সভায় তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—সূর্য্যের চেয়ে বালির তাত বেশী, এমনি আরও কত কি! আবহমান কাল ধরে যাঁকে মানুষ খাঁটী সোনা বলে' জেনে এসেছে, নিছক সত্য বলে' মেনে এসেছে, তা'তে যদি হঠাৎ কেউ মিথ্যার খাদ আবিষ্কার করে ত তার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে ওঠা মানুষের স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ—সত্যের অনাবৃত জ্যোতি সহ্য করবার মত শক্তির অভাব। সে যাই হোক্, এখন দেখা যাক্—স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি।

সভ্যতার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যেমন রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌ছিল, তেমনিই তার মনে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার অঙ্কুর গজিয়ে উঠ্‌ছিল। ফলে পরস্পর এমনই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল যে, কোন জাতির স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তার ইতিহাস বল্‌লে তাদের রাষ্ট্রইতিহাস ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কাজেই Patriotism

ও Nationalism-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

ইতিহাসের প্রভাত হ'তে আজ পর্য্যন্ত মানুষের রাষ্ট্রজীবনের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাই যে, রাষ্ট্রনেতারা এতদিন ধরে' মানুষের আর যা'ই ভালমন্দ ক'রে থাকুক, একটা কথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তাঁরা একটা মস্ত বড় মিথ্যাকে সত্যের মুখোষ পরিয়ে বরাবর মানুষকে প্রতারিত করে' এসেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে—রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক থা'ক্‌তে পারে না; যদিও থাকে ত সে অতি সামান্য, আর তা'ও রাষ্ট্রেরই প্রয়োজনে, তারই ভালমন্দের খাতিরে,—ধর্ম্মের প্রতি নিছক নিরপেক্ষ শ্রদ্ধায় নয়। এই মিথ্যার অনুকূলে যুক্তি দেখানো হয় এই যে—রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতির উপরে ত একান্ত নির্ভর কর্‌ছে খাওয়া পরা ও আর আর দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা অসুবিধা; এ সব ত নেহাৎ স্থূল জীবনেরই লাভক্ষতির কথা। এ সবের সঙ্গে সূক্ষ্ম মনের রাজ্যের, আত্মার রাজ্যের, ধর্ম্মজগতের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলে রয়েছে সত্য-দৃষ্টির অভাব—অর্থাৎ কিনা জীবনের ঐক্য ভুলে গিয়ে তাকে পৃথক পৃথক করে দেখা।

রাষ্ট্র কি? আর মানুষের জীবনে তার প্রয়োজনই বা কি? সৃষ্টির আদি যুগে মানুষ যখন বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়া'ত, সারা বিশ্ব জুড়ে যখন বর্ব্বর জাতির আধিপত্য ছিল, মানুষে আর পশুতে যখন বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না—তখন অবশ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন বালাই ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধিই ছিল—তাও শুধু পেটটা ভরে খাওয়া আর ঘুমানো ছিল তখনকার মানুষের

চরম লক্ষ্য। আর সেই স্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায় ছিল পশুবল। Might is right-ই ছিল তখনকার ধর্ম্ম, নীতি, আইনকানুন, যা' কিছু সব। যার দেহে শক্তির অভাব হত, তার জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকা একরকম অসম্ভব হ'ত। আহারবিহার নিদ্রার জন্যে, কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার খাতিরে—কাড়াকাড়ি, মারামারি, রক্তারক্তি এবং আরও কতরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তির সঙ্গে, ঘূর্ণিঝঞ্ঝার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ধস্তাধস্তি ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাদের সারাজীবনটা কাটিয়ে দিতে হত। তারপর মানুষের এই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, এই দুরন্ত প্রবৃত্তি ক্রমেই তা'কে উত্ত্যক্ত ক'রে তুল্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগল; তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার খোঁজে সে পথে বেরিয়ে এল। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌ল, তার মধ্যে এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল যে সৎবুদ্ধি। এই সৎবুদ্ধিই শেখালে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনার অবাধ উদ্দাম প্রবাহকে সমষ্টির স্বার্থ সাধনার কাছে ধরা দিয়ে বাঁধা পড়তে; ব্যক্তির দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল মতি গতিকে সমষ্টির ইচ্ছাশক্তির কাছে মাথা নীচু ক'রে শান্ত হ'য়ে থাক্‌তে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই হ'ল বিদ্রোহ, এবং সেই বিদ্রোহের শাস্তিবিধানের অধিকার দেওয়া হ'য়েছিল সমষ্টিকে। এই সমষ্টিই হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্র। তা'হ'লেই সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মোটামুটি বিচারে আমরা বুঝতে পারচি যে, সভ্যতাপ্রসারের ফলে রাষ্ট্রসাধনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠেছে মানুষের জীবনকে অবাধ ভোগসুখের অধিকারী করা।

আর ধর্ম্ম? এখানে ধর্ম্ম অর্থে অবশ্য কতকগুলো বাঁধাধরা রীতি নীতি আচারব্যবহারের সমষ্টির কথা বলা হচ্ছে না, যা' দেশভেদে,

জাতিভেদে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম ধারণ করে থাকে। কথা হচ্ছে সেই ধর্ম্মের, যা' কালের বুকে জ্বলন্ত আলোকনির্ঝরের মত অশ্রান্ত বেগে ব'য়ে চলেছে; বিশ্বের সব আলো নিবে গিয়ে প্রলয় ঘটে গেলেও যার প্রবাহ বন্ধ হ'তে পারে না; পৃথিবীর কি প্রাচীন, কি নবীন, প্রতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই যার অল্পবিস্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে; যা' নিত্য নূতন, চির-পুরাতন; যার অফুরন্ত নিখুঁত সৌন্দর্য্যের যুগ-যুগান্তরেও এতটুকু ক্ষয় নেই; যাকে এক কথায় বলা হয়, চিরন্তন বা সনাতন সত্য। মানবজাতির জন্ম-কাল হ'তে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষের যে ধর্ম্মসাধনা, তার তলে তলে রয়ে গেছে তার এই সত্যানুসন্ধিৎসা। সৃষ্টির উষা হ'তে—সভ্যতার আলোকের সবেমাত্র যখন ক্ষীণ রেখাপাত সুরু হ'য়েছে—তখন থেকে প্রকৃতির দেওয়া কি একটা অনিবার্য্য আকর্ষণে মানুষ মন্দ হ'তে ভালর দিকে, ক্ষুদ্র হ'তে বৃহতের দিকে, অর্থাৎ কিনা মিথ্যা হ'তে সত্যের দিকে ছুটে চলেছে। তাইত Carlyle বলেছেন—Man is everywhere the born enemy of lies। এমন একদিন আস্‌বে, যেদিন সে যথার্থই সত্যের কূলে উত্তীর্ণ হবে,—হোক "পশ্চাতে দানবী মায়া ভীষণ সে টান"। সেদিন তার সব অন্ধকার ঘুচে গিয়ে, সকল ময়লা ধুয়ে মুছে গিয়ে তার অন্তর অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর হ'য়ে উঠবে—এই ত হ'ল মানব-জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা। এখন দেখা যাচ্ছে—রাষ্ট্র যেমন মানুষের বাইরের স্থূলজীবনের ভালমন্দের নিয়ন্তা, ধর্ম্ম তেমনই তার ভিতরের সূক্ষ্মজীবনের সব অমঙ্গল, দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে সেখানে মঙ্গল ও যথার্থ সম্পদ প্রতিষ্ঠা করবার নিয়ন্তা। এইবার দেখা যাক্,

রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে কি সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কের উপর বিশ্বমানবের কল্যাণ কতখানি নির্ভর করছে।

সকল দেশে সকল যুগে রাষ্ট্রত ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার এবং বিদ্রোহের শাসন করবার ভার নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—রাষ্ট্রের নিজের যখন বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে, স্বার্থসাধনার ঝোঁকে অন্ধ হয়ে যখন সে অপরের স্বার্থ গ্রাস করতে ছোটে, তার অধিকার ও শক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার করতে থাকে, তখন তাকে শাসনে রেখে অপরের স্বার্থরক্ষা করবে কে? প্রাচীন ইতিহাস বলছে—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে, শাসক-সম্প্রদায় পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আদেশ মান্য করে চলত। ফলে রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধিকারপ্রমত্ততা সংযত ত হয়ইনি, বরং সমাজের বুকে মাথা খাড়া করে' উঠেছিল কত মিথ্যার প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মনীতির কত উৎপাত, কত shams, hollow mockeries :—যেমন Greek oracle, Pope এর অখণ্ড প্রতাপ, এবং ভারতে ব্রাহ্মণের উপর একটা অন্যায় অসহ্য অন্ধ ভক্তি ও ভয়, যা' জাতিকে শিখিয়েছিল ব্রাহ্মণের সাত খুন মাফ' করতে। যে সম্প্রদায় সমাজের ধর্ম্মশিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছিল, সেই পুরোহিতসম্প্রদায়ের আদেশ পালন করার পরিণামে জাতি যদি মিথ্যার পূজারী হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ধর্ম্মগুরুর দল আর যাই হ'ন; সত্যের সাধক ছিলেন না। তাইত যুগযুগান্তর অতীত হ'য়ে গেলেও রাষ্ট্রের তরণী আজও কূলে উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে আঘাটায় আঘাটায় ঘুরে মরছে। এর কারণ কোথাও বা ব্রাহ্মণ হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর কোথাও বা হাল ধরে' থেকেও নৌকাকে স্বেচ্ছায় বিপথে বেয়ে নিয়ে চলেছে। তাইত সুদূর অতীত হ'তে আজ পর্য্যন্ত প্রতি রাজা মহারাজা ও রাষ্ট্র-

নেতাদের জীবন এক একটা একটানা paradox হয়ে উঠেছে। যারা নিজেদের রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলার খাতিরে, নিজেদের দেশবাসীকে নিরাপদ কর্‌বার জন্যে কত শত আইনকানুনের প্রবর্ত্তন করে' থাকে, তারাই আবার দিগ্বিজয়ের দোহাই দিয়ে পরের দেশে অমানুষিক অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দিয়ে, পরের শান্তি, শৃঙ্খলা স্বাধীনতা, জীবন ধন সমস্তই অবলীলাক্রমে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে। অন্তরের যে প্রবৃত্তির বশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রাজারা রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌তেন—তা সে রামচন্দ্রই করে থাকুন আর যুধিষ্ঠিরই করে থাকুন—সে প্রবৃত্তি কি বর্ত্তমান কালের জার্ম্মাণীর বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষারই পুরাতন সংস্করণ নয়? জার্ম্মান দিগ্বিজয়ের পথ এবং রাজসূয় আর অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের পথ কি সমভাবেই নিষ্ঠুর রক্তপাতে ও নরনারীর চোখের জলে ডুবে গিয়ে সুদুর্গম হ'য়ে ওঠেনি? প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ যে সত্যধর্ম্মের সন্ধান পায় নি, এ কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে। তবে তখন রাষ্ট্রের এই সমস্ত কার্য্য যে সত্যধর্ম্মের অনুমোদন না পেলেও অবাধে স্বচ্ছন্দে অনুষ্ঠিত হত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপর ঐতিহাসিক যুগে কত রাষ্ট্রনেতা দিগ্বিজয়ের দোহাই দিয়ে, সভ্যতাবিস্তারের ছল করে পরের শান্তিনিকেতনে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্য-ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করেছে। মুসলমানেরা ধর্ম্মগুরুর প্ররোচনায় দেশদেশান্তরে সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ছলে "পশ্চিমে হিস্পানি শেষ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ" পর্য্যন্ত একচ্ছত্রাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলাতেই এই সব বিরাট যথেচ্ছাচার সম্ভব হ'য়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের নিয়ম

না মেনে চলা খুবই নিন্দনীয়, অথচ জাতির জীবনে প্রয়োজন হ'লে সেইটেই কর্ত্তব্য বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্যষ্টির পক্ষে যা অন্যায়, যা অধর্ম্ম, সমষ্টির পক্ষে তাই হয়ে উঠ্‌ল ন্যায় ও ধর্ম্ম। আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যা করবার কথা ভাব্‌লেও শিউরে উঠি, তা অবাধে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে যখন স্বার্থসিদ্ধিটা হয় জাতিগত। সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করলে অবশ্য এর ভুল ধরা পড়ে। কিন্তু তবুও মানুষ এতকাল ধরে' এই ভুলের বশেই চলে এসেছে। আজ সত্যদ্রষ্টা ঋষি টল্‌ষ্টয় ও রবীন্দ্রনাথের চক্ষে এই ভুল ধরা পড়েছে। তাঁদের সত্যবাণী বিশ্ববাসীর কানে ঠিক তেমনই অদ্ভুত শোনাচ্ছে, যেমন Middle Age-এর মানুষের কাছে শোনাত দর্শনবিজ্ঞানের কোন নবীন তত্ত্ব। সে যুগে সত্যের উপাসককে ঐন্দ্রজালিক বা উপদেবতা বিশ্বাসে তার উপর যথেচ্ছা উৎপীড়ন করা হ'ত, এমন কি সজীব অবস্থায় তাকে পুড়িয়ে মারা হ'ত। বর্ত্তমান যুগে সভ্যতা প্রসারের ফলে ওরকম বর্ব্বরতার পথ রুদ্ধ হ'য়েছে বটে, কিন্তু বচন-বাগীশদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যের শুষ্ক তর্কের নীচে সত্যের বাণী যে তলিয়ে যায়; তাইত Tolstoy-এর অন্তরের কথা পশ্চিমের লোকেরা বুঝতে পারলে না, তাঁর বাণী তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কেঁদে ফিরে এসেছে। এখনও পশ্চিমের লোকেরা, যারা সভ্যতার বড়াই করে থাকে; যারা নিজেদের বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারী বলে অহঙ্কার করে থাকে; তারাই Balance of power-এর দোহাই দিয়ে, দুর্ব্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা কর্‌বার ছলে দেশে দেশে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছে—রক্তপাত করে, অগ্নিকাণ্ড করে, লুণ্ঠন করে, লক্ষ লক্ষ জীবন কীটপতঙ্গের মত দলে' পিষে নষ্ট করে

ফেলছে; এতটুকু দ্বিধা নেই, এতটুকু সঙ্কোচ নেই। কেন থাক্‌বে? তারা জানে—"যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙ্‌বে, পাবার যোগ্য জিনিষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনিষের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্‌বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালবাসে—তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বেরকরা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না"। ভোগবিলাসে ডুবে থাকাই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য, বস্তু বিশ্বের উপর আধিপত্যবিস্তারই যাদের জীবনের আদর্শ, তারাই শক্তির এই মদমত্ততাকে, এই বাসনার ক্ষুধার জ্বালায় উন্মাদ হওয়াকে সত্যের সাধনা বলে ভ্রম করে থাকে। সত্যের বাণীকে, ধর্ম্মের আইনকানুনকে তারা ত পাগলের প্রলাপ বলে' হেসে উড়িয়ে দেবেই। কেননা তা'দের অন্তরের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, এই বিশ্বাস অচল অটল হ'য়ে আছে,—"এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি, এটা হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড় কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল, সে কেন এই শক্ত মাটীর পৃথিবীতে জন্মেছিল? আমি যা' চাই তা' আমি খুবই চাই—আমি তা দু'হাতে করে চট্‌কাব, দুই পায়ে করে দল্‌ব, সমস্ত গায়ে মাখ্‌ব,

সমস্ত পেট ভরে খাব। * * * * * * * * *
এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্যসাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড় বড় কাণ্ডকারখানা চলচে। আর যে সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন, তাঁদের কথা বাস্তব নয়; এই জন্যে এত চীৎকারেও সে সব কথা কেবলমাত্র দুর্ব্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়। যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে, তারা সে সব কথা মান্‌তে পারে না, কেননা মান্‌তে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করেনা, মানতে লজ্জা করেনা, তারাই কৃতকার্য্য হল; আর যে হতভাগারা একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু' নৌকায় পা দিয়ে দুলে মর্‌চে, তারা না পারে এগতে, না পারে বাঁচতে"।

মিথ্যার এই দাম্ভিকতা ও স্বেচ্ছাচারকে আর বেশীদিন বাঁচতে হচ্ছে না—তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; সত্যের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। মানবজাতির যাঁরা সত্যিকারের নেতা, তাঁদের কানে সে ডাক পৌঁচেছে। মানুষকে তাঁরা ব্যাকুল সুরে আহ্বান কর্‌ছেন, সত্যের এই ডাকে সাড়া দেবার জন্যে। সত্যই বিশ্বের অবলম্বন। বিশ্বের যা-কিছু—জড়জগৎ, জীব-জগৎ, মনো-জগৎ,—সবই সত্যের নিয়মে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা। ও নিয়মকে কোথাও এতটুকুও অবহেলা করা চল্‌তে পারেনা, করলেই দুর্গতির আর অন্ত থাকে না! যে সত্য সাধনায় মানুষে জীবনে পূর্ণতা লাভ করে, রাষ্ট্রসাধনা তার থেকে পৃথক কিছু একটা হ'তে পারে না; ও তারই একটা বিশেষ অঙ্গ।

রাষ্ট্রকে পথ চল্‌তে হবে সত্যের অনুমোদনের অপেক্ষা রেখে। এ কথা এখন হয়ত "সোনার পাথরবাটী" গড়ে তোলবার মত অদ্ভুত অসাধ্য সমস্যা বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবিক যে এটা অদ্ভুত বা অসাধ্য সমস্যা নয়, তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে—অশোক মৌর্য্য—সারা বিশ্বের ইতিহাসে যে সম্রাটের জুড়ি মেলেনা। একা অশোকই যুগযুগব্যাপী জগৎজোড়া রাষ্ট্রজীবনের একটানা ধারা অনুসরণ না করে, নিজের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাসের জোরে, সত্যের একনিষ্ঠ সাধনার বলে, পৃথিবীর এক প্রান্তে এক নবীন মহান আদর্শরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বমানব কিন্তু সেদিন সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি। আবার সেই আদর্শ দিকে দিকে ঘোষণা করবার দিন এসেছে। যেদিন সত্যসত্যই পৃথিবীময় এই আদর্শের অনুসরণে দেশে দেশে রাষ্ট্র গড়ে উঠ্‌বে, সেদিন বিশ্ব-মানবের কী এক মহা দিন! সেদিন দেশে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠ্‌বে, আকাশবাতাস আনন্দে মেতে উঠ্‌বে, বেসুরো অনেক কিছু, বেতালা অনেক কিছু সব ঘুচে গিয়ে এক মহা মিলনের সঙ্গীতে সারা বিশ্ব মুখরিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার দাঙ্গা।

——:০:——

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে যে সব কথাবার্ত্তা কওয়া হচ্ছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কারও মাথা নেই, কিন্তু সকলেরই হৃদয় আছে।

হিন্দু মুসলমান কারও কথার ভিতর যে logic নেই, তার কারণ logic জিনিষটে মাথা থেকে বেরয়।

তবে হৃদয়েরও অর্থাৎ রাগদ্বেষেরও একটা logic আছে, যার সন্ধান আরিস্টটেল কিম্বা গোতম জানতেন না।

সেই হার্দ্দাত্মায় বর্ত্তমানে দিব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। ও একটা মানসিক রোগ।

রোগেরও একটা লজিক আছে—যা ডাক্তারদের ভাষায় বলতে গেলে, will take its course। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রোগীকে চট্‌পট সারাতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে।

সুতরাং যা হয়েছে তা হয়েছে বলে মেনে নিয়ে দেখা যাক্, সে বিষয়ে কি বলা যেতে পারে।

মৌলবী কলম আজাদ এবং মিষ্টার জে, এম, সেনগুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের পঞ্চবৎসরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যে সখ্য জন্মলাভ করেছে, উক্ত ঘটনার ভিতর সুধু সেই সখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি এই হিন্দু নেতা ও মুসলমান নেতার পরস্পরের সখ্য উক্তজাতীয় নয়।

প্রণয় জিনিষটে খুব ভাল, কিন্তু তা যদি হয় অতি গাঢ়, তাহলে প্রণয়ী-যুগলকে পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশ হতে মুক্ত হবার জন্য বলতে হয়—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

দ্বিজু রায় বলেছেন যে, একটি আদর্শ দম্পতির দাম্পত্যপ্রণয় যখন চেগে উঠত, তখন "পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।"

এ কদিন ধরে যে পাড়ার লোকে পুলিশ ডেকেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, পাঁচ বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত পলিটিকাল ঘটকালির ফলে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর উক্তরূপ দাম্পত্যপ্রেম স্থাপিত হয়েছে।

"ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে" প্রস্তাবটা রাজনৈতিক হিসেবে খুব চটকদার। কিন্তু যাঁদের রাজনীতির ত্বর সয় না, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—তার পর? বিয়ে ত আর মৃত্যু নয় যে, তারপর আর কিছু নেই।

ওরকম বিয়ের পিঠ পিঠ কথা ওঠে, "বর বড় না কনে বড়"? তারপরই ঘটে দাম্পত্যকলহ, যার আর এক নাম হচ্ছে অজাযুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

যা হয়েছে তা যে যুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধ মানে মারা ও মরা। যে মরেছে তার কাছে সব যুদ্ধই সমান। ওর ভিতর ছোটবড়র প্রভেদ নেই।

যুদ্ধ হলেই লোকে তার কারণ খোঁজে। য়ুরোপের গত যুদ্ধের কারণ লোকে আজও খুঁজছে। কলকাতার যুদ্ধেরও কারণের তল্লাসের দু' চারটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্ভবত যাঁরা খুঁজছেন তাঁরাই তা ঘটিয়েছেন, কারণ এ বিষয়ে অনেকেই একমত যে, এ ব্যাপারের পিছনে brain আছে।

যদি তাই হয় ত সে brain-এর সন্ধান সহজেই পাওয়া যাবে।

একটা লক্ষণে সে brain সহজেই চেনা যাবে। যে brain থেকে এ বুদ্ধি বেরিয়েছে,তা নিশ্চয়ই brainless brain।

হয় মিস্টার আবদার রহিম, নয় সহিদসুরবর্দ্দি বলেছেন যে, এ বিরোধের কারণ দুটি—(১) পলিটিকাল, (২) ধার্ম্মিক।

তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতি দলের ভিতর দুটি দল আছে—(১) শিক্ষিত দল, (২) মূর্খের দল।

পলিটিক্স্ ত শিক্ষিত দলের একচেটে ; আর যে ধর্ম্মের মানে বিধর্ম্মবিদ্বেষ, সে ধর্ম্ম মূর্খদের একচেটে।

অর্থাৎ ধর্ম্মের দলে brain নেই, আছে শুধু পলিটিক্সের দলে। সুতরাং brain-এর তল্লাস করতে হবে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। যদি কোথায়ও তা খুঁজে পাওয়া যায়, ত সেখানেই পাওয়া যাবে।

যদি কেউ বলেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহলে মানতে হয় যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও অশিক্ষিত আর অশিক্ষিতের দলও শিক্ষিত।

সে যাই হোক্, দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স্ মেশানো হচ্ছে Nitric acid-এর সঙ্গে glycerine মেশানো। ধর্ম্মের গ্লিসারীণ জিনিষটে অতি নিরীহ, কিন্তু পলিটিক্সের অ্যাসিডের সঙ্গে মেশালেই তা মারাত্মক হয়ে ওঠে।

পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্ম্ম মেশালে পলিটিক্সের যে শক্তি বাড়ে, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে শক্তি হয় প্রলয়ঙ্কর, আর পলিটিসিয়ানদের এমন কোনও বিদ্যে নেই, যার সাধ্য রোধে তার গতি।

Law and order জিনিসটে বাতাসের মত; অর্থাৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার মর্য্যাদা মানুষ বোঝে না, বরং হঠাৎ "কাগজ উড়িয়ে নিলে" বলে' তার উপর মানুষে গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কিন্তু ঐ জিনিষের অভাবেই মানুষে খাবি খায়।

ও ক্ষেত্রে আর এক বিপদ আছে। বাইরের law and order-এর সঙ্গে সঙ্গেই মনের law and order চলে যায়। এ অবস্থায় ফূর্ত্তি করতে পারে সুধু তারা, যাদের অন্তরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু আছে। বলা বাহুল্য আমাদের অধিকাংশ লোকের ভিতর তা নেই।

সুতরাং আবার কিসে আমাদের ভিতরে বাইরে law and order ফিরে আসে, সে ভাবনা আমরা ভাবতে বাধ্য।

আমি পলিটিকাল ডাক্তার নই, সুতরাং এ রোগের ওষুধ আফিং কি ব্র্যাণ্ডি তা বলতে পারিনে।

ইতালিতে মুসোলিনি নামক একজন পলিটিকাল ডাক্তার ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগ করে এ অবস্থায় খুব ভাল ফল পেয়েছেন। এ দেশের ছোট পলিটিকাল ডাক্তারদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যদি communal গোলমালের সত্য সত্যই জড় মারতে চাও, তাহলে communal representation দূর করতে হবে। এ পলিটিকাল রোগের-মূল বজায় রেখে বাইরে প্রলেপের ব্যবস্থা করবে সুধু পলিটিকাল হাতুড়ের দল।

৩রা মে, ১৯২৬। বীরবল।

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

(১)

শান্তিনিকেতন।

[মাদ্রাজ মেল-এর [illegible] হতে [illegible]]

শান্তিনিকেতন বোলপুর ষ্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড অনুর্বর অধিত্যকা, সেখানে গুটিকতক গ্রাম ও এই ইস্কুল যেন মরুভূমিতে সবুজ দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। কিম্বদন্তি এই যে, কবির পিতা, যিনি ছিলেন মহর্ষি বা মহৎ সাধু, এই পথে যাবার সময় এই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য্যে ও বিশাল নির্জ্জনতায় আকৃষ্ট হন। তাঁর তখন সেই বয়স, যখন হিন্দুর মন স্বভাবতঃ বানপ্রস্থের দিকে ঝোঁকে। তিনি তাঁর চাকরদের জানান যে কিছুদিন একলা থাকতে ইচ্ছা করেন, এবং এখানকার একমাত্র গাছের তলায় বসে' ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হন; রাস্তার ডাকাত তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়। কালক্রমে এই স্থানেই তিনি একটি বড় বাড়ী তৈরি করালেন; শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হ'ল। তাঁর কবিপুত্র সেকালের আশ্রমের অনুকরণে এই বাঞ্ছিত ভূমিতে তাঁর ইস্কুল স্থাপন করেন। মহর্ষি মৃত্যুকালে তাঁকে এই বাড়িটি অতিথিশালা বা guest-house করবার জন্য দিয়ে যান এই সর্ত্তে যে, সেখানে মদ্যমাংসের প্রবেশ নিষেধ। চারিদিকে গুটি ত্রিশেক নীচু খোড়ো বাঙ্গালোয় শিক্ষক ও ছাত্রেরা বাস করেন।

পড়ার ক্লাস বসে গাছের তলায়; কেননা আমগাছ, শালগাছ ও তালগাছ পোঁতা হয়েছে, তা'তে ফলও ফলেছে। শ'তিনেক ছাত্র, তার মধ্যে জন চল্লিশেক ছাত্রী, এখানে পরম শান্তিতে বাস করে। সবসুদ্ধ একটি গভীর শান্তসমাহিত প্রসন্ন ভাব বিরাজিত বলে' বোধ হয়; যেন একটি ক্ষুদ্র জগত, বিদ্যাচর্চ্চা এবং জাতীয় ভাবের একান্ত অনুশীলনই যার প্রাণ।

বহু বৎসর যাবৎ কবি বলতে গেলে একলাই এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন; পরে একটি সমিতি স্থাপিত হয়, তাঁরা এই মহৎ কাজে তাঁকে সাহায্য করে' থাকেন। প্রতিদিন ঠাকুরমশায় গাছতলায় বসে' ছেলেদের ইংরাজী ও বাঙ্গলা পড়ান; এমন যে বড়লোক, যাঁকে পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই খণ্ডই গৌরবরবি বলে' মানে, তিনি তাঁর দিনের এতটা সময়, এমন কি তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছেলেদের জন্য উৎসর্গ করছেন—যে ছেলেরা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গড়ে' তুলবে,—এ দৃশ্য রোজ রোজ দেখা যায় না। বেশির ভাগ লোকের স্বদেশপ্রেম মুখের কথা হলেও, ইনি এই কাজে—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এই কাজে—সেটি প্রকাশ করছেন।

আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে একটি মহা উৎসবের আয়োজন হ'ল। আমগাছতলায় সমস্ত শান্তিনিকেতন—ছাত্র, শিক্ষক, ও ছেলেমেয়ে—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সমবেত হল; কিম্বা দু'টি সিকিচন্দ্রাকারে বলা উচিত (লিঙ্গভেদ এখানে সর্ব্বদাই মেনে চলা হয়)। সামনে একটি নীচু পাথরের বেদীতে আমরা বসলুম। দু'জন অধ্যাপক শ্লোকপাঠ করলেন; ফরাসীর অধ্যাপক আমাদের উদ্দেশে একটি সৌজন্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন; কবিবর তাঁর নূতন অধ্যাপককে

মনোজ্ঞ স্বাগত-বচনে অভ্যর্থনা করলেন, আমাদের কপালে চন্দন দিয়ে দিলেন, আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। মাটিতে শুভ সূচনার আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে; ফুলের গন্ধ তীব্র, আমাদের মন বিচলিত, কেমন যেন একটু দেশছাড়াগোছের ভাব।

সকলেই খেতে উঠে গেল। কিন্তু খাব কি? আমি ত কোন খাবারের নাম জানিনে, আর যদিও জানতুম, তাতে অজানা জিনিষই বোঝাত। অতি মুখরোচক ছোট ছোট কোপ্তা, পাঁচ মিশেলী রকমারী তরকারি, অতিরিক্ত মিষ্টি জিনিষ। পাঁউরুটি একটি বিলিতী সৌখীন দ্রব্য যা' মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়, কিন্তু এখান থেকে মাইলখানেক দূরে বোলপুরের বাজারে প্রায়ই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যেই আমাদের একটি মাদ্রাজী খৃষ্টান ছোক্‌রা জুটেছে;: পাশ্চাত্য জাতি ও তাদের কায়দাকানুন সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল বলে তাঁর অহঙ্কার। "যদি কেবল ময়দা, সির্কা আর পনীর থাক্‌ত ত কি সুন্দর 'মেয়নেজ্‌' না বানানো যেত। কিন্তু এই সব হিঁদুলোকেরা" !—বলে' তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক একটি ইঙ্গিতে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসীকে দেখিয়ে দিতেন, যায় ঠাকুরপরিবার! "আর এই গান্ধী!—ক্যাথলিক খৃষ্টান আমরা—আমাদের কাছে ওদের কিবা ধর্ম্ম! কিন্তু হুজুর কি কাল রাত্রে চাপা শব্দ শুনতে পান নি, যেন কে আস্তে আস্তে জানলায় ঠক্‌ ঠক্‌ করছে?—ভূত, হুজুর। লোকে বলে এই জঙ্গলে ঢের ভূত আছে"। এই জোসেফ্‌ ছোঁড়াটা মিশ কালো, পেরুর মত দেমাকে ভরা, ও সার তত্ত্বে পরিপূর্ণ।

এখানকার সব জিনিষে ও মানুষে কি এক মহা আকর্ষণী শক্তি

আছে। মানুষের মধ্যে আছে ভারি একটি কোমলতা, একটি সৌকুমার্য্য, একটি উদারতম করুণার ভাব, যা' পশুজাতি পর্য্যন্ত প্রসারিত। ব্যঙ্গশ্লেষের মাত্রা খুব কম। এদের শিষ্টতা সুন্দর ও গম্ভীর; পাশ্চাত্য দেশে যে চাপা ভাব এত করে' সাজিয়ে তোলা হয়েছে, এদের মধ্যে সে ভাবটির একান্ত অভাব। আর জিনিষপত্রের মর্য্যাদা এত কম! এখানকার খুব উঁচুদরের গৃহসজ্জাও আমাদের নিতান্ত গৃহস্থ লোকের কাছে হাস্যজনক বোধ হবে; এখানে ঘর মানে একটা মস্ত শক্ত খাট, তার কাঠামোটা কাঠের, তার উপর এক পাতলা গদি; কিন্তু তা'তে মশারির মধ্যে নিশ্চিন্তমনে ঘুমনো যায়, জন্তুজানোয়ারের ভয় থাকে না। চৌকী নেই। মেঝের উপর সাধারণতঃ মাদুর পাতা; ওরা আমাদের তাই কতকগুলি দিয়েছেন, আর গোটাকয়েক আসবাবও দিয়েছেন; কিন্তু যেরকম ঋতুপরিবর্ত্তন হয়—ভীষণ শুখো ও গরমের পর ভীষণ বর্ষা ও গরম,—তা'তে কাঠ ও জোড়ের বাঁধুনী নড়বড়ে হয়ে যায়। স্নানাগার হচ্ছে শান-বাঁধানো একটি ঘর, তা'তে বড় বড় গামলাভরা জল, একটি নীচু টুল যার উপর লোকে দাঁড়ের মত বসে, আর একটা জলপাত্র, কতকটা আধ-সেরী মাপের মত দেখতে, তাই দিয়ে যত ইচ্ছে গায়ে জল ছিটনো যায়।

আর রান্নাঘরটি যদি দেখ—তার মাটির উনুন, ও ছোট এক টেবিল; যখন আমি সেখানে এক নজর দিতে যাই, দেখি আমাদের চাকরসঙ্ঘ যৎসামান্য বেশে উপুড় হয়ে সব বসে' আছে, আমার বাবুর্চ্চিপ্রবর তার অফুরন্ত রসুইরসায়নের উদ্যোগে তরকারি কুট্‌ছে, তার সহকারী বাসন মাজ্‌ছে, ও ঝাড়ুদার একেবারে তৎপরতার চরম সীমায় উঠেছে।

আমার স্বামী বলেন পঁচিশ বৎসর আগে এই ভাবেই চল্‌ত। জিনিষপত্রের দর চড়েছে, ব্যবস্থাদি সমানই আছে, অথচ এখন আর কিছুই চেনা যায় না; এই ভীত সঙ্কুচিত জাত, যারা সাহেব দেখবামাত্র একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে চিট্‌কে যেত, তারা এখন ধীরভাবে নিজেদের খুসিমত যাচ্ছে আস্‌ছে, বিদেশীর কোন তোয়াক্কাও রাখে না। এখন সেকাল গেছে বইয়া, যখন ষ্টেসনের ঘরের দরজায় লেখা থাক্‌ত,—য়ুরোপীয় মহিলার জন্য, দেশীয় স্ত্রীলোকের জন্য। গত যুদ্ধের সময় যে বড় বড় নীতিসূত্রের অবতারণা করা হয়েছিল,—জাতির অধিকার, ব্যক্তির অধিকার,—সে সব যেন সেকেলে রূপকথার দৈত্যের মত, যাদের একবার ডেকে তুল্লে আর দমানো যায় না।

আমরা সব সেরা সময়টিতে এখানে এসেছি। এখন শীতকাল। দিনের বেলা গরমে গা পুড়ে যায়, সকালসন্ধ্যা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, রাত্রিবেলা চমৎকার। তবুও সকলে যেন ঠাণ্ডালাগার ভয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে বেড়ায়, এবং খক্‌খক্‌ কাশিও শুনতে পাওয়া যায়। গরীব লোকের কাপড় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়েছে; মেয়েদের মোটামুটি পরণ হচ্ছে সাড়ি নামক একটি লম্বা কাপড়ের টুক্‌রো, তাই দিয়ে তারা একাধারে সায়া, গা-ঢাকার কাপড় এবং মাথার ঘোমটার কাজ চালিয়ে নেয়। এর চেয়ে সুন্দর মানানসই লজ্জাবস্ত্র আর হতে পারে না। পুরুষেরা এক লম্বা কাপড়কে বেশ চওড়া পাজামার মত করে পরে নেয়, তার উপর একটি লম্বা পিরাণ ঝোলে। যারা বেশী হিসেবী, তারা শেষোক্তের বদলে আমাদের দেশের ভীষণ কামিজ পরে, এবং এই বেশেই আমার ছাত্র,

এখানকার অতি রোগা ও ফ্যাকাসে ফরাসী অধ্যাপক আমার কাছে এসেছিলেন ঃ—খুব চওড়া শাদা পায়জামা, ঔপনিবেশিক খাকি সোলা-টুপি, এবং ছোট একটি কামিজের ঝুল উড়ছে।

শনিবার ১২ই আমরা নিজস্ব সুন্দর বাড়িটিতে উঠে এলুম; উঁচু একতলা, চারিদিকে একটা বড় বারান্দা ঘুরে গেছে। ছোট এক সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যাওয়া যায়, সেখানে শুধু কাক ও পায়রার বাস। কোন প্রতিবেশী নেই, কেবল সূর্য্যদেব আমাদের চারিপাশে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ান। মাথার উপর কোন চাল নেই। হাজার বারোশ' হাত দূরে ইস্কুলের বাড়ীঘর গাছপালা; তার অর্দ্ধপথে র—দের বাঙ্গলো।

এই অতিশয় শুখনো বাতাসে অনন্ত দিগন্ত এত পরিষ্কার যে, কুড়ি মাইল দূরের পাহাড়ের গড়ন স্পষ্ট দেখা যায়, যদিও তার নাম আমার জানা নেই। এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আমরাই সব চেয়ে কুঁড়ে; এখানে সকলে সূর্য্যোদয়ের আগেই উঠে ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হয়; গান দিয়ে দিন আরম্ভ করা হয়, এবং ছাত্রেরা গান দিয়েই দিন শেষ করে।

সি— এরই মধ্যে কাজ সুরু করে' দিয়েছেন; তিনি এখানকার অধ্যাপক ও কয়েকটি সিংহলী বৌদ্ধ পুরোহিতের মধ্যে মনোমত ছাত্র পেয়ে গিয়েছেন, তাদের দ্বারা কাজ পাবেন বলে' তাঁর ধারণা। প্রতিদিনই সংস্কৃত পড়ানো হয়, এবং প্রতি রবিবারে বৌদ্ধ সাহিত্য, মূল ও টীকা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তাতে কলকাতা থেকে ছাত্র এসেও যোগ দেয়।

আমরা এখন মাসকতকের মত এখানে গুছিয়ে বসে' গেছি, ও

সব বেশ ভালোয় ভালোয় চলেছে, কিন্তু য়ুরোপের প্রথম খবর পাবার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছি! দু'দিন ধরে' কোন খবরের কাগজ পাই নি। তা' ছাড়া, ভারতবর্ষ নিজের বাইরে শুধু বিলেতকেই জানে; সিংহল থেকে কলকাতা আসবার পথে, বিভিন্ন কাগজে এই একমাত্র ফরাসী তারেরই বারম্বার পুনরাবৃত্তি দেখলুম যে, বীটের চাষে এবার ঘাঁকতি পড়েছে! সৌভাগ্যবশতঃ কেমাল-ফরাসী সন্ধিপত্রের দরুণ আমাদের দেশের কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে।

সামাজিক জীবনের গতি এখানে অপ্রতিহত। আমাদের অতিথি-শালা, অর্থাৎ আমাদের বারান্দা অভ্যাগতের স্রোতে ভাসমান; পাথরের মূর্ত্তির মত কাপড়পরা মেয়েরা আমাদের সিঁড়ির কয়টি ধাপের নীচে চাপ্‌লি জুতা ছেড়ে রেখে সর্ব্বদাই আসেন, তাঁদের পায়ের তলা লাল রঙ দিয়ে সযত্নে রঙানো, ও তাঁরা এত লাজুক যে মুখ দিয়ে একটি কথা বের করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁদের কারো নাম বা কারো: মুখ আমার মনে নেই। কাল আমার কাছে একটি এমন মিষ্টি তিন মাসের কচি ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, মোটাসোটা, বড়সড়, চমৎকার; তার মস্ত বড় চোখ কাজল দিয়ে আরও বাড়ানো হয়েছে, ও কপালের মাঝখানে একটি ছোট কাল টীপ আছে। ধাত্রীহিসেবে একটি মিশমিশে কালো জোয়ান ছোঁড়া সাবধানে গাড়ী ঠেলে নিয়ে এসেছে, তার পরণে এক হেঁটো ধুতি।

হিংস্র জন্তু এখনো কেউ দেখা দেয়নি, বড় জোর গোটাকতক ছোট মাকড়শা; বড় বড় মাথাওয়ালা ছোট ছোট টিকটিকি তাদের চূণকামকরা দেওয়ালের উপর বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গে শিকার করে' বেড়ায়। আমাদের অনির্ব্বচনীয় জোশেফ বলে সে নাকি বাড়ীর

ঠিক কাছেই একটা সাপ দেখেছে,—কোব্‌রা অবশ্যই! ছোঁড়াটা বেজায় ফক্কড়।

অবশেষে আজ সকালে ছেলেদের কাছ থেকে চিঠি পাওয়া গেল। চারটি ছোট মেয়ে ও একটি ছেলে সে চিঠি আমাদের দিয়ে গেল, এবং কবিবরের নূতনতম গান শুনিয়ে গেল। কাল সন্ধ্যায় পূর্ণিমা-সম্মিলনীতে আমাদের সকলের কাছে তার প্রথম শুনানি হয়ে গেছে। এখানে বেশ বোঝা যায়, কেন এই সব ঐন্দ্রজালিক সন্ধ্যা উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭টা আন্দাজ আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎবাসী সকলে রাত্রির বিশাল আকাশের তলায় সমবেত হয়েছিল,—প্রাচ্য দেশের লোকেই যথার্থ জানে কি রকম করে' বস্‌লে সভা সাজে; চাঁদের সোনালী আলোয় আকাশ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কবিবর ও সঙ্গীতাধ্যাপক (তাঁর নাতি, বৃহদাকার মনোভিরাম দিনু) গান করলেন, ছেলের দলও তা'তে যোগ দিলে। আমার মনে হতে লাগ্‌ল যে, আমাদের তরুণের দল প্রকৃতির বহু দূরে থেকে মানুষ হয়।

আজ সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁদের বলতে হবে যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েরা কি কাজ করেছে,—অথচ আমার ইংরিজীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়!

দুটি কথা।

—:❀:—

আছে মনে ?
সেইদিন যে কেমনে
দুটি মম কথা—'মোর ভিজে বনফুল' –
কিশোরী হৃদয়ে তব দিয়েছিল দুল।
সেই শ্রাবণ দিনের ঝর ঝর বরিষণে
মনে হয়েছিল যেন তরুলতা আনমনে,
কাতর পল্লবে
দাঁড়ায়েছে কেমন নীরবে।
স্বপ্নসম, দ্রুত মৃদুপায়,
সিক্ত বেশে এলে মম আঙিনায়।
প্রেমের বিদ্যুৎ হানি'
থমকি' দাঁড়ালে, ওগো মম বর্ষারাণী !
মুক্ত তব এলো চুল
নিজ গৌরবে ব্যাকুল,
কোন্ ভুলে,
ক্লান্ত ঝঞ্ঝাহত
পথভোলা বিহঙ্গদলের মত
নিরুপায় ছিল দুলে' দুল ;

তব রূপে চঞ্চল আকুল,
রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম শুধু—'মোর ভিজে বকুল।'

বৃন্তহীন তাহাতে উঠিল ফুটি'
লজ্জার গোলাপ দুটি
নবরাগে কম্প্র তব নত আঁখিতলে,
একপলে।
মনে আছে?
ধীরে ধীরে, হে প্রেমচালিতা, এলে কাছে,
দ্বিধায় রাখিলে তুমি আমার হাতের পর
পদ্মদললঘু তব শশিপাণ্ডু কর।

২১ ফাল্গুন, ১৩৩২। জাহাঙ্গীর বকিল।

নবম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রায়তের কথা।

আমার লেখা "রায়তের কথা" যখন সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে, এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি চব্বিশপাতা চিঠি আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য। সেই সঙ্গে তিনি আমাকে যে অপর একখানি পত্র লেখেন, তাতে তিনি পত্রখানি প্রথমে ভারতীতে যেন ছাপা হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়মত "রায়তের কথা" সম্বন্ধে পত্রখানি আমি ভারতী সম্পাদিকার হস্তে ন্যস্ত করি। কিন্তু সে চিঠিখানি ভারতীতে ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে;—পত্র প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে। আমি পত্রের "তুমি" না থেকে প্রবন্ধের "সে" হয়ে গিয়েছি; ভাষান্তরে পত্রের মধ্যম পুরুষ প্রবন্ধের উত্তম পুরুষ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এই সামান্য পরিবর্ত্তনে রবীন্দ্রনাথের কথার চেহারা ফিরে গিয়েছে, যা ছিল সম্বোধন তা হয়ে উঠেছে জনান্তিকে। এই কারণে আমি ভারতীর উত্তমকে আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যমে পরিণত করে তাঁর পত্রখানি স্বরূপে প্রকাশ করছি।

এ লেখা "টীকাসমেত" সবুজ পত্রে প্রকাশ করবার অনুমতি না চাইতেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আমি তাঁর পত্রের স্বরচিত পাদটীকাও এই সঙ্গে প্রকাশ করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রায়তের কথা।

শ্রীমান্ প্রমথ নাথ চৌধুরী,

কল্যাণীয়েষু।

আমাদের শাস্ত্রে বলে সংসারটা উর্দ্ধমূল অবাঙ্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলচে। তোমার "রায়তের কথা" প'ড়ে আমার মনে হ'লো যে আমাদের পলিটিক্সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল এই জিনিষটি শিকড় মেলেচে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্দ্ধলোকে।

যাদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাস্‌চে, আর মাথার উপর অপমানের মূষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌চে, "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বলচে "কালোমেঘ আর হেরব না গো দূতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চলচে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই" আজ তেমনি জোরেই বলচি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেচি বটে যে, পল্লীবাসী জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বলবার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি, তার আওয়াজ বড় মিহী। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারী জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তারপরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেচি—দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান, তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চলত, তাহলে তাদের ডাকতে হত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ ক'রে মরবার জন্যে; আর যাদের অন্ন-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ ক'রে হরতাল করবার জন্যে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া ক'রে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্নি,—তারপর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্স্

আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাসের ধূম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ করলেই হবে। সাজের নামও জানি, একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেন না আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেণ্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেন না গায়ের মাপ নেবার জন্য মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তারপরে স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পাঁজিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারীতে আগে স্বরাজ পাব, তারপরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো, আর আছে ওকালতীর দংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার "রায়তের কথা" স্থানকাল-পাত্রোচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সাম্‌নের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কিনা, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে,—আগে গাড়ি টানাও, তাহলেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তারপরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল,

বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল হাল-আমলের পলিটিক্সে টাইম্‌টেব্‌ল্ তৈরী, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্ত্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও,—ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘসচে;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার "রায়তের কথা" সেই ঘোড়ার কথা—যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

(২)

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্চে তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরখ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠচে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটী রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠী মারলে সে

মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলচে শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গা-যাত্রা করাও, তাহলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরী করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে—তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্স্ নিয়ে পার্লামেণ্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে, তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবালডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্ম্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্, ফ্যাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য্য-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্ত্তুমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের

দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডব নৃত্য করা যায়, তাহলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয় —কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইসারা চলচে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাটা, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

(৩)

আমি নিজে জমিদার, এই জন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়ত শিকারের বিষয়-পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্কের কথা বলে, তাতে বোঝা যায় তাদের "নামে রুচি" আছে; কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে, তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ নামটা হচ্ছে মুখে; আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তাহলে তা'কে দ'লে ফেললেও সেই

মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ মাটি বদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাক্‌তে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জ্জন না ক'রে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্য্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস ক'রে তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা ব'লে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, "রায়তের কথা"য় পুরাতন দফ্‌তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধ্‌তে বসেচ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্চি, রায়তদের বল্‌চি "প্রজা", তারা আমাদের বল্‌চে "রাজা" ;—মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যা'কেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত, যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি

করতে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিন্‌বে না এমন ব্যবস্থা কি করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে-ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল ক'রে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আস্‌তে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(৪)

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাক্‌বে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চল্‌বে। এম্‌নি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কিনা, সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল, তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকৃত, তা হ'লে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধন স্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে, তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে-প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছ্রূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠ্তে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠ্তে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত-সীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে

তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোট মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতী-কুস্তির মারাত্মক প্যাচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুন্‌তেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর চলাচল হয়, সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই, তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে? তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

(৫)

আমি জানি জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও

তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোক্‌সান আছে বলে আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজ-সরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ব বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতি সাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া, সে তত কাল পর্য্যন্ত টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রায়তের কথা।

(টীকা)

রবীন্দ্রনাথ যে আমার "রায়তের কথার" দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এ আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি এ কথাটি তুলি এই আশায় যে বাঙলার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরা এ কথার বিচার করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে মহামতি শিক্ষিত সম্প্রদায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে এ বিষয়ে তাঁরা হাঁ না কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আমি পূর্ব্বে যেমন সাধুভাষা বনাম বাঙ্গলাভাষার মামলা তুলেছিলুম এ ক্ষেত্রেও তেমনি পলিটিকাল সাধু মনোভাবের বিরুদ্ধে পলিটিকাল বাঙলা মনোভাবের মামলা তুলেছি। অতএব এ ক্ষেত্রে চুপ করে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, নচেৎ তর্কের চোটে আমি লোকের কান ঝালা পালা করে দেব। আমি যে একজন নাছোড় তার্কিক তার পরিচয় যাঁরা বাঙ্গলা জানেন তাঁরা পূর্ব্বে যথেষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এ নিরবতার যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন।

আমারও একটা পলিটিক্স্ আছে, যুগধর্ম্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণ মাত্রায় প্রভুত্ব করে। কিন্তু আমার পলিটিক্সের প্রস্থান ভূমি হচ্ছে বাঙলার জমি, বিলেতের আকাশ নয়। ফলে ও উড়ো পলিটিক্সের মত বিচিত্র ও চমকপ্রদ নয়। মহাভারতে পড়েছি যে একটি হংস বলেছিলেন যে:–

"তোমাদের সাক্ষাতেই আমি উৰ্দ্ধগতি, অধোগতি, বেগগতি, সমগতি, ধীর-গতি, সম্যকগতি, বক্রগতি, বিচিত্রগতি, সর্ব্বদিকে গতি, পশ্চাদগতি, সুকুমারগতি, প্রচণ্ডগতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্ব্বদিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে উর্দ্ধগমন, শোভনগমন, মণ্ডকাকারে অধঃপতন, শোভনভাবে উর্দ্ধগমন, শোভনভাবে অধঃপতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষাসহকারে গমন,

পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতিগত কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব।"

আমি দেশের লোকের কাছে উক্তরূপ বিচিত্র শূন্যলীলা প্রদর্শন করতে অঙ্গীকার কস্মিনকালেও করিনি, কারণ পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি যে নিজদেহে ধারণ করিনে—এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল, এখনও আছে। আর যে পলিটিক্সের শিকড় দেশের মাটিতে-বদ্ধ সে পলিটিক্স্ যে উঁচু নজরের লোকের চোখে পড়্‌বে না, সে ত ধরা কথা।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার কি এমন কোন মন্ত্রদাতা বন্ধু ছিলেন না যিনি আমাকে এই মেঠো পলিটিক্স্ থেকে বিরত করতে পারতেন? বন্ধু ভাগ্যে আমি একেবারে বঞ্চিত নই। আর সকলেই জানেন, বন্ধুমাত্রেই বন্ধুর মন্ত্রী যেমন স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর প্রাইভেট টিউটার। তবে যে আমার বন্ধুবর্গ আমাকে পলিটিক্সের বহুজনসেবিত শূন্যমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন নি, তার কারণ, তাঁরা জানেন যে আমি পলিটিসিয়ান নই, সাহিত্যিক। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লোকের মুখে লাগাম দেওয়া চলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আর সাহিত্যিককে সামাজিক করবার চেষ্টা যেমন বৃথা তেমনি অনর্থক।—দেশের সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিসিয়ান হয়ে ওঠে, তাহলে পাল্টা জবাব দেবার জন্য সব পলিটিসিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠবে। ফলে মনোরাজ্যে কি ভীষণ অরাজকতা ঘটবে তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু যদি কাব্য লিখতে সুরু করেন আর মৌলানা মহম্মদ আলি দর্শন, আর আমরা তা পড়তে বাধ্য হই, তাহলে কোন সাহিত্যিক না বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্য ছট্‌ফট্ করবে। এই সব কারণে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করেন নি। "যাঁর কর্ম্ম তারে সাজে"—এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। আসল কথা হচ্ছে সাহিত্যিকের পলিটিক্স্ একেলেও নয় সেকেলেও নয় তেকেলে'। সুতরাং তা একালের সঙ্গেও খাপে খাপে মিলে যাবে না সেকালের সঙ্গেও নয়, অথচ ও দুকালের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে।

(২)

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার যো নেই, আর পাঁচজনে যাকে একটা ismমের ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন, তাহলে তাঁরা যে শিক্ষিত তা কি করে প্রমাণ হয়? আমি যে ism নাস্তিক তার পরিচয় বোধ হয় আমার রায়তের কথার পত্রে পত্রে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথও সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিনডিকালিজম প্রভৃতি কথায় ভয় পান এবং কেন ভয় পান সে কথা তিনি তাঁর পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। ও সব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নয়। কেন যে নয়, সংক্ষেপে তা বলছি।

কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি যেমন একই আদ্যাশক্তির বিভিন্নমূর্ত্তি—সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতিও Capitalism-এরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। এ কথা এতই সত্য যে স্বয়ং লেনিন কমুনিজম ওরফে বলসেভিজমের নাম দিয়েছেন State Capitalism.

এই Capitalism জিনিসটে কি? ওর জন্ম হয়েছে industrialism থেকে। যতদিন ইউরোপে industrialism থাক্‌বে ততদিন Capitalism-ও থাক্‌বে, বদল হবে শুধু ওর নামরূপে।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যেদেশে industrialism নেই সে দেশে সোশ্যালিজম, কমুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতি, যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথার সামিল। এ জাতীয় শিরঃপীড়ায় লোক অবশ্য ভীষণ আর্ত্তনাদ করতে পারে যেমন খালিফের অভাবে খিলাফৎ করছে, কিন্তু সে চীৎকার ধ্বনিতে সহজ লোকের কান্না না পেয়ে হাসি পায়।

আমাদের দেশে এই রায়তের সমস্যাটা হচ্ছে non-industrial-সমাজের সমস্যা। এ বিষয়ে Bertrand Russel-এর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। রাসেলের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপের পলিটিক্‌সের ভাব-রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই, সুতরাং তাঁর কথা শোনা যাক্‌।

"In a non-industrial community, liberal ideals, if they could be carried out, would lead to a division of the national wealth between peasant proprietors, handicraftsmen and merchants. Such a society exists at this day in China, except in so far as it is interfered with by foreign capitalists and native military commanders. The latter revert to the right of the sword, the former introduce fragments of modern industrialism."

(Prospects of Industrial Civilization, p. 55.)

বলা বাহুল্য যে ইকনমিকালি ভারতবর্ষ ও চীন সমবস্থ। আমি "রায়তের কথায়" বাঙলার রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে সুধু প্রজার নয় সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে সব ছোট খাটো অধিকারের দাবী করেছি সে সব অধিকার লাভ করলে বাঙলার রায়তের দল peasant proprietorship-য়ের দিকে আর একটু অগ্রসর হবে। চীনের রায়তের অপেক্ষা বাঙলার রায়তের অবস্থা এক বিষয়ে ভাল। আমাদের দেশে কোনও native military commanders নেই যারা তরবারীর সাহায্যে রায়তের সত্ব অপহরণ করতে পারে। Foreign Capitalist অবশ্য দুই দেশেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গে একদল রায়ত-বন্ধুর সন্ধান পেয়েছেন যারা নাকি সুধু দ'লে ফেলবার পিষে ফেলবার, পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে মতই প্রচার করা যাক না, লোকে তা নিজের বুদ্ধি ও চরিত্র অনুসারে অঙ্গীকার করবে। এবং এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে বহু নির্ব্বোধ লোক আছে এবং নির্ব্বুদ্ধিতার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধির সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে মেলে। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের উপসর্গ জুড়ে দিতে অনেকে লালায়িত। এর জন্য মানুষে দুঃখ করতে পারে, কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না। ধর্ম্মের অর্থ যে অনেকের কাছে বিদ্বেষ বুদ্ধি

তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অবশ্য ধর্ম্ম দায়ী নয়। আর যেখানে মামলা হচ্ছে ধর্ম্মের নয় অর্থের—সেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর স্ফূর্ত্তি ত হবেই। সে যাই হোক "রায়তের কথা" যে riotএর কথা নয় তা বোঝবার মত ভাষাজ্ঞান আশা করি অধিকাংশ পাঠকেরই আছে।

(৩)

রায়তকে তার দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আছে। তাই তিনি হস্তান্তর করবার পক্ষে আমার কি বলবার আছে তা শুনতে চেয়েছেন। "রায়তের কথায়" এ বিষয়ে আমি কোনও আলোচনা করি নি। এই মাত্র বলেছিলুম যে, এ ব্যাপারের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলবার আছে সে সব কথা আর যার মুখেই শোভা পাক্ বাঙলার অধিকাংশ জমিদারের মুখে শোভা পায় না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা যা দেখেন, তা প্রজার হিতাহিত নয়—দেখেন শুধু দাখিল-খারিজের নজরের তারতম্য। যে ব্যাপারে নিজের পকেট ভারি হয় তাতে যে অপরেরও হিত হয় এ রকম মনে করায় বিশেষ আরাম আছে। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ঐ রকম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মন সহজেই অনুকূল।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে, মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেন না তাঁর জমিদারী সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলা গিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্ত্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাঙলার জমিদার মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique. আমি সেই সব জমিদারের কথা বলেছি, যাঁরা শতকরা নিরনব্বই।

আমরা হাজার স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও যেমন শিশুকে সকল বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিতে নারাজ তার ভালর জন্য, তেমনি বাঙলার রায়তকে

তার নিজের সর্ব্বনাশ করবার স্বাধীনতা দিতেও নারাজ হতে পারি, রায়ত বেচারার ভালর জন্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। আমি অনেক বিষয়েই liberal অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সকল লোককে, কথায়, কাজে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা এ জ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে তখন জনৈক liberal বলেছিলেন যে I would rather have England free than England sober. আমার liberalism অবশ্য অতদূর উচুতে ওঠে না। Drink স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় ত, তা sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়।

তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিশু ছাড়া আর কারও শৈশব আমার কাছে প্রীতিকর নয়। এক হাত পরিমাণে ছেলেকে কোলে করতে সকলেরই লোভ যায় কিন্তু সেই মাপের প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অর্থাৎ বামনকে অঙ্কস্থ করতে সহজ মানুষে সহজেই নারাজ হয়। অনেক লোক যাদের আমরা শিশু বলি তারা মনোজগতে বামন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনও দেশে বেশির ভাগ লোক এই জাতীয় হয়, তাহলে সেটা অবশ্য এতটা দুঃখের বিষয় যে, কি করে তাদের আবার মানুষ করা যায় সেইটিই হচ্ছে আসল ভাবনার কথা। এ দেশে রায়তের দল, উক্ত হিসেবে বাস্তবিকই শিশু,—কিন্তু এই শিশুদের কি করে মানুষ করতে হবে সেটা একটা মস্ত সমস্যা, তবে আমি যে সমস্যা তুলেছি তার থেকে পৃথক সমস্যা।

আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে একটা proprietary right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ তাতে কিছু যায় আসে না। ক জমিদারের স্বত্ব-স্বামীত্বও ক নিত্য খ জমিদারের হাতে যাচ্ছে।

এখন যদি কেউ প্রস্তাব করে যে, জমিদারী কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, তাহলে ক চ ট ত প পঞ্চবর্গ জমিদার পঞ্চমুখে তার প্রতিবাদ করবেন। মানুষ চরিত্র এই যে কোনরূপ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোন বিশেষ লোককে চিরকাল বেঁধে রাখা যাবে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে মানুষের এমন বিবাহ হতে পারে না যার আর divorce নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষ-নামক জঙ্গমজীবকে সেকালের ভূম্যাধিকারীরা তাঁদের জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মত স্থাবরজীব হতে বাধ্য করেছিলেন, এ ব্যবস্থার নাম serfdom। একালে আমাদের ও নাম শুনলেই ভয় হয়। অপর পক্ষে ক'র জমি খ'র হাতে যাওয়াটা আমরা বিশেষ দুঃখের কথা মনে করি নে।

তবে কথা হচ্ছে ক'র জোত যদি খ'র হাতে না গিয়ে গ'র হাতে যায়? ক'ও চাষী-প্রজা খও তাই, কিন্তু গ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রজা কিন্তু চাষী নন, তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-টপকা ফল ভোগ করেন—অর্থাৎ জোতদার। "গ" যখন জমি চসে না, তখন সে তা অবশ্য ঘ'কে দিয়ে চষাবে। এই ঘ হবে তখন একজন কোর্ফা প্রজা অথবা আধিয়ার। ফলে এই নূতন জাতের প্রজার উপর অবশ্য সে জমির পূর্ব্ব মালিক ক'র কোন অধিকারই বর্ত্তাবে না, তার সকল অধিকারের মালিক হবে গ। ফলে এই হস্তান্তরের বলে, ঘ'র জোতে দখলী স্বত্বও থাক্‌বে না, তার হস্তান্তরের অধিকারও থাক্‌বে না। অর্থাৎ আমি জমিদারের অধীনস্থ রায়তকে যে সব স্বত্ব-স্বামীত্ব দিতে চাই জোতদারের অধীনস্থ রায়তের তা কিছুই থাক্‌বে না। ফলে হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রায়তের সকল স্বত্ব জোতদারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। আর হস্তান্তরের ফলে বহুজোত যে জোতদার আত্মসাৎ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খরিদ বিক্রীর কথা অবশ্য টাকার কথা। সুতরাং যার টাকা আছে সেই যে জোত খরিদ করবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। জমিদার ও রায়তের ভিতর মহাজনের হবে মধ্যস্বত্ব।

কিন্তু এর উপায় কি? ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছি যে land, labour and capital এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়। কৃষীকর্ম্মের কথাই ধরা যাক।

land বাদ দিয়ে শূন্যে চাষবাস হয় না, labour বাদ দিলে ফসল জন্মায় না, জন্মায় ঘাস, আর সে ঘাসও কাটবার জন্য labour চাই। আর হালবলদ মই বিদে, নিড়ুনি বীচন capital-এর অভাবে এ সব কিছুই জোটে না, আর জোটে না চাষের গরুর ও চাষীর খোরাক্। আজ বীজ বুনে কাল যদি পাকা ধান পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপার হয়ত অন্যরূপ হত। বাজীকররা অবশ্য আঁটি পোঁতবার অব্যবহিত পরেই ফজলী আম ফলিয়ে দেয়। এ বিদ্যে মূর্খ চাষীদের জানা নেই। আর তা ছাড়া বাজীর আমে সুধু নয়ন তৃপ্ত হয় উদর তৃপ্ত হয় না। Land, labour এবং capital এ তিনের Co-operation যখন চাইই তখন এই তিনের ভিতর যাতে বিরোধ নয় সামঞ্জস্য ঘটে তারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য,—অন্তত ততদিনের জন্য যতদিন সোশ্যালিজমের কৃপায় land nationalised এবং কমুনিজমের কৃপায় capital inter-nationalised না হয়ে যায়।

এখন এই মহাজনের হাতে জমি যাওয়ার ফলে মহাজনের অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। জমি কেনা বেচার অর্থ এই যে, যে জমি বেচে সে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে আর যে কেনে সে অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ একই জিনিষ সুধু ভিন্নরূপ ধারণ করে। জমিও capital টাকাও capital, দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে একটি স্থূল ও অচল Capital, আর একটি তরল ও চঞ্চল capital। আর এ পৃথিবীর নিয়মই এই যে স্থূল নিত্য তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে—আর তরল নিত্য স্থূলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তাহলে বলি জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী হয় না জমিদারের বাকী খাজানার দায়েও বিক্রী হয় আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দ্দয়রূপে। সুতরাং জমির কেনা বেচা যেমন চলছে তেমনি চলবেই,—মহাজন নামক Capitalist-এর হাত থেকে রায়তী জোত

আইনত রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক Capitalist-এর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি সেই রকম আইন হওয়া উচিত যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামীত্ব খর্ব্ব না হয়। মধ্য-স্বত্বকে খর্ব্ব করাই তার উপায়। কি করে তা করা যাবে তার সন্ধান উকিল বাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।

(৪)

রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপদেবতার উপদ্রব থেকে রায়তকে যে কি করে বাঁচানো যায় সে বিষয় আমি রায়তের কথায় আলোচনা করি নি,—দু কারণে।

প্রথমতঃ আমি আলোচনাটিকে সরল করবার জন্য রাজা প্রজার সম্বন্ধের বিচার করি, তাই যে ব্যক্তি রাজাও নয় প্রজাও নয় অথচ একাধারে ও দুই তার নাম আর উল্লেখ করিনি। দ্বিতীয়তঃ এ জ্ঞান আমার ছিল যে, জাতিভেদের মত মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজ গঠনের বিশেষত্ব। বিলেতে যেমন middle class প্রবল, এদেশে তেমনি middleman-ই প্রবল, সুধু কৃষীকর্ম্মে নয় সিল্প বাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে সে দুই ব্যক্তির ভিতর অসংখ্য middleman আছে। কথায় বলে “যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই”। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্রলোক। সমাজের এ ব্যবস্থা আর যে হিসেবেই আমাদের উন্নতির কারণ হোক্ জাতীয় ধনের হিসেবে আমাদের অবনতির কারণ। আমি নিজে এই ভদ্রশ্রেণীভুক্ত, জাতি হিসেবেও পেশা হিসেবেও, তবুও এ স্পষ্ট সত্যটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমার জীবনকে দিব্যি খাপ খাইয়েছি, কিন্তু আমার মনকে তদ্রূপ খাপ খাওয়াতে পারি নি। তাই সমাজ-দেহের রোগের কিসে প্রতিকার হয় সে ভাবনা আমি ভাবতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, আমি এ রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দিয়েছি সে হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে symptomatic treatment। তার ফলে জাতীয় হীনতা দূর হবে না। এ জ্ঞানও আমার ষোল আনা আছে। তবে যে লোকের ছোটখাটো কষ্টের কি করে প্রতিকার হতে পারে সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করেছি তার কারণ আয়ুর্ব্বেদে আদেশ আছে, মানুষের গায়ে কাঁটা ফুটলেই যদি পারত তা তুলে দিয়ো, দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না হওয়াতক্ ও কাজ করতে নিরস্ত হয়ো না।

আমাদের সর্ব্ব প্রকার জাতীয় দুর্দ্দশার কারণ হচ্ছে জাতির প্রাণ শক্তির অভাব। এই জীবনমৃত জাতির অন্তরে আবার কি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় সেইটেই হচ্ছে অবশ্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য। চারদিকে যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে তা হবে না। কারণ অনেকে যা করছেন তা হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানী galvanic battery-র shock প্রদান। ও shock-য়ে মরা জানোয়ার হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু বাঁচে না। তবে হবে কিসে? এ বিষয়ে মুক্তি কোন দিকে, সে দিক নির্ণয় আমি করতে পারি—কিন্তু সে পথে কাউকে চালাবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া ধান ভানতে শিবের গীত গাইতেও আমি সঙ্কুচিত। রায়তের কথা আগাগোড়া কত ধানে কত চাল হয় তারই কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কাব্য জিজ্ঞাসা।

(প্রথম প্রস্তাব)

ইহুদী ও খৃষ্টানের ধর্ম্মপুঁথিতে বলে বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্খার বলে দ্যৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে সৃষ্টি অতি চমৎকার। ঐ পুরাণেই বলে সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে তৈরী করেছেন তাঁর প্রতিরূপ করে, আর নিজের নিঃশ্বাস বায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টি রহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া; অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব আয়ত্তের আর কোনও চাবী মানুষের হাতে নেই। বাইবেলের বিধাতার মত মানুষ অন্তরাত্মার আকাঙ্খার চালনায় যা সৃষ্টি করে, তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয়। বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টি কৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির বিরাম নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। কেন না সে সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাহিরের বিশ্বের মতই রহস্যময়।

রামায়ণে কাব্যের জন্ম কথার যে কাব্যেতিহাস আছে তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চ-দ্বন্দ্ব বিয়োগের শোকে যখন বাল্মিকীর মুখ থেকে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন—

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥

বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল শকুনির শোকে শোকার্ত্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম এ কি! তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগ্‌লেন,

চিন্তয়ন্স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্মতিম্।

এবং শিষ্যকে বল্‌লেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রী লয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

এই বাক্য পাদবদ্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রী লয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।

রামায়ণকার আদি কবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন সেটি কাব্য রসিক মানব মনের সাধারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই যে অপূর্ব্ব মনোহর শব্দ গ্রন্থনের সৃষ্টি করে "কিমিদং"—এ কি বস্তু? এর স্বরূপ কি? তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলঙ্কার শাস্ত্র। সে শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্য জিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়? কোন গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়? আলঙ্কারিকদের ভাষায় কাব্যের আত্মা কি?

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদ সমুচ্চয়। সুতরাং কাব্য দর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী তাঁরা বলেন ঐ বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে, সাজ সজ্জায় সাজিয়ে

দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজ সজ্জার নাম অলঙ্কার। শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলঙ্কারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্য। "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ" (বামন)। এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্য জিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্ত্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে তাদের জীবনযাত্রা তার কোনও প্রমাণ দেয় না, তেমনি মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায় তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্য-পাঠক কাব্য বিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলঙ্কারের আস্বাদন। এবং সেই জন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলঙ্কৃত বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবী লাভ করেছে।

অলঙ্কারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলঙ্কারিকেরা বলেছেন কাব্য যে অলঙ্কৃত বাক্য নয় তার প্রমাণ শব্দ ও অর্থ দু রকম অলঙ্কারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয় এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, আবার সর্ব্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য তার কোনও অলঙ্কার নেই এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যের ওসংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন "সাহিত্য-দর্পণের" একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন—

তরঙ্গনিকরোন্নীত তরুণীগণ সংকুলা।
সরিদ্বহতি কল্লোলবাহব্যাহততীরভূঃ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলঙ্কার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বল্‌বে না। বাক্য অনলঙ্কৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য এর উদাহরণে 'সাহিত্য দর্পণ'কার কুমার সম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনা থেকে তুলেছেন।

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌপ্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

এর এখানে ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে "তরঙ্গ নিকরোন্নীত তরুণীগণের" কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একবারে নিরলঙ্কার। অকাল বসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতি দ্বিতীয় মদনের সমাগমে, তির্য্যকপ্রাণিদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলঙ্কারে সাজান নি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুঠ করে নেয়। অলঙ্কারবাদিরা বল্‌বেন এখানেও অলঙ্কার রয়েছে যার নাম স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বল্‌বেন ঐ নামেই প্রমাণ অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য সেখানে নেহাৎ মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলঙ্কার বলা চলে না।

অলঙ্কারবাদকে একটু শুধ্‌রে নিয়ে আর একদল আলঙ্কারিক বলেন অলঙ্কৃত বাক্য মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলঙ্কার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রীতি'। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য," (বামন, ২।৬)। "রীতি" হ'ল পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী। "বিশিষ্টা পদ রচনা রীতিঃ," (বামন ২।৭)। অর্থাৎ

কাব্যের আত্মা হ'ল তার 'ষ্টাইল'। 'ষ্টাইলের' গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাক্‌লেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর 'ষ্টাইল'। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্য লেখক এই 'ষ্টাইলের' গুণে বা নবীনত্বে 'আর্টিষ্ট' বা কবি নাম পেয়েছেন। অলঙ্কার হচ্ছে এই 'ষ্টাইল' বা 'রীতির' আনুসঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলঙ্কার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব-সংস্থান নির্দ্দোষ হয়। 'ষ্টাইল' হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন নির্দ্দোষ অবয়বে ভূষণযোগ করলেই সৌন্দর্য্য আসে না, শরীরেও নয়, কাব্যেও নয়।

> "প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবিনাম্।
> যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥"
>
> (ধ্বন্যালোক, ১।৪)

"রমণী দেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গী এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।" এই 'অতিরিক্ত বস্তুই' কাব্যের আত্মা।

এ 'বস্তু' কি? উত্তরে বস্তুবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন এ জিনিষটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। "তরঙ্গনিকরোন্নীত" ইত্যাদি যে কাব্য নয় তার কারণ ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মত কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের

সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনও বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু, ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী, "চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপভ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ"। অনেক ভাব, যেমন প্রেম, করুণা, বীর্য্য, মহত্ব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এই সব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন। এবং তাদের বিশিষ্ট পদ রচনা ভঙ্গী, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলঙ্কারের সমাবেশ, তাদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে' আর ধর্ম্মান্তর নেই। যেমন বার্হস্পত্যেরা বলেছেন রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয়; মন নামে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে সব আলঙ্কারিক বস্তু-বাদিদের মতে মত দিতে পারেন নাই, তাদেরও স্বীকার করতে হয়েছে অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কারের গুণেই কাব্য। এমন কি মহাকবিদের কাব্য প্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাঁদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশী, তাঁদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গী আরও বিচিত্র, তাঁদের অলঙ্কার অধিকতর সঙ্গত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলঙ্কারিকেরা কাব্য বিচারে এখানেই থামতে পারেন

নি তার কারণ তাঁরা দেখেছেন যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থ মাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয় সেই কথা—বস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হ'ত তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে তারই কাব্যের আস্বাদন হ'ত, কিন্তু তা হয় না।

"শব্দার্থ শাসন জ্ঞানমাত্রে নৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেমলম্॥"

(ধ্বন্যালোক, ১।৭)

"কাব্যের যা সার অর্থ কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থ তত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন"। "যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎ প্রতীতিঃ স্যাৎ—কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হ'ত, তবে বাচ্য-বাচকের স্বরূপ জ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত"। "অথচ বাচ্য-বাচক রূপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদি-লক্ষণমিব প্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ—অথচ দেখা যায় কেবল বাচ্য-বাচক লক্ষণের জ্ঞান লাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যারা জানে তাদেরই সঙ্গীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না" (ধ্বন্যালোক, ১।৭, বৃত্তি)। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে' বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যা-তিরিক্ত ধর্ম্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'।

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যঙ্গঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিনঃ" ॥

(ধ্বন্যালোক, ১।১৩)

"যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রধান্য পরিত্যাগ করে' ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেচেন"। এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিভাষা হ'ল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন এই 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে কাব্যের 'ধ্বনি', উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি যে সব অলঙ্কার তার বাচ্য-বাচকের—অর্থ ও শব্দের—চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিষ। "বাচ্য-বাচক চারুত্ব-হেতুভ্য উপমাদিভ্যোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব" (ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি)। কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে এ সব অলঙ্কারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ঐ অলঙ্কার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে 'ধ্বনি' তা সেখানে নেই। কারণ সেখানেও বাচ্যই প্রধান; ধ্বনির আভাষ যেটুকু আছে তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে 'ধ্বনি' তাই তার প্রধান বস্তু।

"ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥

তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ ”

(ধ্বন্যালোক, ১।১৪, ১৫, ১৬)।

'ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ীমাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালঙ্কার, ধ্বনি নয়। ব্যঙ্গ্য আভাষ মাত্রে থাক্‌লে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হ'লে তাকে ধ্বনি বলে না, কারণ ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যপর হয়ে ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়; সুতরাং সংকরালঙ্কার আর ধ্বনি এক নয়'।

এখানে যে দুটি অলঙ্কারের বিশেষ করে' নামোল্লেখ আছে তার মধ্যে সমাসোক্তি অলঙ্কারে বর্ণিত বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে' বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঐ ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না; বর্ণিত বস্তুর কার্য্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে যা তাদের সূচিত করে। এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষিপ্ত হয় বলে' এর নাম সমাসোক্তি। আনন্দবর্দ্ধন খুব একটা জমকালো উদাহরণ তুলেছেন;—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্॥

'উপগতসন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থির দর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হ'ল, অমনি পূর্ব্বদিকের সমস্ত তিমির যবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হ'ল, তা লক্ষ্যই হ'ল না'। এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, নায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে' বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চাতুর্য্য যথেষ্ট। ওর

প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট ; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বল্‌ছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত কর্‌ছে। "উপোঢ় রাগেণ বিলোল তারকং"—সন্ধ্যার অরুণিমায় আকাশের তারা অস্থির দর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষু-তারকা। "গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্‌" —চন্দ্রোদয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ, আবার 'মুখ' অর্থে বদন, "গৃহীত" মানে ধৃত, পরিচুম্বিত। "সমস্তং তিমিরাংশুকং"—এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। 'অংশুক' মানে সুধু কাপড় নয়, সূক্ষ্মবস্ত্র যা নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়—পাত্‌লা অন্ধকার। "পুরং"—অর্থ পূর্ব্বদিক, আবার সম্মুখে। "রাগাদ্‌গলিতং"—আলোকরাগে অপসৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্খলিত। "ন লক্ষিতং"—রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হ'ল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্খলিত হ'ল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আনন্দবর্দ্ধন বলছেন এখানে 'ধ্বনি' নেই, কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামীমাত্র ("ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যে-নানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে ")। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকা-নায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশী দূর যায় নি ("সমারোপিত নায়িকানায়ক ব্যবহার-য়োনিশাশশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ)। নায়ক নায়িকা ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা সেটি বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদক মাত্র।

দ্বিতীয় অলঙ্কারটি হচ্ছে সংকরালঙ্কার। ওর নাম সংকর, কারণ ওতে একাধিক অলঙ্কার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলঙ্কারকে সূচিত করে।

লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন,—

প্রবাতনীলোৎপল নির্বিশেষমধীর বিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।

তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

'বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মত সেই আয়ত লোচনার চঞ্চল দৃষ্টি সে কি হরিণীদের কাছে থেকে গ্রহণ করেছে, না হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে তা সংশয়ের কথা'। এখানে বক্তব্য হ'ল—যৌবনারূঢ়া পার্ব্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মত চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না বলে', একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ রকম কবি-কল্পিত সংশয়কে আলঙ্কারিকেরা বলেন সন্দেহালঙ্কার। সুতরাং এখানে বাচ্য হ'ল সন্দেহালঙ্কার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা 'ধ্বনি' নয়। কারণ এ কবিতার যেটুকু মাধুর্য্য তা ঐ ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ঐ সন্দেহের অভ্যুত্থানে সহায়তা করে', তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্য্যবসিত হয়েছে। "অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গ্যা তথাপি বাচ্যস্য সা সংদেহালংকারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদ্গুণীভূতা। অনু-গ্রাহ্যত্বেন হি সংদেহে পর্য্যবসানম্"। (অভিনবগুপ্ত)। অর্থাৎ অভিনব-গুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনা কৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সন্দেহ অলঙ্কারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা, 'ধ্বনি' নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে বাক্যে যে কোনও ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। বিশ্বনাথ

অবশ্য সোজাসুজি বলেছেন তা হ'লে প্রহেলিকাও কাব্য হ'ত। কিন্তু এই সব অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হ'লে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য্য তাদের ব্যঞ্জনাকে 'ধ্বনি' বলে' ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে' সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালঙ্কারের ব্যঞ্জনা এক অলঙ্কার দিয়ে অন্য অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা। সুতরাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলঙ্কারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকবির কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়—এ সব উক্তি যেমন একালের তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালী বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন—কাব্যের বাচ্যও নয়, তার গুণ, অলঙ্কারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে' অপূর্ব্ব এক বস্তু, এ আবার কি? ও জিনিষ হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যেই আছে, নয়ত ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র। খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকেরা বর্ণনা করেন নি, এমন একটি বৈচিত্র্যকে একজন বলেছে 'ধ্বনি', আর অমনি একদল লোক অলীক সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিত চক্ষু হয়ে' 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে' নৃত্য আরম্ভ করেছে। ("কিং চ বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎসংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনি ধ্বনি রিতি তদলীকসহৃদয়ত্বভাবনা মুকুলিত লোচনৈর্নৃত্যতে।...

...তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনি"। ধ্বন্যালোক। ১।১, বৃত্তি)। ধ্বনিবাদের মুখ্যাচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতান্ত্রিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে।

"যস্মিন্নাস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ" ॥

"যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচন বিন্যাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলঙ্কারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ 'ফ্যাশনের' খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে' প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে 'ধ্বনির' স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করছে এ ত জানা যায় না!"

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হন নি। তাঁরা স্বীকার করেছেন কাব্যের 'ধ্বনি' তার বাচ্যার্থের মত এত স্পষ্ট জিনিষ নয় যে ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে তাকেই হাতে কলমে প্রমাণ করে' দেখান যায় যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'ধ্বনি', বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই 'ধ্বনির' অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর 'ধ্বনি' আছে বলে' অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখান যায়। ধ্বনিবাদিদের অনুসরণে দু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

'বিবাহপ্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদ্গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়'—এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ—

কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

কোনও কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বল্‌বে না। ঠিক ঐ কথাই কালিদাস পার্ব্বতী সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন,—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুল্‌বে না। কিন্তু কেন? কোথায় এর কাব্যত্ব? এর যা বাচ্যার্থ তা ত পূর্ব্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনও অলঙ্কারের সুষমায় এ কাব্য নয়, কারণ কোনও অলঙ্কারই এতে নেই। ধ্বনিবাদিরা বলেন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্র গণনা—তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের,—পূর্ব্বরাগের লজ্জাকে—ব্যঞ্জনা কর্‌ছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। ("অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং··· অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি"। ধ্বন্যালোক, ২।২৩, বৃত্তি)।

নারীর সৌন্দর্য্যের উপমান যে জলস্থল আকাশের সর্ব্বত্র খুঁজতে হয় এ একটি অতি সাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা॥

'আকাশের চন্দ্রের মত মুখ, নীল পদ্মের মত চক্ষু, শুভ্র কুন্দ ফুলের মত দশনপংক্তি—গগনে, জলে, স্থলে হৃদ্য যা কিছু আছে তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নির্ম্মাণ করেছেন।' এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কিনা সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহারিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি॥

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে? ধ্বনিবাদিরা বলেন এখানে অলঙ্কারগুলি তাদের অলঙ্কারত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর 'ধ্বনি' প্রিয়াবিরহীর অন্তর ব্যথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়—এই ভাব নিম্নের কবিতা দুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শংভুনা ন হৃতং বলম্॥

'সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বল হরণ করতে পারেন নি।'

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্য্যবীর্য্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

'দগ্ধ হ'লেও কর্পূরের মত প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে; আবার্য্য-বীর্য্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার।'

অভিনবগুপ্ত বলেছেন (১।১৩) এ কবিতা দুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাব মাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য ("ইয়ং চাচিন্ত্য নিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সদ্ভাবঃ")। দ্বিতীয়টি কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে ("বস্তুস্বভাবমাত্রে তু পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসদ্ভাব-শঙ্কা")। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পরে' কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছ এ কি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে উচ্ছসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানবমনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ঐ একই কথা তিনি তার আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতেন যে এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর 'করুণ বিপ্রলম্ভের' 'ধ্বনি'।

এই যে তিনটি উদাহরণে দেখা গেল কাব্যের আত্মা হচ্ছে আর

বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয় 'ধ্বনি'—এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি ? ধ্বনিবাদিদের উত্তর, 'রসের'। তাঁরা দেখিয়েছেন বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি। তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই 'রসের' যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে' কাব্যে পরিণত হয়েছে।

"দৃষ্টপূর্ব্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রস পরিগ্রহাৎ।
সর্ব্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥"

(ধ্বন্যালোক, ৪।৪।)

'পূর্ব্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে' বসন্তের নব কিশলয় খচিত বৃক্ষের মত নূতন বলে' প্রতীয়মান হয়'। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' বলে' যারা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তারা উপসংহার করেছেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" (সাহিত্যদর্পণ)। কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য 'রস' যার আত্মা।

'কোঽয়ং রসঃ', এ 'রস' জিনিষটি আবার কি ?

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের রস বিচারের পরিচয় দেওয়া যাবে। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনও দেশে, কোনও কালে, আর কেউ বলে নি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

চিত্রা ও চৈতালি।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থখানি কবির বত্রিশ হইতে তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা। ইহার পদ্মাও বর্ষার, তবে তাহার উন্মাদনা খানিকটা পড়িয়া আসিয়াছে—ইতস্তত ভাঙার চিহ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। এখনো কবি আসল পদ্মার উপরেই আছেন—কোনো শাখানদী বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে আসিয়া পড়েন নাই—তবে তাঁহার নৌকা যে সেই দিকেই চলিয়াছে, তাহা বেশ মনে হইতেছে। বড় নদী লোকালয়কে বিচ্ছিন্ন করে—এপারে ওপারে নূতন মানুষ, নূতন ভাষা; শাখানদী আত্মীয়তার সম্বন্ধ দ্বারা লোকালয়কে আকর্ষণ করে। ঠিক যেন রাজপথ ও গলির প্রভেদ। গলি পারিবারিকতার সূত্র,—এই জন্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে গলি এত আনাগোনা আর এত আদরের স্থান।

সোনার তরীতে দেখিয়াছিলাম কবি নিজের অন্তঃপুরে মানস-সুন্দরীর সহিত আলাপনে নিরত; বাহিরের জগতে বাহির হইবার তাঁহার কোনো ব্যস্ততা ছিল না। শুধু নিজের অন্তরকে নহে, বহির্জগৎকে উপভোগ করিবার একটা অসহ্য আকুতি চোখে পড়ে চিত্রাতে। নিম্নে আলোচিত কয়েকটি কবিতাতে দেখিব, বর্ষার সেই নীরের প্রাধান্য কাটিয়া তীরের প্রাধান্য ধরা পড়িতেছে। ইহার 'সুখ' নামক কবিতাটিতে দেখিব, পদ্মাতীরের লোকালয়ের বর্ণনা কেমন করিয়া কবিকে অধিকার করিতেছে। শুধু তাই নহে, এই 'সুখ' কবিতাটিতে এমন একটি সহজ সরলতা আছে যে, ইহাকে ক্ষণিকার দলভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সোনার তরীর 'আকাশের চাঁদ' নামক

কবিতায় অবাস্তব এক সুখের জন্য সমস্ত জীবনটাকে কবি ব্যর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু 'সুখ' কবিতাটিতে বুঝিলেন "সুখ অতি সহজ সরল।" সোনার তরীতে ইহা ছিল না বলিলেই হয়: চিত্রাতে ইহার সাক্ষাৎ পাইলাম; পরবর্ত্তী কাব্যগুলি এই রসেই আচ্ছন্ন।

নিজ হৃদয়ের কল্পনা-বিলাস হইতে সংসারের তীরে ফিরিবার প্রচণ্ড আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। এই আকুলতা তাঁহার চৈতালি ও ক্ষণিকায় সফল হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত 'সুখ' কবিতায় যে সহজ সরল আনন্দের প্রতি কবির আগ্রহ দেখিয়াছি, 'আবেদন' কবিতাটিতে তাহারই রূপান্তর। যে স্বর্গ হইতে তিনি বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা তাঁহার বিশ্ব-বিহীন অপরের সহিত সমবেদনাহীন কল্পনারই স্বর্গ। এই স্বর্গের আতি-পাতি ঘুরিয়া তিনি দেখিয়াছেন, সেখানে স্বস্তি নাই। তাই তাঁহার অশ্রু-জলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই ভূতলের স্বর্গের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় সাধনা হইয়াছিল পদ্মা তীরের নগণ্য পল্লীগুলিতে।

চিত্রা কাব্যটিতে কবির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার ইতিহাস আছে। নানা রূপ, রূপক ও ছন্দের বিভিন্নতার মধ্যে এই সুরটিই আনাগোনা করিতেছে, সেইজন্য ইহাকে আমি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি না বলিয়া অখণ্ড কাব্য বলিতে ইচ্ছা করি।

চৈতালি।

কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চৈতালি রচিত। এই কাব্যখানিতে আমরা এক নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সোনার তরীতে যাহার আভাস: চিত্রায় যাহার আকাঙ্ক্ষা;

চৈতালিতে তাহার সূচনা : ক্ষণিকাতে তাহার পরিণাম। ইহার পদ্মা বর্ষার নহে, শীতশেষের ; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

শুধু তাহাই ত নহে ; কবি এখন আসল-পদ্মা ত্যাগ করিয়া তাহার শাখা বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চৈতালিতে ছোট নদীর সুর—যাহার কলগর্জ্জন তীরভূমির লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না ; যাহার এপার-ওপারের তরু-পল্লব ছুঁই ছুঁই করে ; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশিদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্ত্তা চলে ;—ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্রবিশেষ। অর্থাৎ ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য বেশি ; লোকালয় এখানে লক্ষ্য—জলাশয় নহে। কবি নিজের অন্তর হইতে বাহির হইয়া এখানে লোকসমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইতেছেন। জ্ঞান ও প্রেম—এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি, কিন্তু এই জ্ঞান-যোগের অভাবে সে প্রেম অসম্পূর্ণ ছিল ; এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, এবার তাহা মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। মেঘদূত যেমন বিশ্বের, তেমনি আবার সামান্য একটি বিরহী যক্ষেরও। ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিভাকে মানস-সুন্দরী, বসুন্ধরা ও উর্ব্বশী লিখিতে দেখিয়াছিলাম ; এখানে তাহাকে দেখিতেছি পল্লীগ্রামের সামান্য লোক—দিদি, পুঁটু, সঙ্গী প্রভৃতি অতি সামান্য চোখ-এড়ানো তুচ্ছতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে। ইহারই নাম প্রতিভার বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনা।

চৈতালিতে কবি যে শুধু লোকালয়ের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছেন তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই—তাহাকে তিনি যথার্থ করিয়া লাভ করিলেন এখানে। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্যের — তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখানদী যেন একখানা লিরিক কবিতা—দুইবার আনাগোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক্।—"পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না—আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষঘেঁসা নদী; তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী।" (ছিন্ন-পত্র)। শুধু তাই নয়, একান্ত আপনভাবে ভালবাসিবার নদীও ইহাই। ফরাসী লেখক জুবেয়ারের একটি বচন আছে যে, ভগবান এত বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও একই কথা। কবি এই শাখানদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সীরূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী, উভয়ের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

সম্পূর্ণতা লাভের জন্য গদ্য ও পদ্য পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। অনেক সময় দেখা যায়—পদ্যে যাহার অভাব, গদ্যে তাহারই প্রকাশ; কখনো বা পদ্যে যাহার আভাস, গদ্যে তাহার ভাষ্য। গদ্য স্বভাবতই পদ্যের বিস্তৃত টীকা; আর গদ্যপদ্য উভয় মিলিয়া রচয়িতার

জীবনের টীকা। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য দুইটিতে কবির যে ইচ্ছাটি দেখিলাম—নিজের অন্তর হইতে বাহিরে আসিবার, এবং বিশ্বের সহিত জ্ঞানের আলোকে পরিচিত হইবার—তাহারই পরিপূর্ণতা আছে ঐ কাব্য দুইটির সমসাময়িক গদ্য নিবন্ধগুলিতে। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটিতে কবির অন্তরলোক হইতে বাহির হইবার যে আকুল ক্রন্দন, তাহা কেবল কাব্যেই পরিসমাপ্ত নহে। কবি মূঢ় মূক মুখে ভাষা দিবার এবং ভগ্ন শুষ্ক বুকে আশার সঙ্গীত বাজাইয়া তুলিবার অনেক পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। দেশকে জানিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার সব অন্ধিসন্ধির খবর লইতে হয়। জ্ঞানের ভিত্তি ইমারতের মত মাটির দিক হইতেই পাকা করিয়া তোলা আবশ্যক। তিনি দেশকে জানিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এই সময়ে দেশের নানাবিধ তথ্যসংগ্রহের দিকে মন দিলেন। ছেলে-ভুলানো ছড়া, কবিসঙ্গীত, গ্রাম্য সাহিত্য—ইহাদের মধ্যে যে দেশের অসংস্কৃত এবং কিম্বদন্তিমূলক একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে, এবং তাহা যে দেশের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়—এ কথা তিনি ভালোরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সাধনা পত্রখানি তখন তাঁহার মুখপত্ররূপে দেশকে নানা দিক দিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নাম দেখিলেই বোঝা যাইবে, কত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে কাজ করিতেছিল। "ইংরাজ ও ভারতবাসী" (১৩০০ সাল), "রাজনীতির দ্বিধা" (১৩০০), "অপমানের প্রতিকার", "সুবিচার" (১৩০১), "সমুদ্র যাত্রা" (১২৯৯), "শকুন্তলা", "মেঘদূত", "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" (১২৯৮), "বিদ্যাসাগর

চরিত” (১৩০২)। এই প্রবন্ধগুলিতে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। একদিকে যেমন বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শ রূপ তাঁহার মনে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কবির পরবর্ত্তী কালের গদ্যেপদ্যে দেখিতে পাইব ভারতের এই আদর্শ রূপটি ক্রমে কি মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং কোন্ কর্ম্মে ও চিন্তায় তাহার পরিণতি হইল। চৈতালিতে কালি-দাসের উপরে যে কবিতাগুলি আছে, তাহার সহিত কালিদাসের গদ্য সমালোচনা কয়টি মিলাইয়া পড়িলে কালিদাস সম্বন্ধে কবির সম্পূর্ণ ধারণাটি জানা যাইবে। উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশ” পুস্তকের তুলনা-মূলক একটা সমালোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

রবীন্দ্রনাথ।

আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে ;
'চলরে অলস কবি,
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি—
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'
চমকি' উঠিনু জাগি ;
ওগো মৃত্যুঅনুরাগী,
উন্মুক্ত ডানায় কোন্ অভিসারে দূরপানে ধাও ?
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে,
ঝড়ের ঝাপট লাগি' হয়েছে যে উদাসী উধাও !
দেখি, চন্দ্র সূর্য্য তারা
মত্ত, নৃত্যদিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী ;
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে,
অনির্ণীত, অনিশ্চিত, অসীমের, অশেষের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে ;
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে,
কূল হতে নিল মোরে সর্ব্বনাশা গতির তটিনী !
তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে, মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে ?
তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ।

বিধিনিষেধ ও মানবপ্রকৃতি।

কোনরকম বিধিবিধান বা ধর্ম্মশাসন মেনে চলা যে মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম নয়, তা' তার কর্ম্ম-প্রকৃতি দেখেই বুঝতে পারা যায়; এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাকে প্রবৃত্ত করলে যে বিকৃত ফল হয়, মানুষের আবহমানকালের ইতিহাসই তার সাক্ষী। মানুষ যে পদে পদে বিধি-নিষেধ ও নীতিনিয়ম লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে এবং অধর্ম্মাচারী হ'য়ে উঠচে, তার কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণপণে চেষ্টা হচ্চে তাকে ধার্ম্মিক ও নীতি-পরায়ণ করে' তুলতে। কথাটা শ্রুতিকটু হলেও যে সত্যি, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতি তুচ্ছ জীবনঘটনা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। সমস্ত নীতিনিয়মের মূলে আছে একটা 'জেনারলিজেশন' এবং বাধ্যতার দাবী; আর মানুষের প্রকৃতিতে রয়েচে একটা উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বেচ্ছাচার-প্রিয়তা। কাজেই নীতিনিয়মের যা' মূলবস্তু, মনুষ্যপ্রকৃতিতে তার অভাব হেতুই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি।

আমাদের রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক বা সামাজিক জীবন থেকেও আমরা এইটে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারচি যে, আমরা মানুষকে দিন দিন যতই মানুষ করে' তোলবার চেষ্টা করচি, সে ততই অমানুষ হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। নিতান্ত দৈহিক প্রয়োজন বা সুখসাধনের জন্য যতটুকু দ্বন্দ্বকলহ আবশ্যক, মানুষের তা' ছাড়া হনন পীড়ন করবার কারণই হয়ত ঘটত না, যদি তার মাথায় নীতিধর্ম্ম, বিধিনিষেধ ও নিত্য

পরিবর্ত্তনশীল আদর্শের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হ'ত। যেদিন তার মাথায় প্রথম ঢুকিয়ে দেওয়া হল 'স্বধর্ম্মেনিধনংশ্রেয়ঃ', সেই দিন হ'তেই সে ধর্ম্মের সমস্ত শ্রেয়ঃকে নিধন করে' 'নিধনং শ্রেয়ঃ' ব্রত গ্রহণ করলে। যেদিন তাকে প্রথম 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হল, বোধ করি সেই দিন হতেই সে সুরু করলে প্রাণপণে অপরকে হিংসা করতে। প্রতিবেশীকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে না পারলেও হয়ত কারণে অকারণে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাকে পীড়ন মানুষ করত না, যদি না তাকে দীর্ঘকাল ধরে' তোতাপাখীর মত পড়ান হ'ত 'Love thy neighbour'। ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম সৃষ্টি করে', নীতিনিয়মের পর নীতিনিয়ম গড়ে' মানুষকে আমরা এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েচি যে, তাকে সেখান থেকে ফেরাতে হলে এমন সব অবতার ও মহাপুরুষদের আসতে হবে যাঁরা এই সব আবার ঢেলে সাজতে পারবেন, এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতির মহাভূত ছাড়িয়ে মানুষকে রক্ষা করতে পারবেন। পুণ্যের ভারে এবং বিধিনিষেধের চাপে মানুষের এমন ত্রাহি-মধুসূদন অবস্থা দাঁড়িয়েচে যে, ধরিত্রী পর্য্যন্ত অধীর হ'য়ে উঠেচেন।

ধর্ম্মানুশীলনের যে পুণ্যলীলা এবং মিলন-পূর্ণিমার যে হোলি খেলা সেদিন আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখেচি, তা'তে প্রাণপণে কেবলি জপেচি—হে যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রচারকগণ! আপনাদের নাম জয়যুক্ত হোক।

কোন স্মরণাতীত যুগে কোন এক সম্প্রদায়বিশেষ পেটের দায়ে দস্যুবৃত্তি ক'রে খেত বলে', তাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তোলবার শুভ-ইচ্ছায় যে মহাপুরুষ এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করেছিলেন, আজ তাঁরই নামে পৃথিবীর বুকে যে অমানুষিক ঘটনাসকল ঘটচে, তা'

দেখলে হয়ত সৃষ্টিকর্ত্তাও আজ চমকে উঠতেন। সুদ্ধ পেটের দায়ে এত হত্যা, এত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন যে তারা নিশ্চয়ই করত না, তা' বনের পশু হিংস্র বাঘভালুককে দেখেও আমরা বুঝতে পারি। কারণ এক ক্ষুধার তাড়নায় ছাড়া প্রাণীহত্যার প্রবৃত্তি সাধারণত তাদের মনে জাগে না, এবং কোনরূপে উদরপূর্ত্তি হয়ে গেলে সে প্রবৃত্তিও আর তাদের থাকে না। কিন্তু এ যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এ যে অতৃপ্ত জিঘাংসা;—এর যে কোনকালে নিবৃত্তি আছে তা'ত মনে হয় না। কারণ পেটের দায়েই হোক আর স্বার্থের তাড়নাতেই হোক, মানুষ অসত্য ও হত্যাশ্রয়ী হলেও তার এক ভরসা থাকে যে, এমন একদিন আসতে পারে যখন তার অন্তরে সত্যধর্ম্মের মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠবে, এবং অজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপরাশি ধুয়ে ফেলবার জন্য তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠবে; কিন্তু এ যে ধর্ম্মাশ্রয়ী-হত্যালীলা! যুগ যুগ ধরে এমনি বেপরোয়া হয়ে মানুষকে মানুষ খুন করে গেলেও, ধর্ম্মসংস্কারের কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত তার হৃদয়ে এতটুকু অনুতাপ কোনদিন আসবে না।

একই দেশের অন্নজলে পরিপুষ্ট হ'য়ে, একই গৃহে বাস করে, একই স্নেহসিক্তনয়নের তলে লালিত হয়েও আজ যে হিন্দুমুসলমান পৈশাচিক উল্লাসে পরস্পরের টুটি কামড়ে ধরচে, অম্লানবদনে পরস্পরের বুকে ছুরি বসাচ্চে—এর কারণও ত, যে যাই বলুক, সেই এক! যেদিন তাদের কপালে ধর্ম্মমতের ছাপ এঁটে তাদেরকে বলে' দেওয়া হয়েচে যে, ঈশ্বর তাদের একরকম করে' গড়বার যতরকম চেষ্টাই করুন না কেন, তারা কোনরূপেই এক নয়,—সেই দিন হ'তেই এ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েচে। এবং যতদিন এই দুই ধর্ম্মের ধ্বজা

সগর্ব্বে উড্ডীন থাকবে, ততদিন যে এ নিষ্ঠুরলীলার অবসান হবে না—এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায়।

এই যে দ্বাবিংশ কোটি হিন্দু আজ এই দুর্দ্দিনে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য চেঁচিয়ে মরচে, হয়ত সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে এতটুকু কষ্ট করতে হত না, যদি সহস্র বিধিনিষেধের নিগড় কানে দিয়ে তাকে সহস্র স্তরে কীলকবদ্ধ করে' রাখা না হ'ত। পাপকে পাপ বলে' সত্যি সত্যি বোধ করে', এবং গুণ ও কর্ম্মের চুলচেরা বিচার করে' হীনকে ঘৃণা করবার মত মানসিক অবস্থা বোধ করি আমাদের লক্ষ জনের মধ্যে একজনেরও হ'ত কিনা সন্দেহ; কিন্তু যেদিন আমরা পাপপুণ্য আর উচ্চনীচ-বিচারকে জন্ম ও বংশগত ক'রে নির্ব্বিচারে মানুষকে জন্মের হীনতা বা উচ্চতার কোটায় আবদ্ধ করেচি, সেই দিনই আমরা পরস্পরকে প্রাণপণে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেচি, এবং আমাদের জাতীয় শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেচি। এখন যতই আমাদের সমাজকে বিধিনিষেধের বাঁধনে শক্ত করে' বাঁধবার চেষ্টা করচি, সে ততই ক্ষেপে উঠচে; ফলে জাতি ও সমাজের বনিয়াদ পর্য্যন্ত নড়তে সুরু করেচে। তাই চারিদিক দেখে শুনে' সম্প্রতি আমরা বুঝতে বাধ্য হয়েচি যে, এ জাতিকে অন্তর্বিপ্লব তথা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সামাজিক বিধিনিষেধের অনেক ভূত এদের ঘাড় থেকে নামাতে হবে—অন্যথা মঙ্গল নেই।

কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, কি ধার্ম্মিক, যে কোন বিষয়েই আমরা বিধিবিধান সৃষ্টি করতে গিয়েচি, কিছুদিন পরেই দেখেচি তার ফল উল্টো হতে আরম্ভ হয়েচে। তার একমাত্র কারণ, নীতিনিয়ম করতে গিয়ে যখনই আমরা কোন 'জেনারলিজেশনে' পৌঁছেচি, তখনই আমরা

মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ, এবং স্থান কাল পাত্রভেদে তার প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিনি; কাজেই সর্ব্বত্রই একটা বিরোধের সৃষ্টি করেচি। কোন্ কালে কি পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষে কোন্ এক সম্প্রদায়বিশেষের জন্য সাময়িক ভাবে হয়ত একটা নিয়ম প্রণয়নের আবশ্যক হয়েছিল, পরবর্ত্তী কালে কালের এবং মানবমনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটারও যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে চিন্তা আমরা করিনে; উপরন্তু সেইটীকেই বিশগুণ জোরে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিই, ফলে তারা জগৎজুড়ে প্রতিনিয়ত অঘটন ঘটাতে থাকে। কাজেই এ কথা নিশ্চয় করে' বলা যায় যে, যতদিন মানুষের প্রকৃতি এবং তার পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে তাদের যথাযোগ্য মান্য করে আমরা নীতি নিয়ম প্রণয়ন বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা বোধ না করি, ততদিন মানুষের এ বিদ্রোহী ভাব ঘুচবে না, এবং মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষেরও অবসান হবে না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ফুলের বিয়ে।

ফুলের কেশরের রেণু যদি সেই জাতের ফুলের গর্ভের মুখে পড়ে, তাহলেই ফুলের বিয়ে হয়। কেশর আর গর্ভ যদি একই জাতের ফুলের না হয়—অন্তত কাছাকাছি জাতেরও না হয়, তাহলে একটার রেণু অন্যটার মুখে পড়লেও বিয়ে হবে না—কেননা সে রেণু গর্ভের ভিতর গিয়ে গর্ভদানার সঙ্গে মিশবে না। একটা দিশী আঁবের ফুলের সঙ্গে একটা দিশি আঁবের ফুলের বিয়ে ত হয়ই, ন্যাংড়া আঁবের ফুলেরও বিয়ে হয়—এমন কি কখনো কখনো আমড়াফুলেরও বিয়ে হতে পারে, কেননা আঁব্ আর আমড়া একজাতের না হলেও অনেকটা কাছাকাছি জাতের; কিন্তু আঁবের ফুলের সঙ্গে কাঁটালের ফুলের বিয়ে কোনকালেই হয় না। তোমরা হয়ত এমন টোকো আঁঠিসার ছোট্ট ছোট্ট আঁব খেয়েছ, যার গন্ধও অনেকটা আমড়ার মত; কিন্তু এমন আঁব নিশ্চয়ই খাওনি, যার স্বাদ কি গন্ধ কাঁঠালের মত।

ফুলের বিয়ে হয়ে গেলেই তার পাপড়ী কেশর ঝরে পড়ে, কিন্তু গর্ভটী গুটী বেঁধে ফল হয়—আর দিন দিন বাড়তে থাকে।* ফলের

---

* পেয়ারা, কমলা লেবু, পেঁপে, কলা এইরকম গোটা কুচ্চার গাছ আছে, যাদের কখনো কখনো শুধু মেয়ে-ফুল থেকেই ফল হয়; পুরুষ-ফুলের সঙ্গে বিয়ে না হলেও চলে। কিন্তু সে সব ফল হয় অনেকটা হাঁসের বাওয়া ডিমের মত। তাদের মধ্যে বীচিও হয় কম—সে সব বীচি থেকে গাছও হয় না।

ভিতরে যে বীচি থাকে—সেই বীচিই হচ্ছে গাছের বাচ্ছা। সেই বীচিই গাছের বংশ রাখে।

তাহলেই বুঝতে পারচ ফুলের বিয়ে হওয়া কত দরকার। কিন্তু ফুলেরা ত নিজেরা নিজেরা বিয়ে ঘটাতে পারে না, তাই তারা ঘটককে দিয়ে সে কাজটা সেরে নেয়। ফুলেদের ঘটক হচ্চে মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, পাখী, বাতাস, জল—এই সব। তারাই এক ফুলের রেণু নিয়ে আর এক ফুলের গর্ভের মধ্যে ছেড়ে দেয়। ঘটকদের মধ্যে মৌমাছি আর প্রজাপতিই হচ্চে সকলের সেরা—কেননা তারা ধাঁ ধাঁ করে এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যায়। তাদের গায়ে যে আঁশ আছে আর পায়ে যে বুরুষের কুচির মত রোঁয়া আছে, তাতে চট্ করে রেণু লেগে যায়। তা ছাড়া তারা রেণু নষ্টও করে কম। তাদের যে ফুল কাজে লাগাতে পারে, তারা অন্য ঘটক চায় না।

ফুলেদের মধ্যে নিজের বিয়ে নিজে ঘটাতে পারে এক যমক ফুল—কেননা তার কেশর গর্ভ দুইই আছে; নিজের কেশরের রেণু নিজের গর্ভের মুখে ফেল্‌লেই হল। তবু সে ঘটক দিয়ে ঘটাতে চায়, কেননা ওরকম ঘরোয়া বিয়ে সে পছন্দ করে না। ঘরোয়া বিয়ের দোষ এই যে, তা থেকে যে ফল হয়, তাতে হয় বীচি থাকে না, নাহয় কম বাচি থাকে; আর থাক্‌লেও সে বীচি তেমন জোরালো হয় না—কাজেই তা থেকে ভাল গাছ হয় না। যদিই বা ভাল গাছ হলো, তাহলেও সে গাছের বীচি থেকে আর ভাল গাছ হবে না। কিন্তু এক ফুলের সঙ্গে যদি আর এক ফুলের বিয়ে হয়, তা সে ফুল দুটো একই গাছের হোক্ কি আলাদা গাছেরই হোক্- তাহলে সে

বিয়ের ফল ভাল হবেই। এরকম বিয়ে এক ঘটকেরাই ঘটাতে পারে; তাই যমক ফুলেরাও হাপিত্যেশ করে বসে থাকে— কখন ঘটকরা এসে পায়ের ধূলো দেবে।

কিন্তু ঘটকরা কি জন্য ফুলের কাছে আসবে, কি বক্‌সিসের লোভে মেহনৎ করে বিয়ে ঘটাবে?—ঘটকদের বক্‌সিস হচ্চে মধু। ঘটকদের খাইয়ে খুসী করবার জন্যই ফুল তার পাপড়ীর তলায় বোঁটার কাছবরাবর একটী ছোট্ট থলিতে মধু তৈরী করে রাখে। যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুলের সেই ঘটকের কাছেই মধু'র ঘরের চাবিটি আছে। সে চাবি আর কিছুই নয়, -হয় জিভ, নাহয় শুঁড়, নাহয় ঠোঁট। তাই দিয়েই সে মধু'র ঘরে ঢুকে মধু লুটে খায়।

ঘটকেরা যে শুধু মধুই খায় তা নয়, রেণুও খায়। কল্‌কে, বক, তরুলতার মত যে সব ফুলে মধু বেশী, তারা রেণু বেশী করে রাখেনা; কিন্তু গোলাপ, পোস্ত, শিয়ালকাঁটার মত যে সব ফুলের মোটেই মধু নেই, তারা রেণুর বরাদ্দটা বেশী করে রাখে। যে সব ফুলের মধু নেই, আছে শুধু রেণু, সে রেণুটুকুও যদি ঝরে মাটিতে পড়ে, তাহলে ঘটকরা আসবে কিসের লোভে? তাই তারা পাপড়ীগুলোকে এমন ভাবে সাজায়, যাতে ফুলের মাঝখানটা বাটীর খোলের মত হয়। রেণু যা ঝরে পড়ে, তা ঐ খোলের মধ্যেই মজুত থাকে।

পাখীরা বড় মধু'র ভক্ত নয়, তারা রেণু পেলেই খুসী। তাই পাখীতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের রেণু হয় খুব বেশী,—যেমন শিমূল, পালতে মাদার, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া। আবার হাওয়াতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, যেমন ঘাস, বাঁশ, সরল, দেওদার, তুঁত, পিটুলি, ভ্যারেণ্ডা—তাদের রেণু তৈরী করতে হয় আরো বেশী; কেননা

হাওয়ায় যে রেণু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে যায়—হয় মাটিতে পড়ে', নাহয় পাতায় বেধে। এ সব ফুলের রেণু হয় শুক্‌নো হাল্কা ধূলোর মত, যাতে হু হু করে উড়ে যেতে পারে—আর গর্ভের মুখটা হয় পালক কি চামরের মত, যাতে উড়ন্ত রেণুগুলোকে চট্ করে ধরে নিতে পারে। জাফরাণ ফুল আর পাহাড়ে জায়গায় পাইন, ফার, সাইপ্রেস বলে সে সব বিলাতী ঝাউ জাতের গাছ হয়, তাদের ফুল যখন ফুটতে আরম্ভ করে, তখন এত রেণু বাতাসে ওড়ে যে, গাছতলা দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে মুখে দেখতে পাওয়া যায় না। চারদিক হল্‌দে রঙে ছেয়ে যায়—আর গাছের তলায় একহাঁটু করে হল্‌দে রেণু জড় হয়। সে সময় যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে গাছের তলা দিয়ে সোণালি রঙের ঝরণা বয়ে যায়। সেই জল পাহাড়ের গা বেয়ে যখন নীচে নাবে, তখন লোকে বলে পাহাড়ের উপর গন্ধক বৃষ্টি হয়েচে।

মৌমাছি, প্রজাপতির মত মধুখোর ঘটকরা যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তাদের বেশীর ভাগেরই রেণু কম—কেননা ও সব ঘটকরা, যা দু'চারটে রেণু গায়ে লাগে, তা ঠিক অন্য ফুলের গর্ভে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। এই জন্য এ সব ফুলের রেণুও চট্‌চটে, যাতে চট্ করে ঘটকদের গায়ে লেগে যায়। আবার গর্ভমুখও হয় চট্‌চটে, যাতে ঘটকদের গায়ের রেণু চট্ করে তুলে নিতে পারে।

কিন্তু মধু আর রেণু ভাঁড়ারে থাকলেই ত হবে না, ঘটকদের টেনে আনা চাই। কি দিয়ে ফুলেরা ঘটকদের টেনে আনে? রং আর গন্ধ* দিয়ে। যে সব ফুল দিনে ফোটে, তারা প্রায়ই হয়

* ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসে?—ফুলের পাপড়ীর মধ্যে একরকম

রংচঙে—কিন্তু যে সব ফুল রাত্রে ফোটে,—যেমন যুঁই, মল্লিকা, মালতী—তারা প্রায়ই হয় ধপ্‌ধপে সাদা, কেননা রাত্রে সাদা রং ছাড়া অন্য রং চোখেই ঠেকেনা। আর সে সব ফুল গন্ধেও হয় ভুরভুরে। চোখে না দেখতে পেলেও গন্ধ ধরেই পোকামাছিরা ছুটে আসে—কেননা চোখের চেয়ে পোকামাছিদের নাকটাই বেশী ধারালো।

আগেই বলেছি সব ঘটক দিয়ে সব ফুলের বিয়ে হয় না। তার মানে, ফুল কত বড়, তার কি রকম গড়ন, কত ভিতরে তার মধুর থলি—সেই হিসাবে এক এক ফুল জুতসই। কুঁদফুল কি কামিনী ফুলের মত ছোট্ট নরম ফুলে ভোম্‌রা, ভীমরুল, গুব্‌রে পোকার মধু খাবার সুবিধা হয় না, কেননা তারা সে ফুলের মধ্যে ঢুকতেই পারে না, উপরে বসতে গেলেও পাপড়ীগুলো ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ে। মাখনসীম, ছোলা, পলাশ, তুলসী, পুদিনার মত যে সব ফুলে মধু'র থলি একেবারে ভিতরে লুকানো, তাতে মাছি, বোল্‌তা, ডাঁশের মত ছোট জিভওয়ালা ঘটকরা পাত্তাই পায় না; আবার ধনে, মৌরি, রাংচিতে, ভ্যারেণ্ডার মত যে সব ফুলে মধু'র থলি উপরে বসানো,

গন্ধতেল পোরা আছে। একটা ফুলের পাপড়ীকে যদি আলোর দিকে রেখে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখ, তাহলে তার মধ্যে অনেকগুলো কালো কালো দানা দেখ্‌তে পাবে। ঐ কালো কালো দানাই গন্ধতেলের দানা। পাপড়ীর গায়ে কতকগুলো খুব সরু সরু ছেঁদা আছে—ঐ ছেঁদার ভিতর দিয়ে গন্ধতেলের গন্ধ বেরিয়ে আসে।

ঘাঁটকোল, কুচলে, শুয়ে বাবলা, র‍্যাফ্লেসিয়া ফুল হতে সুগন্ধের বদলে দুর্গন্ধ বেরোয়, তার মানে তাদের গন্ধতেলটাই দুর্গন্ধ। তারা যে সবুজ মাছিদের টেনে আনে, তাদের নাকে বোধহয় বদগন্ধই মিষ্টগন্ধ বলে লাগে!

তাতে মৌমাছি, প্রজাপতির মত লম্বা জিভওয়ালা ঘটকরা বেকায়দায় পড়ে। আবার মটর, ভুঁই, তুলসী, বকের মত যে সব ফুলের তলার দিক্কার একটা কি দুটো পাপড়ী লক্‌লকে জিভের মত বেরিয়ে থাকে; কি পোস্তফুলের মত যে সব ফুলের গর্ভমুখটা চ্যাপ্টা; কি পদ্মফুলের মত যে সব ফুলের চাকটাই আসনের মত চওড়া; কি সূর্য্যমুখী, কদমের মত যে সব ফুলের সমস্ত গা-টাই ঢালা বিছানার মত পাতা;—সে সব ফুল সব উড়ো পোকাদেরই পছন্দ—বসবার সুবিধার জন্য। কলকে, ধুতরো, ঈশেরমূলের মত সে সব ফুলের খোলটা বাঁশীর মত লম্বা তাতে কুঁড়ে হামাটানা পোকা আর রাতকানা গুঁড়ো পোকাদের আড্ডা; কেননা বৃষ্টি এলে, কি রাত হয়ে গেলে, তারা ফুলের খোলাকেই ঘরবাড়ী করে নেয়। বাকস ফুলের মত যে সব ফুলে বাঁক আছে, সে সব ফুল আর যে পছন্দ করে করুক—ভ্রমর মৌমাছিরা করে না।

যে-কোন ঘটক যে-কোন ফুলের বিয়ে দিতে পারবে—এটা ভাবাই মস্ত ভুল। বসন্তকালে একটা বাগানে যদি অনেক রকমের ফুল ফোটে, তাহলে সেইখানে গিয়ে একটু নজর করে দাঁড়িয়ে দেখো—দেখবে যে ফুলে প্রজাপতি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত মাছি ঢুকচেনা; যে ফুলে মাছি ঢুকচে, সে ফুলে হয়ত পিঁপড়ে ঢুকচেনা। বিলাত থেকে বীচি নিয়ে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় একবার ক্লোভার নামে একরকম গাছের চাষ করা হয়। ফসলে ফুল হল, কিন্তু ফল হল না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বিলাতে একরকম কালো ভোমরা আছে, যা অষ্ট্রেলিয়াতে নেই—আর ঐ কালো ভোমরা ছাড়া অন্য কোন ঘটকই ক্লোভার ফুলের বিয়ে দিতে পারে না। তখন বিলাত থেকে

গোটাকয়েক কালো ভোমরা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় ছেড়ে দেওয়া হল—ব্যস্, তারপর থেকেই ক্লোভার গাছের ফল হতে লাগ্ল। আমেরিকার কোন কোন দেশে বড্ড ঠাণ্ডা বলে কাঁচের ঘরের ভিতরে শঁসার চাষ করা হয়। আগে আগে তার ফুল হত, কিন্তু ফল হত না। কেন ফল হয় না তাই খুঁজতে খুঁজতে পণ্ডিতরা বের করলেন যে, কাঁচের ঘরের ভিতর মৌমাছি ঢুকতে পারে না বলেই ফুলের বিয়েও হয় না, ফলও হয় না। তখন ফুল ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচের ঘরের মধ্যে মৌমাছি ছেড়ে দেওয়া হল, শঁসাও ফলতে লাগ্ল।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মন জুগিয়ে চলে। গুব্‌রে পোকা আর ভুঁড়ো প্রজাপতি* সন্ধ্যার সময় বেরোয়, কাজেই তারা যে ফুলের বিয়ে দেয়,—যেমন বেল, শিউলী, রজনীগন্ধা,—তারা সন্ধ্যাবেলাতেই ফোটে। উইচিংড়ে, ফড়িং, ঝিঁঝিঁপোকা অনেক রাত না হলে বেরোয় না, তাই লবঙ্গলতা, মালতীর মত যে সব ফুলের ঐ সব ঘটক না হলে চলে না, তারা অনেক রাতেই ফোটে। মৌমাছি, প্রজাপতি, ভোম্‌রা ভোরবেলাতেই বেড়াতে বেরোয়—তাই তাদের ঘটকালির ফুল—পদ্ম, জবা, কল্‌কে—সকালেই ফোটে।

যে সব ফুলের গন্ধ আছে, তারা নিজের নিজের ঘটকের আসবার সময় বুঝে গন্ধ ছড়ায়। পদ্ম, গোলাপ, মটর ফুলের মত যাদের ঘটক হচ্চে প্রজাপতি আর মৌমাছি—তারা সূর্য্য ওঠা থেকে আরম্ভ করে সূর্য্য ডোবা পর্য্যন্ত গন্ধ ছড়ায়। সূর্য্য ডুবে গেলে ঘটকেরাও বাড়ী

* ভুঁড়ো প্রজাপতির ইংরাজী নাম 'মথ্'। এ প্রজাপতির পেটটা অন্য প্রজাপতির চেয়ে মোটা, তা ছাড়া এর ডানার বাহার অন্য প্রজাপতির চেয়ে কম।

ফেরে, তাদেরও গন্ধ মরে আসে—তখন আর কার জন্য গন্ধ খরচ করবে? হাস্নাহানা, চীনে লতা আর ধূতরো ফুলের ঘটক সন্ধ্যার সময় বেরোয়; তাই দিনের বেলায় তাদের গন্ধ একরকম থাকেই না—সন্ধ্যা হলেই গন্ধ উথ্‌লে ওঠে। যুঁই, বেল, রজনীগন্ধারও ঠিক তাই।

যে ফুলের যে ঘটক, সে ফুল সেই ঘটকের মনের মত রং পরে সেজেগুজে বসে থাকে। ছোট ছোট পোকামাছিরা যে ফুলের ঘটক, সে ফুলের রং সাদা কি হলদে, কিম্বা সাদার উপর অন্য রঙের ছিট। প্রজাপতিরা সব চেয়ে পছন্দ করে লাল রং, যদি সে লাল রং টক্‌টকে না হয়ে একটু ম্যাড়মেড়ে হয়; আর পছন্দ করে নিজের ডানার মত পাঁচরঙা রং। তাই প্রজাপতিরা যে সব ফুলের ঘটক, তারা হয় গোলাপ জবার মত লাল, নাহয় ঋতুফুলের মত পাঁচরঙা। ভুঁড়ো প্রজাপতি সাদা রংটাই বেশী পছন্দ করে, তবে খুব ফিকে হলে কোন রঙেই তার আপত্তি নেই। বোল্‌তা, ভীমরুল কমলালেবুর মত রং পছন্দ করে। মৌমাছিরা অপরাজিতার মত ঘোর নীল রং সব চেয়ে পছন্দ করে, তারপরই ঝুম্‌কো ফুলের মত বেগুণী রং, তারপর ফিকে নীল, তারপর মেটে লাল, তারপর সাদা, তারপর ফিকে হল্‌দে, তারপর সবুজে। জ্বল্‌জ্বলে হল্‌দে আর টক্‌টকে লাল তাদের দুচক্ষের বিষ। সবুজ মাছিরা কাঁচা মাংসের মত লালচে রং পছন্দ করে। তাই ঘাঁটকোল আর র‍্যাফ্লেসিয়া ফুলের রং কাঁচা মাংসের মত। হামাটানা পোকারা নিজের নিজের গায়ের রং পছন্দ করে, তাই কুমড়ো ফুলের মধ্যে হল্‌দে হামাটানা পোকা, আর লাউ ফুলের মধ্যে সাদাটে সবজে রঙের হামা-টানা পোকা দেখা যায়।

ঘটকদের গায়ে রেণু লাগিয়ে দেবার জন্য, আর ঘটকদের গায়ের রেণু গর্ভমুখে ল গিয়ে নেবার জন্য ফুলেরা যে কত ফন্দী বের করেছে, তা দেখ্‌লে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। ঘটকরা যে ফাঁকি দিয়ে মধু আর রেণু খেয়ে যাবেন, তার জো-টি নেই।

পোকামাছিতে যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা রেণুগুলোকে করেচে চট্‌চটে, যাতে সেগুলো চট্ করে পোকামাছিদের গায়ে লেগে যায়, এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে যাবার সময় গা থেকে না ঝরে পড়ে; এ ছাড়া তারা গর্ভমুখকেও চট্‌চটে করেচে, যাতে পোকা-মাছিদের গায়ের রেণু তুলে নিতে পারে।

কি ফুলেই মধুর থলি এমনভাবে বসানো থাকে যে, তা থেকে মধু খেতে গেলে রেণু-টোপ আর গর্ভমুখের সঙ্গে ঘটকদের গায়ের ঘসা লাগবেই।

ভুঁই তুলসী, বাকস, মটরের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকরা গিয়ে ফুলের উপর বসবামাত্রই সেই চাপে কেশরগুলো বেঁকে তাদের পিঠের উপর লাগে—আর পিঠে ডানায় রেণু জড়িয়ে যায়। অনেক ফুলে আবার ঘটকরা বসবামাত্রই কেশর গর্ভ দুইই ঠেলে ওঠে—গর্ভটা লাগে ঘটকের পেটে আর কেশরগুলো লাগে পিঠে; তাতে এই হয় যে, ঘটকের পেটে অন্য ফুলের যে রেণু লেগেছিল তা জড়িয়ে যায় এই সব ফুলের গর্ভমুখে, আর পিঠে লেগে যায় এই সব ফুলের রেণু।

ট্যাড়স, লুপিনের মত কতকগুলো ফুলে ঘটকের গায়ে রেণু লাগবার চমৎকার কায়দা দেখতে পাওয়া যায়। রেণুগুলো কেশর থেকে ঝরে তলার পাপড়ীতে জমা হয়। ঘটক পাপড়ীর উপর

বসলেই সেই চাপে কেশরের ডাঁটি গিয়ে ব্যাটের মত রেণুর গায়ে ঘা মারে, রেণুগুলো ছিটুকে ঘটকের গায়ে লাগে।

ঈশেরমূল ফুলের সরু চোঙার ভিতর গুঁড়ো পোকারা দিব্যি ফূর্ত্তির সঙ্গে মধু খেতে ঢুকে পড়ে, বেচারীরা তখন স্বপ্নেও জানে না যে তাদের দিয়ে ফুল ঘটকালি করিয়ে নেবে—মধু খাবার মজা সুদে আসলে আদায় করে ছাড়বে। ফুলের চোঙের ভিতরটা সরু সরু শোঁয়ায় ভরা, শোঁয়াগুলোর মুখ সব নীচের দিকে। ঢোকবার সময় খুব সহজেই ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনই মুস্কিল—শোঁয়ার মুখ গুলোতে পথ আটুকে রেখেচে। পোকা বেচারারা সেই ফাঁদের মধ্যে পড়ে যতই বেরবার চেষ্টা করে, ততই কেশরের রেণু মেখে ভূত হয়—ঠিক যেন হোলির দিনে কাউকে জোর করে আবীর মাখিয়ে দেওয়া হচ্চে। এইরকম অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর শোঁয়াগুলো আপনা-আপনি ঝরে পড়ে—তখন পোকারা বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ে; কিন্তু একটু পরেই যখন আবার ভুলে অন্য ঈশেরমূল ফুলে ঢোকে, তখন তাদের গায়ে-জড়ানো রেণু সেই ফুলের গর্ভমুখে লেগে যায়।

এক একটা ফুল আছে, যারা আর এক ফন্দীতে ঘটকদের গায়ে রেণু মাখিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে সাঁড়াসীর মত কল আছে। মৌমাছি, প্রজাপতি তাদের উপর বসলেই তারা সাঁড়াসী দিয়ে পা চিমটে ধরে—এমন শক্ত করে ধরে যে, অনেকক্ষণ ধরে না টানাটানি করলে কিছুতেই খোলেনা—সেই ধস্তাধস্তির সময় ঘটকদের গায়ে রেণু লেগে যায়।

কচু ফুলের বিয়ে দিতে কোন ঘটকই বড় একটা যায় না। একে ত গন্ধ খারাপ, তাতে মধু নেই বল্লেই হয়। তা ছাড়া এ ফুলের

পাপড়ীও নেই যে, রঙের চটকে পাখীরাও এসে ঘটকালি করবে। এ ফুলের মাত্র একটি পেন্সিলের মত ডাঁটি, যার উপরদিকে কতকগুলো কেশর আর নীচের দিকে কতকগুলো গর্ভ বসানো আছে। ঠিক যেন বেয়ে-ওঠা ঘটকদের জন্যই তৈরী—কিন্তু তারা আসবে কি লোভে? হাওয়াতে এ ফুলের বিয়ে দিতে পারে না, কেন না যদিও রেণু খুব বেশী হয়, তবু তা উড়ে যেতে পারে না; যে সবুজ রঙের ঠোঙার মত ফুল পাতা-ডাঁটিটাকে ঘিরে থাকে, তারই ভিতরে পড়ে। তার ঘরোয়া বিয়ে ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু তাই বা ঘটায় কে?—ঘটায় গেঁড়ি আর গুগ্‌লি। কি করে ঘটায় বল্‌চি। বৃষ্টির দিনে মাথা বাঁচাবার জন্য তারা হয় ত গুটীগুটী করে ফুলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে গিয়েই দেখে দিব্যি মখ্‌মলের মত নরম বিছানা; তখন তারা সরাসর নীচে নেমে গিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে ঘুমোয়, আর রোদ ফুট্‌লে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। ফুলের ভিতরকার ডাঁটি ধরে ওঠা-নাবা করবার সময় ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

ডুমুর ফুল আর কাঁটাল ফুল ভারি মজা করে তাদের বিয়ে ঘটায়। তোমরা হয় ত জান ডুমুরের ফুল হয় না—যে ডুমুর ফুল দেখে সে রাজা হয়ে যায়; তাহলে তোমরা সকলেই রাজা হতে পারবে। আসলে ডুমুরের ফুল খুব ছোট্ট ছোট্ট হয় বলে তাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অনুবীণ কি আতসী কাঁচ দিয়ে দেখতে হয়। ডুমুর ফুলের বোঁটার মাথা, যাকে চাক বলে, সেটা দেখতে ঠিক তুবড়ীর খোলের মত। তারই মধ্যে একরাশ কুচি কুচি ফুল গাদা থাকে। একে ত তাদের ফুল খালি চোখে দেখা যায় না, তাতে না আছে সে সব ফুলে গন্ধ, না আছে মধু; কাজেই তারা ঘটক ধরবার জন্য অমন

ডুবড়ীর খোলের মত চাক করেচে। পিঁপড়ে কি ছোট ছোট বোল্‌তারা খোলের ছেঁদা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় ডিম পাড়তে—কেন না বেশ কুঠ্‌রীর মত নিরিবিলি জায়গা। ঢোকবার সময় তারা অন্য ফুলের রেণু মেখে আসে; তাইতেই এ ফুলের বিয়ে হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের ডিমগুলো যখন পিঁপড়ে কি বোল্‌তা হয়ে ফুটে বেরোয়, তখন তারা এই ফুলের রেণু মেখে বেরোয়; তারপর যখন অন্য ফুলে গিয়ে ঢোকে, তখন সে ফুলের বিয়ে হয়ে যায়।

যে ভাবে ডুমুরের ফুলের বিয়ে হয়, কাঁটাল ফুলের বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়। সেই জন্যে মাটির নীচেও কাঁঠাল ফলতে দেখা যায়—কেন না পিঁপড়ে, বোল্‌তা মাটি ফুটো করে মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে।

জলের ফুল জলকে দিয়েই ঘটকালি করিয়ে নেয়। জলের মধ্যে একরকম গাছ হয়, যার কোন ফুলটা হয় মেয়ে, কোনটা পুরুষ। ফুলগুলো জলের মধ্যে ডুবে থাকে, কিন্তু এমনি মজা যে পুরুষ ফুলটার কেশর যেই পেকে পুরুষ্ট হয়ে ওঠে, অম্‌নি তা বোঁটা থেকে আলাদা হয়ে কাগজের নৌকার মত ভেসে ওঠে, আর কেশরগুলো দাঁড়ের মত চারপাশে ঝুলতে থাকে। মেয়ে ফুলটার গর্ভ যেই পুরুষ্ট হয়, সেও অম্‌নি ভেসে ওঠে, কিন্তু বোঁটা থেকে খসে যায় না। পুরুষ ফুলটা স্রোতে ভাসতে ভাসতে মেয়ে ফুলটার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, আর অমনি তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এ ফুলের গাছ তোমরা বোধহয় দেখে থাক্‌বে। এরই নাম পাটাসেওলা বা গঞ্জ।

তোমরা দেখেছ কোন কোন গাছের একটা বোঁটায় একটাই ফুল হয়,—যেমন গোলাপ, যূঁই, চাঁপা—আবার কোন কোন গাছের একটা

বোঁটায় অনেকগুলো করে ফুল হয়,—যেমন আঁব, নারকোল, সোঁদাল, রজনীগন্ধা, সূর্য্যমুখী, মোরগফুল, ফুলকপি। একটা বোঁটায় একটা ফুল হলে তাকে বলে একানে ফুল, আর অনেকগুলো ফুল হলে তাকে বলে ঝাড়ফুল। যে সব গাছের ঝাড়ফুল্ হয়, তারা একানে ফুলের বদলে ঝাড় ফুল তৈরী করে কেন জান? আঁবের বাসন্তী রঙের ছড়া—যাকে বোল্ বলে,—সে হচ্চে ঝাড়ফুল। ঝাড়ফুলটা দেখতে খুবই বড়, কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষে যখন তার এক একটা কুচো ফুল তলায় ঝরে পড়ে, তখন দেখো তারা কত ছোট। সব ঝাড়ফুলেরই কুচো ফুলগুলো এইরকম ছোট। এক বোঁটায় একটা ছোট ফুল থাকলে তা পাছে পোকামাছিদের নজর এড়িয়ে যায়, তাই তারা এক বোঁটায় এক গাদা ফুল জড় করে রাখে।

রং আর গন্ধ দিয়ে ফুল যে কেবল তার মনের মত ঘটককেই টেনে আনে তা নয়, বাজে ঘটকদেরও টেনে আনে। তারা মধু খাবার রাক্ষস, অথচ ঘটকালি করবার মুরদ তাদের এক কাণাকড়িও নেই। তাদের ভাগিয়ে দেবার জন্য গাছ কত ফিকিরই না বের করেচে। মৌমাছি প্রজাপতি কি হমিং বার্ড * যে সব ফুলের বিয়ে দেয়, তারা অন্য ঘটক মোটেই পছন্দ করে না—কেন না তাদের রেণু

* হমিং বার্ড একরকম আমেরিকার পাখী। এত ছোট পাখী আর পৃথিবীতে নেই। এরা দেখতে বোল্‌তার চেয়ে একটু বড়—আমাদের দেশের দুর্গাটুনটুনির অর্দ্ধেক। এদের রঙীন পাখা আর লম্বা লম্বা ঠোঁট। এরা মৌমাছি, ভোম্‌রার মত ফুলের মধু চুষে খায়। এরা যখন ফুলের সামনে ওড়ে, তখন এত জোরে পাখা নাড়ে যে, ভোম্‌রা ওড়বার মত গুন্‌গুন্ শব্দ হয়। এই জন্যই এদের নাম হমিং বার্ড, কিনা গুন্‌গুনে পাখী।

কম, কিন্তু তাদের ঘটকরা তা ঠিক অন্য ফুলে পৌঁছে দেয়; এক দানা রেণুও পথে পড়ে নষ্ট হয় না। তা ছাড়া তারা এত চটপট্ এক ফুল থেকে আর্ এক ফুলে উড়ে যায় যে, বিয়ে হতে মোটেই দেরী হয় না। পিঁপড়ে, গেঁড়ি, আর হামাটানা পোকারা মধুর লোভে কাতারে কাতারে গাছ বেয়ে ওঠে, কিন্তু তারা কুঁড়ে ঘটক—আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে উঠবে, আস্তে আস্তে গাছ বেয়ে নামবে, তারপর তেম্‌নি আস্তে আস্তে অন্য গাছে গিয়ে উঠ্‌বে। কাজেই যতক্ষণে তারা একবার বিয়ে দেবে, ততক্ষণ মৌমাছি প্রজাপতির হাতে পঞ্চাশবার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ কুঁড়ে ঘটকদের এমন তেলচুক্‌চুকে পিছল গা যে, সমস্ত দিন ফুলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও বেশী রেণু গায়ে লাগবে না। আর যদি তারা রেণু মেখে ভূত হয়ে যায়, তবু অন্য ফুলে যেতে যেতে পথেই সমস্ত রেণু গা থেকে ঝরে পড়বে—বিয়েও হবে না, এক গাদা রেণুও নষ্ট হবে। এই সব ঘটকরা যদি মধু খেয়ে যায়, তাহলে মৌমাছী প্রজাপতির মত কাজের ঘটকরা কিসের লোভে আসবে?—তাই তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য গাছেরা নানান্ ফিকির বের করেচে।

তুলসী গাছের গুঁড়ি শোঁয়ায় ভরা, হামাটানা পোকারা উঠ্‌তে গেলেই গায়ে শোঁয়া ফুটে যায়। শিয়ালকাঁটার গুঁড়ি থেকে লম্বা লম্বা কাঁটা বেরিয়েচে—যেই ফুলখেকো গেঁড়িরা উঠতে যায়, অম্‌নি নরম মুখে কাঁটার খোঁচা লাগে। বাঁশের গুঁড়ি কাঁচের মত তেলা; অনেক হামাটানা পোকা উঠতে যায়, আর হড়কে পড়ে যায়। তামাকের গুঁড়ি এমন চট্‌চটে যে, ছোট ছোট উড়ো পোকারা আঠায় জড়িয়ে মরে যায়। অনেক আমগাছের গুঁড়িতে কাঠ পিঁপড়েরা

পালে পালে পাহারা দেয়—অন্য পোকা, পিঁপড়ের সাধ্য কি যে উপরে ওঠে। কোন কোন গাছ আবার তার গুঁড়ির এক একটা গাঁটের কাছে গুঁড়িটাকে ঘিরে পাতার বাটি তৈরী করে রেখেছে। সেই বাটীতে শিশিরবৃষ্টির জল জমে থাকে। হামাটানা পোকারা সেই পর্য্যন্ত উঠে ফিরে যায়। অনেক পিঁপড়ে আছে যারা এম্‌নি নাছোড়-বান্দা যে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু মধু না খেয়ে ছাড়বে না। তাদের তাড়িয়ে দিতে না পেরে কোন কোন গাছ ভুলিয়ে রাখার ফিকির করেচে। তারা যে মধু খাবে আর কুটকুট করে ফুলের নরম পাপড়ী কাটবে, তার জো নেই। ফি পাতার গোড়া দিয়ে একরকম মিষ্টি রস বেরোয়, যা ভেঁয়ে পিঁপড়েরা মধু মনে করে, তাতেই মজে থাকে, আর কষ্ট করে উপরে ওঠে না। কিন্তু সে নকল মধু। ওদিকে আসল মধু যে মনের মত পাখা-ওয়ালা ঘটকরা লুটে খাচ্চে, তার খোঁজও এরা পায় না।

ঘরোয়া বিয়ে আটকাবার জন্যও গাছেরা কম ফন্দী বের করে নি। বেশীর ভাগ যমক ফুলের গর্ভ আর কেশর দুই-ই এক সঙ্গে পাকে না। শিমুল, ঢ্যাঁড়স, জবা, সূর্য্যমুখীর কেশর পাকে আগে; তারপর কেশরের রেণু সব ঝরে গেলে গর্ভ পাকে। চাঁপা, রাংচিতে ঈশেরমূলের গর্ভ পাকে আগে, তারপর গর্ভ গুটি বাঁধলে কেশর পাকে। মস্‌নে ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই একসঙ্গে পাকে, কিন্তু তার গর্ভটী কেশরের চেয়ে উঁচুতে বসানো, কাজেই গর্ভমুখে রেণু পড়তে পারে না। ঘেঁটু ফুলের কেশর গর্ভ দুই-ই এক সময়ে পাকে, আর দুই-ই মাথায় সমান। কিন্তু তার মজা এই যে, টাট্‌কা ফোটা ফুলে কেশর-গুলো লম্বা হয়ে বেরিয়ে থাকে, আর গর্ভনলীটা উল্টো দিকে বেঁকে

থাকে। যেই কেশরের রেণু ফুরিয়ে যায়, অম্‌নি কেশরগুলো যায় গুটিয়ে, আর গর্ভনলীটা ওঠে খাড়া হয়ে। টাট্‌কা-ফোটা ঘেঁটুফুলের সাম্‌নে ভুঁড়ো প্রজাপতি যখন মধু খাবার জন্য উড়তে থাকে, তখন তার ডানায় কেশরের রেণু লেগে যায়—তারপর যখন সে আর একটা ঘেঁটুফুলে উড়ে যায়,—যা হয় ত আগের রাত্রে ফুটেচে,—তখন গর্ভ-মুখেই তার ডানা লাগে; অম্‌নি বিয়ে হয়ে যায়।

অর্কিড ফুলের* কেশর গর্ভ দুই-ই এক সময়ে পাকে, আর কেশর গর্ভের উপরে বসানো। কাজেই উপর থেকে রেণু ঝরে পড়ে সহজেই ঘরোয়া বিয়ে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। অর্কিডের গর্ভমুখটা একটা ঢাকনীর মত ছোট্ট পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। উপর থেকে রেণু ঝরে পড়লে, তা ঐ ঢাকনীর উপর পড়ে, গর্ভমুখে পড়তে পারে না। মৌমাছিরা যখন ফুলের মধ্যে মাথা চালিয়ে দিয়ে ঢাকনী ফুঁড়ে মধু খায়, তখন তাদের মাথায় জড়ানো রেণু গর্ভমুখে লেগে যায়।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক
ও
শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি।

---

* অর্কিড ফুলের মত দেখতে সুন্দর ফুল আর নেই। এক একটা অর্কিড ফুল গোলাপ পদ্মকেও হার মানিয়ে দেয়—কিন্তু দুঃখের বিষয় অর্কিড ফুলে গন্ধ নেই। অনেক বড়লোকের বাগানে অর্কিডের বাগান-ঘর (অর্কিড হাউস) দেখতে পাবে।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহোক আমরা মামার বাড়ীর বাগানে খুব আমোদে ছিলুম বটে, কিন্তু আমার এক এক দিন কলকাতায় মন ছুটে আস্‌ত, সেদিন আমি যেন স্থির হতুম ও একটু ভাবতুম। আমার বেশ মনে আছে মা বার বার কপালে হাত দিয়ে দেখতেন ও বলতেন—আজ যে বড় চুপচাপ, অসুখ করেছে নাকি? এত ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছ যে? দিদিমা বলতেন ওর আপন দিদিমার জন্যে মন কেমন করছে, তাই ভাবছে। যদিও কথা সত্য, তবু দিদিমা এমন ভাবে বল্‌তেন যে আমার শুনে রাগ হত। এইরকম ক'রে প্রায় ৫৬ মাস কেটে গেল। তারপর পূজার আগে চিঠি গেল আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। আমার খুব আহ্লাদ হ'ল। সবাই ব'লতে লাগল--আহা, এতদিন ছিল, সব চলে যাবে, এই বলে সকলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে দিন দেখে চিঠি পাঠালেন। বোট ও গাড়ীভাড়া ঠিক হ'য়ে গেল। তখন কোন্নগরে এত গাড়ী পাওয়া যেত না। আগে ঠিক করতে হত। এক টাকা বায়না দিয়ে রাখতে হ'ত।

আমরা আশ্বিন মাসের ২রা সেখান থেকে রওনা হলুম। তিন দিনে কলকাতায় পৌঁছলাম। কলকাতায় এসে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কত দৃশ্য—কত জাহাজ, নৌকা, পান্‌সি, কত

লোক স্নান করছে, কেউবা আবার জপ করছে; আবার পটলের নৌকা হ'তে পটলের ঝোড়া আজাড় করে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছে, কেউ মুটের মাথায় তুলছে; আবার কোন নৌকায় লাল লাল হাঁড়ি থাক্ থাক্ করে' সাজান হচ্ছে। এইরকম খুব গোলমালে সহরটি গম্‌গম্ করছে। এদিকে ভাড়া গাড়ীগুলি সারবন্দি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রামু দাদা পান্‌সি করে ধারে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল কখন তীরে নাম্‌তে পাব; কতদিন কর্ত্তামণি, দিদিমা ও দাদাকে দেখিনি; বড়দি, ছোটদির সঙ্গে কতদিন খেলি নি। কত কথা পেটে জমে রয়েছে। সে সব আর পেটে ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবুও আমি জলটা দেখ্‌তে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতুম্, সেজন্য বোটের একটা জানলা খুলে রেখেছি। আমরা বিস্কুট খেতুম, তার বাক্সের সঙ্গে দড়ি বেঁধে, জলে যে সমস্ত পেঁয়াজ ভেসে যেত সেগুলি তুলতুম, মাঝিদের দেবার জন্যে। মা কেবল বলছেন ঐরকম করে করে শেষে হাতে ব্যথা হবে।

আমরা বসে আছি, হঠাৎ দেখি দাদা গাড়ি করে এলেন। দাদার সঙ্গে বাবার মাসতুতো ভাইও এসেছিলেন। কাকা দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখেই আমি একেবারে নেচে উঠেছি—ওগো মাগো! দাদা এসেছেন, বড় মজা হবে। তারপর দাদা আমাদের সঙ্গে দেখা করে কত খুসীই হলেন। আমার পেটে যত গল্প জমা ছিল, ইচ্ছা যে দাদাকে একেবারে সব বলে ফেলি। একমুখে পেরে উঠ্‌ছি নে। দাদাও কত জায়গায় বেড়িয়েছেন—দুবার আলিপুর গেছেন। নতুন বাঁদর এসেছে, বাঁদরকে কলা খাইয়েছেন।

যে যে গল্প জমা ছিল বলা হচ্ছে, ও ভাইবোনে খুব গুলজার হচ্ছে। এইরকম গল্প হ'তে হ'তে জোয়ার এল। আমাদের রামুদাদা পাল্‌কি ও দরোয়ান, আর একজন দিদিমার পুরাণো ঝি পাল্‌কির ঘেরাটোপ হাতে ক'রে উপস্থিত। তখন ঘাটে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সব লোক হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর এক এক করে বাক্স, বিছানা, ব্যাগ ইত্যাদি নাম্‌তে লাগল। কাকা মাঝিদের বকশিষ্‌ দিলেন। তারপর মা পাল্‌কিতে উঠ্‌লেন ও পাল্‌কির চারপাশে ঘেরাঢাকা পরিয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা ভাইবোনে সবাই মিলে গাড়ীতে উঠলুম। একটু পরেই ঠাকুরবাড়ীতে পৌঁছলুম। মা একেবারে মন্দিরে নেবে দর্শন করে বাড়ী যাবেন বলে গিয়ে দেখেন, তখনও গা তোলানো হয় নি। কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর ব্রজঠাকুর এলেন, ঠাকুরের ভোগ আরতি হ'ল। মা দর্শন করে হরির লুট, সন্দেশ ও বাতাসা আনবার টাকা দিয়ে এলেন। প্রণামীও দেওয়া হল। পরে মা বাড়ী এসে দিদিমার সঙ্গে দেখা করে, প্রণাম করে ঘরে গিয়ে সব গোছাতে লাগলেন। আমি আবদার ধরলুম—বেড়াতে যাব, ভাল পোষাক চাই ও এক্ষুনি চাই, আমি কর্ত্তামণির সঙ্গে যাব। মা রাগ করে বক্‌তে লাগলেন যে—মেয়ের কি আবদার! এই এলুম, এখন সব গোছাব, না ওর কাপড় দেও, চুল বাঁধ! মেয়ে কি দুষ্টুই না হয়েছে। আমি এরকম অন্যায় আবদারে মাকে কত জ্বালাতনই না করেছি। মার আবার এর জন্যে বকুনি শুন্‌তেও হ'ত দিদিমার কাছে। দিদিমার কানে উঠলেই তিনি বল্‌তেন—কাপড় বের করতে আর কতক্ষণ লাগে? ও কতদিন বেড়াতে যায় নি। সব তাতেই আজকাল মেয়ে ও বৌদের কুঁড়েমি! আমি

এক এক দিন আবার দিদিমাকে গিয়ে বলে দিতুম। সেদিন মা আমার উপর বড় রেগে যেতেন। কিন্তু তিনি কখনও গালাগালি, কি বেশী মারপিট, এ সব জানতেন না। তাঁর বড় বড় পদ্মের মত চোখ ছিল, সেগুলি একটু কুঁচ্‌কে চেয়ে থাকতেন। এইটি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ছিল। আমাদের উপর, এমন কি ঝিদের উপর রাগলেও তাঁর ঐ একইরকম ভাব হত। যাহোক, সেদিন বেড়াতে গিয়ে নতুন আনন্দ লাভ করলুম। কতদিন বাদে কেল্লার ব্যাণ্ড শুনে আনন্দে প্রাণ নৃত্য করতে লাগল। সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে, কাপড় ছেড়ে, দুধ খেয়ে ও-বাড়ীর সবার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা আমায় আন্তরিক ভালবাসতেন। আমাকে আদর করে কত কথাই না জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আবার কচুরি, মিষ্টি ইত্যাদি খেতে দিলেন। পরে মাষ্টারমশায়কে খবর দেওয়া হ'ল যে আমি এসেছি, পড়াবার জন্য যেন কাল থেকে তিনি আসেন। পরদিন তিনি এসে পড়াতে বস্‌লেন। পড়া মোটেই হয়নি, তবে যতটুকু পড়েছিলুম ভুলে যাইনি। ঠিক ঠিক বানান, নাম্‌তা সব মুখস্থ বলে গেলুম। সেদিন থেকে গুরুমশায় আর দুখানা বই বাড়িয়ে দিলেন—বাল্যশিক্ষা আর পদ্যপাঠ। এইরকম লেখাপড়া চলতে লাগল। আমি আদরে বড় হতে লাগলুম। আমি আগে লিখেছি যে বাড়ীতে দুর্গোৎসব আছে বলে আমরা বাগান থেকে চলে আসি। তখন মা দুর্গার অঙ্গে খড়ি হয়েছে, আর চালচিত্র হচ্ছে। আমি চুপ করে বসে বসে ঠাকুর গড়া দেখি—শুধু দেখিনে, আমার মনে মনে সাধ হয় যে আমিও বড় হয়ে এইরকম গড়ব। কেন, কুমররাও মানুষ, আমিও মানুষ। বিজয় মামাও ত কুমোরদের কাছে বসে বসে শিখে নিয়েছেন। আমার

বাল্যজীবনের কথা যতদিন থেকে স্মরণ হয়, ততদিন আমার মনের এই অহঙ্কারটুকুর উদ্দীপনা মাঝে মাঝে উঠত। অথচ আমার ক্ষমতা কিছুই ছিল না, বা নেই। সেদিন একটু মাটি কুমোরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে প্রথম একটী পুতুল গড়লুম। সেটি ভাল হ'ল না। আমার নিজেরই পছন্দ হ'ল না। পরে একটী শিল নোড়া করি, বেশ হ'ল; তারপর একটী নুনের পিরিচে মাটি চেপে চেপে দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে ছাড়িয়ে নিয়ে শুকাতে দিলুম। বেশ মাটির পিরিচ তৈরি হ'ল। আবার তার ধার মায়ের পেনসিল-কাটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বেশ বাহারি করে দিলুম। পরদিন ঘিয়ের বাটির ছাঁচে বাটি গড়লুম। মা ও দিদিমা দেখে বললেন—"বাঃ! বেশতো হয়েছে, ছেলেমানুষ বেশ গড়েছে।" আমার আর আনন্দের সীমা নেই! একে নিজের মনে আহ্লাদ হয়েছিলই—আবার নতুন মতলব বের করলুম। আজ ছোট করে একটী উনুন গড়ব। এক টুক্‌রো ভাঙা শ্লেট জোগাড় করেছি, তারই এক পাশে এক কাঠের উনুন করেছি; আর এক পাশে এক কয়লার উনুন করব ভাবছি। কিন্তু কয়লার উনুনে শিক্ দিতে হয়—শিক্ আমি কোথায় পাব? তোষা-খানায় গেলুম। একটা ভাঙ্গা ছাতা পড়ে আছে, কিন্তু সে মস্ত মস্ত শিক্—কি করে ছোট হবে? সে হ'ল না, তখন মাথায় আর এক বুদ্ধি জেগেছে; সেটা দুষ্টু বুদ্ধিই বলতে হবে, কিন্তু যখন উনুন হয়েছে, তখন শিক্ না দিলে ত চলবে না। তখন কি করি, মাথায় মস্ত খোঁপা আছে; তার তিনটি কাঁটা ভেঙ্গে ৬টী শিক্ করে, উনুন গড়া সাঙ্গ করে ফেল্লুম। এখন আর মনের শান্তি নেই, কবে আমার উনুন শুকাবে? আমার পিতলের ছোট ছোট হাঁড়ি, কড়া, হাতা,

খুন্তি ইত্যাদি বাসন আছে। তা ছাড়া তামার পূজার বাসন, পাথরের শিলনোড়াও ছিল। আবার সাহেব বাড়ীর কলের পুতুল, ভাল ভাল বিলাতী খেলনাও ছিল। আমার ও দাদার যে খেলনা কিন্‌তে ইচ্ছা হত, তার কোন বাধা কখনও পাই নি; কে বাধা দেবে? কর্ত্তামণির কড়া হুকুমই আছে যে, ছেলেরা যখন যে খেলনা চায়, খাজাঞ্চিদাদা এনে দেবে। আমাদের আর পায় কে? বেড়াতে গিয়ে যা পছন্দ হত দোকানদারের কাছে চাইতুম। সেও তাড়াতাড়ি অমনি প্যাক করছে, দাদাও সঙ্গে সঙ্গে দাম টুকে নিচ্ছেন। মহিষের গাড়ী করে খেলনা বাড়ীতে আসৃত। এতে কখনও কর্ত্তামণি বলেন নি যে, কেন এত কিনেছ? বাল্যকাল হতে এখন পর্য্যন্ত কখনও কোন ইচ্ছায় বাধা পড়েনি, পরে কি হয় জানি নে। যখন লিখতে আরম্ভ করেছি, তখন সঠিক লিখে যাব।

আমার সাত বছর থেকেই বিয়েব কথা হতে লাগল। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমার বিয়ের কথা হয়। তাঁরা আমাকে আদর ও আহ্লাদ করে দুই একদিন নিয়েও যান। কিন্তু তখন এ প্রথা ছিল না যে, পাত্রপাত্রীর দেখাদেখি হবে। মেয়েরা নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন, ও পুতুল দিয়ে নানান গল্প করতেন। আমিও আমার দিদিমার সঙ্গে যেতুম।

কিছুদিন পর শুভদিন দেখে আমার আশীর্ব্বাদ হয়ে যায়। পাত্র পক্ষ হতে পাত্রের বড় ভাই এসে দেখে যান, ও আমাকে একটী মোহর দেন। আমার দিদিমাও আশীর্ব্বাদ করে আসেন একটী মোহর দিয়ে। কিছুদিন পরে—বেশ মনে আছে ৮।৯ মাস বাদে—সে পাত্রের নানারকম দুর্ণাম রটে। সে কথা দিদিমার কানেও ওঠে। তিনি মা বাবা সকলকে বলেন ও স্থির করেন যে, ও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে না।

তা ছাড়া কর্ত্তামণির কথাই ছিল, ও কেঁদে দিদিমাকে বলতেন যে—ওকে কোথায় দেবে, কে অযত্ন করবে। এই সকল কথা আমিও একটু একটু শুনি, তবে আমার সদানন্দ মন ওসব কিছুই বোঝে না। পরে নাকি দিদিমা ওদের বাড়ী গিয়ে যা যা শুনেছেন সব খোলাখুলি বলে আসেন। তাঁরা আর কি বলবেন? যার মেয়ে সে যদি না দেয়, তবে ত কোন জোর নেই। এইরূপে আমার প্রথম সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়। ওঁদের ভিতরে ভিতরে মনও ভেঙেছিল। যাহোক আমাদের বাড়ীতে ও সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌তে লাগল। আমিও দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠলুম। আমি প্রায়ই ঠাকুর বাড়ী যেতুম। ওখানে রোজ তিনবার কীর্ত্তন হত,—ভোরে, পূজার পর, আর সন্ধ্যাকালে। আমার শুন্‌তে বেশ ভাল লাগত। আমার শোন্‌বার বেশি অবকাশ হত না। তবে কোন পালপরব উপলক্ষ্যে যেতুম ও শুনতুম। এ ছাড়া দিদিমার কাছেও অনেক মেয়ে-কীর্ত্তনী আসত। শুনতে চমৎকার লাগত। বৈঠকী গান রোজ হত। আবার কখনও কখনও বাইনাচও হত। তাদের কাছ থেকে অনেক গান শিখে ফেলতুম। আবার গানের বই পেলেই গান করবার সখ হত। আমার প্রাণটা খুব সখের বটে। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমী কম্‌তে লাগল। আমি একদিন গড়ের মঠে বেড়াচ্ছি, দেখি কর্ত্তামণি একটী বেঞ্চে বসে এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে গল্প করছেন। আমার কর্ত্তামণির পাশে কে বসেছেন, দেখবার বড়ই ইচ্ছা হল। তখনি ছুটে গিয়ে দেখি অতি সুশ্রী, দেবতার মত দেখতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, আর তাঁর কথাগুলি যেন মধুমাখা। আস্তে আস্তে, খুব মান্যের সঙ্গে, ভক্তিভাবে কথা বলছেন—আপনার কোন চিন্তা নেই; আমার এক ছেলে, আপনার

পৌত্রী ঘরে নিয়ে যাব, এটা আমি বহু ভাগ্য মনে করি। এই সময় আমি দৌড়চ্ছি, খাজাঞ্চিদাদাও আমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। অমনি কর্ত্তামণি চোখ ছল্ ছল্ করে তাঁকে বললেন যে—এই শোন, তোমরা কি বলবে বল। আমি অসুস্থ, আমি জানি নে। বাড়ীর ভিতরকে বল ইনি এঁর ছেলের সঙ্গে (আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন) এর বিবাহের প্রস্তাব করছেন। দেখ বাপু তোমরা বোঝ, আমার ত অসুখ। তখন সেই দেবোপম মুর্ত্তিটী একটু হাসি হাসি মুখে বললেন—আমি নিজে একদিন কাকিমার কাছে যাব'খন। এই কথা বলবার পর তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তখন কর্ত্তামণির মন ভাল নেই, তাঁর অসুখ; সদাই মন উৎকণ্ঠায় ভরা। তাতে আবার আমার বিয়ের প্রস্তাবে মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খাজাঞ্চিদাদা বললেন—মশায়, সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা। তিনি আমায় শিখিয়ে দিলেন প্রণাম করতে, আমিও প্রণাম করলুম।

সন্ধ্যার পর খাজাঞ্চিদাদা দিদিমার কাছে এসে মাঠে আমার বিয়ের সম্বন্ধে যে যে কথা শুনেছিলেন, সব বললেন। আমাদের বাড়ীতে এ কথা নিয়ে খুব আন্দোলন চলতে লাগল। এইরকমে দশ দিন কেটে গেল। দুর্গাপূজা এসে পড়ল। আমাদেরও নতুন পোষাক ও জরির জুতা পাবার আহ্লাদ সুরু হ'ল। আমার আরও আহ্লাদ হয়েছিল যে, দাদা একলা পূজার নিমন্ত্রণ সারতে বেরতেন, এবার আমার উপর অর্দ্ধেক ভার হ'ল। দাদার হঠাৎ একটু অসুখ হ'ল। অত বাড়ী বাড়ী ঘোরালে তাঁর কষ্ট হবে বলে কর্ত্তামণি বললেন—খুকিকেও খোকার আর একটা পোষাক দিয়ে নিয়ে যাও। সবাই শুনে হাসতে লাগল। দিদিমা বললেন যে—পোষাক না হয় দিলুম,

কিন্তু চুল কিসে ঢাকা যাবে? কর্ত্তামণি বললেন—আমি নিজে বেনারসী পাগড়ী বেঁধে দেব, দেখো দেখি কেমন দেখাবে। এই সব মন্ত্রণা হয়ে আমার পোষাক পরিবর্ত্তন হ'ল। দাদার দুরকম পোষাক হয়েছিল। লাল মখমলের ওপর চুমকি কল্‌কার কাজ, আর কালো রংয়ের একটা। কর্ত্তামণি বললেন—লালটা একে দাও, বেশ মানাবে। সে কাপড়টা আমাকেও বেশ মানাল; তবে তাতে জরি ছিল না, বড় বড় লেস্‌ দেওয়া ছিল। আমার রোজ রোজ গাউন পরে আর ভাল লাগত না। আমার এক একবার মনে হত—আচ্ছা, আমি দাদার মত যদি খোকা হতুম, তাহলে জরির পোষাক পরে কেমন রাজপুত্র সাজতুম। রোজ রোজ কি মেম সাজা ভাল লাগে। ঠাকুর আমার বাল্য জীবনের এই সাধ পূর্ণ করবার জন্যই বুঝি কর্ত্তামণিকে মনে করিয়ে দিলেন। আমি পাগড়ি বেঁধে খোকা সেজে অনেক বাড়ী নিমন্ত্রণ সারলুম। কোন কোন বাড়ীতে দালানে প্রতিমার সাম্‌নে টাকা দিয়ে প্রণাম করিয়ে আমাদের খাজাঞ্চিদাদা তাদের সরকারের খাতায় নামটি লিখিয়ে দিলেন। আমরাও প্রতিমা দর্শন করে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। আবার কোন বাড়ীতে বাবুরা চণ্ডিমণ্ডপে বসে আছেন। তাঁরা ভাল করে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তখনি আমার লজ্জা ও ভয় হত। বড় মুস্কিল ত! খাজাঞ্চিদাদা পৌত্র বলেই সারছেন; কর্ত্তামণির নামটি লেখানো হচ্ছে। আবার কোন কোন বাড়ীর দোতলার বৈঠকখানায় উঠ্‌তে হত। আর এক এক জায়গায় রূপার থালায় মিষ্টি ও রূপার গ্লাসে জল, দুটি মিঠা পানের খিলিও পাওয়া যেত। কোথাও আবার চণ্ডির গান হচ্ছে। উঠানে লোক জমেছে বিস্তর। আবার এক এক বাড়ীতে দোতলার হলে বাই

নাচ হচ্ছে। এইরকম ঘুরে ঘুরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বাড়ী যাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। খাজাঞ্চিদাদাকে বলছি—চল, আর কত ঘোরাবে। তিনি তবুও যতদূর পারেন সেরে যেতে চান। কিন্তু সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা চাই, নইলে কর্ত্তামণি রাগ করবেন। বাড়ীতে আরতির সময় উপস্থিত থাকা চাই। আমি ও দাদা দুজনেই নিমন্ত্রণ সেরে এসেই দালানে দাঁড়ালুম। পরে আরতি দর্শন করে উপরে উঠলুম। ষষ্ঠির দিন বেলবরণ থেকে আনন্দ চলেছে প্রায় কোজাগর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। বিজয়া দশমীর দিন আমাদের ঠাকুরের সঙ্গে সবাই হেঁটে যেত। আসাসোটা, বল্লম, রূপার ছাতা ইত্যাদি বেরত। আমাদের ঠাকুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হত, দুখানি নৌকা বেঁধে তার উপর প্রতিমাখানি বেঁধে দিত। আমরা সব ঘাটের উপর ছোট ছোট ছাতা মাথায় দিয়ে বসে দেখতুম। কেন না যে সময় আমাদের প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হত, তখন বেশ কড়া রোদ থাকত। আমাদের সব বাড়ীর ঠাকুর এক ঘাটেই ভাসান হ'ত। তারপর আমরা গাড়ী করে সব ঘাটে ঘাটে ভাসান দেখতুম। পরে বাড়ী গিয়ে শান্তিজল নেওয়া, প্রণাম ও কোলাকুলির ধুম পড়ে যেত। দুর্গা-পূজার এক মাস আগে থেকে আর দশদিন পূজার পর পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী সরগরম থাকত। আগেই পূজার ধূপ তৈরী, হরেকরকম বড়ি দেওয়া—এ সব কাজ দিদিমা নিজে তদারক করে করাতেন। দিদি-মার একজন বিধবা ভাজ ছিলেন। তিনি প্রায় ঐখানেই থাকতেন। আর আমাদের একজন পিসিমা ছিলেন। এই পিসিমা পূজার ভাঁড়ারের কর্ত্রী ছিলেন। লোকজন ঘরামীদের খাটানো, জলখাবার দেওয়া, দেখাশোনা সব করতেন। পূজার তিন দিন খুব আমোদ হ'ত।

আমাদের পাশের বাড়ীর পিসিমা, বৌঠাকৃরুণ আর বড়'মা, মেজমা এঁরা সব আসতেন। সবাই মার ঘরে জমা হতেন। সেখানে গল্প, হাসি ও তাস খেলা হত। তখন এ চাল ছিল না যে, বৌরা সব কাজ করবে। আজকাল এ হাওয়াটা হয়েছে। আর সে হয়েও গেল বহুদিন। আমার বয়স ছিল তখন ৮; এখন আমার বয়স ৪৪ বছর। এতদিনে চালচলন পরিবর্ত্তন হবার কথাই ত। আমার দিদিমার কাছে গল্প শুনেছি যে, তাঁরা যশোর থেকে ৮/৯ বছর বয়সে এসেছিলেন। তাঁরা শ্বশুরশাশুড়ীকে ঠাকুর ঠাকৃরুণ বলতেন। সুমুখে যেতেন না, কিন্তু দাদাশ্বশুর ও শাশুড়ী যাঁরা থাকৃতেন, তাঁদের সঙ্গে খুব খেলা, ঠাট্টা, হাসি, গল্প, ফুলের মালা পরানো; এই সব চলত। হোলির সময় মন্দিরে খুব আনন্দ ও উৎসব হত। দাদাশ্বশুররা দিদিমাদের সাদা মল্‌মলের একটি করে পেশওয়াজ দিতেন; আর একখানা করে' ওড়না তৈরী হত, তাতে চওড়া চওড়া গোটা বসানো থাকত। আবার আবীর নেবার জন্য একটি করে ঝোলা তৈরী হত। রূপার বড় গামলায় আবীর গোলা উঠানের মাঝ-খানে থাকত; আর দিদিমাদের একটা করে রূপার পিচকারী হাতে থাকত। তারপর রং খেলা হত। কিন্তু মা'দের এটা আর ঘটে নি। কারণ তাঁদের ভাগ্যে দাদা দিদি কেউ ছিলেন না যে, নাতবৌ ও নাতিদের নিয়ে আমোদ করবেন। পূজার সময় দেখতুম একবার বেনারসী চেলি প'রে পঁইচে, বাউটি, নথ, মল, এ সব অষ্টালঙ্কারে ভূষিত হ'য়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে সকালে বাড়ীতে যে কটি ছোট বৌ থাকত, তাঁরা সবাই মিলে নামতেন। একটা পুরাণো ঝি সঙ্গে করে নিয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলত যে, বৌঠাকরুণরা এসেছেন—

তাঁদের অঞ্জলী দেওয়াতে হবে। পরে অঞ্জলী দিয়ে এসে পরস্পর সিঁদূর পরানো হ'ত। দিদিমার কাছে সিঁদূর এনে দাঁড়াতেন কিন্তু যতক্ষণ তিনি দিতে না বলবেন, ততক্ষণ দেবার নিয়ম নেই। তারপর যখন তিনি বলতেন দাও, তখন দেওয়া হ'ত। পরে দিদিমা আবার সবাইকে পরাতেন। তারপর যার সিঁদূর তার হাতের সোনা বাঁধানো লোহায় মুছে দিতেন। তখন মা'রা সবাই এক এক করে দিদিমাকে প্রণাম করতেন। তারপর তাঁরা যে যার ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে নতুন দেশী কাপড় পরতেন। তখন ঘরামীরা মা'দের জন্য মস্ত বড় বারকোষে জলপান দিয়ে যেত; মা'রা সব কলাপাতায় আজড়ে, বারকোষ ঘরামীদের ফিরিয়ে দিতেন। পরে তার সঙ্গে কচুরী, নিমকি ও সিঙাড়া নিয়ে খুব জলযোগ হয়ে যেত। আমারও সেই সঙ্গে চলত। পরে খিচুড়ি ভোগ হ'য়ে গেলে আমরা এক দফা খেতুম। আমরা কিন্তু পাশের বাড়ী থেকে পূজার তিন দিন মাগুর মাছের ঝোল, লেবু ও গলা ভাত খাবই। আমার মেজমা আমাদের এটি না খাইয়ে আর পূজাবাড়ীতে যেতে পারতেন না। পরে ভোগ হ'য়ে গেল, আবার মা'দের সব প্রসাদ পাওয়া হ'ল; আমরাও একটু আধটু পেলুম।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

২।

আমতলায় বিশ্ববিদ্যালয়।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১১ই নবেম্বর।—আমাদের জীবনযাত্রা ধীরে সুস্থে গড়ে' উঠ্‌ছে : বাঙ্গলা পড়াটাই সব চেয়ে নিয়মিত হচ্ছে, আমরা একটি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি, এবং আমাদের ক্ষুদ্র জগতে গুছিয়ে বসে' নিয়েছি। সূর্য্যাস্তের পর (দিনের বেলা দারুণ গ্রীষ্ম এবং বর্ষার জলে গহ্বরাঙ্কিত এ সব জায়গায় ছায়া দুর্লভ) আমরা র—র সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে যাই। * * * * পাশের গ্রাম গোয়ালপাড়ায় গেলুম : মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাড়ীগুলি বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা, ন্যাংটা ছেলের কিলিবিলি, ঢোলের আওয়াজ, হাউই বাজি। আমরা দুর্গা প্রতিমার পূজা ও বিসর্জ্জনের ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। দুই মোটা বাঁশের উপর ভয়ঙ্করী দেবীমাতার মূর্ত্তি চড়ানো হয়েছে ; ডাইনে মহাদেব, তাঁর স্বামী ; বাঁয়ে নারদ, দেবতাদের দূত, কিন্তু Iris*-এর চেয়ে ঢের খারাপ দেখতে ; এ সমস্তই রঙলেপা, সোনার পাতমোড়া, মামুলী— হয়ত St. Sulpice গির্জ্জার সাজসজ্জায় নীরসতার তুলনায় কিছু কম কুশ্রী। চারিদিকে যে সব ভক্ত ঠেলাঠেলি করছে, তাদের ব—

---

* গ্রীকদের দেবদূত। এমন সময় মাদাম লেভি গ্রামে কোন্ পূজা দেখ্‌লেন তা' বর্ণনা থেকে বোঝা শক্ত।

বলে' দিলেন সাহেবটি কে; তারা আমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিলে, আমাদের মিষ্টান্ন খেতে বল্লে, দেবীর স্নান দেখবার নিমন্ত্রণ করলে,—কাছেই যে ছোট নদী এরই মধ্যে কতকটা শুকিয়ে এসেছে, সেখানে তাঁকে নাওয়ানো ধোওয়ানো হবে। কিন্তু বাড়ী ফিরতে হবে, রাত হয়েছে, আর আকাশে চাঁদ এমন অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করেছে যে তারার আলো হার মেনেছে; এ আলোয় পড়া যায়।

রবিবার, ১৩ই।—অন্য দিনেরই মত কাজের দিন। এখানে বিশ্রামের দিন হচ্ছে বুধবার, কারণ শুনতে পাই ঠাকুরবাড়ী ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বুধবার দিনের কি একটা যোগ আছে। ব্রাহ্মসমাজ হচ্ছে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়; ক্যাথলিক ধর্ম্মের সঙ্গে রিফর্মের যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ। সনাতন শাস্ত্রবচনে, বিশেষতঃ উপনিষদে ধর্ম্মের আদি অকলুষ স্বরূপের অনুশীলনই তার লক্ষ্য।

১৪ই নবেম্বর।—পূর্ণিমার উৎসবের দিন এখানকার অপর য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হল। ঘটনাক্রমে তিনি হচ্ছেন একজন পোলজাতীয় বা লিথুয়ানিয়াদেশীয় ইহুদী, রসায়নবিৎ, এবং জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের পাস্তুর ইন্‌স্‌টিট্যুটের ছাত্র; তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, আমেরিকা য়ুরোপ ঘুরে অবশেষে ভারতবর্ষে এসে আট্‌কা পড়েছেন। তিনি ছ'মাস হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তারপরে এখানে এসে ছেলেদের রসায়নবিদ্যা শেখাচ্ছেন। এখানে তিনি হিন্দুর মতই থাকেন। বেশভূষা নিতান্তই সাদাসিধে: তাঁর পেণ্ট্‌লুনের উপর তাঁর খাকী কামিজ উড়ে বেড়াচ্ছে; যখন দেশে ফিরবেন—যদি কখনও ফেরেন—তাহ'লে ওটার মধ্যে ফের এটা গুঁজে দেবেন, তারপর চল ভিল্‌নায়।

ঠাকুরমশায় আমাদের সঙ্গে এসে খেলেন, আমরা অনেকক্ষণ ধরে' গল্পগুজব করলুম, তাঁর কথা শুনলুম। তিনি আমাদের বল্লেন তাঁর দুই ইংরাজ অধ্যাপকের কথা,—যে ইংরাজদের ভারতবর্ষ জয় করেছে ঃ—ভারতবর্ষ করেছে, না এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুটি? তারপর জাতীয় প্রসঙ্গ উঠে পড়ল; অমৃতসরের সেই ভীষণ অধ্যায়ের কথা তিনি স্মরণ করলেন, যার পরে দেশের সরকারবাহাদুরকে তিনি নিজের উপাধি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন; একজন ইংরাজ-মহিলার উপর রাস্তায় অত্যাচারের ফলে কিরূপ দমন-নীতি চলেছিল। সে বৃত্তান্ত কেবলমাত্র স্মরণ করেই তাঁর গলা কাঁপছিল আর চোখ জ্বল্‌ছিল, যদিও ইংরাজরাজ খুব সম্ভব ঘটনাগুলি অস্বীকার করেন।

১৬ই তারিখে আমার নিজস্ব এক ক্ষুদ্র নিমন্ত্রণসভার আয়োজন হল। এখানকার মেয়েরা 'আলাপিনী' নামে এক সমিতি স্থাপন করেছেন; তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন যুদ্ধের সময় আমাদের মেয়েরা কি কাজ করেছে, সে বিষয় তাঁদের কিছু বলতে। আমি মিনিট বারো ধরে' আমার কাঁচা ইংরাজীতে বাধো বাধো কথা বল্লুম, তাঁরা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, তারপর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্কোচ অসাধারণ; অথচ এঁদের মধ্যে অনেকে কোনকালে 'পর্দ্দা' ন'ন—যে রহস্যময় আড়ালের পিছনে ভারতবর্ষের এত স্ত্রীলোক লোকচক্ষুর অগোচরে জীবনযাপন করেন, এঁরা সে ভাবে কখনো বাস করেন নি। কিন্তু খুব শিক্ষিতাদের কাছ থেকেও নত চক্ষু, দু' একটি হুঁ হাঁ এবং মুচ্‌কি হাসি ছাড়া কিছু আদায় করতে পারা যায় না।

আমার একটি ছাত্র বেড়েছে, এবং ম—র ক্লাসে ক্রমশঃ লোক

ভর্ত্তি হচ্ছে। এই ম—ভদ্রলোকটির সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় পড়ার আড্ডা বসাই; এমনি করে' সমস্ত মোলিয়ের আমাদের পড়তে হবে। * * * সমালোচনার বই তার যথেষ্ট পড়া আছে * * * * কিন্তু আসল বই কখনো পড়েনি। বেচারার বইয়ের অভাব এবং জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। তার উপর সে নিতান্ত লাজুক, এবং কতকগুলি কথা মনে করতেও তার কানের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। আমরা Sganarelle পড়ব কেমন করে?

১৭ই নবেম্বর।—বৈলাতিক যুবরাজ বোম্বায়ে নেবেছেন, এবং আমাদের জোসেফ মহাত্মা বাজার থেকে ফিরে এসে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। হরতাল এমন সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, আমরা ফলও পাব না, তরকারিও পাব না, এবং কালকের আগে আমাদের কয়লা দেবে না! গান্ধির আদেশ পালন হয়েছে; ভারতবর্ষে সব দোকান, সব আফিস ও সব ইস্কুল বন্ধ হয়েছে। পরে কি কিছু গোলমাল বাধবে? বত্রিশ কোটি লোককে কি অহিংস অসহযোগ ব্রতে বেঁধে রাখা সম্ভব?—তবে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শান্তশিষ্ট এই জাতির অভ্যাস ও মনোভাবের পক্ষে এই ব্যবস্থা অনুকূল বটে।

সওয়া তিনটের সময় সি—তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন, সেই জায়গায়, সেই আমগাছের ছায়ায়, যেখানে আমাদের প্রথম আগমনে সমস্ত শান্তিনিকেতন আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল। গালচের উপর বেয়াল্লিশ জন শ্রোতা আসন হয়ে বসলে, তার মধ্যে ছিলেন সিংহলের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাঁর সুন্দর হলদে রংয়ের কাপড় এমন ভাবে পরা যাতে ডানদিকের কাঁধ খোলা থাকে (দেখো যেন দিক

ভ্রম না হয়! এই ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে ব্রহ্মদেশে মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে; এর উপর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নির্ভর করছে)। চার জন মেয়ে সেই ভাবেই পিছনে বসেছেন, একটু তফাতে, যেমন এখানকার দস্তুর। নীচু বেদীতে বসে ঠাকুরমশায় নোট লিখছেন; যে পাঠ শেখাবার জন্যে এই ভদ্রলোকটি সোজা প্যারিস্ থেকে এসেছেন, তিনি পরক্ষণেই সেটির সারমর্ম্ম বাঙ্গলায় বল্‌বেন। ভদ্রলোকের ইংরাজি ভাষা খুব সড়গড়ও নয়, খুব চোস্তও নয়, কিন্তু সকলেই মন দিয়ে শুনছে। সে ছবি মন থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। "বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ" বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার এই সূত্রপাত হল। প্রতি রবিবারে কলকাতাগত শ্রোতার জন্যে বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তৃতাবলী।

১৮ই।—বক্তৃতার পর আমরা পাশের একটি সাঁওতাল গ্রামে গিয়েছিলুম। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে অনেক লেখা হয়েছে, এরা ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীর বংশধর। তারা নিজস্ব বিশেষ অভ্যাস, ভাষা, আচার, ধর্ম্ম সবই বজায় রেখেছে। তারা বেশ কাজ করে, কিন্তু একটা হিসেব রাখতে পারে না; রোজকার কাজের পাওনা তাদের সেইদিনই চুকিয়ে দিতে হয়, নইলে পরদিন আর আসবে না; তারা খুব আমুদে, খুব কারিগর; আমরা দেখলুম তারা দলে দলে তাদের ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার গ্রামগুলিতে ফিরছে; তাদের মধ্যে একজন বাজনদার বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে,—মনে হয় যেন আদি যুগে ফিরে গেছি।

এখানে বেশি দীর্ঘ ভ্রমণ সম্ভবে না; সূর্য্য ওঠবামাত্র তারই জয়। চারটে বেলার আগে আমরা কখনোই বেরই নে; রাস্তাগুলি ঘোর

লাল রঙের, গরুর গাড়ির চাকায় গভীর খাঁজকাটা, সংখ্যায় বড় বেশি নয়,—কিন্তু আমরা পায়ের দাগ ধরে' চলে' যাই, সেগুলি কখনো মিলিয়ে যায়, কখনো শুক্‌নো নদীর খাতে পৌঁছে দেয়, যেগুলি বর্ষাকালে সত্যিকার নদীর জলে ভরপূর হয়ে উঠবে; বড় বড় ঘাস ও ছুঁচলো কাঁটার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, এত ছুঁচলো যে কাপড়ের মধ্যে, মোজার মধ্যে বিঁধে যায়, ও পদে পদে থেমে পায়ের কাঁটা বাছতে হয়। বাড়ী ফিরে এসে দেখি আমার ছাত্র ও সি—রয়েছেন, সেই সঙ্গে সুন্দর গেরুয়া বস্ত্রধারী সিংহলের সেই ভিক্ষু, এবং একটি বাচ্ছা ভিক্ষু, যার এখনো দীক্ষা হয় নি।

কবি আমাদের সঙ্গে খেলেন, এবং খবর দিলেন যে শীঘ্রই একজন গালিসিয়াদেশীয় ইহুদী যুবতী আসছে, তাকে তিনি য়ুরোপে দেখেছিলেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ও বিদুষী, এবং কারু-শিল্পের ইতিহাস শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসতে চেয়েছে। সে একাধারে দার্শনিক, লেখিকা ও নৃত্যকুশলা।

(ক্রমশঃ)

নবম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৩।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩]

আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই—ভাষাতত্ত্বের খুঁটীনাটী হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়,—আমার মাস্টারী ব্যবসায়ের পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে অন্যের কাছে এটা তত আনন্দ-জনক হবে না—এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার কিছু ব'ল্‌তে হবে অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'র্‌তে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের এই বাঙালী-জা'তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ আপনাদের সমুখে নিবেদন ক'র্‌বো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের আস্থা আর অনুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী-রকমে সাত্মাভিমান; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্যেও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌ছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি দু' শ' কুড়িটী বর্ম্মা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্ম্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাঁড়ায় এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় মোটামুটী ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির একটী হিসাব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে' কোনও কথা ব'লতে গেলে বর্ম্মাকে বাদ দেওয়া উচিত; কারণ যদিও বর্ম্মা এখন ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি-নীতি সব বিষয়েই বর্ম্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও সিংহল ভিন্ন সরকার দ্বারা শাসিত। এখন ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক-বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপ-ভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহির্ভূত) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, সংখ্যাটা এত ফেঁপে বেড়ে উঠেছে। ভারতের ভাষাগুলি চারটী মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে:—[১] আর্য্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] কোল গোষ্ঠী, [৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্ম্মার সীমান্ত, তিব্বত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী (আর বর্ম্মায় বর্ম্মী) ছাড়া

অন্যগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এই সব ভাষা বলে। কোল গোষ্ঠীর ভাষা হ'চ্ছে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর, প্রভৃতি। কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়,—সব-শুদ্ধ ত্রিশ লাখ-এর বেশী হবে না। কোল ভাষা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতের লোক ভারতে আ'স্‌বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আর্য্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আস্‌ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগ্‌বে—অবশ্য কোল-ভাষীরা আর্য্য-ভাষা এখন যে অনুপাতে গ্রহণ ক'র্‌ছে সেটা যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহুই-জা'তও দ্রাবিড় ভাষা বলে: দক্ষিণ-ভারতে তামিল, মালয়ালী, কানাড়ী ও তেলুগু—এই চারটে হ'চ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচান তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পাশেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়-ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে ছ' কোটির

কাছাকাছি—আর সুসভ্য দ্রাবিড়গণের আর্য্যধর্ম্ম আর সভ্যতা বাহ্যতো মেনে-নেওয়ার ফলে দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের অর্দ্ধসভ্য দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)।

তারপরে বাকী থাকে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পর্য্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটি বড়ো শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখ্‌লে, এই ক'টী শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্‌তে পারা যায়ঃ—

[১] পূবে' বা পূর্ব্বী শাখা: এর ভিতর বিহারের মৈথিল, মগহী আর ভোজপুরে' যথাক্রমে এক কোটি, ষাট লাখ আর এক কোটি আশী লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে চার কোটি নব্বুই লাখ, পনেরো লাখ আর নব্বুই লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত।

[২] মধ্য-পূর্ব্বী শাখা, বা পূর্ব্বী-হিন্দী: এর তিন প্রকার রূপভেদ আছে,—অযোধ্যা প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য প্রদেশের পূর্ব্ব অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব-শুদ্ধ দু' কোটি সাতাশ লাখ লোকে এই পূর্ব্বী-হিন্দী ব্যবহার করে।

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী: চার কোটি দশ লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাখা, কনোজ-অঞ্চলের কনোজী, বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী, অম্বালা-অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাব অঞ্চলের মৌখিক

ভাষা, আর দিল্লী, মীরাট অঞ্চলের হিন্দুস্থানী। এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দুটী,—এক উর্দ্দু, আর দুই, হিন্দী; এই হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু বা হিন্দী ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে' প'ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা বা রাজস্থানী-গুজরাটী: এর মধ্যে পড়ে মাড়োয়ারী, মালবী, জয়পুরী, হারোতী প্রভৃতি রাজপুতানার নানা ভাষা, যা এক কোটি চল্লিশ লাখ আন্দাজ লোকে বলে; আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে।

[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা: এর মধ্যে আসে পূর্ব্বী-পাঞ্জাবী (এক কোটি আটান্ন লাখ), লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী (আটচল্লিশ লাখ), আর সিন্ধী (ছত্রিশ লাখ)।

[৬] দক্ষিণী বা মারহাট্টী শাখা: এক কোটি নব্বুই লাখ লোক এই ভাষা বলে।

[৭] উত্তুরে' বা হিমালয় শাখা: কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ভুটান পর্য্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে নাম ক'রতে পারা যায় এই তিনটীর—(১) গুর্খালী বা নেপালী বা পর্ব্বতীয়া বা খাস্‌কুরা,—গুর্খাদের ভাষা; (২) কুমাউনী, (৩) গাড়োয়ালী। সবশুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ।

[৮] সিংহল দ্বীপের আর্য্য-ভাষা সিংহলী—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইওরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাযাবর-বৃত্তি বা ভব-ঘুরে' বেদের জীবন অবলম্বন

করে। ইংরিজীতে এদের Gipsy (জিপ্‌সি) বলে; ইওরোপে বহু স্থলে এই জিপ্‌সিরা এখনও আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ভাষাই বলে।

কাশ্মীরে কাশ্মীরী আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে সংপৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,—যেমন শীণা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আর্য্য ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য ভাষাগুলি থেকে একটু তফাৎ; আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর খুব সম্পর্কে গ্রথিত।

ইংরিজী ১৯২১ সালের লোক গণনার হিসেবে বাঙলা ভাষা চার কোটি নব্বুই লক্ষ লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেক্‌বে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে ভারতের আর কোনও ভাষা এত বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী বা হিন্দীভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দীভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেয়ে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক অধিকসংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সেটা পোষাকী ভাষা হিসেবে। সিন্ধুদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিলে, সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক,—পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতে, মধ্য-প্রদেশের অনেকখানিতে, আর বিহারে —হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দী রূপেই হোক্ আর উর্দূ

রূপেই হোক্) তাদের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১৩ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষা; আর এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া আরও আড়াই কোটি আন্দাজ লোকে ব্রজভাখা, কনোজী প্রভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাখার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে একই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে যে-গুলিকে হিন্দুস্থানীরই রূপভেদ ব'ল্‌তে পারা যায়। এদেরও মাতৃ-ভাষাকে হিন্দুস্থানী ব'লে ধ'র্‌লে খুব বেশী ভুল হয় না। কাজেই যে ১৩ কোটি লোকের মধ্যে হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাদের মধ্যে মোটে ৪ কোটি ১০ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জা'ত হিন্দুস্থানী-ক'ইয়ে,—হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মুন্‌শী মৌলবীর কাছে বেত-খেয়ে-শেখা ভাষা নয়। বাকি ৮ কোটি ৯০ লাখ ঘরে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, মালবী, গাড়োয়ালী, আউধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরে', মৈথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাইরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, ইস্কুলে তারা মাতৃভাষাকে বর্জ্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। এই জন্যেই হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত বেশী, এই জন্যেই হিন্দুস্থানী ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই জন্যেই ভারতের লোক-সমাজে আর জাতীয় জীবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে' র'য়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের এক-

যষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা ধ'রে বিচার ক'র্‌লে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ'চ্ছে সপ্তম;—বাঙলার আগে নাম ক'র্‌তে হয় [১] উত্তর চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৫ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোটি), [৪] জার্ম্মান (৭॥০ কোটি), [৫] স্পেনীয় ভাষা (৬॥০ কোটি), [৬] জাপানী (৫ কোটি ২০ লাখের উপর), আর [৭] বাঙলা (৪ কোটি ৯০ লক্ষ)। Culture language বা মানসিক উৎকর্ষের সহায়ক ভাষা হিসেবে, বিদেশী ইংরিজীর পরেই, এদেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলারই আদর বাঙলার বাইরের শিক্ষিত সমাজেও দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—বিহারী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাট্টী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালীভাষী বহু ইংরিজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙলা প'ড়্‌ছেন দেখা যায়, আর বাঙলা থেকে নিজেদের ভাষায় বই অনুবাদ ক'র্‌ছেন। হিন্দী বা উর্দ্দূ বা হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচার হ'য়েছিল উত্তর ভারতের মোগল যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসকসম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছ'ড়িয়ে-পড়ার ফলে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লোকের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহুল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে'-যাবার সুযোগ ঘটে নি। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী যাঁরা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার দিক থেকে ধ'র্‌লে তাঁরা ত'লিয়ে গিয়েছেন; কিন্তু বাঙলাদেশে থেকেই, তার সাহিত্যের জোরে বাঙলা ভাষার প্রভাব ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে আর

ভারতের অন্যান্য ভাষার উপর বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এখন তার ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা মমতা-বোধ হ'য়েছে। তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালী তার জাতীয় culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্ সম্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক বাঙলার যাঁরা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলা তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালীজা'ত সম্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
বাঙালীর প্রাণে যত ভালোবাসা,—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্!

আর এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙলা-ভাষীরই আকাঙ্ক্ষা।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের দিগ্‌দর্শন ক'র্‌বো। যা নিয়ে' আমরা গর্ব্ব করি, সেই জিনিষটী আমরা যেন সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব্ব যেন জ্ঞানের অবলম্বনে সুদৃঢ় হয়। আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রসূত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস আত্মঘাতী হয়।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিদ্যমান র'য়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছি, লিখ্‌ছি, এর জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার মূর্ত্তি কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ং নয়। যাকে আশ্রয় ক'রে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত মানুষ, তত বিচিত্ররূপে একই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটী বহুরূপী বস্তু—সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদ্‌লায়, আবার কাল-ভেদেও তেম্‌নি বদ্‌লায়। আবার অবস্থাগতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চল্‌তি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্ত্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্র-সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'র্‌ছি, যে ভাষা এখন বাঙলা দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আর (যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'ল্‌ছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'ল্‌তে থাক্‌লে) যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে, এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হ'ঠিয়ে দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্ব্বজন-পরিচিত মূর্ত্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্ত্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্ত্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই-সব

মূর্ত্তিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলাত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে, অথচ এরা স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখাই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারু চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার ক'রলে বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য। তবে একটী বিশেষ শাখা অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত-সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়; কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয়স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়,—তখন স্বভাবতো অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টি-পাত করে না। যে ভাষা একদিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয়স্থল, আর অন্যদিকে জীবনের রসের দিক্ থেকে সব চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, তার জড় কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত—অন্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত।

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নির্দ্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল অবস্থা মনে ক'রে তার আমি গাছের সঙ্গে এই উপমা দিলুম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটী বড় চমৎকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে কোনও জা'তকে

অবলম্বন ক'রে একটা ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, এক বংশ-পীঠিকা থেকে আর এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্য্যক্রমে বহমান হ'য়ে আমাদের ভাষা-স্রোত চ'লে আ'স্‌ছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—৫ ক্রোড় নরনারীর জিহ্বা আর মস্তিষ্ক জুড়ে' এর বিস্তার; এর নিজস্ব, আর তা ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট শব্দসম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্ হ'চ্ছে; দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য্য এর স্রোত বেয়ে' এ দেশে আ'স্‌ছে। কত শতাব্দী ধ'রে, কেমন সরলভাবে বা এঁকে-বেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন্ কোন্ উপনদী এতে এসে প'ড়ে তার কর-সম্ভার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্ কোন্ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন্ মরা গাঙের খাত দিয়ে' বা এর জল বান উজিয়েছে, কোন্‌খানে বা এর জল শুখিয়ে' চড়া প'ড়ে গিয়েছে—অর্থাৎ কিনা কি-রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন্ ভাষা কি পদ্ধতিতে বদ্‌লে' বদ্‌লে' কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে ব'সেছে, কোন্-কোন্ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি ক'রেছে; কোন্ সময় আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীনরূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ সৃষ্টি ক'রেছে—তা ধ্বনিতেই হোক্, বা প্রত্যয়েতেই হোক্, বা বাক্য-রীতিতেই হোক্; বা কোথায়, কি ক'রে কবে, কোন্ অনার্য্য বা অন্য ভাষাকে তাড়িয়ে দিয়ে' বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে আর সেই লুপ্ত ভাষা

ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষায় দিয়ে' গিয়েছে; —কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্ত-র্নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফূর্ত্তি পেয়েছে; কি-রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি;—এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে; এর আলোচনা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ আর অনেকটা এই বিদ্যার শাস্ত্র অনুসারী বিচার-সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে হয় মানসিক-উৎকর্ষ-কামী ইতিহাসপ্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটা একটা সার্থক আলোচনা;—কেবল-মাত্র ঐতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণশক্তি আর বিচারশক্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে।

(৩)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্য্যভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দু'দিকে দুটী অবধি পাই—একদিকে হচ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৩৩ সাল, আর এখনকার চল্‌তি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি; অপর দিকে হ'চ্ছে ঋগ্‌বেদের কাল, আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মূর্ত্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করার কোন সার্থকতা নেই। ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বে আর্য্যভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি নি; কিন্তু

তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার অনুমোদিত অনুশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে তার অনেকখানি আমরা অনুমান ক'র্তে পারি। কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্ব্বের কোন বই বা লেখা আমরা পাই নে, এখানে তাই বস্তুর অভাব। সেইজন্য কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাক্লেও, সেটা প্রমাণিত হয় না। ঋগ্বেদের পূর্ব্বের যুগের আর্য্যভাষার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর তাকে তার দুহিতৃ-স্থানীয় বৈদিক, প্রাচীন ইরাণীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্টিক, জার্ম্মানিক, শ্লাভ প্রভৃতির পরস্পরে তুলনা দ্বারা নোতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্বার প্রয়াস বেশ একটা কৌতুকপ্রদ বিদ্যা। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত; এ যেন কোনও মানুষের জীবনচরিত লিখ্তে গিয়ে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থেকে আরম্ভ ক'রে ক' পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করা। আমাদের এখন অত দূরের কথা ভাববার দরকার নেই। ঋগ্বেদের ভাষা ভারতের আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগ্-বেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়; আর যেখানে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির জড় গিয়ে পৌঁছেচে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝ্তে বাকি থাকে না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদ দেবতাদের আরাধনাবিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটি সংগ্রহ—এতে ১০২৮টী স্তোত্র আছে। এই সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন ঋষি বা কবিরা রচনা ক'রেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইএ সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলনটি কবে যে করা হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত রূপে জানা যায় না; তবে কেউ কেউ মনে করেন সেটি আনুমানিক

১০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা মতে আরও ২।৩ শ' বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্ব্বে, এমন কি তারও আগে, এই সঙ্কলন হ'য়েছিল। আমি প্রথম মতটাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকেই সমীচীন ব'লে মনে করি—তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর যেতে চাইনে। কিন্তু অন্য সব মতের কথা এখন আলোচনা ক'র্‌বো না। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বে সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্‌বেদের সূক্ত বা স্তোত্রগুলির রচনাকাল তার ৩,৪ ৫,৬ শ' কি আরও বেশী বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে। ঋগ্‌বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব থেকে, আধুনিক বাঙলা, হিন্দী, মারহাট্টী পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে আদি আর্য্য-ভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব থেকে আজকালকার দিন পর্য্যন্ত—ধরা যাক্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—এই প্রায় ৩৫০০ বছর ধ'রে আর্য্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটি একরকম বেশ পরিষ্কার-ভাবে দেখ্‌তে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে—ইতিহাসে, পুরাণে—কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চ'লে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ'চ্ছে এই শিকলটীর এক একটী কড়া বা আংটা। কিন্তু কালের

মহিমায় তার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটী বা আংটাটী এখন তার যথাযথ একটীর পর একটী ক'রে পাওয়া যায় না, কারণ পর-পর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আসেনি। যেখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাঁক র'য়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে' ভাষার গতি হ'য়েছিল, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হয়। ভাষা-স্রোতস্বিনী ব'য়ে এসেছে ঠিক্, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটি অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃসলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে' বইয়ে' এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে' রেখে যাচ্ছি, আমাদের বিরাট আর প্রবর্দ্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে থাক্‌ছে; আর তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে গ্রামোফোনের রেকর্ডে গানে আবৃত্তিতে, কথোপকথনে, বক্তৃতায় আমাদের ভাষার ছায়া ধরা থাক্‌ছে—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের ভাষাচর্চ্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'রবে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য্য হবে। সুতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার জন্য আজ থেকে দু তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রম ক'রবেন, তাঁদের জন্য অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভাল ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌ছে। সন ১৫৩৩ বা ১৭৩৩ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুন্‌তে পাবেন—ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েদের প্রতি দৃষ্টি রেখে' ইওরোপের কোথাও

কোথাও ভাষাতত্ত্ব-সংগ্রহাগারে এইরকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম, যদি বুদ্ধদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাক্‌ত, আর যদি তাঁর দু' একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কণ্ঠে শুন্‌তে পেতুম! বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোন্‌বার উপায় থাক্‌ত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দী ঢঙে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্যের ভাবে ব'ল্‌ছি না—আমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যই ব'ল্‌ছিলুম যে, অল্পস্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আম্‌রা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটি কত-টুকুই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আর্য্যভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে' এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'র্‌তে গেলে বস্তুর অভাবজনিত এই অসুবিধাটুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝ্‌তে পারি। তখন দু' এক খানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বুঝ্‌তে পারি যে সাধু-ভাষা, চল্‌তি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলাভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্ব্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন লেখা হয় নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলাভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল

পেরিয়ে হবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারো শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়, তার থেকে ওই দু' শ' বছরের বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়। আর ওই দু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে কতকটা অনুমান এই সব পুঁথি থেকেই ক'র্‌তে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এই সব নকলে একটু আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দ্‌লে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে মুল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'র্‌ত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল করবার চেষ্টা ক'র্‌বে; আর সে ইচ্ছে থাক্‌লেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না— তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাক্‌ত না, ব'দ্‌লে যেত; ফলে অবশ্য ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত। কাজেই যে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। জলের দেশ বাঙলা, কাগজ সহজেই প'চে যায়, তালপাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে-যায়; তা'ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর পোড়া আছে, বন্যা আছে, আর আছে অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের যত্নের অভাব। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া

যায়। যে দু'চার খানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ল্‌লেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের আগের বাঙলার স্বরূপ জান্‌বার জন্যে পরবর্ত্তী কালের, অর্থাৎ ১৬।১৭ বা ১৮ শ' সালের দিকে নকল করা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ'চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু' এক শ' বছর পূর্ব্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ'চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্ত্তী বিকৃত পুঁথিই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি অলোচনা ক'র্‌তে গেলে এই কথাটাই সব প্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্ব্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গড়ে' ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্যটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটী সত্য-সত্য কি ছিল তা জান্‌তে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ১৩ শ' বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ' সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসম্বাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয়-গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা খুব আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(৪)

তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে

হ'য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। তার পূর্ব্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধ্‌ত, কাব্য লিখ্‌ত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে দু' একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কানা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ'তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্তের কথা,—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মত এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিক্থ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ নয়। দেখ্‌ছি যে চণ্ডীদাসের পরে এই সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদিরূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল;—কিন্তু এটা একটা প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান আর ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে'. গিয়ে' একটা কাল্পনিক বৌদ্ধ-যুগ খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ'ড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু এই কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন তারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ক'টিও নিতান্তই কাল্পনিক।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা—অর্থাৎ ১৬শ'

বা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের পুঁথির অভাব,—বাধ্য হ'য়ে বহুদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আট্‌কে থাক্‌তে হ'য়েছিল ; অথবা কল্পনা দিয়ে তার আগেকার ফাঁক পুরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'ল্‌ছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর দশেক হ'ল দু' খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যার দ্বারা আমরা ১৫শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্য্যাপদ। প্রথম খানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন ; বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়ালঘরের মাচার উপরে এক ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটী ছিল। বসন্তবাবুকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটী তাঁর যথাযথ বর্ণনা ; এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানিনে। তিনি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার কর্ত্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লেখ-বিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। বাঙলা ভাষায় এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দু' একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন ; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের

কিছুতেই হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক কাব্য। কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মাত্র দু' একটীর সঙ্গে এর পদের মিল পাওয়া যায়। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর সাধারণতো অর্দ্ধশিক্ষিত আঁখরিয়া বা নকল-নবীশের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দ্‌লে যাবে তা নিঃসংশয়। কেউ কেউ বলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন; আবার কারো মতে দুইএর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন। কিন্তু সে কথায় আমাদের এখন কাজ নেই—কারণ আমরা ভাষা আলোচনা ক'র্‌ছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি, এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে; যারই লেখা হোক্ না কেন, ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০। ২০০ বছরের আগেকার দলিল মিল্‌ল, তার ইতিহাসের বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল।

তারপর চর্য্যাপদের কথা ধরা যাক্। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম দেওয়া একখানা পুঁথি অন্য তিনখানা পুঁথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের' বিশেষ স্থান আছে—অন্য তিন

খানির ভাষা বাঙলা নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয় এখানে এখন কিছু ব'ল্‌বো না। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে চর্য্যা বা চর্য্যাপদ বা পদ বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'ল্‌তে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে একরকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক—যারা ঐ সাধন-পথের গুহ্যতত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুঁথিতে চর্য্যা-পদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির চেয়ে বেশী নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে অন্ততঃ দেড় শ' বছর আগেকার;—দু চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যাঁরা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন-পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে, এই চর্য্যাপদ-গুলির ভাষা সত্যি-সত্যি বাঙলা কি না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে চর্য্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত এই দাঁড়িয়েছে যে এর ভাষা বাঙলাই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে

এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের দু'চারটে রূপ এসে গিয়েছে, তাতে এর ভাষার 'বাঙলাত্ব' যায় না। চর্য্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলাভাষার আর একটি মূল্যবান দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার কর্‌বার উপযুক্ত বস্তু মিল্‌ল—মোটামুটি খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

(৫)

এর পূর্ব্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই নে। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তখন অবশ্য বাঙলা ভাষা বা তার আদিম রূপ হিসেবে একটা কিছু বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা পাচ্ছি নে। আগে হিন্দু আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ক'র্‌তেন। এই-সব দান, দলিল ক'রে দানপত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুঁদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাক্‌ত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলা দেশে যা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটী হ'চ্ছে উত্তরবঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত সম্রাট্‌ কুমারগুপ্তের সময়ের; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত, আর তার পরবর্ত্তী কালেরও অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙলা দেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্র-শাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর

বর্ণনা করবার সময় মাঝে মাঝে দু' চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে দুই একটি উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের পিছনে জুড়ে দিয়ে' বাহ্যতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যেও তাদের প্রাকৃত রূপটাকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা করবার একটা সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। "কণামোটিকা" অর্থাৎ কিনা কানামুড়ী, "রোহিতবাড়ী" অর্থাৎ রুইবাড়ী, "নড়জোলী" অর্থাৎ নাড়াজোল, "চবটীগ্রাম" অর্থাৎ চটীগাঁ, "সাতকোপা" অর্থাৎ সাতকুপী, "হড়ীগাঙ্গ" অর্থাৎ হাড়ীগাং প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃতশ্রেণীর একটি ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষায় এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্ত্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে একটি বিষয় চোখে পড়ে: অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোনও আর্য্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্য আর্য্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। "অঝড়াচৌবোল, দিজমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডার-বীটিজোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী" প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য্যভাষার নয়; আর "পোল বা বোল", "জোটী, জোড়ী

বা জোলী", "হিট্ট বা ভিট্টা", "গড্ড বা গড্ডী", প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এই গুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে দেশে অনার্য্যদের বাস অনুমান ক'র্‌লে কেউ ব'ল্‌বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

কিন্তু এই সব নাম তো ভাষার পূরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্য্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেক্‌তে হয় একেবারে মাগধী প্রাকৃতে। সংস্কৃত নাটকে ছোটো-লোকের মুখের কথা এই ভাষায় বলানো হত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী প্রাকৃত বা অন্যান্য প্রাকৃতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী প্রাকৃত সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লে গিয়েছেন। বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন; খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন মনে হয়। বররুচি যে মাগধী প্রাকৃত আলোচনা ক'রেছেন, সেটী হ'চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা,—যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে কথাবার্ত্তা ব'ল্‌ত, সে ভাষা নয়; বরং তারই কাঠামোর উপর গ'ড়ে তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাঁধা একটী ভাষা। যাই হোক্, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী অন্ততো কতকটা কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা, বররুচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব্ব-ভারতে মগধে কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ'ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা

দেশে তখন যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধীই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্ত্তমান বাঙলা ভাষা বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয় নি। এই মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণগত একটী বিশেষত্ব ছিল, যা এর পৌত্রীস্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'র্ছে—সেটী হ'চ্ছে ভাষার 'শ ষ স' স্থানে কেবল 'শ'। মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্য ভাষা যে অবস্থায় ছিল, তার পরিচয় পাই অশোক অনুশাসনে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। স্থানভেদে অশোকের অনুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহবাজগড়ী আর মানসেহ্‌রার পাহাড়ের অনুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্ণার অনুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব্ব ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্যরকমের প্রাকৃতে লেখা। অশোকের পূর্ব্ব-ভারতীয় অনুশাসনাবলীর ভাষা—দু' একটী খুঁটিনাটী বিষয়ে ছাড়া—পরবর্ত্তী-কালের বররুচি কর্ত্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে পূরোপূরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্ব্বী প্রাকৃতকে মাগধী প্রাকৃতের একটী পুরাতন রূপ ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পূর্ব্বী অশোক-অনুশাসনের ভাষায় গেলে পাওয়া যায়। এই অশোকের পূর্ব্বী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিস্ফুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্ব্বী-প্রাকৃতের বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের

উপর লেগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে একটু একটু আন্দাজ ক'রতে পারি। অশোক বা মৌর্য্যবংশের পূর্ব্বে খুব সম্ভব বাঙলা দেশে আর্য্য ভাষার বিস্তার হয় নি। বুদ্ধদেবের সময়েও বোধহয় মগধ আর চম্পার পূর্ব্বদিকে আর্য্য ভাষা আসে নি। বুদ্ধ-দেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ যুগের অবসান কাল। এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০০-র দিকে, ভারতে কথিত আর্য্য ভাষা দেশ-ভেদে তিনটী ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[১] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য—কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্য্যই কালে অশোক যুগের পূর্ব্বী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে মাগধী প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা বৈদিক ভাষার একটী অর্ব্বাচীন রূপ মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য্য ভাষা তাহ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দ্দেশ পাচ্ছি:—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল, খ্রীঃ পূঃ ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জ্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্বেদে আর পরবর্ত্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্য্য ভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। এই সময় বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'রলে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ বইগুলিতে কিছু কিছু আভাস পাই; তা থেকে বুঝ্তে পারা যায় যে পূর্ব্ব অঞ্চলে যে আর্য্য ভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্য্য ভাষার ভাঙন ধ'রেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব্ব দেশেই হয়। পূর্ব্ব দেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই নে, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—"বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড, গিল্" প্রভৃতি।

[৩] এর পর দেখি, প্রাচ্য অঞ্চলের এই ভাষা প্রাকৃত রূপ নিয়ে', দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে :—এক, পশ্চিম খণ্ডের প্রাচ্য; আর দুই, পূর্ব্ব খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটাকে মাগধী নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্ব্বী প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটায় যে, পূর্ব্বীতে সব জায়গায় 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য'স'-র ব্যবহার ছিল। দু' একটা ছোটো লেখে এই পূর্ব্বী প্রাচ্য বা মাগধী প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক যুগের; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সুতনুকা-লিপি সব চেয়ে মূল্যবান। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে, মৌর্য্যদের কালে এই পূর্ব্বী-প্রাচ্য বাঙলা দেশে তার জড় গাড়্তে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্ত্তী কালের মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন পাই সংস্কৃত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে এর যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চ্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্র-শাসনের দু' একটী নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী প্রাকৃত আস্তে আস্তে ব'দ্‌লে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে পরিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলাভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ, তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলা দেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলাভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অরাজকতা অশান্তি তখন দেশব্যাপী হ'য়েছিল। পরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের উত্থান, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্ত্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলাভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে কটা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সে গুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুল্‌তে পারি? ভাষার ক্রমিক বিবর্ত্তন দেখাতে হলে সেগুলোকে ট'প্‌কে বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে না, কারণ সেই সমস্ত যুগের মধ্যে দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত গতিতে চ'লে এসেছে। এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী প্রাকৃতের কাল থেকে চর্য্যাপদের কাল, মোটামুটি খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে একাদশ শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনামূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক'রতে পারা যায়? এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্ত্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী প্রাকৃতের সমকালীন আর তার স্বস্থানীয় শৌরসেনী, প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তাই দেখে'। শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বররুচির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্ত্তী যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করে; আর, একটী নাতিবৃহৎ গীতিকাব্যসাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্ব্বাচীন অবস্থা আমরা দেখ্‌তে পাই। পরবর্ত্তী যুগের এই শৌরসেনীকে "শৌরসেনী অপভ্রংশ" বা খালি "অপভ্রংশ" বলা হয়। শৌরসেনী হ'চ্ছে একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্য্যভাষা হিন্দী—এই দুইয়ের সন্ধি-

স্থল। শৌরসেনী অপভ্রংশ থাকায় বেশ পরিষ্কার দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে যে কিরকম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন যদি মাগধী প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে (শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন) উভয়ের সংযোগস্থল এক "মাগধী অপভ্রংশের" নিদর্শন পেতুম,—"মাগধী অপভ্রংশ" নাম যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাকৃত, তাহলে বাঙলার উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না মাল-মশলা আমাদের হাতে জুটতে পারত! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সাত শ' বছরের মধ্যে বাঙলা দেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন দেব-ভাষা সংস্কৃতে;—আর জনসাধারণ চিত্ত-বিনোদনের জন্য বা দেবতার আরাধনার জন্য ভাষায় যে গীতিকবিতা গান আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখ্‌ত, সেগুলি সব লোপ পেয়েছে। যুক্তিতর্কের অনুসারে, মাগধী প্রাকৃত আর বাঙলা ভাষা এই দুইয়ের সন্ধিস্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের স্থাপিত ক'রতে হবে; আর তাকে "শৌরসেনী-অপভ্রংশের" নজীরে "মাগধী-অপভ্রংশ" নাম দিতে হয়। আর যুক্তিতর্ক আর ভাষাতত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার ক'রে এই মাঝের অবস্থার, আমাদের কল্পিত এই মাগধী অপভ্রংশের, রূপ কিরকম ছিল তাও স্থির ক'রতে হবে। অবশ্য যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটা একটু জটিল ঠেক্‌বে, কিন্তু এটা হ'চ্ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কানুন বা সূত্র বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। সূত্র যেখানে ছিন্ন, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে' ছিন্ন অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে' অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বদিক ▷ প্রাচ্য ▷ মাগধী প্রাকৃত ▷ মাগধী অপভ্রংশ ▷ প্রাচীন বাঙলা ▷ মধ্যযুগের বাঙলা ▷ আধুনিক বাঙলা। বাঙলাভাষার ইতিহাস চর্চ্চা ক'রতে হ'লে এই কয় ধাপের প্রত্যেকটীর সঙ্গে পরিচয় দরকার;—মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত হ'লেও ভাষা মুখ্যতো একটী প্রাকৃতিক বস্তু; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্য্যাকারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হ'য়েছে, সেই কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বল্‌বার স্থান এ নয়, তবে বাঙলাভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দুটী ছত্র উদ্ধার ক'রে বাঙলাভাষার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কিরকম ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখাবার প্রয়াস করা গেল। ছত্র দুটী "সোনার তরী" কবিতা থেকে নেওয়া সর্ব্বজন পরিচিত ছত্র—"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" আলোচনার সুবিধার জন্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ "তরী"কে বাদ দিয়ে নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ "না"টী বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ "উহারে"কে বর্জ্জন ক'রে "আধুনিক "ওরে"কে নেওয়া হ'ল।

আধুনিক বাঙলা	গান গেয়ে [না] বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন (জেন) মনে হয় চিনি [ওরে]।
মধ্যযুগের বাঙলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)	গান গায়্যা (গাইহ্যা) নাও বায়্যা (বাইহ্যা) কে আস্যে (আইসে) ে পারে, দেখ্যা (দেইখ্যা) জেহ্ন মনে হোএ চিহ্নী ওহারে।

প্রাচীন বাঙলা (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ)	গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারই, দেখিআ জৈহণ মণে (মণহি) হোই, চিহ্নিবিঁ (চিহ্নিমি) ওহারই।
মাগধী অপভ্রংশ (আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ)	গাণঁ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কি (কএ, কই) আইশই পারহি, দেক্‌খিঅ জইহণ মণহি হোই, চিহ্নিমি ওহ- করহি (ওহ)।
গামধী প্রাকৃত (আনমানিক ২০০ খ্রীঃ)	গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) কে (*কগে) আবিশদি পালধি (পালে), দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) জাদিশণং মণধি হোদি, চিহ্নেমি অমুশ্‌শ।
প্রাচ্য প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রীঃ পূঃ)	গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা কে (ককে) আবিশতি পালে, দেক্‌খিত্বা যাদিশং মনোধি (মনসি) হোতি (ভোতি), চিহ্নেমি অমুম্‌।
বৈদিক (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূঃ)	গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা কঃ (*ককঃ) আবিশতি পারে, *দৃক্ষিত্বা যাদৃশম্‌ মনসি ভবতি, চিহ্নয়ামি অমুম্‌।

এর পূর্ব্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে যে অবস্থা ছিল, সেই প্রাক্‌-বৈদিক অবস্থাও আমরা প্রাচীন ইরাণীয়, গ্রীক, লাটিন. কেল্‌টিক, শ্লাভ, আর জার্ম্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠন ক'রতে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটো মোটা কথা ব'ল্লুম। এ ছাড়া বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,—যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্লে কি বুঝ্তে হবে; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কিরকম, আর কতটা; বাঙলাভাষার উপর অনার্য্য প্রভাব; মুসলমান আর বাঙলাভাষা; বাঙলাভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা-আশঙ্কা;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। যে যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক'র্লুম, সে সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'র্তে গেলে বা মত দিতে গেলে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সেটা সকলেই স্বীকার ক'র্বেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কাব্য জিজ্ঞাসা।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

(১)

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামে গল্পের অশরীরী নায়িকাটি তার জীবিত কালের শরীরাবশেষ কঙ্কালটিকে নিয়ে বড়ই লজ্জায় পড়েছিল। অস্থি বিদ্যার্থী ছাত্রকে সে কি করে' বোঝাবে যে ঐ কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর তার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, যে সে শরীর থেকে যে অস্থি বিদ্যা শেখা যেতে পারে তা অতি বড় শরীর-বিদ্যাবিদেরও বিশ্বাস হ'ত না! কাব্যের রসাত্মা যদি কাব্যরসের তত্ত্বালোচনা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে তাঁকেও নিশ্চয় এমনি লজ্জা পেতে হ'ত। কারণ কাব্যের তত্ত্ব বিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচারা। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্ব মাত্র। ধর্ম্ম-পিপাসুর কাছে 'থিয়লজি' যে বস্তু, কাব্যরসিকের কাছে কাব্যের রস বিচারও সেই জিনিষ। তবুও এ বিচারের দায় থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। যা মুখ্যত বুদ্ধির বিষয় নয় তাকেও বুদ্ধির কোঠায় এনে, বুদ্ধির যন্ত্রপাতি দিয়ে একবার মাপযোগ করে না দেখ্‌লে, মানুষের মনের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুতরাং ধর্ম্মের সঙ্গে 'থিয়লজি' থাকবেই, কাব্যে সাথে সাথে অলঙ্কার-শাস্ত্র গড়ে' উঠ্‌বেই। কেবল ও শাস্ত্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলেই বিপদ।

কাব্যের রস বিচার মানুষকে কাব্য-রসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিষ। আলঙ্কারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে "সহৃদয়হৃদয়সংবাদী"। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্য-রসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে 'রসের' আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় 'রসের আস্বাদ', তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার করে' কথা বলা হয়। (১) যেমন আমরা কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে', যদিও পাকের যা ফল তাই ভাত। তেমনি যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা অনুভূতি', কিন্তু ঐ প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে 'রস'। (২) সহৃদয় লোকের, অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মত নির্ম্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, (৩) এমন দরদী লোকের সুকাব্য-জনিত চিত্তের অনুভূতি বিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়—সহৃদয় কাব্য পাঠকের মন। "কাব্যে রসয়িতা সর্ব্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্।"

রস যখন এক রকমের মানসিক অবস্থা, তখন স্বভাবতই তার পরিচয়ের প্রথম কথা,—কি করে' মনে এ অবস্থার উদয় হয়।

---

(১) "রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্ম্মকর্ত্তরি বা প্রয়োগঃ"। (সাহিত্য দর্পণ)।

(২) "ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ।" (অভিনবগুপ্ত। ২।৪)।

(৩) "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।" (অভিনবগুপ্ত। ১।১)।

মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে' কাণ্ট দেখিয়েছেন যে তাতে দু রকমের উপাদান—মানসিক ও বাহ্যিক। বাইরের উপাদান ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনি উদয় হয়, যখন মনের কতকগুলি তত্ত্ব, ঐ বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে', তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এই সব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে পায় না, নিজের ভিতর থেকে এনে বাইরের জিনিষের উপর ছাপ দেয়। রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান, রৌদ্র এবং পূর্ব্বের ঠাণ্ডা ও পশ্চাৎ গরম মাথা—ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে ; কিন্তু রৌদ্র ও গরম মাথার সম্বন্ধটি, অর্থাৎ ওদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্য্যকারণ তত্ত্বের প্রয়োগেই ঐ বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অথবা উল্টে বলাও চলে, ঐ বাহ্যিক উপাদানই মনোগত সাধারণ কার্য্যকারণ তত্ত্বকে বিশেষ কার্য্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে। এবং জ্ঞান অর্থই বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব এ দুয়ের সংযোগ হ'লে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ, ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি পঙ্গু নয়, একবারে শূন্য।

রসের বিশ্লেষণে আলঙ্কারিকেরাও এই দুই উপাদান পেয়েছেন,—মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হ'ল মনের 'ভাব' নামে চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন্' গুলি। আর ওর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মত, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্টি কাব্যের জগৎ থেকে। আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্যজগতের ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের 'ভাব' রূপান্তরিত হয়ে 'রসে' পরিণত হয়। সুতরাং আলঙ্কারিকদের মতে 'রস' জিনিষটি

লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে সব 'ভাব' রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতেই তাদের অস্তিত্ব, এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। কিন্তু এই 'ভাব বা 'ইমোশন' 'রস' নয়, এবং মানুষের মনে যাতে এই 'ভাব' জাগিয়ে তোলে তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে 'রসের, উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয় তা, চোখে জল আনলেও, মনকে অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে সেই জানে। যদিও একে প্রমাণ করে' দেখান কঠিন। কারণ,—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥" (সাহিত্যদর্পণ।)

'করুণা প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব্ব সুখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি'। তবু এ কথাও আলঙ্কারিকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে করুণ রস যদি দুঃখেরই কারণ হ'ত, তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণ রসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না।

"কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তদা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥" (সাহিত্যদর্পণ।)

কিন্তু করুণ রসের আনন্দ কাব্য-রসিক মানুষকে নিয়তই সে দিকে টান্‌ছে। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"। আলঙ্কারিকেরা বলবেন, "ঠিক কথা। কিন্তু মনে থাকে যেন, '*tell of* saddest thought'। যা মনে সোজা-সুজি sad thought আনে তা, sweet ও নয়, song ও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought এর কথা বলেন, তখনি তা sweetest song হয়।"

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্য-জগতের এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলঙ্কারিকেরা বলেন, রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনটি সুখের, কোনটি দুঃখময়। কিন্তু ঐ সব লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে, পাঠকের মনে ঐ সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে তাদের এক অলৌকিক বস্তু—'রসে'—পরিণত করে। 'রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও, তার পরিণাম যে 'রস' তা নিত্য আনন্দের হেতু। কারণ লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

"হেতুত্বং শোকহর্ষাদে
র্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।

শোকহর্ষাদয়ো লোকে
জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ ॥
অলৌকিক বিভাবত্বং
প্রাপ্তেভঃ কাব্য সংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ
সর্ব্বেভ্যোহপীতি কা ক্ষতিঃ ॥" (সাহিত্য দর্পণ।)

(২)

কবি যে কাব্যের মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন তার কৌশলটি কি? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবশ্য অসম্ভব। কারণ, এ প্রশ্ন হচ্ছে নিখিল কবি—প্রতিভার নিঃশেষ পরিচয় দাবী করা। কিন্তু প্রতি কবির প্রত্যেক কাব্যের নির্ম্মাণ কৌশল অন্য সকল কাব্য থেকে অল্প বিস্তর স্বতন্ত্র। কারণ প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কলের তৈরী জিনিষ নয়। সুতরাং কাব্যতত্ত্ব সে কৌশলের যে পরিচয় দিতে পারে, সে পরিচয় সকল—কাব্য-সাধারণ কাব্য—কৌশলের কঙ্কাল মাত্রের পরিচয়। এ কাজ সম্ভব, কারণ দেহের রূপের ভেদ সত্বেও, কঙ্কালের রূপ প্রায় এক।

আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্য—নির্ম্মাণ কৌশলের তিন ভাগ। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

'বিভাব' কি?

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।" (সাহিত্য দর্পণ)

'লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই 'বিভাব' বলে'। যেমন,—

"যে হি লোকে রামাদিগত—রতি—হাসাদীনামুদ্বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো 'বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি--ভাবাঃ' ইতি বিভাবাউচ্যন্তে।" (সাহিত্য দর্পণ।) লৌকিক জগতে যে সীতা, ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি, হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয় তখন তাকে 'বিভাব' বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনের রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে, যে তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

'অনুভাব' বলে কাকে ?

"উদ্বুদ্ধং কারণৈ স্বৈঃ স্বৈ—
বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽ—
নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥" (সাহিত্য দর্পণ।)

'মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যে সব স্বাভাবিক বিকার, ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই সব লৌকিক কার্য্য কাব্য ও নাটকের 'অনুভাব।'

"দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।"

"মিলন-মধুর লাজের" এই কাব্য ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি 'অনুভাব'।

(৩)

এইখানে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাস বাক্যে কাব্য রসের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতেই এখন তার অর্থবোধ হবে।

"শব্দসমর্পমানহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত,—প্রাঙ্‌নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার,—স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার,—রসনীয়রূপো রসঃ।" (১।৪।)

'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিদের (consciousness) আস্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্ব্ব নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাবের' কারণ ও কার্য্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য—পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট 'ভাব'গুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে।'

অভিনবগুপ্ত 'বিভাব' ও 'অনুভাব'কে বলেছেন—'সকল হৃদয়ে সমবাদী'। কারণ যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্ত্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ—
সান্তরায়তয়া তথা।
অনু কার্য্যস্য রত্যাদে—
রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ॥" (সাহিত্য দর্পণ)

'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক;

সুতরাং প্রেমের রস--বোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত, লৌকিক ভাবকে "সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী," অলৌকিক রসমূর্ত্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের 'বিভাব' ও 'অনুভাবের' মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্য-চিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়,—

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ।"

(সাহিত্য দর্পণ।)

যার ফলে,—

"পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ॥"

(সাহিত্য দর্পণ।)

'কাব্য পাঠকের মনে হয় কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনও ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।'

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মত, তা একটি abstract জিনিষ। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণ রূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয়জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এই জন্যই কবি যখন কাব্যে ভাবকে রসের মূর্ত্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবের লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে উঠেন। লৌকিক ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাক্‌লে, যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না। 'ধ্বন্যালোকের' একটী কারিকা আছে,—

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥" (১।৫।)

'সেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। যেমন, পুরাতনী কথায় বলে, আদিকবির ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব—বিয়োগজনিত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল।' এই কারিকার প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন,—'এ কথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হ'ত তবে, ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাক্‌তেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হ'ত না। কারণ কেবল দুঃখ সন্তপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।' ("ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তস্যৈষা দশেতি।") অভিনবগুপ্ত বলেন, এখানে যা ঘটেছে তা এই ;—

সহচরী—বিয়োগ—কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন স্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে' ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে। ("সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্য্যধ্বংস-

সনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ…স এব…আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণ-রসরূপতাংলৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ…সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।")

আলঙ্কারিকদের আবিষ্কৃত, লৌকিক 'ভাবকে' কাব্যের 'রসে' রূপান্তরের এই তত্ত্বটি, ইতালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ অনেকটা ধরেছেন। তাঁর "কাব্য ও অকাব্য" নামক গ্রন্থে ক্রোচ লিখ্‌ছেন,—

"What should we call the blindness of a poet? The incapacity of seeing particulcar passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordant ideals in the ideal which shall compose them in harmony: what at one time was called incapacity of "idealizing." For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." (৪)

(৪) European Litrature in the Nineteenth Century নামে ইংরেজী অনুবাদ : ৫২ পৃষ্ঠা।

ক্রোচের "poetic idealization" আলঙ্কারিকদের 'ভাব' ও তার কারণ কার্যের, "সকল হৃদয়সংবাদী" 'বিভাব', 'অনুভাবে' পরিণতি। ক্রোচের 'passage from troublous emotion to the serenity of contemplation', আলঙ্কারিকদের লৌকিক 'ভাবকে' আস্বাদ্যমান 'রসে' রূপান্তর। "Serenity of contemplation" হচ্ছে দার্শনিক সুলভ 'মনন' বৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলঙ্কারিকদের "রস চর্ব্বণ" কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশী ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি Wordsworth যে কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, poetry "takes its origin from emotion recollected in tranquility", সেটি আলঙ্কারিকদের এই 'রূপান্তর বাদের' ই অস্পষ্ট অনুভূতি, ও অস্ফুট বিবৃতি।

আজকের দিনের 'লিরিক' কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের 'ভাবই' কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই বুঝি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময় তাঁর কাব্য-রচনাও তত সার্থক। কিন্তু 'লিরিক' কিছু আলঙ্কারিকদের কাব্য-বিশ্লেষণের বাইরে নয়। 'ভাব' যদি না কবির মনে রসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাকে সে 'বিভাব' ও 'অনুভাবে' প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে। মনে যাতে 'ভাব' উদ্বুদ্ধ হয় তাই যদি কাব্য হ'ত, তবে আজ বাঙ্গলাদেশে যে সব হিন্দুমুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হ'ত। কারণ অনেক হিন্দু-

মুসলমানের ক্রোধই তাতে জাগ্রত হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন, "তোমার পুত্র জন্মেছে", এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ তা রস নয়, এবং ও বাক্যটিও কাব্য নয়। ('পুত্রস্তে জাতঃ' ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা নাপি লক্ষণয়া।" ১।৪) 'অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ সিদ্ধস্বভাবসুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি।" 'কিন্তু কবি সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা, সহৃদয় পাঠকের সম বাদী তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত মনে, ঐ হর্ষকেই, স্বভাবসিদ্ধ সুখ থেকে বিভিন্ন লক্ষণ, আস্বাদ্যমান রসের রূপে পরিণত করতে পারেন।' যেমন কালিদাস রঘুর জন্ম শ্রবণে দিলীপের 'হর্ষকে' করেছেন ;—

"জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ এয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি॥"

তবুও যে ভাবোদ্বেল কবির আবেগময় কাব্য কাব্য-রস থেকে বঞ্চিত নয়, তার কারণ 'ভাব' "শব্দে সমর্পিত" হ'লেই ব্যক্তিগত লৌকিকত্বের গণ্ডী থেকে কতকটা মুক্ত হয়। কেন না ভাষা জিনিষটিই সামাজিক। কিন্তু 'লিরিক' যত 'ভাব'—ঘ্যাসা হয় ততই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, তা যে কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদাহরণ নিলেই দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'অনন্তপ্রেম'।

"তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শতবার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!

* * * * * *

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।"

এর সঙ্গে যদি হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে", কি নবীনচন্দ্রের "কেন দেখিলাম", তুলনা করা যায়, তবেই কাব্যের রস ও ভাবের উচ্ছাসের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হবে।

(৪)

আলঙ্কারিকেরা 'বিভাব' ও 'অনুভাব' ছাড়া "সঞ্চারী" নামে কাব্য-কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হ'লে, 'ভাবের' যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলঙ্কারিকেরা তাঁদের রসতত্ত্বের ভিত্তি গড়েছেন তার একটু বিবরণ দিতে হয়।

মানুষের মনের 'ভাব' বা 'ইমোশন' অনন্ত। কারণ 'ইমোশন' শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের ভাষায় 'ইমোশন' হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্ব্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ 'ইমোশন' বা 'ভাবের' সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি idea বা 'বিজ্ঞানকে' অবলম্বন করে' বিদ্যমান থাকে। এই 'আইডিয়া' পুঞ্জের কোনও অংশের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলেই, 'ইমোশন'

বা 'ভাব' নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটে। 'আইডিয়ার' সংখ্যা অগণ্য এবং তাদের পরস্পর যোগ বিয়োগের প্রকারও অসংখ্য। সুতরাং 'ভাব' বা 'ইমোশন' সংখ্যাতীত। এবং কোনও 'ভাব' অন্য 'ভাবের' সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও, যেমন মনোবিজ্ঞানবিদ্, তেমনি আলঙ্কারিক, কাজের সুবিধার জন্য, অগণ্য স্বলক্ষণ 'ভাবের' মধ্যে কয়েক প্রকারের 'ভাবকে,' সাদৃশ্য বশত কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত করে', পৃথক করে' নিয়েছেন। আলঙ্কারিকেরা এই রকম নয়টি প্রধান 'ভাব' স্বীকার করেছেন,—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, ওশম।

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥"

এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন "স্থায়ী ভাব"। কারণ, "বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ" (অভিনবগুপ্ত, ৩।২৪)। 'ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় সেইটি স্থায়ীভাব।' আলঙ্কারিকদের মতে এই নয়টি 'ভাব', কাব্যের 'বিভাব', 'অনুভাবের' সংস্পর্শে, যথাক্রমে নয়টি 'রসে' পরিণত হয়,— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত, ও শান্ত।

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভূত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥"

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু 'ভাব' আছে, এবং তার মধ্যে অনেক 'ভাব', কাব্যের 'বিভাব ও অনুভাবে',

আলঙ্কারিকদের কথায়, "আস্বাদ্যমানতা" প্রাপ্ত হয়। আলঙ্কারিকেরা 'নির্ব্বেদ', 'লজ্জা', 'হর্ষ', 'অসূয়া', 'বিষাদ' প্রভৃতি এ রকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন, এবং তা ছাড়াও যে আরও অনেক 'ভাব' আছে তা স্বীকার করেছেন। "ত্রয়স্ত্রিংশদিতি ন্যূনসংখ্যায়াঃ ব্যবচ্ছেদকং ন ত্বধিকসংখ্যায়াঃ।" এই সব 'ভাবকে' আলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী' ভাব। তাঁদের 'থিওরী' হচ্ছে যে, এই সব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনও না কোনও 'স্থায়ীভাবের' সম্পর্কেই মনে যাতায়াত করে', সেই 'স্থায়ীভাবের' অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য এদের নাম 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী'। (৫) 'ভাবের' এই থিওরী থেকে স্বভাবতই 'রসের' থিওরী এসেছে যে, কাব্যে 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র রস-মূর্ত্তি নেই; তাদের "আস্বাদ্যমানতা" স্থায়ীভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানারকমে পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নব রসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই 'সঞ্চারীর' আস্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলঙ্কারিকই, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, 'সঞ্চারী' ভাবের পরিণতিকে 'রস' বল্‌তে রাজী নন। অভিনব গুপ্ত বলেছেন, "স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সংচারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ন তু রসানাং স্থায়ি সংচারি ভাবেনাঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা"। 'স্থায়ীভাবের পরিণতিই 'রস', বাকীগুলিকে বলে 'সঞ্চারী'। রসের ধ ɿ আবার 'স্থায়ীরস' ও 'সঞ্চারী রস' এই ভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।' এবং তাঁর মতই অধিকাংশ আলঙ্কারিকের মত। কিন্তু 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী'র এই প্রভেদ কিছু মূলগত

(৫) "স্থিরতয়া বর্ত্তমানে হি রত্যাদৌ নির্ব্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামভিমুখ্যেন চরণাদ্ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।" (সাহিত্যদর্পণ।)

প্রভেদ নয় ; এবং 'সঞ্চারী' ভাবের স্বতন্ত্র 'রসে' পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু অতি সাহসের কথা। সেই জন্য আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, 'সঞ্চারী' ও 'রস', কেবল 'রসের' পরিপুষ্টি সাধক নয়। অভিনবগুপ্ত ভাগুরি নামে এক আলঙ্কারিকের মত তুলেছেন, "তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসনামপি স্থায়িসংচারিতাস্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবোচৎ বাঢ়মস্তীতি"। 'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আছে। এর উত্তরে ভাগুরিও বলেছেন, অবশ্য আছে।' এবং সকল আলঙ্কারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে 'স্থায়ী' ও 'সঞ্চারী' এই ভেদটি আপেক্ষিক। কারণ, এক কাব্য-প্রবন্ধে যখন নানা রস থাকে, তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে একটি 'রস' প্রধান, এবং স্থায়ীভাবের পরিণতি অন্য 'রস' তার পরিপোষক হয়ে' 'সঞ্চারীর' কাজ করছে। "রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি" (ধ্বন্যালোক, ৩।২৪)। 'এক 'রস' অন্য 'রসের' ব্যভিচারীর কাজ করে'।

"প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্ত্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥" (ধ্বন্যালোক, ৩।২১)।

'এক কাব্য-প্রবন্ধে নানা রস একত্র থাক্‌লেও, দেখা যায় কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটা রসকেই প্রধান করেন।' এবং বাকী 'রস'গুলি তার পরিপোষক বা 'সঞ্চারী'। এই 'সঞ্চারী' কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলঙ্কারিকদের মধ্যে এ মতও চল্‌তি হয়েছিল যে 'সঞ্চারী' দিয়ে পরিপুষ্ট না হলে 'রসের' রসত্বই হয় না। "পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্" (ধ্বন্যালোক, ৩।২৪, বৃত্তি।)।

কবিরাজ বিশ্বনাথ যে কারিকায় 'রসের' 'উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, 'সাহিত্য-দর্শনের' সেই কারিকাটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ
স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্ ॥"

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, (কাব্যের) 'বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে', রসে পরিণত হয়।' আশা করা যায় এর আর এখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(৫)

আলঙ্কারিকদের রসের তত্ত্ব একটা উদাহরণে বিশদ করা যাক। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণা সভায় স্থির হ'ল শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে' ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের কাছে পাঠান হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে সকলেই মত দিলেন যুদ্ধ না করে' শান্তিতেই যাতে বিবাদ মীমাংসা হয় সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, 'যাতে শান্তি স্থাপন হয় সেই চেষ্টা কোরো। দুর্য্যোধনকে উগ্র কথা না বলে, মিষ্ট কথায় বুঝিও'। শ্রীকৃষ্ণ হেসে বল্লেন, 'ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব্ব। এ যেন ভারহীন পর্ব্বত, তাপহীন অগ্নি'। কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজাসুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন। তখন, :—

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থ সহিতং হিতম।
কৃষ্ণা দাশার্হ মাসীনমব্রবীচ্ছোক কর্ষিতা॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য স্বসিতায়ত মূর্দ্ধজা।
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথম্॥
ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্ম্মনাঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বাক্য মুবাচেদং যশস্বিনী॥

* * * * * *

কা নু সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী॥
আজমীঢ়কুলং প্রাপ্তা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চ্চসাম্॥
সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ত্বয়ি জীবতি কেশব॥
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেষ্বথ বৃষ্ণিষু।
দাসীভূতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা॥

* * * * * *

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্‌বলম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি॥
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্ব্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্॥
ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্ব্ব গন্ধা ধিবাসিতম্॥

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগ বর্চ্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা ॥
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসন করোদ্ধৃতঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥
যদি ভীমার্জ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তি হৃদয়স্য মে ॥
ত্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥
বিদীর্য্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্‌শল্যপীড়িতম্।
যোঽয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্ম্মমেবানু পশ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা বাষ্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়ত লোচনা।
রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সস্বরং বাষ্পগদ্‌গদম্ ॥

(মহাভারত; উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৮১।)

'ঘোরকৃষ্ণ আয়ত কেশা, যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যশ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করত অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—"হে কেশব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে

আমার তুল্য নারী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদীসমুত্থিতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও পঞ্চইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্লিষ্টা হইয়াছি; পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিদ্যা ও ভীমসেনের বলে ধিক! যে দুর্য্যোধন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।”

‘অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, সুদর্শন, ঘোরকৃষ্ণ, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগ সদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিও। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হয়েন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, পাংশুগুণ্ঠিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়। আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের

বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে, কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।'

ব্যাসের এই মহাকাব্যখণ্ডের কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনও কাব্য-রসিককে সচেতন করতে হবে না। ওর কাব্যের দ্যুতি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। এখন আলঙ্কারিকদের কাব্য বিশ্লেষণ ওতে প্রয়োগ করে' দেখা যাক্।

আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন, এ কাব্যের আত্মা হচ্ছে কয়েকটি রস। কিন্তু কাব্যটি "নানা রস নিবন্ধ" হলেও কবি একটি রসকেই প্রধান করেছেন। সে রস 'রৌদ্র' রস। রৌদ্ররসের লৌকিক 'ভাব'-উপাদান হচ্ছে 'ক্রোধ'। বাস্তব জীবনে 'ক্রোধ' মনোহারী জিনিষ নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব্ব রস-মূর্ত্তিতে পরিণত করেছে। রৌদ্ররসের 'বিভাব' হচ্ছে লৌকিক জগতে যাতে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তার শব্দে সমর্পিত হৃদয়-সংবাদী চিত্র। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও তাদের নিদারুণ অপমানের সেই চিত্র এখানে সামান্য কয়েকটি রেখায় ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ 'সভাপর্ব্বে' তার অত্যুগ্র, উজ্জ্বল ছবি সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে পূর্ব্ব থেকেই ক্রোধের রৌদ্র রাগে রক্তিম করে' রেখেছে।

কিন্তু রৌদ্র রসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হ'ত তবে এর কাব্যত্বের শতাংশও অবশিষ্ট থাক্‌ত না। আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন, কয়েকটি 'সঞ্চারী' এর রৌদ্র রসকে আশ্চর্য্য সরসতা ও পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নবরসের দুইটি প্রধান রস, বীর ও করুণ, এবং কয়েকটি

ব্যভিচারী—বিষাদ, গর্ব্ব, দৈন্য,—রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে' তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোককম্পিত, অশ্রুলোচন, বিষাদ মূর্ত্তিতে কাব্যের আরম্ভ হ'ল। তার পর দ্রৌপদীর পিতৃকুল, পতিকুল ও মিত্র—সৌভাগ্যের যে গর্ব্ব তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে। আর শোকের অন্তরে যে ক্রোধ তার রৌদ্রের রক্তিমদ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজলে রক্তের রামধনু ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্ত্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায় মিলিয়ে গেছে।

মহাভারতকার যে দুটি শ্লোকে দ্রৌপদীর মহাভুজঙ্গের মত দীর্ঘ বেণীর ছবি এঁকেছেন; সেই বেণী যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করবে, আলঙ্কারিকেরা তাকেই বলেন কাব্যের 'বিভাব'। এ কাব্যের সমস্ত রসের অবলম্বন হচ্ছে দ্রৌপদী। সুতরাং সেই সব রসের অনুগত দ্রৌপদীর, ও তার চেষ্টার ছবি,

"কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা।
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।"

এ কাব্যের 'বিভাব'। বলা বাহুল্য এর মত 'বিভাব' মহাকবিতেই সম্ভব। অন্য কবির হয় এ ছবি কল্পনায় আসত না, না হয় বেণীর বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক চল্‌তো।

এর পর দ্রৌপদীর বাক্য করুণ ও রৌদ্রের এক অপরূপ মিশ্রণ দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি কখনও সন্ধির কথা মনে হয়, দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই বেণীর কথা মনে কোরো।' এবং এই মিশ্র রস বীর-পিতা, বীর-ভ্রাতা ও বীর-পুত্র ক্ষত্রিয় নারীর বীর রসের তাপে তপ্ত হ'য়ে, রৌদ্রের বহ্নিরাগে দপ্ করে জ্বলে' উঠেছে।

এবং অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হ'লেও, সে করুণ রস মুখ্য রৌদ্ররসকে নির্ব্বাপিত না করে', তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে। যে শোকের ছবিতে কাব্য সমাপ্ত, সে ছবি কয়েকটি 'অনুভাব' দিকে আঁকা। লৌকিক শোক যা দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, ও ছবি তারই কাব্যে সমর্পিত রস মূর্ত্তি।

এ কাব্যের রসের বিবরণ এখনও শেষ হয় নি। কারণ এর রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের অন্তরালে আর একটি রসের মূর্ত্তি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কাব্যের ক্রোধ, বীরত্ব, শোক—সকলই যে তেজস্বিনী, সুন্দরী নারীর ক্রোধ, বীর্য্য ও শোক; কবি এ কথা বিস্মৃত হতে' দেন নি। সমস্ত কাব্যের মধ্যেই সে স্মৃতির উদ্দাম ছড়িয়ে রেখেছেন। সম্ভব না শৃঙ্গার রসের 'বিভাব' সুন্দরী নারীর সংস্পর্শ এর রৌদ্র, বীর, করুণ—সমস্ত রসের উপরেই একটা মাধুর্য্যের রশ্মিপাত করেছে।

এ কাব্যে রৌদ্র ও বীর-রস পাশাপাশি রয়েছে। একটু অবান্তর হ'লেও এদের প্রভেদটা একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় নিরর্থক নয়। রৌদ্র রসের 'ভাবের' উপাদান হ'ল 'ক্রোধ', কিন্তু বীর রসের 'ভাবের' উপাদান হচ্ছে 'উৎসাহ'। যাত্রার বীররস যে হাস্যাস্পদ তার কারণ যাত্রাওয়ালা রৌদ্র রসকে বীররস বলে' ভুল করে। তার মনে ধারণা যে বীর রসের উপাদান 'ক্রোধ'! "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে"—আলঙ্কারিকদের মতে বীর রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!"—কবি বীর রসের কবিতা মনে করে'

লিখ্‌লেও, আলঙ্কারিকেরা ওকে কখনই বীর রস বল্‌তে রাজী হতেন না। কারণ ওটি 'উৎসাহের' রস-মূর্ত্তি নয়।

আলঙ্কারিকদের এই কাব্য-বিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠন-মূলক' সমালোচনায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধরবে না, তা বেশ জানি। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ওর অর্থ ও সার্থকতা তাঁরা বুঝতেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকে সমালোচনার ফিঁকে রঙ্গে এঁকে কার কি হিত হয় তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism যে হয় কাব্যের রসকে, রস-হীন বাক্যের জল মিশিয়ে, পাতলা করে' পাঠকদের সাম্‌নে ধরা; না হয়, কাব্যের 'ইমোশনকে' সমালোচনার sentimentalism-এর একটা উপলক্ষ করা—এ কথা "আধুনিকতার" ঠুলি, যা আজ বাদে কালই পুরাতন বলে' গণ্য হবে, তা একটু খুলে ফেল্‌লেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আলঙ্কারিকেরা বুঝেছিলেন কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হ'লে পাত্‌লা করে', পাঠককে গিলেয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কারণ ও কাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পার্‌বে না। আলঙ্কারিকেরা জান্‌তেন কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না।

এই দীর্ঘ প্রস্তাবের এখানেই 'ইতি' করা যাক্। 'রসের' সঙ্গে কাব্যের আর সব উপাদান—তার বাচ্য-বাচক, তার ছন্দ ও অলঙ্কার—এদের সম্বন্ধ কি তা এখানেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্যের উপর আর জবরদস্তী করা অসম্ভব। আর একটি প্রস্তাবে

এর আলোচনা করা যাবে। Truth বা সত্যের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কি তা এই বিচারেরই অন্তর্গত। এবং আলঙ্কারিকেরা সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধের কি মত পোষণ করতেন তৃতীয় প্রস্তাবে তারও পরিচয় দেবো।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাধুমা'র কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু মা'র আর চিন্তার হাত থেকে নিস্তার ছিল না। তাঁর হয় একটি মেয়ে কি একটি ছেলে লিবার জ্বরে ভুগছে, নয় মারা গেছে,— এ সব একটা কিছু ঘটনা আছেই। নয়ত আমার পিতা, দিদিমা কর্ত্রীমণির সঙ্গে কিছু বাদবিসম্বাদ করছেন। তার দরুণ মা'র সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত হয়ে থাকতে হত। আমার পিতা যে কিছু মন্দ লোক ছিলেন তা নয়, তবে তাঁর একটা দোষ ছিল, তিনি মাঝে মাঝে নেশার বশীভূত হয়ে কলহ, গোলমাল করতেন। তাঁর সংসারে মন বসত না, কেননা তিনি বেশ বুঝতে পারতেন যে, এ সংসার কেবল পাঁচ জনের লুটের বাজার। যদি এ কথা বুঝিয়ে বল্‌তে যেতেন, কোন ফল হত না; দিদিমা ধমক দিতেন। কিন্তু বাবা বেশ বুঝতে পারতেন যে, তাঁর সন্তানগুলির ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। বাবাকে আমার কর্ত্রীমণি খুব আদরযত্ন করতেন ও বাবুয়ানায় লালন পালন করেন। ছোটবেলায় বাড়িতে মেম রেখে ইংরাজি শেখান। সাহেবের ইস্কুলে পড়ান। শুনেছি যে বাবা যদি অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে ইংরাজি বল্‌তেন, লোকে বল্‌ত এ ইংরাজে কথা কইছে। পরিষ্কার উচ্চারণ ছিল। আর তাঁর মন খুব খোলা, ও পরোপকারে রত ছিল। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে' বল্‌তেন যে, আমায় একটা বাবু করে' মানুষ করেছেন, একটু কষ্ট সইবার ক্ষমতা নেই; মখ্‌মল জরি মুড়ে, ক্ষীর সর ছানা খাইয়ে, আর আদর দিয়ে দিয়ে একটি

কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বানিয়েছেন; আর আমার ছেলে মেয়েগুলিকেও সেইমত করেছেন; কিন্তু এ সকল বাবুয়ানা কিসে চিরকাল চল্‌বে, বিষয় বে-বন্দোবস্ত, প্রচুর ব্যয়, আর তেমনি দেনা; আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এই সকল নানা কারণে বাবার মন বড় খারাপ হত; হলেই তিনি চিন্তারাক্ষসীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ঐ সুরাদেবীর আশ্রয় নিতেন। তিনি প্রায় নানা দেশভ্রমণেই জীবনাতিবাহিত করেছিলেন। শেষ তাঁর মৃত্যু হয় প্রয়াগধামে, ২৪ ঘণ্টার ভিতর, কলেরায়। আমার বাবা বাড়ীতে এলে বড় খুসি হতুম, কিন্তু যেদিন নেশা করতেন, আমি সেদিন বড় ভয় পেতুম। আমি দিদিমার কাছে আর ওবাড়ীতেই বেশী সময় অতিবাহিত করতুম। খেলা, আমোদআহ্লাদ—এইটী হলেই বড় আনন্দে থাকি। বাবা বৃন্দাবনে গিয়ে বনযাত্রা করেছিলেন, পরে অতি সুন্দর একখানি সচিত্র গোলকধাম এঁকেছিলেন। প্রথম আঁকেন সংসার-আশ্রম—তাতে চিত্রিত ছিল পুত্রকন্যা, স্ত্রী, পিতামাতা, দাসদাসী, গৃহপালিত পশুপক্ষীবেষ্টিত একটী ভবন। আবার তিন নং চিত্র বিশ্রাম-ঘাট—সেটা আমাদের নিজ বাড়ী; আর দশ নং ছিল নরককুণ্ড, একটী কঙ্কালবেষ্টিত কূপ। উচ্চস্থানে ছিল সুরলোক, তাতে ইন্দ্ররাজার যে প্রতিমূর্ত্তি, সেটা অঙ্কিত করেছিলেন তাঁর পিতার। তিনি বড় আদরে ছেলে ছিলেন, তাঁকে কর্ত্তামণি বাবু বলে ডাকতেন, আর তিনি বাবা বলতেন। আমার পিতার চেহারা ঠিক ইংরাজদের মতই ছিল। আর তাঁর স্বভাব ছিল—এ না হলে চলে না, এটী না হলে আহার করা যাবে না, তা নয়; যেদিন যা হোক্ চলে যেত। আর

খুব নকল করতে পারতেন। সব জাতীয় কথা কইতে পারতেন—বেহারা, বামুন, রজক, জলের ভারী, পরামাণিক, এদের সকলকার সঙ্গেই নকল আনন্দ করতেন।

আমি পূর্ব্বেই লিখেছি আমার নীচে দুটী ভগ্নী ছিল, তারা দুজনেই পীড়িত ছিল; তাদের বিস্তর চিকিৎসা হয়, কিন্তু পরমায়ু ছিল না। একটার মৃত্যু হয় ৪ বৎসর বয়সে; তখন মা আমার পূর্ণগর্ভা ছিলেন। সেইদিন রাত ২টার সময় একটী পুত্রসন্তান হয়েছিল; তার পরদিন আর একটা কণ্যা মারা যায়, তার বয়স ছ'বৎসর। এই রকম মা বিস্তর শোক পেয়েছিলেন।

আমার বিবাহের সম্বন্ধ হবার মধ্যে নানা কথা এসে পড়েছে। দুর্গাপূজা হয়ে গেল, পরে পূর্ব্বদর্শিত দেবতার মত লোকটী, যিনি ইডেন পার্কে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি পূজার পর দ্বাদশীর দিন পুনরায় আমাদের বাড়ীতে দর্শন দেন। দিদিমার কাছে এসে, প্রণাম করে' বসে, মিষ্টি মিষ্টি করে' কত কথা কইতে লাগলেন। আমিও দিদিমার কাছে বসেছিলুম। ক্রমে ক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। দিদিমা আমায় বল্লেন—যাও দাদা, খেলা করগে। আমি চলে গেলুম, একেবারে পাশের বাড়ী। পরে বাড়ী এসে সকলেরি মুখে শুনতে লাগলুম যে, আমার বেশ ভাল জায়গায় বিয়ে হবার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। যিনি এসেছিলেন, তিনি আমার শ্বশুর, খুব অমায়িক লোক। আর তিনি এটর্নি, তাঁর একটী ছেলে; ছেলেটীও নাকি খুব সুন্দর, ও ভালমানুষ। ঝিয়েরা সব আমায় খুব ক্ষেপায়,—এইবার আর গাড়ী চড়ে' বিবি হয়ে বেড়াতে পাবে না, ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে বসে থাকতে হবে।

আমিও শুনে শুনে যেন কিছু একটু বদ্‌লে গেলুম, একবার একবার একটু একটু চিন্তা করতে লাগলুম, মনে হতে লাগ্‌ল মা ও মেজমা যেমন বউ, সেইরকম আমিও বউ হব ত? আর বেড়াতে যেতে পারব না, ঠাকুরবাড়ী গিয়ে কীর্ত্তন শোনা হবে না। হোলির সময় দেউড়িতে বড় গামলায় আবীর গুলে একবার ঠাকুরবাড়ীতে, একবার রাস্তায়, একবার ও-বাড়ীর দিদিদের সঙ্গে আবীরখেলা আর হবে না। কিন্তু কি জানি আমার দেহটা পরমেশ্বর কি উপাদানে গঠিত করেছেন, চিন্তা আমায় বেশীক্ষণ চিন্তিত করতে সক্ষম হয় না, তখনি মন জোর করে নূতন আনন্দ এনে চিত্ত প্রফুল্ল করে। আমি অমনি একটা স্থির করে' গঠন করে নিলুম। বেশ ত ভালই, বরের বাড়ী যাব, কত গহনা পরব, ভাল ভাল জরির কাপড় পরব, আবার নতুন বাড়ী দেখব; শুনছি বাগান পুকুর আছে, ফুল তুল্‌ব, পুকুরে স্নান করব, বেশ কত মজা হবে। আমরা ত কাউকে শ্বশুরবাড়ী যেতে দেখিনি, ওবিষয় যে কি দুঃখ তা জানিনে। আমার যেমন খেলাধুলা, খাওয়াপরা চল্‌ছিল, সেই মতই চলেছে। নূতন ঘটনার মধ্যে একবার আমি, দাদা, খাজাঞ্চিদাদা আর কর্ত্তামণি, বামুন, চাকর, বেহারা নিয়ে, বজরায় ক'রে ফরাসডাঙ্গায় হীরালাল শীলের গঙ্গার উপর যে বাগান ছিল, তাতে গিয়ে মাসখানেক থাকি। আমার খুব আমোদ, বেলা ৭টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত জলের উপর থাকতুম। বাগানে নেমে স্নান আহারটা সেরে নিয়ে, আবার ওঠা হত। তার-পর রাত্রি ৮টার পরে নেমে বৈঠকখানায় শোওয়া হত। কর্ত্তামণির বায়ুর প্রকোপ হওয়াতে, সাহেব ডাক্তার ব্যবস্থা দেয় কিছুদিন জলে জলে বেড়ালে উপকার হবে। তবে কর্ত্তামণি বড়ই ভীতু

ছিলেন, তাঁর রাত্রে বোটে থাকতে সাহস হত না, সেইজন্য ঐ বাগানে নেমে থাকা হত। আর রান্না, ভাঁড়ার, লোকজনের থাকা, সবই বাগানেই ছিল। এক মাস থেকে কর্ত্তামণির একটু সুস্থ ভাব হয়, কিন্তু তাঁর আর ভাল লাগল না। দাদার পড়া কামাই, আমিও যাহোক টটা টিটি করি, তাও বন্ধ; এইসব নানা কথার আলোচনা করে, কর্ত্তামণি বল্লেন আর নয়, বাড়ী চল; পরদিনই আমরা বাড়ীর দিকে আসতে লাগলুম, দু'রাত বুঝি বজরায় ঘুমতে হয়, ভাঁটার টানে টানে তবে তিন দিনে কলকাতায় পেঁছিলুম। তার দিনকয়েক বাদে একদিন সন্ধ্যাকালে, একটী আধবুড়ো লোক এল, তার কালো রং, নাকটী খুব মোটা, খাঁদা, আর ঠোঁট দুটীও খুব মোটা, মাথায় আধপাকা আধকাঁচা চুল, সেগুলি সব খোঁচা খোঁচা হয়ে ঊৰ্দ্ধমুখে আছে; চক্ষু দুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, তাও আবার কোটরে প্রবিষ্ট; আর তার সাজ একখানি সরু লালপাড় ধুতি, আর গলায় একখানা কোঁচানো চাদর, পরে মনে পড়ে গেল গলায় দু'কণ্ঠী মালা, হাতে একটী ছাতা। তখন আমি বেড়িয়ে এসে প্রায় দিদিমার কাছেই সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকতুম; দিদিমা মহাভারত রামায়ণ পড়তেন, আবার কোনদিন পদ্মপুরাণ, কি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ পড়তেন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগত। আবার কোন দিন আমায় আস্তে আস্তে ভাল উপদেশ দিতেন,—এমনি করে' শ্বশুর বাড়ী যেয়ে ননদকে ভক্তি করবে, ননদের আর কেউ নেই, তিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে প্রণাম করবে; তোমার সব জায়েরা আছেন, তাঁদের কথা শুনবে, তাঁদের সব ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে ভাব করে খেলা করবে, যেন কখনও কাউকে মারাধরা কোরনা। যদিও দিদিমা জানতেন যে, আমি কখনও কারও ছেলে

মেয়েকে মারিনি, তবু আমায় ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা দিতেন। সেই যে অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তিটীকে বসিয়ে রেখেছি, এখন তার কথা হোক্। সে বুড়ো বল্‌ছে—আজ্ঞা মা, বড় মা পাঠালেন, তাঁর ছোট ছেলের বউটী ও-মাসে মারা গেছেন, একটী ১ বছরের মেয়ে রেখে গেছেন। তাই মা তাঁর বিবাহের জন্যে একটী মেয়ে খুঁজছেন,—যদি আপনার পৌত্রীটীর সঙ্গে দেন, তাহলে এই শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয়ে যায়। দিদিমা একটু ইতস্ততঃ করে বল্লেন যে, তোমাদের ছোট বাবুর ছেলেটী কেমন, তাঁর বিবাহ কবে হবে? দিদিমা একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন, কেননা ছোট বাবু ছেলের সঙ্গে স্থির করে গেছেন, সে ছেলেকেও ঐ গিন্নিই মানুষ করেছেন; আবার নিজের ছেলের জন্যে বলে পাঠালেন,—এর ভাবটী কি বুঝতে হবে। তখন ঐ লোকটী বলছে যে, ঐ বড়মার ভাগ্‌ঝি আছেন দুটী, তার বড়টী খুব সুন্দরী, তার সঙ্গে সে বাবুর বিয়ে দিতে মা'র খুব ইচ্ছা, তবে এখনও কিছু ঠিক নেই। তখন দিদিমা একটু ভাব পেলেন, বল্লেন আচ্ছা, তুমি কাল একবার এস, ও মেয়ে এখন ছোট, এই আট বৎসরে চলছে, আর ওর মা বাপকে বলি, আমি এখনি কি বল্‌ব। পরে বুড়ো আর একটী প্রণাম করে চলে গেল। দিদিমা সব কাণ্ড শুনে আর থাকতে পারলেন না, মাকে ডেকে বল্লেন—আবার বিয়ে টলমল, এখন কোন আশা নেই।

এইরকম কথাবার্ত্তা হয়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আর এখন কোন ঘটনা নেই। আমার বোনগুলি যে মারা যায় তা' আগেই লিখেছি। এখন একটী খোকা ছিল, আমি আর দাদা। আমি দাদার সঙ্গে একদিন একদিন লুকিয়ে স্কুলের গাড়ীতে উঠে বসে থাকতুম, কেউ জানতে পারত না, পরে খোঁজ নিয়ে শুনতেন। আমার দাদা

তখন পড়তেন নর্ম্মাল স্কুলে, আমি একটু স্কুলে বেড়িয়ে চলে আসতুম। সেইবার পোষ মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড্ আসেন, কলকাতায় খুব ধুম পড়ে' যায়, আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়; তবে এখনকার মত বৈদ্যুতিক আলো তখন আবিষ্কার হয় নি, ল্যাম্পে রং গুলে গুলে বাহারি করে সাজানো হয়েছিল, আর গ্যাস্। তবে বাজি নানাপ্রকার হয়েছিল। জগদানন্দের বাড়ী বরণ হয়েছিলেন, আমরা জাহাজ দেখতেও গিয়েছিলুম। জাহাজের নীচের গহ্বরে খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গরু ছিল, তাদের দুধ বাদ্সা খেতেন; তাদের গায়ের রং সাদা ধব্ধবে, তার ভিতর থেকে গোলাপী আভা বেরচ্ছে। তারপর দোতলায় খানার তদ্বির হচ্ছে, তেতলায় সব আফিস ঘর, পল্টনরা পাহারা দিচ্ছে, আর যুবরাজ চৌতলায় থাকেন। এক এক করে' সব ঘরগুলি দেখলুম, বড় চমৎকার; আয়নার দরজা আর. রকম রকম মখ্মল-মোড়া কৌচ সোফা ছিল, বড় বড় আয়না টাঙ্গানো। এক ঘরে প্রকাণ্ড স্নানের টব, আল্না, আয়না, টয়েল করবার সব জিনিস; আর একটি ঘর লাইব্রেরি, তা'তে সব সোনালীমোড়া বাঁধানো বই আর টেবিলচেয়ার সাজানো ছিল; আবার তাস খেলবার একটী টেবিল ছিল, তার চারদিকে চেয়ার দেওয়া। শোবার ঘরটী অন্য ধরণের সাজানো, খাট মশারী আয়না ফুলদান, মোটা কারপেট মোড়া ছিল। আমার কর্ত্তামণি আমায় কিছু দেখাতে কি খাওয়াতে পরাতে বাকি রাখেন নি, যখন কলকতায় যা নতুন হবে, সারকাস্, ইংরাজি থিয়েটার, ফেন্সি-ফেয়ার—সব দেখাতেন; মিউজিয়মে প্রায় যেতুম, জুলাজিকেলে মাসে একদিন যাওয়া হত; আমার বেড়াবার আমোদটা বড় ছিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষে।

(সিংহল হতে নেপাল)

৩।

কবির আশপাশের জীবনযাত্রা।

[মাদাম লেভির ফরাসী হইতে পূর্ব্বানুবৃত্তি]

২২ নবেম্বর :—আজ সকালে বেলা ৭টায়, কর্ত্তার জন্য দর্জ্জি হাজির। এই দর্জ্জিটির বেশ-বিন্যাস নেহাৎ মন্দ নয় বলতে হবে, যেহেতু তার পরণে পাজামাও নেই, জুতাও নেই; কিন্তু একটা ময়লাটে গামছাগোছ কাপড় বেশ জাঁকালোরকমে গায়ে জড়ানো রয়েছে। মুখটি কালো, চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বলে। সে গায়ের মাপজোখ এমনভাবে নিলে, যেন নিউটন তাঁর গণনা করছেন। * * * * * * * *

তারপর ক্ষি—বাবুর আগমন; ইনি আমাদের বিশেষ জগতের শক্তিমান পুরুষদের মধ্যে একজন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম্য সঙ্গীত, কিম্বদন্তি প্রভৃতি মস্ত এক লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন। জাতিতে বৈদ্য হওয়ার দরুণ চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর জানা আছে এবং তাই নিয়েই গুছিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় ঠাকুরমশায় তাঁকে আসতে লেখেন। তিনি উত্তরে লিখলেন : আপনার কাছে যাবার উপযুক্ত উঁচুদরের মানুষ আমি নই; প্রত্যুত্তরে আবার কবি লিখলেন "আমি নীচুদরের মানুষই চাই।" ফলে ক্ষি—বাবু পরাস্ত হয়ে আশ্রমে বাস করতে এলেন।

ঠাকুরমশায়ের আকর্ষণী শক্তি, তাঁর লোককে লওয়াবার ও চুম্বকবৎ টানবার ক্ষমতা বাস্তবিক অদ্ভুত। এই যে নিভৃত মনোরম বিদ্যাপীঠ, কতকটা আমাদের Port Royal-*এর মত, অথচ তার চেয়ে হাস্যোজ্জ্বল, কোমল, আনন্দময়,—এখানে বাসকালীন আমার কতক-গুলি স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধুর কথা মনে পড়ে, যাঁরা থাকলে এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের মর্য্যাদা বুঝতে পারতেন; যে-সব বাইরের ঠাট বজায় রাখবার উদ্বেগে আমরা কাতর, যে-সব প্রয়োজনের বোঝায় আমরা এমন ভারাক্রান্ত, প্রতিবেশীর নকল করা ও সমকক্ষ হবার যে আকাঙ্ক্ষা বা আবশ্যকতা আমরা অনুভব করি—তার থেকে মুক্ত এই জীবন; এই শান্তি তাঁদের কাছে কত না উপভোগ্য হত, তাই ভাবি।

এই বুধবার ২৩শে, ৭টার সময়, মন্দিরে উপাসনা; মন্দিরটি কাঁচ ও লোহা দিয়ে তৈরি একটি অতি কদাকার ইমারৎ; শুনতে পাই তার জন্যে নাকি কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দায়ী। অনুষ্ঠানের মধ্যে জটিলতা কিছুই নেই; মন্দিরের ভিতরে ইস্কুলসুদ্ধ লোক,—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্র,—সকলেই কবিকে ঘিরে বসে; বাইরে সিঁড়ির উপর স্ত্রীলোক ও ছোট মেয়েরা থাকে। উপনিষদের শ্লোকপাঠ ও বাঙ্গলায় তার ব্যাখ্যা পড়া হয়; পৌনে ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

পরদিন সকালে উঠে আমার শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হল। বারান্দায় একটা লম্বা চৌকিতে আস্তানা গাড়লুম; পশ্চিমখোলা বলে' এখানে সারা সকালটি সুন্দর ঠাণ্ডা থাকে; দুপুর পর্য্যন্ত সেই

* বিখ্যাত ফরাসী খৃষ্টধর্ম্মসম্প্রদায়।

খানে কাটালুম, ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলুম, পড়লুম, লিখলুম। কিন্তু যতই সূর্য্যের তেজে আকাশের আলো বাড়তে লাগল, আমারও তত বেশি অসুখ করতে লাগল; এই আলোটাই আমার অস্বস্তির কারণ, সে বিষয় সন্দেহ নেই; অথচ সকালে কেমন সাদা, নরম ও পরিষ্কার থাকে। শেষে কি এর সৌন্দর্য্যের মায়া কাটাতে হবে? সেই কুৎসিৎ কালো চষমাগুলি ভিন্ন কি গতি নেই? * * * সন্ধ্যাবেলা সেই ভিক্ষু (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) তাঁর বাচ্ছা ভিক্ষু এবং একটি সিংহলী যুবককে সঙ্গে করে' আমার খোঁজ নিতে এলেন; তাঁরা ভদ্রোচিতভাবে জানতে চাইলেন আমি কোন ওষুধ খেয়েছি কি না? আমি ওষুধপত্র সম্বন্ধে আমার অনাস্থা প্রকাশ করলুম। তারপর তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রার্থনায় কি উপকার হওয়া সম্ভব নয়?—আমি বল্লুম নিশ্চয়ই, কেন হবে না। তখন তাঁরা আমার সূতোর রীল থেকে লম্বা এক খেঁই সূতো টেনে বের করে' নিয়ে দড়ি পাকালেন, ভিক্ষুটি তার একদিক ধরলেন, আমি আর এক দিক ধরলুম, বাচ্ছা ভিক্ষু মাঝ-খানটা ধরলে (বোধহয় যাতে আমাকে না ছুঁয়েও যোগাযোগ স্থাপন হয়)—তারপর তাঁদের ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সুদীর্ঘ বৌদ্ধ উপাসনামন্ত্র ধ্বনিত হতে লাগ্‌ল। প্রার্থনা শেষ হলে আমি স্বীকার করলুম যে, এরই মধ্যে আমার অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে। তাঁরা সূতোটা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে বল্লেন রাত্রে বালিশের তলায় রেখে দিতে, তারপর কাল সকালে তাঁরা এসে আবার আরম্ভ করবেন। কিন্তু যখন তাঁরা এলেন, তখন আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে' আমার ভোগলিকের সঙ্গে পড়াশুনা করছি। ওঁরা সম্প্রতি যে বৌদ্ধ-সম্মিলনীতে যোগ

দেবার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন, তা'তে এই সুন্দর গল্পটি বেশ বল্‌তে পারবেন।

* * * * * * * *

এখানকার ইস্কুলটি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে অভিনব প্রতিষ্ঠান। কবি যখন অবসর গ্রহণ করে' তাঁর পিতার কাছে শান্তিনিকেতনে নির্জ্জনবাস করতে এলেন, তখন গুটিকতক ছেলেকে তাঁর মত এবং ইচ্ছানুযায়ী গড়ে' তোল্‌বার সঙ্কল্প করলেন। প্রথমে অল্প কয়েকজন এল। ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচারব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা অবলম্বন করাই ছিল প্রথম ও মূল নিয়ম। প্রথম প্রথম কোন কোন ছেলে নিম্নতর জাতের সঙ্গে একত্রে বসে' খেতে একটু অপ্রবৃত্তি বোধ করত, তাদের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে চল্‌বার স্বাধীনতা দেওয়া হত। ক্রমশঃ হিন্দুর প্রাণে একান্ত গভীরভাবে বদ্ধমূল এই কুসংস্কার একটু শিথিল হল, এবং এখন অধিকাংশ ছেলেই ভ্রাতৃভাবে একত্রে বসবাস করে। কেবলমাত্র জনকতক গুজরাটী ও মারহাট্টী বেশী গোঁড়া ছেলে এখনো আলাদা খায়। * * * ছেলেরা খুব ছোট, ১২ বৎসর বয়েসের কম না হলে নেওয়া হয় না। এখানকার শিক্ষাসোপান তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌঁছে দেয়; এবং এখন থেকে আশ্রমে অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হতে পারবে, কারণ বিশ্বভারতী বা আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভোর ৫টায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটবড় সকলকে ঘুম থেকে তোলা হয়। তারপর গান, উপাসনা, ধ্যানধারণা; গান দিয়েই আবার দিন শেষ হয়। খাওয়াদাওয়ায় নিরামিষের ব্যবস্থা কড়াকড়; শোবার ঘর

ছেলেরা নিজেই সাফ করে। তাদের বিছানা?—এক তক্তা-পোষের উপর একটা কাপড় ঢাকা; ঘরকন্নার কাজে বিশেষ সময় লাগে না। তারা কিছুদিনের জন্যে এক একজনকে নেতা বা কাপ্তেন পদে বরণ করে, সে নিজের দলের তত্ত্বাবধান করে; দেখে শুনে ত মনে হয় বেশ নিখিঁকিচে সংসারযাত্রা চলে' যাচ্ছে।

২৬ নবেম্বর।—সকালেই কবির আগমন, তিনি শিষ্টতাপূর্ব্বক আমার খবর নিতে এসেছেন। দীর্ঘ কথোপকথন, আমি সানন্দে শুনতে লাগলুম। তিনি শ্রান্ত, তিনি সহরের হাঙ্গাম ও হুজ্জুৎ এড়াবার জন্যে এখানে বাস করতে এলেন, আর তাঁর চারপাশে এখানেই এক সহর গড়ে' উঠছে। যেন এমন প্রাণপ্রতিষ্ঠাতার চতুর্দ্দিকে দূরতম বিজনতাও লোকালয় হয়ে উঠতে বাধ্য নয়। কৃষি বিদ্যালয় গড়ে' তোলবার উদ্যোগ হচ্ছে, তাঁর স্কুলের জমিতে তার পত্তন করেছেন। সেটি আশ্রমের অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, তার বাগান এত মস্ত যে এখান থেকে মনে হয় যেন একটি ছোট বনবিশেষ। ভারতের জাতীয় কবি তাঁর দেশের তরুণদের রাজোচিত দানখয়রাৎ করছেন।

২৭ নবেম্বর।—বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে সি—এর বক্তৃতা। কলকাতা থেকে জন কুড়িক শ্রোতা এসেছিল, তার মধ্যে তিনজন বক্তৃতার পর আমাদের এখানে এসে অনেকক্ষণ রইল। প্রথমে লেখাপড়া পরীক্ষাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়ে পরে রাজনীতির কথা উঠল,—যে রাজনীতিতে এদের সমস্ত জীবন এমন ওতঃপ্রোত, এবং লেখাপড়ার চর্চ্চা এমন ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চলে' যেতে না যেতে অপর একটি যুবক এল, যার ভাইকে আমরা প্যারিসে চিনতুম। সেই একই প্রসঙ্গ প্রায় একই

ভাষায় উত্থাপিত হল। এই বৃহৎ দেশের মানসিক তিক্ততা, আর এই দুই বৃহৎ জাতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভরা বিরুদ্ধতা দেখলে খারাপ লাগে। দিনশেষে আমরা শুতে যাব মনে করছি, এমন সময় জোসেফ তার হিসেব নিয়ে এল। আসছে হপ্তায় অবশ্য সে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ও পরে নেপালে যাবে,—কিন্তু "সাহেব মেমসাহেবের কাশ্মীর যাওয়া উচিত নয়, সেখানে গোলমাল হবার সম্ভাবনা।" পরে এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যান সুরু হল,—এবারত ওর পালা,—তা'তে জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ানরা (কখনো কখনো তাদের বল্‌ছিল অষ্ট্রেলিয়ন) বোল্‌শেভিকদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের খেলা খেল্‌তে লাগ্‌ল। "আর আফ্‌গানিস্থান—এই কাবুলীরা কাশ্মীরীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, তারাই কাশ্মীর নিয়ে নেবে! সত্যি, বাজারে অনেক জিনিষ শোনা যায়, যা' সাহেবরা জানেন না।" সেকন্দর শা এখনো জীবিত, অথচ এরই মধ্যে তাঁর রাজ্যভাগ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায়, খাবার আগে, কলাভবনে সম্মিলন। আমরা যখন এলুম, সবাই সেখানে জড় হয়েছে ও আসনপিঁড়ি হয়ে বসে' আছে—সেই স্তব্ধ নিশ্চল ভাবে যা' প্রাচ্যদেশের বিশেষত্ব, যদিও এ দেশের লোক চেঁচাতে ও হাত পা নাড়তে বিলক্ষণ পারে। একটি যুবক বক্তৃতা করলে, এ ভবনের সে একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র, এবং তার উপরেই এঁদের আশাভরসা; তার বয়স বছর আঠারো, মুখ চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত প—সাহেব বলে' একজন ফরাসী ভারতবাসীর পোষ্যপুত্র। সে "দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু আচারব্যবহার" সম্বন্ধে বল্লে। তার বক্তৃতা হয়ে গেলে পর—সব চুপ। ফরাসী

অধ্যাপক বল্লেন যে, এই সাধারণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গবেষণার ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করে' আনলে ভাল হয়; যদি কোন যুবক, নিজের ঠাকুরদাদার আমল থেকে নিজের আমল পর্য্যন্ত তার আপন পরিবারের আচারব্যবহার তার চোখের সামনেই কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, শুধু সরলভাবে তাই লিপিবদ্ধ করে, তাহলেও মহৎ উপকার সাধন হয়। একজন মারাঠী সেকালের আচারবিচার সম্বন্ধে একালের শৈথিল্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ঠাকুরমশায় তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ অথচ মহান ভাবে আলোচনাকে উচ্চতর স্তরে তুলে ক্রমোবিকাশের আবশ্যকতার কথা বল্লেন, যা' নইলে জীবনের অস্তিত্বই থাকে না।

(ক্রমশঃ)